লোকসঙ্গীত

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১০

লোকসঙ্গীত

সম্পাদক
মুহম্মদ নূরুল হুদা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

www.pathagar.com

প্রকাশক
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
৫, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড
নিমতলী, ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৭

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রকাশকের পূর্বানুমতি ছাড়া এই গ্রন্থ বা এর কোনো অংশবিশেষ মুদ্রণ বা ইলেক্ট্রনিক কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না।

খণ্ডটি এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারী প্রেস, স্বামীবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৫০০.০০ টাকা

ISBN 984-300-000966

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা

প্রধান সম্পাদক: অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: অধ্যাপক সাজাহান মিয়া

সমীক্ষামালা	সম্পাদক
১. প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য	অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান
২. স্থাপত্য	অধ্যাপক এ.বি.এম. হোসেন
৩. রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি	অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ
৪. সাংস্কৃতিক ইতিহাস	অধ্যাপক কে.এম. মোহসীন অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ
৫. আদিবাসী জনগোষ্ঠী	মেসবাহ কামাল অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম সুগত চাকমা
৬. ভাষা ও সাহিত্য	অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
৭. লোকসংস্কৃতি	অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
৮. চারু ও কারু কলা	লালা রুখ সেলিম
৯. প্রবাদ-প্রবচন (শুধু বাংলা সংস্করণ)	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
১০. লোকসংগীত (শুধু বাংলা সংস্করণ)	মুহম্মদ নূরুল হুদা
১১. বস্তুগত ঐতিহ্য (শুধু ইংরেজি সংস্করণ)	অধ্যাপক হেনরী গ্লাসী ড. ফিরোজ মাহমুদ
১২. পরিবেশনা শিল্পকলা (শুধু বাংলা সংস্করণ)	ড. ইসরাফিল শাহীন

www.pathagar.com

প্রধান সম্পাদকের কথা

২০০৪ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা' নামে তিন বছর মেয়াদী একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে একটি জরিপ-ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা এবং গবেষণাসমূহ সিরিজ আকারে প্রকাশ করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সোসাইটির কাউন্সিল (কার্যকরী পরিষদ) প্রফেসর কে.এম. মোহসীন-এর সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে। আমার ওপর ন্যস্ত হয় প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব এবং প্রফেসর সাজাহান মিয়াকে প্রদান করা হয় এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্ব। সকল সম্পাদক ও গবেষণা সহযোগীর প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি মোটামুটি ধার্য সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

আমরা এ সমীক্ষামালাটির চিন্তা করেছি এই উপলব্ধি থেকে যে, নানা কর্মকাণ্ড ও বিশ্বায়নের অভিঘাতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় নানামুখী পরিবর্তন আসছে এবং এসব পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির বিদ্যমান বিভিন্ন ধারা উপধারা যদি এখনই জরিপের মাধ্যমে শনাক্ত করে একটি মানদণ্ড (বেঞ্চমার্ক) তৈরি করা না যায় তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিবর্তন ধারায় বাংলার পূর্ব ধারার সংস্কৃতি শনাক্তকরণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং এমনকি ঐ ধারা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়েও যেতে পারে। সিদ্ধান্ত হয় যে, আমাদের সমীক্ষাটি হবে বিষয়গতভাবে ব্যাপক। সংস্কৃতির বহুমুখিতাকে শনাক্ত করে একে এক সূত্রে গেঁথে সমীক্ষামালাটি প্রকাশ করা গেলে এমন একটি মানদণ্ড তৈরি হতে পারে যা ভবিষ্যতের পরিবর্তনের গতিধারার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে পারে। সংস্কৃতির গতি ও পরিবর্তন ধারা নির্ণয় ও সংরক্ষণের জন্য অনেক দেশেই নানা ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের কাজে সরকারি ও বেসরকারি অনেক সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্থায়ী তথ্য-ভাণ্ডার নির্মাণে এমন কোনো সক্রিয় প্রতিষ্ঠান এখনও গড়ে উঠেনি। এ শূন্যতা পূরণ করতে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সংস্কৃতির পরিবর্তন-অপরিবর্তনের ধারা-উপধারাগুলি শনাক্ত করা এবং বিচার বিশ্লেষণ করা। বাংলাদেশে এখনও এমন কোনো ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নি যা কিনা উক্ত উদ্দেশ্যে জরিপ কার্য চালিয়ে যেতে পারে। এখন সময় এসেছে জরিপ কার্যটি সম্পন্ন করা।

এমন মনে করার কারণ রয়েছে যে, অনেক পরিবর্তন ও সংযোজনের পরও বাঙালি সংস্কৃতির অনেক উপাদান এখনও পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমানকে জরিপ করে একটি মাইলফলক নির্মাণ করা দরকার, যা হবে ভবিষ্যতের সংস্কৃতি গবেষণার দিক নির্দেশক। সংস্কৃতির যেসব ক্ষেত্র আমরা বর্তমান সমীক্ষামালায় অন্তর্ভুক্ত করেছি সেগুলি হলো: ১. প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য; ২. স্থাপত্য; ৩. রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি; ৪. সাংস্কৃতিক ইতিহাস; ৫. আদিবাসী জনগোষ্ঠী; ৬. ভাষা ও সাহিত্য; ৭. লোকসংস্কৃতি; ৮. চারু ও কারু কলা; ৯. প্রবাদ-প্রবচন; ১০. লোকসংগীত; ১১. বস্তুগত ঐতিহ্য এবং ১২. পরিবেশনা শিল্পকলা। সারাদেশের সকল বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠানের তথ্য সম্বলিত একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করাও এ প্রকল্পের একটি অংশ।

একের পর এক বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশের সংস্কৃতির ধারা যুগে যুগে নতুন মোড় নিয়েছে এবং এর সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে এর অভ্যন্তরীণ রূপের ও অভিব্যক্তির। এ বৈশিষ্ট্য মনে রেখেই প্রকল্পটির

www.pathagar.com

পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করল যা কিনা পূর্বেকার সকল পরিবর্তন ধারাকে অতিক্রম করেছে। মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মূলত বাংলার সংস্কৃতির মুক্তিকে কেন্দ্র করেই। মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে ছিল বাঙালির মুক্তি, বাঙালির সংস্কৃতির মুক্তি, বাঙালি সত্তার মুক্তি। মুক্তির গান ছিল সংস্কৃতি-নির্ভর। তাই আমাদের গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো যুগে যুগে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশধারার চরিত্র নির্ণয় করা। আমরা লক্ষ করেছি কীভাবে বারে বারে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সংস্কৃতির সকল বিভাগে পরিবর্তন ঘটেছে। আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে প্রতিটি বিদেশী শক্তি দেশ শাসন করেছে এর নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশাসন অনুসারে। এর মানে প্রতিটি নতুন রাজশক্তির সঙ্গে সংস্পর্শ ও সংঘাত ঘটেছে বাঙালি সংস্কৃতির এবং সংঘাতে টিকে থাকতে হয়েছে নানা সমঝোতা ও মিথস্ক্রিয়া কৌশলের মাধ্যমে। অর্থাৎ বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে সাংস্কৃতিকভাবে আপোষ করা যেন একরকম একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বঙ্গ-বদ্বীপ যেমন গড়ে উঠেছে উজান থেকে আসা পলিমাটি দিয়ে, তেমনি বঙ্গ-বদ্বীপের মানুষের সংস্কৃতির অনেকটাই গড়ে উঠেছে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে। লক্ষণীয় যে, নানা জাতি ও নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে কখনই দৃশ্যত কোনো সংঘাত ঘটেনি, কোনো সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যও তৈরি হয় নি। বরঞ্চ দেখা যায় যে, সব সময়ই দেশী-বিদেশী সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে একটি তৃতীয়মাত্রার অভিনব সংস্কৃতি যা পুরনো সংস্কৃতিকে সাথে করে নির্মাণ করছে এর নতুন গতিধারা। এ সংশ্লেষণে দেখা যায় নানা রঙের, নানা উজ্জ্বলতার এক মিথস্কৃত সাংস্কৃতিক নকশা। সাগর পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের প্রভাবে যেমন বালির মধ্যে গড়ে উঠে ঢেউয়ের আদলে মনোরম নকশা, দেশী সংস্কৃতির উপর বিদেশী সংস্কৃতির ঢেউয়ের প্রভাবটি যেন ঠিক একই রকম। দেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বিদেশী সংস্কৃতির উপাদানগুলি গ্রহণ, বর্জন, সংশ্লেষণের মাধ্যমে সব সময়ই একটি মিশ্র সংস্কৃতির নকশা তৈরি করেছে, যার ফলে দৃশ্যত কোনো সংঘাত ছাড়াই ঐ মিশ্র সংস্কৃতির ধারা বঙ্গ-বদ্বীপ অঞ্চলের সামাজিক সৈকতে যুগে যুগে নির্মাণ করেছে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঢেউয়ের নকশা। অজান্তেই এ ধারা প্রভাবিত করেছে বৈদেশিক শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বঙ্গবাসীর সম্পর্ক। ফলে এই মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান একদিকে যেমন বহুমাত্রিকতা অপর দিকে ঐক্যতানও। এর প্রবহমানতা থেকে তৈরি হয়েছে বাঙালি জাতিসত্তা ও বাংলা ভাষা। বিজ্ঞ সম্পাদকগণ তাঁদের স্ব স্ব খণ্ডের পরিকল্পনায় বাঙালি জাতির এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন।

সম্পাদক এবং লেখকগণ তাঁদের স্ব স্ব আলোচনায় সব সময়েই চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে তথ্য-নির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ থাকতে। তথাপি, আমরা মনে করি না যে, আমরা সংস্কৃতির সকল স্তর ও এর সার্বিক সত্যকে তুলে ধরতে পেরেছি। সাংস্কৃতিক গবেষণা খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে পড়ে না। গবেষকের ব্যক্তিগত মনোভঙ্গি এখানে প্রবল। তাই দেখা যায়, জ্ঞানের এ শাখায় ঐকমত্যের চেয়ে ভিন্নমতই বেশি বিদ্যমান। তবে বাঙালি সংস্কৃতির গোটা সময় ও সকল যুগের ধারাকে একটি সমীক্ষামালার মধ্যে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা এটাই প্রথম। এতটুকুই আমাদের কৃতিত্বের দাবি। এই সমীক্ষামালার লক্ষ্য হচ্ছে বিবরণের চেয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া এবং এর মাধ্যমে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।

আপাতত বাংলাদেশ সংস্কৃতির মোট বারোটি দিক নিয়ে সমীক্ষামালাটির যাত্রা শুরু। ভবিষ্যতে আরও নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এই সমীক্ষামালায়। বাঙালি ও বিদেশী পাঠকদের সুবিধার্থে দুটি ছাড়া সমীক্ষামালাটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হলো। তদুপরি এর সঙ্গে প্রকাশিত হলো খণ্ডগুলির ইলেকট্রনিক সংস্করণও। সোসাইটির একটি নীতি হলো এর বিশেষ প্রকাশনা বাংলা-ইংরেজি সংস্করণের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক সংস্করণও প্রকাশ করা।

বিষয়-ভিত্তিক খণ্ডগুলি 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা' নামে প্রকাশিত। এ সমীক্ষামালার প্রতিটি খণ্ড সংস্কৃতির একটি শাখার উপর আলাদাভাবে প্রণীত হয়েছে। প্রতি খণ্ডের একটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে

www.pathagar.com

এ সংখ্যা কেবলই সমীক্ষামালার মুদ্রণ সংখ্যা নির্দেশ করছে। বিষয়গতভাবে খণ্ডগুলি একটি অপরটি থেকে আলাদা। বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালাটি একদল পণ্ডিতের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল। প্রকল্পটির আইডিয়া থেকে শুরু করে তা সম্পন্ন ও প্রকাশ করা পর্যন্ত প্রতি স্তরে অবদান রেখেছেন অনেক বিজ্ঞ সম্পাদক, কমিটি সদস্য, লেখক, অনুবাদক, গবেষণা ফেলো, গবেষণা সহকারী, রিভিউয়্যার, কপি সম্পাদক, শিল্পী, আলোকচিত্রী, মানচিত্র বিশেষজ্ঞ, গ্রাফিক ডিজাইনার ও আরও অনেকে। সমীক্ষামালার যা অর্জন তা সবই এই বিশাল টিমের ব্যক্তিগত ও সামষ্ঠিক কৃতিত্বের ফল। তাঁদের সবাইকে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই। সমীক্ষামালাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য যেসব বিষয় সম্পাদক অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ, প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেন, প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর কে.এম. মোহসীন, প্রফেসর শরীফ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, মেসবাহ কামাল, প্রফেসর জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা, লালা রুখ সেলিম, ড. ইসরাফিল শাহীন, প্রফেসর হেনরী গ্লাসী, ড. ফিরোজ মাহমুদ এবং মুহম্মদ নূরুল হুদা। তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রকল্পটির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংস্কৃতি ও অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বরাবর আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা সরকার, বিশেষ করে সংস্কৃতি ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা আশা করি যে, প্রকল্পটির সাফল্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সহযোগিতা দিতে সরকার আরও উদারতার সঙ্গে এগিয়ে আসবে।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষাটি নানাভাবে জাতীয় গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশনাটি হাতে নিয়ে এবং সময়মতো ও সফলভাবে সম্পন্ন করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ও প্রসারে আবারও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখল। সোসাইটির কাউন্সিল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকল্প কমিটি ও সম্পাদকের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, কাউন্সিল প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ওপর যে আস্থা ও প্রত্যাশা স্থাপন করেছে তা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমান কাউন্সিলের সময়ে সম্পন্ন হলেও শুরু হয়েছে আগের কাউন্সিলের সময় (২০০৪-২০০৫)। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি উভয় কাউন্সিলের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সোসাইটির সভাপতি (২০০৪-২০০৭) প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ-এর নিকট। তাঁর আকর্ষণীয় নেতৃত্ব আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মাহফুজুর রহমান (২০০৪-২০০৫) প্রকল্পটির প্রারম্ভে এর নানা খুঁটিনাটি তথ্য ও হিসাব নিকাশের ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর উত্তরসূরি সাধারণ সম্পাদক এবং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক প্রফেসর সাজাহান মিয়া ছিলেন আমার নিত্যসঙ্গী। প্রকল্পে জড়িত এসব পণ্ডিতজনের সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ডিসেম্বর ২০০৭ — সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

দেশের বহমান জনজীবনের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির পর্যালোচনা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক পরিকল্পিত, গৃহীত ও সম্পাদিত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। আজ থেকে চার বছর আগে ২০০৪ সালে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন খণ্ডের বিষয়বৈচিত্র্য বাংলাদেশের 'প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য' থেকে 'পরিবেশনা শিল্পকলা' পর্যন্ত সুবিস্তৃত। দশম খণ্ডের বিষয়বস্তু 'লোকসঙ্গীত'। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে এই খণ্ড প্রণযনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়। এজন্য আমি এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সমীক্ষামালার মধ্যে সমরূপীয় আরও দু'টি বিষয় 'লোকসংস্কৃতি' ও 'প্রবাদ-প্রবচন' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'লোকসঙ্গীত' বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে 'লোকসংস্কৃতি'-রই মুখ্য অঙ্গ। লোকসংস্কৃতির প্রধান দুই বিভাজন মূর্ত ও বিমূর্ত রূপ। লোকসঙ্গীত এই দুয়ের সংশ্লেষণে একটি মিশ্রসৃষ্টি। বাণী ও গীতি বিমূর্ত প্রকৃতির হলেও এর সঙ্গে যে সব লোক-উদ্ভাবিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তার রূপ মূর্ত। বাঙালি সংস্কৃতির উৎস যেমন লোকসংস্কৃতি, তেমনি লোকসংস্কৃতিরও মুখ্য উৎস ও অভিব্যক্তি লোকসঙ্গীত। কাজেই এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃপক্ষ ও বিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই 'লোকসঙ্গীত' সম্পর্কে একটি পৃথক গ্রন্থ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বাস্তব মাঠ-জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত হালনাগাদ লিখিত প্রতিবেদন এবং সনাক্তকৃত সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তিসমূহের মহড়া ও চূড়ান্ত অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের পর বাংলাদেশে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রচলিত লোকসঙ্গীতসমূহ দলিলিকরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এলাকাভিত্তিক প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই ও সম্পাদনার পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির মঞ্চে দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল থেকে উপস্থাপিত লোকসঙ্গীত দলের অনুষ্ঠান ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণ ও প্রকাশ করা হবে।

একটি প্রমিত ছকের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সনাক্তকৃত সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহ থেকে তৃণমূলীয় গবেষক, প্রতিবেদক ও শিল্পীদের দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। নগর-সংস্কৃতির প্রভাবে লোকসংস্কৃতির যে অনভিপ্রেত বিকৃতি ঘটছে, তাকে প্রতিরোধকল্পে আবহমান বাংলার লোকসঙ্গীতের মৌলিক ও অবিভাজ্য ধারাটি জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যেই মূলত স্থানিক পর্যায়ের গবেষক, প্রতিবেদক ও শিল্পী নির্বাচন করা হয়েছে। পহেলা ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে গ্রন্থের পরিকল্পনা, প্রাথমিক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি, মাঠ-জরিপ, মাঠ-পর্যায়ের অনুষ্ঠানের মহড়া পর্যবেক্ষণ, দেশব্যাপী তৃণমূলীয় সঙ্গীতদল ও শিল্পী সনাক্তকরণ, লিখিত প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্র সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং সবশেষে তিনদিনব্যাপী একটি সমন্বিত লোকসঙ্গীত উৎসব (২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮) আয়োজনের মতো কর্মযজ্ঞ সূচিত ও সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের সর্বাঞ্চলের লোকগবেষক, গীতিকবি, শিল্পী, এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞ পরিষদ, কর্মকর্তা ও দেশের তাবৎ সংস্কৃতিপ্রেমী, সাংবাদিক ও মিডিয়ার সমর্থনে মাত্র তিন মাস সময়ে এই উৎসব সফলভাবে আয়োজিত হয়। এ-সবেরই প্রত্যক্ষ ফসল এই 'লোকসঙ্গীত' গ্রন্থ, যা সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালার দশম খণ্ড হিসেবে চিহ্নিত। এ-ছাড়া, অনধিক দশটি ডিভিডি-তে পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানমালাও অতি শীঘ্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সময়ের আত্যন্তিক স্বল্পতার কারণে কোনো কোনো প্রতিবেদনে অপূর্ণতা রয়ে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে আমরা যথাসাধ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা নিরসনের চেষ্টা করবো। কিছু অনতিক্রম্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের চলমান লোকসঙ্গীত সনাক্তকরণ, দলিলিকরণ, বাণিজ্যিক মূল্যমান নির্ধারণ, উৎস ও বিস্তৃতিস্থল নির্ণয় এবং মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে এই প্রতিবেদনমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

www.pathagar.com

এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞ কাউন্সিল এই লোকসঙ্গীত উৎসব-এর অনুমোদন দিয়ে এবং প্রকল্প পরিচালনা কমিটি খণ্ডটি সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। নিবেদিতপ্রাণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রাহক, প্রতিবেদক, গবেষক, লোকসঙ্গীত সম্মেলনের সম্মানিত উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, সভাপতি, আলোচক, শিল্পী, কলাকুশলী ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নানা সময়ে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে এই দুরূহ কর্মসম্পাদনে সাহসী করেছেন। এ জন্যে তাঁরা সবাই আমার ধন্যবাদার্হ। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রধান সম্পাদক প্রফেসর সিরাজুল ইসলামকে, যাঁর নিরন্তর তাগিদ, পরামর্শ, সজাগ দৃষ্টি ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আমাকে আমার কর্তব্য সম্পাদনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাহফুজা খানম এবং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক অধ্যাপক সাজাহান মিয়াকে, যাঁরা প্রতিনিয়ত পরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। এ-গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশনা পর্যায়ে লোকসঙ্গীত উৎসবের সমন্বয়কারী মিস মুর্শিদা বিনতে রহমান, এশিয়াটিক সোসাইটির কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ জনাব মুকবিল হোসেন, অন্যান্য কম্পিউটার কুশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্যে তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মার্চ ২০০৮ — মুহম্মদ নূরুল হুদা

www.pathagar.com

সম্পাদক

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	প্রধান সম্পাদক, বাংলাপিডিয়া
অধ্যাপক সাজাহান মিয়া	দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান	প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক এ.বি.এম. হোসেন	প্রফেসর এমেরিটাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ	উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, ঢাকা
অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ	রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক কে.এম. মোহসীন	ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ	ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেসবাহ কামাল	ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম	নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সুগত চাকমা	পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ	বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লালা রুখ সেলিম	সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মুহম্মদ নূরুল হুদা	পরিচালক (অব.), বাংলা একাডেমী
অধ্যাপক হেনরী গ্লাসী	লোকসংস্কৃতি অধ্যাপক, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র
ড. ফিরোজ মাহমুদ	গবেষক, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র
ড. ইসরাফিল শাহীন	সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

মহিবুর রহিম	প্রভাষক, বাংলা, চিনাইর কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শফিকুর রহমান চৌধুরী	প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
সাইমন জাকারিয়া	পাণ্ডুলিপি সম্পাদক, ফোকলোর উপবিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
মিজানুর রহমান	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা, সরকারি এম.এম কলেজ, যশোর
মহসিন হোসাইন	সহ-সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা
ইসহাক চৌধুরী	সিনিয়ন বিবলিওগ্রাফার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
মালিক সোবহান	প্রভাষক, বাংলা, রামু ডিগ্রি কলেজ, কক্সবাজার
সুগত চাকমা	পরিচালক, রাঙামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি
শেখ গোলাম সারোয়ার জহিরুদ্দিন	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান কলেজ, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম
বিমান বিশ্বাস	খণ্ডকালীন শিক্ষক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শাহিদা খাতুন	উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমী
রীতা ভৌমিক	সাংবাদিক, দৈনিক সমকাল, ঢাকা
তপন বাগচী	সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা
দেবাশীষ চক্রবর্তী	প্রভাষক, ইতিহাস, অমৃতলাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল
প্রিন্স রফিক খান	অধ্যক্ষ (অব.) মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ কলেজ, নিকলী, কিশোরগঞ্জ
লুলু আব্দুর রহমান	সিনিয়র শিক্ষক, শ্রীবরদী এ.পি পাইলট ইন্সটিটিউট, শেরপুর
শফিউদ্দিন তালুকদার	সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, শমসের ফকির কলেজ, নিকরাইল টাঙ্গাইল
ফরিদ আহমেদ দুলাল	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ শাখা
মতেন্দ্র মানখিন	মিশনারী বিদ্যালয় পরিদর্শক
নাজমূল হক	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, দিনাজপুর সরকারি কলেজ
মোতাহার হোসেন সূফী	অধ্যাপক (অব.), কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ
পরিতোষ কুণ্ডু	সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ
শহীদ সারোয়ার আলো	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, মোহিপুর ডিগ্রি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মাযহারুল ইসলাম তরু	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মাহফুজুর রহমান	লেখক ও গবেষক
দীপঙ্কর মোহান্ত	ইন্সট্রাক্টর পিটিআই, সিলেট
হামোম তনুবাবু	প্রাক্তন পরিদর্শক, বিআরডিবি

www.pathagar.com

সূচিপত্র

	ভূমিকা	*vx-xix*
১.	**কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল**	১-৩৫
	১.১ কুমিল্লা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত	১
	১.২ নোয়াখালী অঞ্চলের লোকসঙ্গীত	২২
২.	**খুলনা অঞ্চল**	৩৬-৭২
	২.১ কুষ্টিয়া জেলার লোকসঙ্গীত	৩৬
	২.২ খুলনা বিভাগের লোকসঙ্গীত	৫৩
	২.৩ যশোর জেলার লোকসঙ্গীত	৬২
৩.	**চট্টগ্রাম অঞ্চল**	৭৩-১৩৭
	৩.১ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকসঙ্গীত	৭৩
	৩.২ চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত	৯৪
	৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের লোকসঙ্গীত	১২০
	৩.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের লোকসঙ্গীত	১২৫
৪.	**ঢাকা অঞ্চল**	১৩৮-১৯১
	৪.১ ঢাকা বিভাগের লোকসঙ্গীত	১৩৮
	৪.২ ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীত	১৪৯
	৪.৩ নরসিংদী জেলার লোকসঙ্গীত	১৬১
	৪.৪ ফরিদপুর অঞ্চলের লোকসঙ্গীত	১৮০
৫.	**বরিশাল অঞ্চল**	১৯২-২০৯
	৫.১ বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীত	১৯২
৬.	**ময়মনসিংহ অঞ্চল**	২১০-২৭২
	৬.১ কিশোরগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত	২১০
	৬.২ জামালপুর জেলার লোকসঙ্গীত	২২৪
	৬.৩ টাঙ্গাইল জেলার লোকসঙ্গীত	২৩৪
	৬.৪ ময়মনসিংহ জেলার লোকসঙ্গীত	২৪৩
	৬.৫ গারো-হাজংদের লোকগীতি	২৬৬
৭.	**রংপুর অঞ্চল**	২৭৩-২৯৮
	৭.১ দিনাজপুরের লোকসঙ্গীত	২৭৩
	৭.২ বঙ্গপুরের (রংপুরের) লোকসঙ্গীত	২৮৩

www.pathagar.com

৮.	**রাজশাহী অঞ্চল**	২৯৮-৩৪৫
	৮.১ পাবনা জেলার লোকসঙ্গীত	২৯৮
	৮.২ বগুড়া জেলার লোকসঙ্গীত	৩১০
	৮.৩ রাজশাহী বিভাগের লোকসঙ্গীত	৩১৯
	৮.৪ ওরাওঁ ও সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর লোকসঙ্গীত	৩৩২
৯.	**সিলেট**	৩৪৬-৪০৩
	৯.১ সিলেট বিভাগের লোকসঙ্গীত	৩৪৬
	৯.২ সিলেট জেলার লোকসঙ্গীত	৩৬২
	৯.৩ মণিপুরী লোকসঙ্গীত (মীতৈ)	৩৮৯
	৯.৪ মণিপুরী লোকসঙ্গীত (বিষ্ণুপ্রিয়া)	৩৯৮
	পরিশিষ্ট	৪০৪
	১. ছক	৪০৪
	২. লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর কর্মসূচি	৪০৫
	৩. সেমিনার প্রতিবেদন	৪০৮
	নির্ঘণ্ট	৪৩১

www.pathagar.com

ভূমিকা

১. বাংলার লোকসংস্কৃতি

বাংলার লোকসংস্কৃতি তার আদি ও অনার্য জনগোষ্ঠির ক্রমবিবর্তিত জীবনায়নের বহুমাত্রিক শৈল্পিক অভিব্যক্তি, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত, নবায়িত ও সম্প্রসারিত। এই লোকজ অভিব্যক্তি মূলত এই গাঙ্গেয় অববাহিকার গণমানুষের পরিশ্রুতিপ্রবণ লোকজ্ঞানের ফসল। আবশ্যকীয়ভাবেই তা লোকমুখে প্রচারিত, লোকশ্রুতিতে গৃহীত ও লোকস্মৃতিতে সংরক্ষিত। এভাবে একটি জনসম্প্রদায়ের নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বসহ জাতিতত্ত্বের তাবৎ মিশ্র-উপাদান লোকসংস্কৃতির প্রবহমানতায় ঐতিহ্যিকভাবে সুপ্ত। ফলে একটি জনগোষ্ঠির জাতিগত পরিচয়ের মৌলিকতা, স্বকীয়তা ও অবিভাজ্যতা তার লোকসংস্কৃতিতে প্রতিফলিত। আধারগত বিচারে গণমানুষের এই নান্দনিক অভিব্যক্তির দুই রূপ: মূর্ত ও বিমূর্ত। যা-কিছু স্পর্শগ্রাহ্য তা-ই মূর্ত, আর যা-কিছু কেবল অনুভবগ্রাহ্য তা-ই বিমূর্ত। মূর্ত অভিব্যক্তির মধ্যে প্রধানত বিচিত্র প্রকৃতির হস্তশিল্প, মাটির কাজ, পোড়ামাটির কাজ, বাঁশ-বেত-কাঠের কাজ, নক্সীকাঁথা, শোলার কাজ, পিঠেপুলি, অলঙ্কার, হাতির দাঁতের কাজ, কৃষি-যন্ত্রপাতি, মৎস্য-যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র, লোকচিত্রকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি প্রধান। আর বিমূর্ত অভিব্যক্তির মধ্যে স্মরণবাহিত লোকসাহিত্য (যথা প্রবাদ প্রবচন, কিসসা-কাহিনী-কিংবদন্তি, ধাঁধা, লোকছড়া, পথকবিতা, লোকনাট্য ইত্যাদি), সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি বা লোকসঙ্গীত (যথা ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, জারি, সারি, পালা, গম্ভীরা, সুফী, মাজার, মাইজভান্ডারি, কীর্তন, হওলা, রয়ানি ইত্যাদি) এবং সকর্মক অভিব্যক্তি (যথা গ্রামীণ খেলাধূলা, মেলা, পার্বণ, উৎসব, নৃত্য, যাত্রা ইত্যাদি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয়, সামাজিক, নান্দনিক, বিনোদনিক, জাগতিক ও হিতকরী ইত্যাকার নানা পারলৌকিক ও ইহলৌকিক প্রয়োজন মেটায় লোকসংস্কৃতির নানা অভিব্যক্তি। তবে উৎস, বিকাশ ও কাম্যতার বিচারে এগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য লোকসঙ্গীত, যেখানে মূর্ত ও বিমূর্ত অভিব্যক্তি সমন্বিত স্বরূপে অন্তর্প্রবিষ্ট।

২. লোকসঙ্গীত লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক কেন্দ্র

লোকসঙ্গীতের এই প্রবাহ বাঙালির বহমান জীবনচর্চার সুরচঞ্চল পটচিত্র। সেইসঙ্গে লোকসঙ্গীতের নানা অভিব্যক্তির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উৎসভূমি ও বিস্তৃতিপ্রবণ বর্ণিল প্রান্তর। মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় রূপে বিদ্যমান থাকার কারণে এটিই হয়ে উঠেছে আমাদের লোকসংস্কৃতির ভারসাম্যময় ভরকেন্দ্র। তাই লোকসঙ্গীতের পঠনপাঠন, চর্চা-গবেষণা-অনুশীলন ও উপস্থাপনা সমধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। দ্রুত সম্প্রসারণশীল নগরায়ন ও মুক্ততথ্যপ্রবাহের এই অভূতপূর্ব বিস্তৃতির যুগে যখন বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী থাবার মুখে বিশ্বের ক্ষুদ্র ও স্থানিক সংস্কৃতিসমূহ বিপন্ন ও লুপ্তপ্রায়, তখন তার পুনঃসনাক্তকরণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে লোকসঙ্গীত উৎসবের পর্যায়ক্রমিক ও সমন্বিত আয়োজনের মাধ্যমে এ-কাজটি যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এতে লোকসঙ্গীতের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক চর্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। স্মর্তব্য যে, বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস রূপে স্বীকৃত হওয়া ছাড়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের দারিদ্র্য নিরসন ও সম্পদ সৃষ্টির এক মুখ্য উপায় লোকসংস্কৃতি, বিশেষত হস্তশিল্প ও লোকসঙ্গীতের পরিকল্পিত ব্যবহার।

www.pathagar.com

সেইসঙ্গে ব্যক্তি, কমিউনিটি বা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিটি অভিব্যক্তির স্বত্বাধিকারী ও উপকারভোগী নির্ধারণ। এই স্বত্ব ও উপকারভোগের ন্যায়ানুগ বণ্টনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ ও সময়োপযোগী মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন ও হালতককরণ।

বাংলার বিচিত্র লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাটিয়ালী, বাউলগান, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, কবিগান, পালাগান, বিচারগান, গাথাগান, পুথিগান, ধামাইল, হঁওলা, রয়ানি, গম্ভীরা, আলকাপ, অষ্টক, বারমাসী, গাজীর গান, পথকবিতাগান, পালকির গান, ঘাটুগান, পটগান, সুফী গান, ইসলামী আধ্যাত্মিক গান, মাজার গান, মাইজভাণ্ডারী গান, কীর্তন, রামায়ণ গান, বিয়ের গান, মেয়েলি গান, বৃষ্টির গান, হুদমার গান, নৌকাবাইচের গান, সাম্পানমাঝির গান, ধুইয়া গান, হাইল্লা গান, মাদার বক্সের গান, সাওঁতাল-গারো-হাজং-কোচ-চাকমা-মারমা-রাখাইন-ম্রো-মণিপুরী-খাসিয়াসহ বাংলার পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলে বসবাসরত সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের গান, হাসন-লালন-জালালসহ অগণিত ব্যক্তিস্রষ্টার গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অঞ্চলভিত্তিক লোকগবেষকদের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও গবেষণার ফলে এই অপূর্ণ তালিকাটি যে আরো বিস্তৃততর ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কোনো গবেষক বর্ণাক্রমিকভাবে তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে পাঁচশতাধিক লোকগীতির নাম লিখেছেন (ওহাব, ২০০৭)। তবে বর্তমান মাঠ-জরিপে এ-পর্যন্ত শতাধিক লোকসঙ্গীত প্রধানভাবে সনাক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অভিব্যক্তি নান্দনিক ও বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যমান ও ক্রমসম্প্রসারণশীল (যথা বাউল গান), কিছু কিছু বিপন্ন ও লুপ্তপ্রায় (যথা ঘাটু গান), আর কিছু কিছু অভিব্যক্তি বিলুপ্ত (যথা হুদমার গান, পট গান, ভাদু, টুসু) ইত্যাদি। উপরন্তু এ-সব অভিব্যক্তির কোনো-কোনোটি বিশেষ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে অন্যত্র বা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে মেধাস্বত্ব সুরক্ষার স্বার্থে প্রতিটি অভিব্যক্তির বাণিজ্যিক ও নান্দনিক মূল্যমানসহ উৎপত্তিস্থল ও বিস্তৃতিস্থল নির্ণয়ও জরুরি।

৩. লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা ও পরিধি

লোকসঙ্গীতের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব নয়। তবে লোকসঙ্গীত সম্মেলনে (২০০৮) অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে একটি ধারণাগত সংজ্ঞা প্রদান করা যায়। নিম্নে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার মাধ্যমে আরো সম্প্রসারিত ও স্পষ্টীকৃত হতে পারে: (ক) লোকসঙ্গীত লোকসংস্কৃতিরই মুখ্য মৌখিক অভিব্যক্তি ও উপস্থাপনা, যা যন্ত্রসহযোগে বা যন্ত্রছাড়া গীত হতে পারে। (খ) ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বলতে ঐ অঞ্চলের তৃণমূলীয় লোকমনের তাবৎ জাগতিক ও অধিজাগতিক অনুভূতির সুরারোপিত ও ঝংকৃত উপস্থাপনাকে বোঝানো যেতে পারে। (গ) লোকসঙ্গীতের স্রষ্টা প্রধানত অজ্ঞাত, তবে কখনো কখনো জ্ঞাত। (ঙ) লোকসঙ্গীত মূলত সামষ্টিক বা যৌথ সৃষ্টি, তবে কখনো কখনো একক ব্যক্তিক সৃষ্টি। (চ) লোকসঙ্গীত প্রধানত দলগত বা দ্বৈত উপস্থাপনা, তবে একক উপস্থাপনা হিসেবেও গ্রাহ্য। (ছ) লোকসঙ্গীত সাধারণত ছন্দায়িত অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্যসহযোগে উপস্থাপিত, তবে কেবল মৌখিকভাবেও গীত। (জ) লোকসঙ্গীতের বিষয় ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের যে কোনো অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত।

৪. লোকসংস্কৃতির বাণিজ্যিক মূল্য

দেশের তাবৎ মূর্ত ও বিমূর্ত সংস্কৃতিপণ্যের পরিকল্পিত বাজারজাতকরণ ও তার লোকস্রষ্টাদের সুরক্ষা করা গেলে দেশের তৃণমূলীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতেও অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। সম্প্রতি ওয়াইপো-র উদ্যোগে পরিচালিত একটি মূল্যমান জরিপে আভাসিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রতি বছর অন্যূন বারো হাজার কোটি টাকা ফোক কালচারাল গুড্স বা লোকসংস্কৃতি পণ্যের ক্ষেত্রে লগ্নিকৃত হয়ে থাকে (হুদা ২০০৬)। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, বিনোদনিক, সর্বোপরি বাণিজ্যিক দিক থেকে সমূহ গুরুত্বপূর্ণ লোকসাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মুখ্য অঙ্গ লোকসঙ্গীত সম্পর্কে তৃণমূলীয় মাঠজরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, গবেষণা-উপাত্ত ও সাঙ্গীতিক উপস্থাপনা ইত্যাদি ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে 'লোকসঙ্গীত সম্মেলন ২০০৮' আয়োজন করা হয়েছে। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে, লোকসঙ্গীতের বাণিজ্যিক মূল্যমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমান জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে আরো নিবিড় ও অনুসন্ধানী জরিপ অত্যাবশ্যক।

৫. লোকসঙ্গীত সম্মেলনের উদ্দেশ্য

এ-পর্যায়ে বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত সম্মেলন ২০০৮ (তত্ত্ব ও প্রয়োগ) আয়োজনের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও বিবেচনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ: ক. বাঙালির জাতিগত স্বকীয়তা, মৌলিকতা ও অবিভাজ্যতা সুরক্ষা; খ. বাংলার ভিন্ন ভিন্ন লোকসঙ্গীতের উৎস ও বিস্তৃতি-স্থল সনাক্তকরণ; গ. পূর্বে সনাক্তকৃত অভিব্যক্তিসমূহ পুনঃপরীক্ষণ; ঘ. বিদ্যমান ও বাণিজ্যসফল অভিব্যক্তির পরিকল্পিত ও আইনানুগ ব্যবহার; ঙ. বিপন্ন ও বিলুপ্ত অভিব্যক্তি পুনরুদ্ধার ও পুনর্জাগ্রতকরণ; চ. প্রতিটি অভিব্যক্তির স্বত্বাধিকারী ও উপকারভোগী নির্ধারণ; ছ. প্রতিটি অভিব্যক্তির মেধাস্বত্ব নির্ধারণ ও সংরক্ষণ; জ. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ; ঝ. জাতীয় প্রবৃদ্ধি সংহতকরণ; এবং ঞ. স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বিশ্বে জাতীয় ভাবমূর্তি বৃদ্ধিকরণ।

৬. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সারা দেশ থেকে প্রধানত আঞ্চলিক (জেলা ও কম্যুনিটির নিচে নয়) পর্যায়ের গবেষক, সঙ্গীত-স্রষ্টা (তত্ত্বীয়), শিল্পী, সুরকার, বাদক (প্রায়োগিক) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

বিভাগীয় লোকসঙ্গীত অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ বিভাগ ও জেলার জন্য লোকগবেষক ও অনধিক ৩টি দল প্রেরণ করেছেন।

সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত প্রমিত ছকে (পরিশিষ্ট ১) প্রত্যেক গবেষক লিখিত প্রবন্ধ প্রদান করেছেন। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র, ছবি, নকশা ইত্যাদি রয়েছে।

প্রতিটি শিল্পীদলে উপস্থাপক, শিল্পী ও লোকবাদক বা যন্ত্রীসহ ১১ জন সদস্য ছিলেন। প্রতিটি দলের সঙ্গীতানুষ্ঠানের সময়সীমা ছিল ৩০ মিনিট। তবে সুষ্ঠু রেকর্ডিং-এর প্রয়োজনে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সময়সীমায় কিঞ্চিৎ রদবদল হয়েছে।

প্রত্যেক জেলা থেকে সাধারণত একজন লোকগবেষক তাঁর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির উৎপত্তিস্থল ও পরিচয়সূচক গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি উপস্থাপনার সময়সীমা ৩০ মিনিট।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাঁর নিজ নিজ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক পোশাক পরিধান করেছেন। সম্মেলনে গবেষক, স্রষ্টা, শিল্পী, বাদকসহ পাঁচশতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। লোকসঙ্গীত সম্মেলনের প্রধান সমন্বয়কারী প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ও সিডি-র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৭. অনুষ্ঠান কর্মসূচি

(ক) সম্মেলনের তারিখ	: ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, বুধ-বৃহস্পতি-শুক্রবার
নিবন্ধন	: সকাল ৮.০০টা-১০.০০টা (২৭.২.২০০৮)
উদ্বোধন	: সকাল ১০.০০টা-১০.৩০টা (২৭.২.২০০৮)
সেমিনার	: সকাল ৯.৩০টা-দুপুর ১.৩০টা (প্রতিদিন)
আহার ও বিশ্রাম	: দুপুর ১.০০-বিকেল ৩.০০টা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	: বিকেল ৩.০০টা - রাত ৯.০০টা, প্রতিদিন
সমাপনী	: ২৯.২.২০০৮

(খ) দেশের সকল এলাকা ও আদিবাসী অঞ্চল থেকে লোকগবেষক ও শিল্পীবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণা ও সঙ্গীত উপস্থাপনা করেছেন। এই লক্ষ্যে দেশকে কয়েকটি লোকসাংস্কৃতিক অঞ্চলে

www.pathagar.com

ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক অঞ্চলকে কোনো কোনো গবেষক বিভিন্ন লোকগীতির নামেও সনাক্ত করেছেন। যথা, ভাওয়াইয়া অঞ্চল (বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর জেলা), মালসী অঞ্চল (বগুড়া জেলা ও নওগাঁ), গম্ভীরা অঞ্চল (রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর), পালা অঞ্চল (পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, শেরপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বৃহত্তর সিলেট), বাউল অঞ্চল (কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, বৃহত্তর সিলেট), ভাটিয়ালি অঞ্চল (বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম), রয়ানী (বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি), মুর্শিদি-মারেফতি-মাইজভাণ্ডারি অঞ্চল (বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ইত্যাদি), আদিবাসী অঞ্চল (পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, রাজশাহী ইত্যাদি)। এই বিভাজন ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই জরিপের সুবিধার্থে বিভাগীয় পর্যায়ে দেশের বিদ্যমান প্রশাসনিক বিভাজন বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশকে নিম্নোক্ত লোকসাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে :(১) ঢাকা (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা বাদে ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলা); (২) ময়মনসিংহ (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা); (৩) রংপুর (বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা); (৪) রাজশাহী (বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা বাদে বিভাগের অন্যান্য জেলা); (৫) খুলনা (বিভাগের সব জেলা); (৬) বরিশাল (বিভাগের সব জেলা); (৭) সিলেট (বিভাগের সব জেলা); (৮) চট্টগ্রাম (বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা); (৯) কুমিল্লা (বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলা); (১০) আদিবাসী অঞ্চল ১ (বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম); (১১) আদিবাসী অঞ্চল ২ (পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর বাইরে)।

(ঙ) জাতীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক কমিটি: সম্মেলন আয়োজনের জন্য প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অনধিক ২১-সদস্যবিশিষ্ট সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে একজন সভাপতি, একজন আহ্বায়ক ও অন্যরা সদস্য ছিলেন। কমিটি একাধিক সভায় মিলিত হয়ে সম্মেলনের রূপারেখা, কর্মপদ্ধতি ও যাবতীয় দিক বাস্তবায়নের ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন।

(চ) পরিচালনা কমিটি : সম্মেলনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ঢাকা-ভিত্তিক একটি পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক এই কমিটির প্রধান নির্বাহী ছিলেন।

(ছ) অনুশীলন ও পরিদর্শন : প্রত্যেক অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে গবেষক ও শিল্পীদল তাঁদের উপস্থাপনার অনুশীলন করেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালের মধ্যে ঢাকা থেকে দু'টি প্রতিনিধিদল প্রতিটি দলের মহড়া পরিদর্শন করেছেন।

৮. প্রকাশনা ও অন্যান্য কার্যক্রম

সম্মেলনের ধারানুক্রমিক পরবর্তী লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ: (১) সম্মেলনে পঠিত সকল প্রবন্ধ, নিবন্ধ, তথ্যবিবরণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; (২) যথাযথ সম্পাদনার পর সকল প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ; (৩) ধারণকৃত অনুষ্ঠানাদির সিডি প্রকাশ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ; (৪) ধারণকৃত অনুষ্ঠানাদি বিভিন্ন টিভি-চ্যানেল ও মিডিয়ায় সম্প্রচার; (৫) ভবিষ্যতে বার্ষিক ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে অনুরূপ সম্মেলন/সেমিনার আয়োজন; (৬) বছরের সুবিধামত সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন ও চিরুনি-জরিপ সম্পাদন; (৭) আঞ্চলিক সমীক্ষা, সেমিনার, সচেতনতা-বৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল প্রান্তের লোকস্রষ্টাদের মধ্যে তাদের সৃষ্টির মালিকানা তথা মেধা-স্বত্ব এবং সৃষ্ট-অভিব্যক্তির মূল্যমান সম্পর্কে অবহিতি ও উদ্বুদ্ধকরণ; (৮) লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ-গ্রহণ; এবং (৯) সম্মেলনোত্তর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে এশিয়াটিক সোসাইটির সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় একটি **'সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র'** প্রতিষ্ঠা।

www.pathagar.com

৯. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন

২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে মোট ১০টি অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২৭টি গবেষণামূলক জরিপ-প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। যদিও একটি পূর্ব-নির্ধারিত ছক ছিল, তবু সব গবেষক সমভাবে ছকটি কাজে লাগাতে পারেন নি। ফলে বিভিন্ন প্রতিবেদনের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্য রয়েছে। সম্মেলনের দশটি অধিবেশনে সবগুলো প্রতিদেন উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে মনোনীত বিজ্ঞ সভাপতিগণ এ-সব প্রতিবেদনের ওপর তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। যাঁরা লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য এ-গ্রন্থে সঙ্কলিত হলো (পরিশিষ্ট ২)।

অধিবেশন চলাকালে আরো দু'জন গবেষক নরসিংদী জেলা ও মনিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের মতামত লিখিত প্রতিবেদন আকারে জমা দিয়েছেন। এ-গুলো সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে মুদ্রিত হলো। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এর ফলে পাণ্ডুলিপিটি মোট ৯-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে: ১. কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল; ২. খুলনা অঞ্চল; ৩. চট্টগ্রাম অঞ্চল; ৪. ঢাকা অঞ্চল; ৫. বরিশাল অঞ্চল; ৬.ময়মনসিংহ অঞ্চল; ৭. রংপুর অঞ্চল; ৮. রাজশাহী অঞ্চল; ৯. সিলেট অঞ্চল ও পরিশিষ্ট। আদিবাসী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা জেলা প্রতিবেদনের পাশাপাশি সংযুক্ত হলো। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় সারা দেশ থেকে মোট ৩২-টি দল অংশগ্রহণ করেছে। আনন্দের বিষয় এই যে, সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনসহ দেশের সকল মিডিয়া লোকসঙ্গীত উৎসবের সংবাদ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেছে। সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ছবি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে দালিলিক প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. দেশের আর্থ-সামাজিক/জাতীয় ঐতিহ্য/উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক

বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, ঐতিহ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকসঙ্গীত সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ ও তার পরিকল্পিত ব্যবহারের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে রাখা যেতে পারে, একটি দেশের মৌলিক সাঙ্গীতিক কাঠামোর সংজ্ঞায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের ভিত্তি তার লোকসঙ্গীত। আর লোকসঙ্গীত সৃষ্টির বিমূর্ত মেধা ও যাবতীয় মূর্ত উপকরণ যেহেতু দেশজ, লোকজ ও গোত্রজ, সেহেতু লোকসঙ্গীতের পরিকল্পিত উন্নয়ন মানে সর্বাংশে লোকমনন, লোকবিদ্যা, লোককৌশল ও দেশজ-লোকজ উপকরণের সর্বোত্তম প্রয়োগ। এর ফলে জীবন্ত লোকজাদুঘর হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশের জনগণের তৃণমূলীয় শেকড়-স্তরে অভাবনীয় আর্থসামাজিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি যে-সব সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, তার কিছু কিছু নিম্নে আভাসিত হলো:

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তি ও সমাজগোষ্ঠির (কম্যুনিটি) মধ্যে সচেতনতা ও সামর্থ্য (ক্যাপাসিটি) বৃদ্ধি; (খ) শিল্পী ও লোকস্রষ্টাদের জন্য বিনোদন ছাড়াও অর্থকরী কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি; (গ) প্রতিটি সমাজের জন্য সমাজ-জাদুঘর বা কম্যুনিটি মিউজিয়ামের অবকাঠামো সৃষ্টি; (ঘ) অপেক্ষাকৃত অবহেলিত জনগোষ্ঠি, বিশেষত মহিলাদের আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; (ঙ) অপেক্ষাকৃত অবহেলিত সমাজগোষ্ঠি, বিশেষত আদিবাসীদের আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; (চ) শিল্পীসহ বৃহৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; (ছ) জাতীয় ঐতিহ্য বিকাশের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য তৃণমূলীয় স্তরে বাস্তব কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি, ইত্যাদি।

বাংলাদেশের শতকরা আশিভাগেরও বেশি মানুষ লোকবাংলার গ্রামীণ অধিবাসী। লোকসঙ্গীত তাদের চিত্তের বহতা ঝংকার। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত জরিপ ও লোকসঙ্গীত সম্মেলন (২০০৮)-এর গবেষণা প্রতিবেদনসহ তাবৎ কার্যবিবরণী, যা বর্তমান খণ্ডে দলিলিকৃত, তা বাংলাদেশের গণমানুষের সাংস্কৃতিক শেকড়-সংলগ্নতার অনুসন্ধিৎসাকে আরো তীব্র ও বেগবান করবে। সেইসঙ্গে আবাদ হবে অসাম্প্রদায়িক মানবতার। আমরা দেখবো, দেশজুড়ে অভিব্যক্তিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমরা সবাই 'একই মায়ের পুত'।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল

১.১ কুমিল্লা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

মহিবুর রহিম

লোকসঙ্গীত আবহমান মানবসমাজের সৃষ্টিশীল চেতনার স্বাক্ষর বহন করে। অঞ্চলভিত্তিক লোকসঙ্গীত খুঁজে পাওয়া যায় সমাজ ও জীবন প্রণালীর নানা অনুষঙ্গ, লোকবিশ্বাস, লোকপ্রথা ও অন্যান্য ঐতিহ্যগত বিষয়। কালের বিবর্তন ধারায় সঙ্গতি রক্ষা করে এখনো লোকসঙ্গীত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ শৈল্পিক আবেদন ছড়িয়ে দেয়। সে কারণেই লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এখনো তুলনারহিত।

বিষয় ও ভাবের ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের অঞ্চলভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। শুধু অঞ্চলভিত্তিকই নয়, সমাজের নানা স্তরের মানুষেরা নানা প্রকৃতির লোকসঙ্গীতের চর্চা করে থাকে। এভাবে লোকসঙ্গীত আদিকাল থেকেই শত ধারায় উৎসারিত হয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবন চর্চাকে অনুপ্রাণিত করছে।

অঞ্চলভিত্তিক লোকসঙ্গীতের মধ্যে বৃহত্তর মেঘনা-অববাহিকা অঞ্চল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। অতি প্রাচীনকাল থেকে জীবন প্রণালীর সহজ বৈচিত্র্যের মধ্যে গড়ে উঠেছে এখানকার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির ভূগোল। বিশেষ করে এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা-বৈশিষ্ট্য পল্লীসংস্কৃতির জন্য খুবই উপযুক্ত। পুরোপুরি আঞ্চলিক নয় বরং উচ্চতর ভাববাহী গীতল ভাষা-বৈশিষ্ট্য লোকসংস্কৃতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলের ভাষায় সে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাবযুক্ত একটি প্রাকৃত ভাষা বৈশিষ্ট্যের ধারা এখানে বহমান– যা এখানকার লোকসাহিত্য তথা লোকসঙ্গীতের নান্দনিকতাকে উচ্চকিত করেছে। আরও একটি বিশেষ দিক হচ্ছে কৃষিভিত্তিক আড়ম্বরহীন জীবনপ্রণালীর প্রভাব। যা এখানকার মানুষদের সর্বদা চিন্তাশীল করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসঙ্গীতে।

লোকসঙ্গীত লোকজীবন চেতনারই সৃষ্টিশীল ভাবচিত্র। বাংলাদেশের মানুষের আদি যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নদী। জীবন ও জীবিকার তাগিদে মানুষ নদীপথে ছড়িয়ে পড়তো প্রয়োজনীয় স্থানে। এভাবে একটি নদীভিত্তিক জীবনপ্রবাহ আদিকাল থেকেই বিকশিত হয়েছে। যোগাযোগের এই মাধ্যমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে অঞ্চলভিত্তিক ভাষা-বৈশিষ্ট্য এবং লোকসাহিত্যের বিশেষ অঞ্চল। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে বড় অংশ অধিকার করে আছে নদী-চেতনা। এ চেতনার জন্ম দিয়েছে নদী-বিহারী ও নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের নদী-বিহারী মানুষদের মরমি কিংবা নান্দনিক সঙ্গীত ভুবন উপভোগ্য এক সাংস্কৃতিক ধারা। মেঘনা নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে চাঁদপুর পেরিয়ে মেঘনা-মোহনা, অপরদিকে চাকলা রৌশনাবাদ থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার কিয়দংশ এই সাংস্কৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত। এককালে এ অঞ্চলের পাট-বেপারি, ধান-বেপারি, পাতিল-বেপারি ও অন্যান্য পণ্যপরিবহনকারী লোকেরা, যারা সুদীর্ঘকাল ধরে

www.pathagar.com

নদী পথে পণ্য ব্যবসায় কাজে দেশ-বিদেশ বিহার করতো, এরাই যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের এই শাখাটি সমৃদ্ধ করেছে। প্রাণ আকুল-করা ভাটিয়ালি গান, কিংবা মুর্শিদি-মারেফতি ও বিচ্ছেদ গান এদেরই অনন্য অবদান। এছাড়া জারিগান, নাওদৌড়ানীর গান, মাজারের গান, বাউল গান, দেহতত্ত্ব গান এমনি বহু ধরনের গানে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত নির্মোহ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে এক আশ্চর্য সৃষ্টিশীল জগৎ। জীবন সত্যের ভাব উন্মোচনে যেখানে আছে গভীর জীবন দর্শনও। যেমন–

এলাহির দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা
শিলপাথর ভাসিয়া গেল শুকনায় ডুবল ভেলা
জলের আসন জলের বাসন দেইখ্যা সারাসারি
বালু চরে নাও ঠেকাইয়া পালাইল বেপারী।

কিংবা,

নাও আমার চলে না রে
ও নাও ঠেকল বালু চরে রে,
নাও আমার চলে না রে।।
আফালে মারিল নাও
মাঝি নিল চিলে রে;
নাও আমার চলে না রে:

জীবন-দর্শনের সঙ্গে গভীর জীবনসংরাগ ও সৃষ্টিশীলতা এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বড় বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্যই এখানকার লোকসঙ্গীতগুলোকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছে। ১৯৩৫ সালে প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতবিদ গিরীন চক্রবর্তী এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ গানগুলো সংগ্রহ করে 'সুজনের গান' নামে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। অনেক মূল্যবান আর বিখ্যাত গান এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে গিরীন চক্রবর্তীর নিজের লেখা গানগুলোও সেকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গিরীন চক্রবর্তীর সেই বিখ্যাত গান:

মাসির বাড়ি কিশোরগঞ্জে
মামার বাড়ি চাতলপাড়
বাপের বাড়ি বাউনবাইরা
নিজের বাড়ি নাই আমার।
আমি রে যে জলের ঢেউ
আমার বলতে নাই রে কেউ
চান্দের হাট ভাইঙ্গা গেল
একূল ওকূল অন্ধকার।
আমি কই আমার আমার
তারা কয় না,
চিঠি নাই পত্র নাই
খবর লয় না।
ঢাকার তারা আনল টাকা
মনে ভাবলাম ঘুরল চাকা
আইসা দেখি সবই ফাঁকা
পোড়া কপাল অন্ধকার ॥

অসাধারণ এই লোকসঙ্গীতটি ছিল এককালে আকাশবাণী রেডিওর জনপ্রিয় সঙ্গীত। ফলে গোটা উপমহাদেশেই এই গানের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। গিরীন চক্রবর্তীর মতোই এ অঞ্চলের অপর লোকসঙ্গীত স্রষ্টা ছিলেন দুলামিয়া মাস্টার। তিনি একটি সঙ্গীত দল নিয়ে বৃটিশ শাসনামলে সারাদেশে গান গেয়ে

www.pathagar.com

বেরিয়েছেন। তার গানগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং বৃটিশ শাসন ও শোষণের চিত্র হয়ে ওঠে। তাঁর একটি বিখ্যাত গান:

সাধের তিতাস নদী রে,
গাঙ্গে দইল ধুয়া পানি।
একখান জাহাজে টানে
তিরিশখান রপ্তানী॥ ঐ
তিতাস নদীর মাঝে একখান
জাহাজ আসিল,
কৈরা ইছা মুছ তাওয়াইয়া
বসিয়া রহিল
এমন সময় দাঁড়িমালম্না
নোঙ্গর তুলিল
ইছা বলে সাধের জাহাজ
তিতাসেই রহিল॥ ঐ

আদিতে এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত চর্চায় যাদের নাম আসে তারা হলেন বানচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মীর্জা হোসেন আলী, লবচন্দ্র পাল, ফকির আফতাবউদ্দিন, মনোমোহন দত্ত, গিরীন চক্রবর্তী, সুরেন চক্রবর্তী প্রমুখ। ফকির আফতাবউদ্দিন সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বড় ভাই। তিনি ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতসহ লোকসঙ্গীতের চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ফকির আফতাবউদ্দিন, মনোমোহন দত্ত ও লবচন্দ্র পাল এই তিনজন মিলে প্রকাশ করেন 'মলয়া' সঙ্গীত। মলয়ার প্রধান ভাব ধর্মসংস্কৃতি ও ধর্মীয় সমস্যা। সব মিলিয়ে মলয়া গানে মানুষ ও মানবতাবোধের জয়ধ্বনি উচ্চকিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সাতমোড়া গ্রামে মনোমোহন দত্তের জন্ম। সাতমোড়া এখনও লোকসঙ্গীতচর্চার এক তীর্থকেন্দ্র। বছরের বিভিন্ন সময়ে সাতমোড়ায় লোকসঙ্গীতের আসর জমে ওঠে। মলয়া ছাড়াও সেখানে মুর্শিদি, মারেফতি, বাউল গান ও দেহতত্ত্ব গান পরিবেশিত হয়। এ-সব গান এ-অঞ্চলের জনসমাজে বিপুলভাবে আদৃত ও জনপ্রিয়।

কুমিল্লা অঞ্চলের ফিরোজ ও তার দল

www.pathagar.com

লোকগানের প্রেক্ষাপট বিবেচনার জন্যে কুমিল্লা অঞ্চলের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যেতে পারে।

বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে। আদিতে নদ-নদী অধ্যুষিত এই অঞ্চল কিরাতস কিংবা সমতট নামে পরিচিত ছিল। স্রোতস্বিনী মেঘনা ও প্রাচীন লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদী এ অঞ্চলের পাদদেশ ঘেঁষে সমুদ্রে পতিত হত। তখন সমুদ্র খুব বেশি দূরে ছিল না। সুদীর্ঘকাল ধরে নদীবাহিত পলি ও বালির সঞ্চয়ে পার্বত্য ত্রিপুরার পাদদেশে গড়ে-ওঠা জনপদই আজকের কুমিল্লা অঞ্চল। উত্তরে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা, পূর্বে সিলেট ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে নোয়াখালী এবং পশ্চিমে ঢাকা ও ফরিদপুরের অবস্থান।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে কুমিল্লা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। সামান্য কিছু পার্বত্যভূমি বাদ দিলে পুরো অঞ্চল প্রায় একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিল-নদী-জলাভূমি-বেষ্টিত হওয়ায় এখানকার নিসর্গ প্রায় সবুজের আচ্ছাদনে ঘেরা।

মেঘনা সমভূমি হতে পার্বত্য ত্রিপুরার পাদদেশ পর্যন্ত এ অঞ্চলের বিস্তৃতি। সমুদ্রতীর থেকে পার্বত্য ত্রিপুরার পাদদেশের উচ্চতা ২৫ ফুট আর মেঘনা সমভূমির পশ্চিম ভাগের গড় উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট। কুমিল্লা অঞ্চলের উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত লালমাই পাহাড় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিম্ন জলাভূমি ব্যতীত সামগ্র অঞ্চলকে পশ্চিম ঢাল সমন্বিত সমভূমি বলা যেতে পারে। ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে কুমিল্লা অঞ্চলকে ত্রিপুরা সমতল (Tippera Surface) বলা যেতে পারে। এ সমভূমির পুরো অঞ্চল বর্ষাকালে ৫ ফুট থেকে ২৫ ফুট পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। এ সময়ে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে পুরো অঞ্চল কৃষি কাজের দারুণ উপযোগী। নদ-নদী অধ্যুষিত এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী হচ্ছে-মেঘনা, তিতাস, গোমতী, ডাকাতিয়া, সালদা, বিজনী, সোনাই, হাওড়া, ঘুঙ্গুর, মাজেরা, পাগলি, সিনাইহানী, সালিয়াজুরী প্রভৃতি।

কুমিল্লা অঞ্চলের আয়তন ৬৭১৬.৪২ বর্গ কিমি। বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৮৩,৮৪,৫৭৩ জন। সমতট বা ত্রিপুরা নামে পরিচিত কুমিল্লা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় চতুর্থ শতাব্দীর দিকে এ অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটদের অধিকারে আসে। কুমিল্লায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায় গুণাইঘরে আবিষ্কৃত বৈণ্যগুপ্তের তাম্রশাসন হতে। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই এখানে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে। কুমিল্লা শহরের ৫ কি:মি: দক্ষিণ পশ্চিমে লালমাই ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে জানা যায় অষ্টম শতাব্দীতে এখানে দেববংশ, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে চন্দ্রবংশ রাজত্ব করে। নবম শতাব্দীতে এ অঞ্চল হরিকেল রাজাদের দ্বারাও শাসিত হয়েছে। কুমিল্লা ময়নামতি-কেন্দ্রিক বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়। এখানকার শালবন বৌদ্ধবিহার আদি শিক্ষায়তন হিসেবে যেমন খ্যাতি কুড়িয়েছে তেমনি এখানকার বৌদ্ধসংস্কৃতি ও উপাখ্যানগুলো কালোত্তীর্ণ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতকের দিকে এ অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৬৫ সালে কুমিল্লা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে আসে। ১৭৯০ সালে পুরো অঞ্চল নিয়ে ত্রিপুরা জেলা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে ১৯৬০ সালে ত্রিপুরা জেলার নামপরিবর্তন করে কুমিল্লা জেলা করা হয়।

নৃ-তত্ত্ব ও বর্ণের বিবেচনায় পুরো বাংলাদেশের প্রায় একই চিত্র পাওয়া যায়। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এসে এখানে স্থান করে নিয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক সঙ্কর জাতি। কালের বিবর্তন ধারায় এখানে এক উদার মনোভাবসম্পন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে। এই উদার প্রেক্ষাপটের মধ্যেই এখানে ইসলাম ধর্মের বিকাশ ঘটে। পণ্ডিতদের ধারণা বঙ্গবিজয়ের পূর্বেই কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে ইসলামের বিকাশ ঘটে। এ-অঞ্চলে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়তের ফলে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর দিকে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। এভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিমসমাজের উত্তরাধিকার নিয়ে

www.pathagar.com

মনোমোহন দত্ত

কুমিল্লার জনপদ সমৃদ্ধতর হয়েছে। আদি সমাজের ঐতিহ্য ও বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে এখানকার লোকসংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। বিশেষত লোকসঙ্গীতে এখানকার আদি মানুষের ধর্ম ও গোত্রের উদ্ভব ও বিকাশধারা এবং তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। একই সঙ্গে কুমিল্লা অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশ এখানকার সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতগুলোর উদ্ভবের গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা বলে মনে হয়। নদ-নদী, জলাভূমি, বিল-হাওর-ঘেরা এখানকার উঁচু জনপদগুলো ভিন্ন রকম এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, গাছপালার সবুজেঘেরা গ্রাম, রাখালের মেঠো সুর আর মাঝির কণ্ঠে বিচিত্র গানের পসরা। সব মিলিয়ে প্রকৃতির রূপ সুধায় মাধুর্যমণ্ডিত কুমিল্লা অঞ্চল। ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে প্রতিটি ঋতুর বৈচিত্র যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি কুমিল্লা অঞ্চল ও এর ব্যতিক্রম নয়। হৃদয়স্পর্শী নদীর তরঙ্গলীলা, বর্ষায় উত্তাল জলরাশি, সেই সাথে নদীগুলোর ভাঙ্গা-গড়ার খেলা-এখানকার মানুষদের করেছে চিরসংগ্রামী। একদিকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা অপরদিকে অফুরন্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবনের প্রতি গভীর মায়া। এই মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এখানকার ভাটিয়ালি ও বাউল সঙ্গীতে। শুধু তাই নয়, এখানকার মুর্শিদি, মারেফতি ও দেহতত্ত্বের গানগুলোতেও জীবনের গভীর দ্বান্দ্বিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা ধর্ম সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কুমিল্লা অঞ্চলে বিকশিত আদি প্রাকৃতিক ধর্মগুলোর সঙ্গে বৌদ্ধ, হিন্দু, শৈব, নাথ ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব এখানকার লোকসংস্কৃতির মর্মমূলে গ্রথিত হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে আন্তঃধর্মীয় ভাব সমন্বিত হয়ে লোকসংস্কৃতিতে প্রবাহিত হয়েছে। তাই দেখা যায় কুমিল্লা জেলার বৌদ্ধ উপাখ্যান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানে হিন্দু ও মুসলিম প্রভাব রয়েছে। আবার মনোমোহন দত্তের মতো সঙ্গীতসাধকের লেখনীতে বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সমন্বয় সাধন ঘটেছে এখানকার লোকসংস্কৃতির প্রভাবে। কুমিল্লা জেলার লোকসংস্কৃতিতে নাথ ধর্ম তথা নাথযোগীদের চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্ট তান্ত্রিক সহজযান পন্থার পরিণতিই হচ্ছে নাথ ধর্ম। নাথ ধর্মের প্রবর্তক মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথ। নাথসাহিত্যে মীননাথকেই এ ধর্মের আদিগুরু বলা হয়েছে। মীননাথ আদিগুরু হলেও এ ধর্মমতের প্রধান গুরু ছিলেন মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। মীননাথের আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। খুব সম্ভবত পাল যুগের শেষদিকে তার আবির্ভাব হয়েছিল। পরবর্তীতে তার শিষ্য গোরক্ষনাথ নাথধর্মের প্রধান গুরু হন। গোক্ষনাথের সময়ে নাথধর্ম হিন্দু ধর্মমতের খুব কাছাকাছি চলে আসে। নাথ ধর্মমতের অনেক উপাখ্যান এখানকার লোকসংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এর মধ্যে "মানিকচন্দ্রের গান", "গোরক্ষবিজয়", "ময়নামতির গান" ও "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" উল্লেখযোগ্য।

কুমিল্লা হিন্দুসাধকদেরও লীলাক্ষেত্র। এদের মধ্যে সর্বানন্দ সর্বাবিদ্যা, শ্রী আনন্দস্বামী, শ্রী বৈকুণ্ঠ গোস্বামী, মা আনন্দময়ী, স্বামী সত্যানন্দ ও সাধক মনোমোহন দত্ত অন্যতম। এসব সাধকদের মাধ্যমে হিন্দু সংস্কৃতির

www.pathagar.com

যেমন বিকাশ ঘটেছে তেমনি নানা হিন্দু উপাখ্যান এখানকার লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। তবে মনোমোহনের সাধনায় হিন্দু ধর্মমত অনেকাংশে একেশ্বরবাদী রূপে পরিগণিত হয়েছে। তাই দেখা যায় সাধক মনোমোহনের চেয়ে বাউল মনোমোহন এখানে সবিশেষ জনপ্রিয়। তিনি গুরু আনন্দস্বামীর নির্দেশে গান রচনা শুরু করেন। তার লোকসঙ্গীত বর্ণন সৌকর্য ও অধ্যাত্মবাদের দিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী।

কুমিল্লায় ইসলাম ধর্মের আগমন ও প্রভাবে লোকসংস্কৃতির ব্যাপক রূপান্তর ও বিকাশ ঘটে। বিশেষত লোকসঙ্গীতে এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল লক্ষ করা যায়। এ-অঞ্চলের ধর্মপ্রচারক ও সুফি সাধকদের মধ্যে শাহ সৈয়দ শরীফ বোগদাদী (রঃ) নাটেশ্বর (দীঘির পাড়), সৈয়দ আহমদ গেছু দারাজ (কল্লা শহীদ রঃ), শাহ মোহাম্মদ বোগদাদী (রঃ), হযরত রাশতি শাহ (রঃ), শাহ মোহাম্মদ কামাল (রঃ), শাহ মোহাম্মদ ইসরাইল (রঃ) ও শাহ মোহাম্মদ নুরুদ্দীন (রঃ) প্রমুখ এ-অঞ্চলের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। কুমিল্লা অঞ্চলের একটি লোকগানে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

ইসলামের ঐ রওশনীতে উজল হল কুমিল্লা
বল রে ও মন বল আল্লাহু আল্লাহু।।
তিতাস স্রোতে ভেসে এল শহিদী কল্লা
বুঝবে কে শান রে ভাই
চারদিকেতে শুধুই রব-
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।।
চাঁদপুরে শাহ মোহাম্মদ বোগদাদী
আর মজনু দরবেশ রাশতি শাহ
গাইল না'ত- মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।।
লাকসামেতে শাহ শরীফ
কুমিল্লায় শাহ আবদুল্লাহ
ঘুমিয়ে আছে জেলার মাঝে
তিনশ আউলিয়া
মাজার থেকে গাইছে গান
লা-শারীকাল্লাহ।।

কিংবদন্তি বা লোকশ্রুতি আছে, সিলেটবিজয়ী দরবেশ হযরত শাহ জালাল (রঃ)-এর সঙ্গে যে ৩৬০জন শিষ্য এসেছিলেন হযরত সৈয়দ আহম্মদ গেছু দারাজ (রঃ) তাঁদের অন্যতম। তরফ রাজ্যের রাজা আচক নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন এবং তাঁর মাথা তিতাস নদীতে ভেসে আসে। সে সময়ে খরমপুরের জেলেরা তিতাস নদীতে মাছ ধরতে গেলে চৈতন্য দাস ও তার সঙ্গীরা মাছ ধরার সময় জালে একটি খণ্ডিত শির পায়। তখন জেলেরা ভীত হয়ে পড়ে এবং খণ্ডিত শিরটি উঠাতে গেলে আল্লাহর কুদরতে শির কথা বলতে শুরু করে। –"যে পর্যন্ত না তোমরা কলেমা পাঠ করে মুসলমান না হবে, সে পর্যন্ত আমার শির স্পর্শ করবে না"। খণ্ডিত শিরের কথা শোনে চৈতন্য দাস ও তার সঙ্গীরা কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যায়। শিরের নির্দেশ মত তারা ইসলামী শরীয়ত অনুসরণে শির খরমপুর কবরস্থানে দাফন করে। ধর্মান্তরিত জেলেদের নাম হয় শাহবেলা, শাহজাদা, শাহ গোরা ও শাহ রওশন। তারাই খরমপুর দরগার আদি বংশধর। বহুকাল ধরে খরমপুর দরগা লাখ লাখ মানুষের পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। খরমপুর দরগাকে কেন্দ্র করে একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক ধারার বিকাশ ঘটেছে। এ অঞ্চলে বহু লোকগীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। এখানে কেল্লা বাবার গান নামেও বিশেষ এক ধরনের লোকগানের প্রচলন হয়েছে। এ ছাড়া এখানে বাউল গান, মুর্শিদিগান, মারফতি, কাওয়ালি, দেহতত্ত্বগান ও বিভিন্ন ভাবসঙ্গীতের প্রচলন ঘটেছে। এভাবে কুমিল্লা অঞ্চলের অনেক দরগা ও মন্দির লোকসঙ্গীতের তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এসব দরগা ও মন্দিরে ফকির, দরবেশ ও সন্ন্যাসীগণ তাদের অধ্যাত্মসাধনে সঙ্গীতচর্চা করে থাকেন। এসব গান লোক মুখে মুখে

www.pathagar.com

প্রচলিত হয়ে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক ধারার সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে মনোমোহন দত্ত, আব্দুল ওয়াহেদ ওরফে তিতন শাহ, আবদুল বারী শাহ, শেরালী পাগল ও ওসমান শাহের গানগুলো সবিশেষ উল্লখযোগ্য।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ভাটিয়ালি গান: ভাটিয়ালি গানের আদি উৎপত্তিস্থল মেঘনা অববাহিকার কোনো অঞ্চল। তবে এর বিকাশ লক্ষ্য করা যায় কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও বরিশাল জেলার কিছু অংশে। কুমিল্লা অঞ্চলে ভাটিয়ালি গানের ব্যাপকচর্চা লক্ষ করা যায়। এখানকার প্রচলিত লোকগানের মধ্যে ভাটিয়ালি গানই প্রধান। প্রচলিত অনেক গানের প্রকৃত রচয়িতাদের সন্ধান পাওয়া না গেলেও জন সমাজে এগুলো বহুল প্রচলিত ও চর্চিত হচ্ছে। এমনি একটি গান:

১

আমি বইসা রইলাম নদীর কূলে
আমায় কেবা পার করে।
আমি কান্দিয়া আকুল হইলাম
বইসা ঘাটের পারে গ
আমায় কেবা পার করে।।
বটবৃক্ষের তলে গেলাম
ছায়া পাইবার আশে
পত্র ছেইদ্দা রৌদ লাগে
আপন কর্ম দোষে গ
আমায় কেবা পার করে।।
আশা নদীর তীরে গেলাম
পিপাসিত হইয়া
আশা নদীর জল শুকাইল
দুঃখিনী দেখিয়া গ
আমায় কেবা পার করে।।
নাও আছে কান্ডারী নাই
শুধু ডিঙ্গা ভাসে
আমি খেওয়ার মাঝির নাম জানি না
কি নামে ডাকিব তারে গ
আমায় কেবা পার করে।।

২

দয়াল গুরুজী
হগলরে তরাইলা ভবে
আমার উপায় কি?
অ গুরুজী
আসমানেতে গোরারে তার
জমনিতে ডাল
পৃথিবীতে আইসারে আন্দায়
ঘডাইল জঞ্জাল
অ গুরুজী
ঘাডের পারে বটগাছ
তার উপরে চিতা
মায়ে-পুতে স্মরণ যাইতে
সামনে দাঁড়ায় পিতা।।

মেয়েলি গীত: কুমিল্লা অঞ্চলের অবারিত প্রকৃতির মতোই মেয়েলি গীতগুলো পুরো জনপদে ছড়িয়ে আছে। এ সঙ্গীতে কোনো পরিকল্পনা নেই এবং পরিমার্জনাও নেই। নিখুঁত, নিখাদ মেয়েলী মন থেকেই উৎসারিত হয়েছে এ গীতগুলোর পূর্ণ অবয়ব। মেয়েলি মনের স্মৃতি, আশা, হতাশা, বিরহ, সুখ-দুঃখ স্থান পেয়েছে এসব গীতে। মেয়েলি গীতগুলোর অবয়ব পুনরাবৃত্তিতে ভরপুর। ফলে অন্যান্য সঙ্গীতের মতো গভীর অভিনিবেশ সৃষ্টি করে না। তবে বিষয় ও ভাবের ক্ষেত্রে এসব গীত অতুলনীয়। মেয়েলি গীতগুলোকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

১. আদিরসাত্মক গীত
২. হাসির গীত
৩. বিয়ের গীত

www.pathagar.com

৪. নায়রের গীত ও

৫. ভাবপ্রধান মেয়েলি গীত।

মেয়েলি গীতগুলো দলগত গীত হিসেবেই সৃষ্টি। কুমিল্লা অঞ্চলে প্রচলিত মেয়েলি গীতের কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে:

১. রহিমনের আম্মা কান্দে পিছদরে বসিয়া
আমি অইনা রহিমনরে পালছি এত না আদর কইরা এত না কষ্ট কইরা
আজদেহি পরের গো পুতে লইয়া তারে যায় গা
বুকে শেলঅ দিয়া (২)
রহিমনের আব্বা কান্দে হুমুকদরে বইয়া
আমি অইনা রহিমনরে পালছি এত না আদর কইরা এত না কষ্ট কইরা
আজদেহি পরের গো পুতে লইয়া তারে যায় গা
বুকে শেলঅ দিয়া।
রহিমের চাচি কান্দে মাইজ্জালে বসিয়া
আমি অইনা রহিমনরে পালছি এত না আদর কইরা এত না কষ্ট কইরা
আজদেহি পরের গো পুতে লইয়া তারে যায় গা
বুকে শেলঅ দিয়া।
রহিমের চাচা কান্দে ঘাটাতে বসিয়া
আমি অইনা রহিমনরে পালছি এত না আদর কইরা এত না কষ্ট কইরা
আজদেহি পরের গো পুতে লইয়া তারে যায় গা
বুকে শেলঅ দিয়া।

২. পাঁচ টাকা মুজুরী দিমু
মন মাঝি তোরে রে
নাওখান সাজাইও ভালো রঙেতে।
আবুইদ্ধা দামান যাইব রে
নবীন শ্বশুর দেশে রে
নাওখান সাজাইও ভালো রঙেতে।
দশ টাকা মুজুরী দিমু
মন মাঝি তোরে রে
নাওখান সাজাইও ভালো রঙেতে।
আবুইদ্দা দামান যাইব রে
নবীন শ্বশুর দেশে রে
নাওখান সাজাইও ভালো রঙেতে।

৩. কেডা যায় রে ধলি গাং বাইয়া
আমার ভাইরে গিয়া কইও
নায়র নিত আইয়া
থাহ বইন থাহ বইন
কিল গুতা হাইয়া
আঘুন মাসে নিতে আমু
হাইট্টা ধান দাইয়া

www.pathagar.com

হাইট্টা ধানের মুইট্টা চিড়া
বিন্নি ধানের খই
ভাই বইনে দেখা অইলে
দুঃখের কথা কই।

৪. লীলার বাপের ঘাড়ার মাঝে লীল মরিচের চারা
সেই না মরিচ তুলিতে সেই না মরিচ পারিতে
লীলার বাপে কান্দন জুরিল রে।।
পাড়া অই না পড়শি গো আমার বাবা রে বুঝাইও গো
কোরান কিতাব তুলিয়া দিও আমার বাবার হাতে গো
লীলার মার কান্দনে গো গাছের পাতা ঝরে গো
উইড়্যা যায় গো পশুপক্ষী ফিরা উজান ধরে গো।।
চাচি অইনা জেডি গো আমার মায়ে রে বুঝাইও গো
ছোট ভাই বোন তুলিয়া দিও গো আমার মায়ের কোলে গো।।
লীলার ভাই এর কান্দনে গো গাছের পাতা ঝরে গো
উইড়্যা যায় গো পশুপক্ষী ফিরা উজান ধরে গো
পাড়া অই না পড়শি গো আমার ভাইয়ে রে বুঝাইও গো
আলের বলদ তুইল্যা দিও গো আমার ভাইয়ের আতে গো।।
লীলার বইনের কান্দনে গো গাছের পাতা ঝরে গো
উইড়্যা যায় গো পশুপক্ষী ফিরা উজান ধরে গো
চাচি ঐ না জেডি গো আমার বইনেরে বুঝাইও গো
পানির কলসি তুইল্যা দিও আমার বইনের আতে গো।।

জারি গান: কমিল্লা অঞ্চলের প্রখ্যাত কথাশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর বিখ্যাত "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে এ অঞ্চলের জারি গানের কথা উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসে উল্লেখ আছে আমিনপুরের শরীয়তুল্লাহ ও বাহারুল্লাহদের বাড়িতে প্রতি বছর জারি গানের আসর হত। সেখানে হিন্দু মুসলমান সকলেই অংশগ্রহণ করত। উপন্যাসের চরিত্র রামপ্রসাদের ভাষায়-"এই উঠানে (শরীয়তুল্লাদের) কত জারি গান হইয়াছে। মুল্লুকের সেরা ওস্তাদ আনা হইত। এক মাস ধরে সে ওস্তাদ পাড়ার ছেলেদের শিখাইত। তারপর নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দল আনা হইত। দুই দলে হইত প্রতিযোগিতা। ছেলে ও যুবার দল কাঁধে কাঁধে কোমড়ে কোমড়ে ধইরা বীরের মত নাচিত। সারা উঠান কাঁপিয়া উঠিত।" অদ্বৈত কিছু জারি গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন:

১। মনে লয় উরিয়া যাই কারবালার ময়াদানে।

সৈয়দ আবদুল বারী শাহ

www.pathagar.com

২। জয়নালের কান্দনে মনে কি আর মানে রে
বিরিক্ষের পাতা ঝরে।

৩। বাছা তুমি রণে যাইও না
চৌদিতে কাফেরের দেশ
জহর মিলে ত পানি মিলে না।

বিভিন্ন সুত্র থেকে জানা যায় এ অঞ্চলে শত শত জারি গানের দল ছিল। এরা মহরম মাসে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে জারি গান পরিবেশন করত। এখনো কিছু কিছু দলের অস্তিত্ব আছে। আমরা এদের থেকে কিছু জারি গান সংগ্রহ করেছি। যেমন

১.
এজিদ কাল ঘুমে রইয়াছ রে হায় হায়-
আজি বইলা কছ না তোরা, ডাকাতি করিলি এজিদরে
মুহম্মদ হানিফ দেশে আইল ডুবাইলি নবীর ভরা।
সৈন্য লইয়া খাড়া। বাঁচবিনি রে দাসীর পুত্র
এজিদ কালঘুমে রইয়াছ রে।।
ভাঙ্গব রে তোর বালাখানা
চৌদিকে যম খাড়া
এজিদ কাল ঘুমে রইয়াছ রে।।

২.
আজকা তোরে শেষ করিমো রে
বাডুনীর পুত কই তুই রে
দেখ না চাইয়া হানিফ আইসাছে।
দেও দানব যক্ষ পরী
চৌদিকে যম খাড়া।। বাঘ পলা তার ডরে।
ভবের আশা নাই ভরসা
পাঠাইমো যম ঘরে
দেখ না চাইয়া হানিফ আইসাছে
তোর দামেস্ক শহরে।।

সাম্প্রতিক কালে জারি গানগুলো অডিও এবং সিডিতে রেকর্ড হয়ে বাণিজ্যিকভাবেও প্রচলিত হয়েছে। পুরো কুমিল্লা অঞ্চলেই বিশেষত গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষেরা এ গানের ব্যাপক কদর করে থাকে।

বাউল গান: কুমিল্লা অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন গানের মধ্যে বাউলগীতি অন্যতম। মনে করা হয় বৌদ্ধ চর্যাপদের ঐতিহ্য থেকে বাউলগীতির প্রবর্তন ঘটেছে। এ অঞ্চলের আদি বাউলগণ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতোই সংসার-বিবাগী ছিলেন। তারা তাদের গানে জীবন, ধর্ম ও স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। এই বাউলদের জীবন দর্শন সহজবোধ্য ও অতি আকর্ষণীয়। যেমন একটি বাউল গানে আছে:

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

এ গানের জীবন রহস্যের সন্ধানে সংসার বিবাগী বাউলের মনোভাব অনায়াসে উপলব্দি করা যায়। পরমাত্মা বা স্রষ্টাই বাউলের আরাধ্য মনের মানুষ। এমনি জিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হয়েছে আখাউড়ার টানপাড়া নিবাসী মরহুম আবদুল ওয়াহেদ ওরফে তিতন শাহ। চিশ্‌তির গানেও আছে:

মন আমার খুঁইজে দেখ তর মনের মানুষ কই,
না খুঁইজে না দেখলে পরে কারে করবি নিশানা সই।
ঢাকা শহর রং বাজারে দিল বরের দোকানে
মনের মানুষ চিন্তা মণি আছে ঈশান কোণে
সে যে নগরের নাগর, দয়ার সাগর হু হু শব্দে
বাজায় বাঁশি, শুইনে ধ্বনি শান্ত হই।

www.pathagar.com

মুশির্দাবাদ গেলে পাবি পন্থের পন্থি একজনা
তারই কাছে মন্ত্র নিলে পাবে বন্ধের ঠিকানা
সে যে থাকে রসুল পুরে, প্রিকুলা মন্দিরে
ত্রিবেণীতে ডুবদা দেখ না খাস্তা মালের বস্তা কই।
প্রেম বাজারে থাইকা বন্দে করে লুকালুকি
ভক্ত জনায় দেখতে পাবে অভক্তেরে দেয় ফাঁকি
যে জন নিষ্কামিক নয়, তার পায় না পরিচয়
ভাবিয়া ওহেদে কয় ধুড়া ভাজলে হয় কি খৈ।।

কুমিল্লা অঞ্চলের প্রচলিত একটি বাউল গানে বিরহী বিবাগী মনের অন্তর্যাতনা পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন:

তোরা বল গো প্রাণ সই
ছেড়ে গেছে মনের মানূষ
তারে পাব কই।
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে আগুন
ধান দিলে সে হয় খৈ,
ছেড়ে গেছে মনের মানুষ
তারে পাব কই।
লাভের আশায় ভবে আইলাম
আপন দোষে সব হারাইলাম
মহাজনের সমন ভয়ে
এখন একাশ্বরে রই।

বাউলদের চিন্তা-চেতনা অনেকাংশেই আত্মকেন্দ্রিক। আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমেই বাউলেরা আত্মসত্তার উৎসকে খুঁজে ফেরে। কারও প্রতি ক্ষোভ বা অভিযোগ তাদের নেই। সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে নিয়েই বাউলেরা জীবন নির্বাহ করে। কুমিল্লা অঞ্চলের এক বাউলের গানে এমনটাই পাওয়া যায়–

১. আমি অন্যেরে আর দোষ দিব কি
নিজের দোষে দোষী হইয়াছি
সাজাইয়া মানব তরী
অকূলে ভাসাইছি।
নিজের দোষে দোষী হইয়াছি।।
মোহাজনের লইয়া ভারা
দিবারাত্র দেই পাহারা
আমার নাই গো শক্তি
নাই গো ভক্তি
ভিতরে গরল রাইখাছি।
দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াইছি।।
ভেবে গোপীচন্দ্র বলে
ঠেকেছি তার চরণ তলে
মায়াজালে বন্দী হইয়াছি।।

২. জগতে আমার কে আছে আর দরদী

www.pathagar.com

বুঝবে দুঃখ যে দুঃখে আমি কান্দি।
স্বাধীন জন্ম নিয়ে এ সংসারে
আশা ছিল পাব বন্দুরে
মনের মত হেরব নিরবধি
(এখন) পাগল করে ছাইড়া গেল বন্দু
দেখায়ে রূপের ছন্দ।।
সখি গ আঁমি যদি চাই দেখিতে
যায় গা সে ঘোর বনেতে
আমায় সে করিয়া অপরাধী
(এখন) বন্ধের লাগি কানতে কানতে
চক্ষের জলে হইল নদী।
সখি গ ঘরে বাইরে হইনু দোষী
খোটা দেয় পাড়া পড়শী
কলঙ্কিনী বলে কাল ননদী
(এখন) আমার বন্ধু বিনে একাকিনী
কেমনে প্রাণ ঘরে বান্ধি।
সখি গো অহেদে বলে শোন সখি
সমনের কি আছে বাকি
আমার কানতে কানতে চক্ষু হইল নদী
সরল প্রেমে দাগা দিয়া লাগাইল তেরাছান্দি।।

৩. আরে ও মানুষ জ্ঞানের চোখে দেখ
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
মূলমন্ত্র সবার এক, আরে ও মানুষ।।
কোরান পুরাণ বাইবেল ত্রিপিটক
প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য পাঠ কর পাঠক
তাতে পূর্ণ জাগবে না সখ না পাইলে রূপের সেক।
গরু শুয়র কাট্টা খাইয়া এরে ক সে ভালা না
আরেক জনে সাধু সাইজ্জা মরা খায় জেতা খায় না
আসলে এসব কিছু না যার যার ভাবে ধরছে ভেক।
ধর্মের নামে বুলি আওড়াও কর্মেতে ঠং ঠং
পৈতা- তসবি টিকলি কিংবা ফুটা দিয়া করছ ডং
শামছেল হক কয় এই সকল ছং কর্মের মাঝে কর ত্যাগ।

৪. পাপে বাপেরে ছাড়ে না
কোন পাপে তোর মন ভেসে যায়
সদজ্ঞানে ভেবে দেখ মনা।
তিল পরিমাণ পাপ করিলে
কঠিন শাস্তি হয় কপালে
নবী ওলি গাউস কুতুব

www.pathagar.com

কাউকে ক্ষমা করে না।।
কলেমাতে পড়ছ বান্দা
কেন কর অন্য ধান্ধা
নড়বি যত মরবি তত
না নড়লে যমেও ছুয় না।
শাসছেল হকের পাপের ভরা
ভাসিতেছে জগৎ জোড়া
হযরত হালিম চিশতির দোহাই দিলাম
মাফ কর হে সাঁই রাব্বানা।।

৫. প্রেমের ভাব না জেনে সাতার দিলে গো
হারাইবি ভাবের বীজ
জাইন্যা শুইন্যা প্রেম করিস।
সত্য- ত্রেতা- দাপর- কলি
চার যুগের কথা বলি
প্রেমিক যারা প্রেম আনন্দে মজিয়া থাকিছ।
মনের মত মানুষ পাইলে
না নিলেও ঠাইস্যা দিছ।
অরসিকের পিরিত করা
যেমন ওজন ছাড়া ভোজন করা
নারীর যৈবন এক জোয়াইরা গো
শেষে লাগে বিষ।
প্রেমের উজান কালে রসের গোল্লা গো
ভাটা লাগলে গোলামষ্টি
কিছু মধু থাকতে ফুলে
প্রেমালিঙ্গন দিবার কালে
ধরিয়া প্রাণবন্ধের গলে
প্রমের বিদায় নিস।
তার কাছে প্রেম রেজিস্টারী গো
আর যত সব নকল বিষ।
জাইন্যা শুইন্যা প্রেম করিস।।
পাগল শেয়ালী শাহ/ বীরগাও, নবীনগর/

সাম্প্রতিককালে নাসিরনগরের অমিয়ভূষণ ঠাকুর ও ঝাড়ু মিয়া, মোহন লাল দাস, শামছেল হক চিশতি, সরাইলের দূর্গাচরণ দাস প্রমুখ বাউল সঙ্গীতকে এ অঞ্চলে জনপ্রিয় করে রেখেছেন।

নাওদৌড়ানীর গান বা নৌকাবাইচের গান: বহুকাল ধরেই নৌকা বাইচের গান কুমিল্লা অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে। নদনদী প্রধান কুমিল্লা অঞ্চলে কতটা সুপ্রাচীন কালে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার সূচনা ঘটেছে তা নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার। তবে এ অঞ্চলের মেঘনা, তিতাস, শালদা, ডাকাতিয়া, গোমতী, প্রভৃতি নদীতে নৌকা চলাচলের আধিক্য ছিল। ফলে এসব অঞ্চলে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হত বলে ধারণা করা হয়। এককালে চাঁদপুরে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলাতে এ প্রতিযোগিতার প্রচলন বেশী। এ

www.pathagar.com

নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার সুত্র ধরেই নৌকাবাইচের দলগত গানগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। নৌকার মাঝি মাল্লারাই এইসব গানের প্রকৃত স্রষ্টা। এইসব গান লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে কিছু কিছু এখনও টিকে আছে। যেমন:

১. রসিয়া নগর আইব গ
বুবাই শীগ্র কইরা রান্ধনে যাও,
রান্ধনেতে যাই গ আমি রান্ধনেতে যাই
সাতশ টাকার পাটের শাড়ী
যদি বেবার পাই...
রসিয়া নাগর আইব গ
বুবাই শীগ্র কইরা রান্ধনেতে যাও।।

২. সুন্দইরা মাঝির নাও
ওজান চলে ধাইয়া।
আগায় পাছায় নিশান ওরে
যুবতীর মন কাইরা রে।।
আগায় পাছায় গলুই দুইখান
কাইক্কা মাছের ঠুইট্টা।
আহা বেশ বেশ বেশ।।
লহর ভাইঙ্গা পবন বেগে
ছুটছে কলকলাইয়া রে।
পাছার মাঝি হাইলা ভাল
বাইছা সব যোয়ান
আহা বেশ বেশ বেশ...।।
সমানে মিলাইয়া গলা
যাই সারি গাইয়া রে।।

৩. আরে রসিক চাঁন দীনের চাঁন যাইব রে দূরে
ও দারুণ বিধি রে
বিধি অন্তরে দুখ কত দিলা রে।
ও বিধি রে
আষ্ট না বয়সের কালে
বাফে দিলা বিয়া
তের না বয়স কালে আমার
পতি গেল মইরা
ও দারুণ বিধি রে
বিধি অন্তরে দুখ কত দিলা রে।।

৪. আগরতলা রাজার বাড়ি
জলে ডইব্যা যায় যায় রে
রাজা রাণীরে লইয়া কুঞ্জ বনে যায়।।
ও রাজা বগল খাইল রে
উদয়পুরের সিংহাসন কারে দিল রে
ও রাজা বগল খাইল রে।।

www.pathagar.com

গিরীন চক্রবর্তী

মাগনগান বা মেঘরাজার গান: আদি থেকেই কুমিল্লা অঞ্চল বা ত্রিপুরা সমতল পুরোপুরি কৃষিনির্ভরশীল অঞ্চল হিসেবে খ্যাত ছিল। শুকনো মৌসুমে এখানে শস্যের আবাদ হতো। এই শস্য ছিল মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু ক্রান্তীয় মৌসুমী বায়ু অঞ্চলে প্রায়শ খরা, বন্যা সহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এসবের মধ্যে খরাই এখানকার মানুষদের অধিক পীড়িত করতো। খরা মোকাবেলার কোনো উপায় মানুষের জানা ছিল না। তাই খরা মোকাবেলায় প্রকৃতি ও স্রষ্টার কাছে মানুষ নানা উপায়ে প্রার্থনা করত। মাগনগান বা মেঘরাজার গানগুলো এই চেতনারই সাংস্কৃতিক নিদর্শন। মাগনগানগুলো দলগতভাবে কৃষিনির্ভর পরিবারের তরুণ-তরুণীরা কিংবা কৃষাণীরা স্রষ্টার প্রার্থনার মানসে পরিবেশন করত। বিশেষ করে চৈত্র বৈশাখ মাসে এদেশে যখন অনাবৃষ্টির প্রকোপ হতো তখন এসব গান দলগতভাবে কিংবা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশন করা হতো। এ অঞ্চলের কিছু মাগনগান হচ্ছে:

মেঘ রাজা তুই আমার সোদ্দর ভাই
এক গুড়ি মেঘের লাইগ্যা দুয়ার ভিজ্যা যায়
দুয়ার ভিজ্যা যাইতে যাইতে দিনে দিল ডাক
একটানে ভইরা গেল কচু ক্ষেতের ফাঁক
কচু ক্ষেতের পানি পুড়ি টল মল করে
মার চক্ষের পানি পুড়ি বুক ভাইস্যা পড়ে
আবের কুলা বেতের বান
ঝুম্মুর কইরা মেঘ আন।
হওরা খাইল ঘুণে
ধান খাইল রইদে
মেঘা মেঘি বইয়া রইয়া রইছে বড় গাঙের কূলে
অ ব্যাঙ্গি ল মেঘ দিয়া যা।
ব্যাঙের ঝিয়ের বিয়া
ছাতি মাথাত দিয়া
অ ব্যাঙ্গি ল মেঘ দিয়া যা।।

বৃষ্টির প্রার্থনার এই অনুষ্ঠান নানা রূপে পালিত হয়। কখনো হিরালীদের মাধ্যমে আবার কখনো গ্রামের রাখাল ছেলেদের মাধ্যমে। গ্রামের প্রতি ঘর থেকে চাল টাকা তুলে গ্রামের পাশে শিরনী রান্না করা হয়। এই সব শিরনী উলঙ্গ শিশুদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেও গান পরিবেশন করা হয়:

নবী সত্য আল্লাহ কেন মেঘ দিল না
মেঘ দিল যেমন তেমন বান দিল না

www.pathagar.com

ছিক্কার তলে পুরা থইয়া ভিক্ষা দিল না
নবী সত্য আল্লাহ কেন মেঘ দিল না
হওরি বউয়ে কাইজ্জা কইরা ভিক্ষা দিল না
নবী সত্য আল্লাহ কেন মেঘ দিল না
মেঘ হইল যেমন তেমন উঠান ভিজল না
নবী সত্য আল্লাহ কেন মেঘ দিল না
আলের বলদ বাইন্দা গিরছ মরে কাইন্দা
আল্লাহ তালা দিব মেঘ চিন্তা কইর না।
নবী সত্য আল্লাহ কেন মেঘ দিল না।

কুমিল্লার এই মাগনগান বিলুপ্তপ্রায় গানের মধ্যে পড়ে। গ্রামের নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত কিছু মানুষ এখনো মাগনগান জানেন। কিন্তু সেসব মানুষ যেমন সনাক্ত করা যেমন কঠিন তেমনি সেগুলো সংগ্রহের উপযুক্ত লোকের বড়ই অভাব।

মুর্শিদি ও মারেফতি গান: কুমিল্লা অঞ্চলে খুব কম গ্রামই খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে পীর বা সাধক নেই। এরা মাজার-কেন্দ্রিক ধর্ম সাধনা করে থাকেন। এই পীর বা সাধকদের তত্ত্বাবধানেই মুর্শিদি ও মারেফতি গানের ঘরানা গড়ে উঠেছে। এইসব গানের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একজন মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শকই পারেন ভক্তকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে। মুর্শিদ বা গুরুর গুণ-মাহাত্ম্য প্রচার এবং ধর্মের গূঢ়-রহস্যের আভাস ও গুরুমন্ত্র প্রচারই মুর্শিদি গানের উদ্দেশ্য। মুর্শিদি গানগুলোতে মুর্শিদ বা পীর মাশায়েখের স্তবগানও করা হয়। যেমন:

১. আশরে আইস মুর্শিদ চান্দগুণমণি
অধম জেনে মনসাধ পুরাও আপনি।
তুমি বাঞ্ছা না পুরাইলে মুর্শিদ
কে পুরাইবে কও শুনি
মুর্শিদ ও, তুমি হও সুরতে খোদা
নামে মাত্র আদম জাদাও
তার রূপে লও ছাজিদা ও মুর্শিদ
রাব্বিকুল কাদের গণি
মুর্শিদ ও, আকুল প্রাণে যেবা ডাকে
তুমি দয়া কর তাকে ও
আসন দিয়া আমার বুকে ও মুর্শিদ
দেখাও স্বরূপ নিশানি।।
মুর্শিদ ও, আব্দুল ওয়াহেদ অবুঝ ছেলে
আমায় তুমি লও কোলে
বিকাইয়াছি জানে মালে ও মুর্শিদ
তোমার পদ তলে নিছনি।।

২. জঙ্গলেতে কাপাস বাঁশ
সে তো সোদ্দর ভাই
দিতে লাগে ঘরের পালা
মইলে সঙ্গে যায়
আমার মুর্শিদের কইও
আষ্ট আঙ্গুল কোদাল খানি

www.pathagar.com

আড়াই আইত্তা ডান্ডি
সে কোদাল টাইন্যা তুলব
আমার আপন ঘরে মাটিরে
আমার মুর্শিদের টে কইও।।
দেহের বাত্তি নিভ্যা গেলে
ঘর শূন্য হইবে
সোনার যৌবন ফুরাই গেলে
আর কি আমার রইবে
সারে তিন হাত ঘরে আমার
বাঁশের চালি দিও
আমার মুর্শিদের টে কইও।।

মারফতি গানগুলোতেও ধর্মের রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির গোপনসূত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই গান বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। শুধু ধর্ম, স্রষ্টা ও জীবন রহস্যই নয়, জীবনের বিভিন্ন রহস্য উন্মোচনই মারেফতি গানের মূল লক্ষ্য। মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব মুর্শিদি গানগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়।

কে কে যাবি ভাবে দেশে
আয় গো তোরা আয় আয় আয়
ভাবে মানুষ ভাবে থাইকা ভাবেতে খেলায়।।
ভাবে দেশে গেল যারা,
তার ছাড়ে না মাথা ধরা
ধন মান চায় না তারা
শুধূ তারই মন যোগায়।।
ভাবেতে যার নাই গো মতি
এ ভাবেতে সে অসতী
মৌলা অলি মুস্কিল কুষা
কভু নাহি পায়।।
ভাব রে মন দিবানিশি
ভাবে কর মিশামিশি
হয়ে গেল একই রাশি
দুঃখ চিন্তা নাহি রয়।।
সঙ্গের সাথি যারা ছিল
নবীর জুব্বা নাহি পেল
ভাবে ফল দেখ ভাইরে
ওয়াছকরনী জুব্বা পায়।।
পাগল বেনু মিয়া বলে
ভাবুক লোকের সঙ্গ করলে
কু ভাবনা যায় গো দূরে
সু ভাবনা হয় উদয়।।

[সৈয়দ বাহাউদ্দিন ওরফে বেনু মিয়া]

www.pathagar.com

খরমপুরের গানঃ আখাউড়া উপজেলার খরমপুর দরগাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান। এসব গানে সৈয়দ আহম্মদ গেছু দারাজ ওরফে কল্লা শহীদের (রঃ) মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। আদিতে এখানে অনেক লোকশিল্পী এ গান রচনা করেছেন। তাদের অনেকের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে সৈয়দ আব্দুল বারী শাহ, আব্দুল ওয়াহেদ ওরফে তিতন শাহ, আব্দুল কাইয়ুম মাস্টার, শেরালী পাগলসহ বহু গীতিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের থেকে আব্দুল বারী শাহের একটি গান উলেস্নখ করা যায়ঃ

কাটা কেল্লা রূপ ধরিয়ে উদয় খরমপুর মাজার
হযরত সৈয়দ আহম্মদ গেছু দারাজ আসল নামটি হয় তাঁহার।।
খরমপুরে মাজার হল দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হল
হিন্দু মুসলমান সকল, ভক্তি করে অনিবার।।
দেশের যত ফকির গণে দুজাহানের বাদশা জানে
বাবার দয়াল নামের গুণে পাপী তাপি হয় উদ্ধার।।
যে যাহা বাসনা করে সবের বাঞ্ছা পূর্ণ করে
এমন দয়াল ব্রজপুরে কোথায় আছে বল আর।।
ধন্যবাবা পীরানে পীর যুগযুগান্ত কীর্তি স্থির
দেশের যত আউলিয়া পীর সবে গুণ গাই বাবার।।
কেলস্বা বাবার আশা করি বসিয়া আছি আব্দুল বারী
আব্দুল রসুল খরমপুরী চরণ ছায়া চায় বাবার।।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকাঃ মীর্জা হোসেন আলী, বানচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মনমোহন দত্ত, গিরীন চক্রবর্তী, অজয় ভট্টাচার্য, সুরেন চক্রবর্তী, আব্দুল ওয়াহেদ ওরফে তিতন শাহ, সৈয়দ আব্দুল বারী শাহ, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, সৈয়দ বাহাউদ্দিন ওরফে বেনু মিয়া, দুলা মিয়া মাস্টার, ভুবন রায়, অমিয়ভুষণ ঠাকুর, শামছেল হক চিশতি, দুর্গাচরণ দাস, শেরালী পাগল, সৈয়দ মানজুর আল আহমদী, আব্দুল কাইয়ুম মাস্টার ও এ.কে.এম হারুনুর রশীদ।

সৈয়দ বাহাউদ্দিন বেনু মিয়া

সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকাঃ বাউল ওসমান গণি সাং তালশহর, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শামছেল হক চিশতি সাং বীরগাঁও, নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাউল দুর্গাচরণ দাস সাং কালীকচ্ছ, সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আবু তাহের সাং কুড়িঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আবদুর রহমান সাং কুড়িঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হরমুজ দেওয়ান, শিমরাইলকান্দি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ইব্রাহিম খন্দকার, ঘোলখার আখাউড়া। মাহফুজা বেগম সাং বড্ডা পাড়া, সরাইল। সুভাষ সরকার, ইসলামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। রাধু চক্রবর্তী সাং জেঠা গ্রাম, নাসির নগর, শ্রীচরণ দাস-সাং জেঠা গ্রাম, নাসির নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ফরহাদ মিয়া সাং ভাতশালা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ফিরোজ আহমদ সাং পৈরতলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। নাসের আহমেদ চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রমুখ।

www.pathagar.com

কুমিল্লা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত: উৎপত্তি ও বিস্তৃতিস্থল
(ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা)
সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা

লোকসঙ্গীতের নাম	বিষয়	প্রচলিত এলাকা	উৎপত্তি স্থান
প্রাচীন লোকগান	বিরহবোধ ও জীবন সম্পর্ক	তিতাস, গোমতী ও মেঘনার তীরবর্তী অঞ্চল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা
ভাটিয়ালীগান	জীবন চেতনার নানা অভিব্যাক্তি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, কুমিল্লা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর
বাউলগান	সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক	নাসিরনগর, নবীনগর, সরাইল, চাঁদপুরের কিছু অঞ্চল	নাসিরনগর, সরাইল
মেয়েলি গান	নারী জীবনের সুখ দুঃখ	বৃহত্তর কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
নাথ যোগীদের গান	নাথ ধর্মমত ও জীবন দৃষ্টি	কুমিল্লা জেলা	কুমিল্লা সদর
কেল্লা বাবার গান	কেল্লা বাবার শান বর্ণনা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	আখাউড়া উপজেলার খরমপুর
নাওদৌড়ানীর গান	মাঝি মাল্লাদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, কিশোরগঞ্জ	তিতাস তীরবর্তী অঞ্চল
মেঘরাজার গান	বৃষ্টি প্রার্থনা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
মুর্শিদি ও মারফতী গান	সুফীবাদী ধর্মমত	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোগঞ্জ	নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
জারিগান	কারবালার শোকাবহ ঘটনা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
ছাদপেটানোর গান	আদি রসাত্মক যৌন বিষয়	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা	বাহ্মণবাড়িয়া সদর
বারমাসি গান	নারী জীবনের দুঃখ বেদনা ও প্রকৃতি বর্ণনা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, কিশোগঞ্জ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
নটীগান	প্রেম ও যৌনচেতনা	নবীনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	শ্যামগ্রাম, নবীনগর
দুলামিয়ার গান	রাজনৈতিক চেতনা ও ধর্মমত	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	গ্রাম-গজারিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মলয়াগান	সর্বধর্ম সমন্বয় ও অধ্যাত্ম বিষয়	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	সাতমোড়া, নবীনগর মনোমোহন দত্ত কতৃক রচিত
তিতন শাহের গান	মুসলিম ধর্মমত ও অধ্যাত্ম বিষয়	আখাউড়া নবীনগর	দুর্গাপুর ফকিরবাড়ি, আখাউড়া, আব্দুল ওয়াহেদ কর্তৃক রচিত
আব্দুল বারী শাহের গান	ধর্মতত্ত্ব ও পীর মাজার মাহাত্ম্য	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	কাজীপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সৈয়দ আব্দুল বারী শাহ কর্তৃক রচিত
গণি শাহের গান	গণি শাহর মাহাত্ম বর্ণনা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, নরসিংদী	বড়িকান্দি, নবীনগর বিভিন্ন লেখক কতৃক রচিত
বেনু মিয়ার গান	ইসলামী ধর্মতত্ত্ব	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	দৌলতবাড়ি, আখাউড়া
পুতুল নাচের গান	নৃত্য বিষয়ক	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ	প্রবর্তক ধনমিয়া, মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
যাত্রা গান	দেশাত্মবোধ ও বিভিন্ন বিষয়	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ	শিমরাইলকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ফসল তোলার গান	বিনোদনমূলক	কুমিল্লা জেলা	কুমিল্লা সদর

লোকসঙ্গীত দলের তালিকা: শামছেল হক চিশতি, চিশতিয়া শিল্পীগোষ্ঠী, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। হরমুজ দেওয়ান ও তার দল-শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। রেনু মিয়া ও তার দল-কে দাসের মোড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাউল শিল্পীগোষ্ঠী, কালীকচ্ছ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আবরু মিয়া ও তাঁর দল, উজানীসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। রতন মিয়া ও তার দল-সুলতান পুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সনাক্তকৃত সামষ্টিক (দলীয়) সঙ্গীতের তালিকা: জারিগান, মেয়েলি গান, ছাদপেটানোর গান, নাওদৌড়ানির গান, কেল্লাবাবার গান, কাওয়ালি গান, ফসল তোলার গান।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা: ভাটিয়ালি গান, বাউল গান, মুর্শিদি গান, মারফতি গান, দেহতত্ত্ব গান, মনোমোহন দত্তের গান, খরমপুরের গান, গিরীন চক্রবর্তীর গান, দুলা মিয়ার গান, ভুবন রায়ের গান, সুরেন চক্রবর্তীর গান, আব্দুল বারী শাহ এর গান, গণি শাহের গান।

সনাক্তকৃত বাদ্যযন্ত্রের তালিকা: ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম, দোতারা, একতারা, মন্দিরা, বেহালা, চটক, বাঁশি (আরবাঁশি), সারিন্দা, ঢুগ্গি, ডুগডুগি, ঢোলক, নাল, পাতিল, বিজ্ঞু, করতাল, খোমা, খুঞ্জরি প্রভৃতি।

সনাক্তকৃত বাণিজ্যিক ভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা: ভাটিয়ালি গান, বাউল গান, মুর্শিদি গান, মারফতি গান, মনোমোহন দত্তের গান, দেহতত্ত্ব গান, গিরীন চক্রবর্তীর গান, দুলা মিয়ার গান, কেল্লাবাবার গান, গণিশাহের গান, ভাণ্ডারি গান, মেয়েলি গান, প্রচলিত লোকগান।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬) অন্তত-২৫ লক্ষ টাকা।

বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা: নাথ যোগীদের গান, প্রচলিত পল্লীগান, হাইর গান, ফসলতোলার গান, ছাদপেটানোর গান, দুলা মিয়ার গান, গিরীন চক্রবর্তীর গান, মেয়েলি গান, পালা গান, বারমাসী গান, নটীর গান, যাত্রা গান।

সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা: লাঠি খেলার গান, বেদেদের গান, পালা গান,যাত্রা গান, কিচ্ছাকাহিনী গান, টান, নটীগান, হোলি গান, শৈলেন চক্রবর্তীর গান, ভুবন রায়ের গান, সুজনের গান।

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক: লোকশিল্পী ও রচয়িতাগণ।

সুপারিশমালা: প্রান্তিক পর্যায়ের সংগ্রাহকদের উৎসাহিত করা ও নতুন সংগ্রাহক সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সংগ্রাহক, সঙ্গীত স্রষ্টা ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।

জাতীয় পর্যায়ে দীর্ঘ মেয়াদি সংগ্রহ কর্মসূচিগ্রহণ ও সেসব সংগৃহিত লোকগান, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। লোকগানগুলো মূলত তার নিজস্ব সুরের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য প্রকৃত স্রষ্টা ও শিল্পীদের সুর ও স্বকণ্ঠের পরিবেশনগুলি সংরক্ষণ প্রয়োজন।

অন্যান্য তথ্য: কুমিল্লা অঞ্চলে অজস্র সঙ্গীত স্রষ্টা ও শিল্পী লোক চক্ষুর আড়ালে পড়ে আছে। এদের সনাক্ত করে আদি ও আসল লোকসঙ্গীতগুলো সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন। এ জন্যে দীর্ঘ মেয়াদি সংরক্ষণ অভিযান ও কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

উপসংহার: কুমিল্লা অঞ্চলের লোকসঙ্গীতগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু আধুনিক জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রভাবে লোকসঙ্গীতের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব এসব গান সংরক্ষণ ও বিপণন করা গেলে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ

কুমিল্লার জেলার ইতিহাস, আ.কা. মো. জাকারিয়া সম্পাদিত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিবৃত্ত, মুহম্মদ মুসা
ব্রাহ্মণবাড়িয় জেলার ইতিবৃত্ত, শোয়েব চৌধুরী সম্পাদিত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একাল সেকাল, লুৎফুর রহমান
মলয়া (সঙ্গীত সংকলন, ১ম ও ২য় খন্ড), মনোমোহন দত্ত
কুমিল্লা জেলার লোক সাহিত্য, তিতাশ চৌধুরী
কয়েকটি মেয়েলি গান, আসাদ চৌধুরী
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কয়েকটি মেয়েলি গীত, শাহনাজ মুন্নি

www.pathagar.com

ব্যক্তি

কবি জয়দুল হোসেন
অন্ধের চক্ষু, আব্দুল ওয়াহেদ ওরফে তিতন শাহ
ভাবের দেশ, সৈয়দ বাহাউদ্দিন আহাম্মদ ওরফে বেনু মিয়া
আবেগ, সৈয়দ আব্দুল বারী শাহ
লোকসাহিত্য সংকলন, বিভিন্ন খণ্ড, বাংলা একাডেমী
মোহাম্মদ ফারুক খান, খরমপুর, আখাউড়া
মোঃ শাহাবুল হোসেন ভূইয়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কুমিল্লা জেলার লোক সাহিত্য, কাজী নূরুল ইসলাম
পরশমণি, সৈয়দ মানজুর আল আহমদী
খরমপুর দরগা কতৃপক্ষ
মাহফুজা বেগম, বাউল শিল্পী, বড্ডাপাড়া, সরাইল
শামছেল হক চিশতি, বাউল শিল্পী
শিল্পী ফিরোজ আহমদ
কাজী মজিবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ
মোঃ মাঞ্জু ভূইয়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সেলিনা রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, কুমিল্লা
ফারুক আহম্মেদ
সিদ্দিকুর রহমান
মোঃ দারু মিয়া, রামরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
আবুল বাসার খাদেম ও সাইরাজ খাদেম- আখাউড়া
সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল
মু. আবুল কাশেম ভূইয়া
সৈয়দ মোঃ আজম

www.pathagar.com

১.২ নোয়াখালী অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

শফিকুর রহমান চৌধুরী

ভূমিকা: বাংলাদেশের ফোকলোর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। ফোকলোরের একটি বিশাল ও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে লোকসঙ্গীত। ভৌগোলিক পরিবেশ, পাহাড়, নদ-নদী, জনগণের ধর্মকর্ম, আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা, আচার-অনুষ্ঠান ভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র ধরনের স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অসংখ্য লোকসঙ্গীত। বাঙালির হাজার বছরের সমন্বিত সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ-সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীত বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য ও পরিচয় সৃষ্টি করেছে। এশিয়াটিক সোসাইটি 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা' প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকসঙ্গীত লোকসঙ্গীত শিল্পী সনাক্ত করা, মেধাস্বত্ব নির্ধারণ এবং লোকসঙ্গীতের পঠন-পাঠন ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে ৬৪টি জেলার লোকসঙ্গীত ও শিল্পী সনাক্তকরণ এবং লোকসঙ্গীতের সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, অর্থনৈতিক মূল্যমান, শিল্পীদের মেধাস্বত্ব নির্ধারণ-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

নোয়াখালী জেলা পরিচিতি: আয়তন ৩,৬০০,৯৯ বর্গ কি.মি. উত্তরে কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে মেঘনার মোহনা ও বঙ্গোপসাগর। পূর্বে ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলা এবং পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর জেলা। ১৮২১ সালে ভুলুয়া জেলা নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ১৮৬৮ সালে নোয়াখালী জেলা নামকরণ করা হয়। প্রধান নদী বামনী ও মেঘনা। উপজেলাসমূহ হচ্ছে নোয়াখালী, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ: পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯৫), বজরা শাহী জামে মসজিদ (১১৫০ হিজরী, বেগমগঞ্জ। কালীমূর্তি (সিরাজপুর ইউনিয়ন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা, অষ্টাদশ শতাব্দী)। জনসংখ্যা: ২৫,৩৩,৩৯৪। মুসলমান ৯৩.৪১%, হিন্দু ৬.৪১%, অন্যান্য ০.১৮%। শিক্ষার গড় হার ৩৭.১১%।

কুটির শিল্প: বাঁশ বেতের কাজ। কামার, মৃৎশিল্প, স্বর্ণশিল্প। মাদুর তৈরির কাজ, পাটি পাতার কাজ, কাঠের কাজ, কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, ব্যবসা, পরিবহণ, চাকুরি ইত্যাদি হচ্ছে জনগণের উল্লেখযোগ্য পেশা।

লোকসঙ্গীত

বাংলাদেশের অন্য জেলার সঙ্গে তুলনা করলে নোয়াখালীর ভূ-প্রকৃতি, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নোয়াখালীর ক্বারি, হাফেজ, মৌলভি, মাওলানা যুগে যুগে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে ইসলামধর্ম, কোরান, হাদিস, শিক্ষা দিয়েছেন। সেজন্য নোয়াখালী অঞ্চলে সঙ্গীতের প্রতি একটি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা স্বাভাবিক। তবে এখানকার জনগণ সঙ্গীত অনুরাগী। তারা গোঁড়া ও ধর্মান্ধ মুসলমান নয়।

নোয়াখালীর আঞ্চলিক সঙ্গীত: লোকসঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা আঞ্চলিক গান। আঞ্চলিক গানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাটি ও মানুষের পরিচয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনযাপন পদ্ধতি, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়।

মোহাম্মদ হাশেম ও নোয়াখালীর আঞ্চলিক গান: মোহাম্মদ হাশেম নোয়াখালীর আঞ্চলিক গান রচনা ও চর্চার ক্ষেত্রে একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী। এখন পর্যন্ত নোয়াখালীর আঞ্চলিক গান বলতে বুঝায় মোহাম্মদ হাশেমের গান। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের ক্ষেত্রে শেফালী ঘোষ, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব যেমন কিংবদন্তি, তেমনি নোয়াখালীর আঞ্চলিক গানের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ হাশেম একজন খ্যাতিমান শিল্পী ও রচয়িতা।

নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটবেলায় গ্রামোফোনে আব্বাস উদ্দীন এবং আব্দুল আলীমের গান শুনে সঙ্গীতের

www.pathagar.com

মোহাম্মদ হাশেম

প্রতি অনুপ্রাণিত হন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে লোকসঙ্গীতের কিংবদন্তি আব্দুল আলীমের নিকট থেকে সঙ্গীত শিখেন। তিনি রেডিও পাকিস্তানের সঙ্গীত বিভাগের অনুষ্ঠান প্রযোজক ও অনুষ্ঠান সংগঠক হিসেবে চার/পাঁচ বছর কর্মরত ছিলেন। ঢাকা শহরের কোলাহলমুক্ত নোয়াখালীর নিভৃত কবিরহাটে এসেই নোয়াখালীর আঞ্চলিক সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীত জীবনের স্ফুরণ ঘটে। ষাটের দশক থেকে দীর্ঘদিন বেতারে লোকসঙ্গীত গেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়েছে। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের দিকপাল হচ্ছেন আব্বাস উদ্দীন। হাছন রাজা আঞ্চলিক ভাষায় সঙ্গীত রচনা করেছেন। কুষ্টিয়ার লালন ফকির আঞ্চলিক ভাষায় মরমি সঙ্গীত রচনা করেছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় সঙ্গীত রচনা করেছেন কবিয়াল রমেশ শীল। গণসঙ্গীত রচনা এবং পরিবেশন করে রমেশ শীল বিভিন্ন গণ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাছাড়া শেফালী ঘোষ ও শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব-এর গাওয়া চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান আমাদের লোকসঙ্গীতের এক মূল্যবান সম্পদ। এসব গান শুনে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনায় অনুপ্রাণিত হন। নোয়াখালীর মাটি, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, সর্বোপরি এ উপকূলীয় অঞ্চলের গণমানুষের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকসঙ্গীতের সুরকে অবলম্বন করে তাঁর গানে সুরারোপ করেছেন।

নিম্নে তাঁর গানের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা হলো:

১. অঙ্গো বাড়ি নোয়াখালী
রয়াল ডিষ্ট্রিক ভাই
হেনী মাইজদি চৌম্‌মুনির
নাম কে হুনে নাই।।

২. রিকশাঅলা কুচকাই চালা
ইষ্টিশন যাইয়াম
ইঞ্জিন ঢেক্কর ঢেক্কর চালাই গেলে
গাঁড়ি হেল করইয়াম।।

ভক্তিমূলক

১. কচু হাতার হানিরে ভাই
কচু হাতার হানি
বেশী ওইলে ক' বোছর আর
এই জিন্দেগানি

২. মুহাম্মদ আছিল আল্লার বড় খাতিল্লা
দুনিয়া বানাইছে আল্লায় তারই উছিল্লা।।
আহারে ও কুলসুম
কতুন আইল ডুবাইঅলা কইল্লো এ জুলুম
এত আশা ভালোবাসা
কেন্নোগো ভুলুম।।

www.pathagar.com

এসব গান ও আরো অসংখ্য গানে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বেতার, টিভি, মঞ্চে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে গানগুলো পরিবেশিত হলে দর্শক-শ্রোতাকে যেমন আনন্দদান করে তেমনি গানের মাধ্যমে তারা নিজদের স্বকীয়তা খুঁজে পায়। নোয়াখালীর আঞ্চলিক গানগুলো বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ। আঞ্চলিক গানের স্বরলিপি প্রস্তুত, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণায় লোকসঙ্গীত গবেষকদের এগিয়ে আসা জরুরি।

বিয়ের গীত: নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিয়ে-শাদি উপলক্ষে বিয়ের গান গাওয়া হয়। শহর ও গ্রামে হিন্দি গানের ক্যাসেট, ভিডিও-র প্রচার প্রসারের ফলে বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী বিয়ের গান বিপন্ন।

কবিগান: নোয়াখালী অঞ্চলে কবিগান বিলুপ্তির পথে।

যাত্রাগান: বিলুপ্তির পথে।

সারিগান: বিলুপ্ত।

কীর্তন সঙ্গীত: হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে মন্দিরে কীর্তন সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বৈশাখী মেলা, মহররম ও বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

ফেনী জেলার লোকসঙ্গীত

জেলা পরিচিতি: আয়তন ৯২৮.৩৪ বর্গ কি.মি.। উত্তরে কুমিল্লা জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা। ১৮৭৬ সালে ফেনী মহকুমা এবং ১৯৮৪ সালে ফেনী জেলা সৃষ্টি হয়। উপজেলাসমূহ হচ্ছে ফেনী, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, ফুলগাজী, দাগনভুঁইয়া ও সোনাগাজী।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ: শর্শদিতে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ ও বাসভবন (৭০০ বছর পূর্বে নির্মিত), চাঁদগাজী মসজিদ (৪০০ বছর পুরাতন), ফেনী সরকারী কলেজ ভবন (১৮২২), মহিপালের বিজয় সিংহদীঘি (১৭৬০), রাজারঝি দীঘি (১৮৩০), কবি নবীন চন্দ্র সেনের স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন বৃক্ষ (দাউদপুর পুল) উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যা: ১১,৯৬,২১৯। মুসলমান ৯২.৮০%, হিন্দু ৭.১৩%। শিক্ষার গড় হার ৪৩.০৫%।

প্রধান নদী: ফেনী নদী, ছোট ফেনী নদী এবং মুহুরী নদী।

কুটির শিল্প: পাটিপাতার বটনি ও পাটি, কামার, মৃৎশিল্প, স্বর্ণের কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ বেতের কাজ।

লোকসঙ্গীত

ফেনী জেলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নোয়াখালীর মতোই। ভাষাগত দিক থেকে ও শব্দ উচ্চারণের দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। লোকসঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচনে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

মেয়েলি গীত: মেয়েলী গীত, বিয়ের গান একসময় খুব প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে বিয়ে শাদি উপলক্ষে। গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারে এখনো বিয়ের গীত শুনা যায়। কবিগান বিলুপ্তির পথে। ফেনী অঞ্চলে নিজস্ব কবির দল নেই। যাত্রাগান বিলুপ্তির পথে। সারিগান বিলুপ্ত। গুরু-শিষ্যগান বা প্রশ্ন উত্তরের গান বিলুপ্ত। ধানবুনা/ফসল কাটারগান বিলুপ্ত।

কবিয়াল কুমুদ চন্দ্র শীল (বালিগাঁও) বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোনো দল গড়ে ওঠে নি।

স্বভাব কবি রুহুল আমিন গেদু সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব, তবে গায়ক ছিলেন না। একান্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই গান তাঁর কণ্ঠে শিল্প হয়ে যেত। যা তিনি উচ্চারণ করতেন তাই গান হয়ে যেত। ফেনী শহরের প্রাণকেন্দ্র তাকিয়া বাড়িতে তাঁর জন্ম। মারফতি, মুরশিদি, দেহতত্ত্ব, আঞ্চলিক গান গাইতেন। ব্যক্তিজীবন ছিল একেবারেই ছন্নছাড়া।

নজরুল নজরুল
চুপ কেন আজ ওগো
বাংলার বুলবুল

www.pathagar.com

বা বসুরহাটে মেলা অইছে
আঁরে নিছনি

অন্যতম জনপ্রিয় গান। গানের সুর সে অবলীলাক্রমে নিজেই করে ফেলত। তাঁর মৃত্যুর পর কোনো সুযোগ্য শিষ্য তৈরি হয় নি।

ফেনীর লোককবি আক্তারুজ্জামান

১৯৪৩ সালে দক্ষিণ কাশিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পিতা আবদুর রহমান সরকার সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি মুরশিদি, মারফতি এবং দেশাত্মবোধক গান গাইতেন। পিতার সঙ্গে জনসভায় উপস্থিত থাকতেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কবি আক্তারুজ্জামান জলস্করা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ফেনী জেলার ভগবানপুর গ্রামে শফি ভাই ও ছোট ধলিয়ার শামছুল হক ভূঁইয়া বাংলা ভাষার পক্ষে সঙ্গীত, শ্লোগান রচনা ও মিছিলে যোগদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
নূরুল আমিনের কল্লা চাই

এ জনপ্রিয় শ্লোগান ফেনীর রাজপথ মুখরিত করেছিল। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন এবং সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই লোককবি গান গেয়ে ফেনীর ছাত্র-জনতাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন।

ফেনীর গোবিন্দপুর গ্রামের প্রখ্যাত লোককবি বারেক (প্রয়াত) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আক্তারুজ্জামান প্রতিটি গণআন্দোলনে সঙ্গীত পরিবেশন করে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের কথা ও গান বর্তমানেও মানুষের মুখে মুখে। যেমন,

আমার মায়ের মুখের বাণী
আমি যখন কই,
জেল জুলুম আর ফাঁসিকাষ্টের
আসামী যে হই
মায়ের ভাষা রাখতে হবে
বুকের রক্ত দিয়ারে।।

১৯৫৮ সালে তিনি রচনা করেন

আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র
মোনায়েম খার খপ্পরে
বাংলার মানুষ দিশেহারা
মরতেছে ঘরে ঘরে

তিনি সত্তরের নির্বাচনের সময় গেয়ে ওঠেন।

ওরে বাঙালিরা হুশিয়ার
ঘরে বসে থাকিসনারে আর
বঙ্গবন্ধুর ছয়দফাতে তোমার
আমার অধিকার।

কবি বারেকের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান

ভাই বাঙালি
সোনার বাংলা রক্তে রাঙালি
বাঙালিরগো সুযোগ আসলে

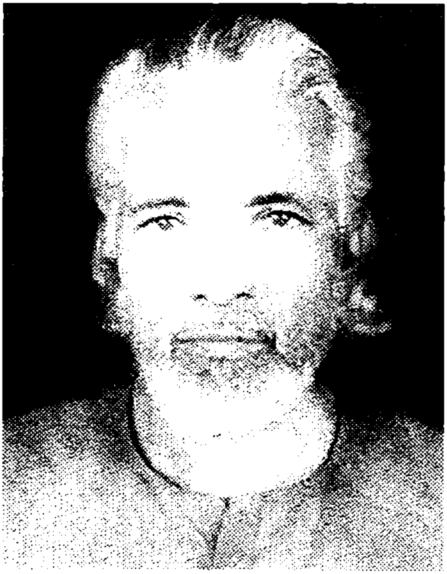

লোককবি আক্তারুজ্জামান

www.pathagar.com

কত হয় তালিমালি
আমরা ছিলাম রাজপথেতে
বঙ্গবন্ধু জেলাখানায়
বাঙালির গো ঠেলার চোটে
বঙ্গবন্ধু মুক্তি পায়।

কবি আক্তারুজ্জামান বর্তমানে বৃদ্ধ। অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করছেন। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁর নিজস্ব কোনো দল গড়ে উঠে নি।

ফেনীর জগন্নাথ বাড়ি মন্দিরে ফেনী সংলাপ নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে পূজা উপলক্ষে যাত্রাপালা, লীলাকীর্তন, পদাবলী কীর্তন, ভজন সঙ্গীত-এর Performance হয়। মন্দিরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে। যাত্রাগানের প্রবীণ ও বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে সুলতানপুরের হেমভাদুড়ি, কেশবদাস, দশরথ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এরা সবাই প্রয়াত। বর্তমানে যাত্রাগান বিলুপ্তির পথে। ফেনীর প্রাচীন ও খ্যাতনামা শিল্পী নান্টু দত্ত বর্তমানে জীবিত। মৃদঙ্গ, বাঁশি ও তবলার নামকরা অভিজ্ঞ শিল্পী তিনি। বর্তমানে মৃদঙ্গ বাজান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে কীর্তন সঙ্গীতে।

পরশুরামের লোকসঙ্গীত

তিনদিক ভারত পরিবেষ্টিত প্রান্তিক থানা পরশুরামের সংস্কৃতি একসময় বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিল। চল্লিশের দশকে পরশুরামের সংস্কৃতির মূল বিষয় ছিল যাত্রা, কবিগান, পালাগান ও বৈঠক গান। পরশুরামের লোকসংখ্যার অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তাঁরা গান বাজনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলমানরা গান বাজনাকে ধর্ম ও সমাজবিরোধী মনে করতেন। মুসলমানদের মধ্যে পুঁথিপাঠের আসর ছিল জনপ্রিয়।

ভারত বিভক্তি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ হিন্দু ভারতে চলে যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও রাজনৈতিক কারণে কবিগান, যাত্রাগান ও পালাগান বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। বেড়াবাড়িয়ার বাবু অনাথ চক্রবর্তী ও বাবু গুরুচরণ রায়, অনন্তপুরের বাবু সুধীর চন্দ্র নাথ, কোলাপাড়ার বাবু অমরকৃষ্ণনাথ ও অতুল চন্দ্র নাথ এদের প্রত্যেকের যাত্রাদল ছিল। কবিগানের আয়োজক ছিলেন খন্দকিয়ার বেহালাবাদক বাবু ভগিরত দাস। এরা সবাই বর্তমানে প্রয়াত।

সঙ্গীতা সৌখিন শিল্পী গোষ্ঠী

১৯৭৩ সালে গঠিত হয়। 'সঙ্গীতা' পরশুরামের প্রবীণ ও নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের সমন্বয়ে অজপাড়াগাঁয়ে লোকসঙ্গীত, নাটক চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পরশুরামের সঙ্গীত জগতের প্রাণপুরুষ এটিএম ফারুক (প্রয়াত), এম এ বারী, আমিনুল করিম মজুমদার খোকা মিয়া (প্রয়াত), হেদায়েত উল্লা চৌধুরী (প্রয়াত), ভুপেশ রঞ্জন চক্রবর্তী, স্বাধীন মজুমদার, নেপাল সাহা প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা নেন। পরশুরামের ঐতিহ্য চিকন পাটি, চিড়া দেশ বিখ্যাত। এগুলোকে নিয়ে 'সঙ্গীতা' রচনা করেছে অসংখ্য জনপ্রিয় আঞ্চলিক গান। বাংলাদেশ টেলিভিশনে ১৯৮৯ সালে 'নিবেদন' অনুষ্ঠানে এটিএম ফারুক রচিত ও সুরারোপিত গানগুলো পরিবেশিত হয়।

১. চিয়ন হাড়ি চিড়া দিমু
দিমু বেতের লাই
আভা বাড়ি হেনীর পরশুরামে
একবার আইও ভাই।

২. ঝমঝম করি চলে ভাইরে বিলইননার গাড়ি
হুলগাজী আর মুন্সির আঁড়ে কন কন যাইবা বাড়ি

www.pathagar.com

৩. মহুরী নদীর হাড়ে হাড়ে
খেত কুবাই বাইয়ুন করি
আন্ডা আসল খন্ডলী ভাইরে
আন্ডা আসল খন্ডলী

৪. ও নদীরে হরানের মুহুরী নদীরে

অর্ধ শতাব্দী আগে পরশুরামের গ্রামে গঞ্জে পুঁথি পাঠের আসর বসতো। কবি মদন ধূপী গুনাগাজীর ওপর পুঁথি রচনা করেছেন, যা বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। শমসের গাজী কর্তৃক খননকৃত দীঘি, প্রাচীন উজিরের দীঘি, হিন্দুদের তীর্থস্থান ফুলগাজীর দৈলবাড়ি এবং অত্র এলাকার সুফী সাধক বাঘা মামার মাজারের কথা নতুন প্রজন্মের কাছে 'সঙ্গীতা' সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে। 'তেপান্তর খেলাঘর আসরও' এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করছে।

নতুন প্রজন্মের শিল্পী সুপর্ণা ফারুক

বাংলাদেশ টেলিভিশনের কলকাকলি অনুষ্ঠানে এটিএম ফারুক রচিত ও সুরারোপিত আঞ্চলিক সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতা-দর্শকের প্রশংসা লাভ করেছে। সুপর্ণা আঞ্চলিক সঙ্গীতকে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। ফেনী জেলার পরশুরাম থানার অনন্তপুর গ্রামে সুপর্ণার জন্ম। বাবা এটিএম ফারুক।

লক্ষ্মীপুর জেলার পরিচিতি

আয়তন ১৪৫৫.৯৬ বর্গকি.মি.। উত্তরে চাঁদপুর জেলা, পূর্বে নোয়াখালী জেলা, দক্ষিণে ভোলা ও নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে বরিশাল ও ভোলা জেলা এবং মেঘনা নদী। প্রধান নদী: মেঘনা, ডাকাতিয়া, কাটাখালী, রহমতখালী ও ভুলুয়া। ১৯৭৯ সালে মহকুমা এবং ১৯৮৪ সালে জেলা গঠিত হয়।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ: তিতা খাঁ জামে মসজিদ, মজুপুর মটকা মসজিদ, মধুবানু মসজিদ, দায়েম শাহ মসজিদ, আবদুল্লাহপুর জামে মসজিদ, সাহাপুর সাহেব বাড়ি, কামানখোলা জমিদার বাড়ি। দালালবাজারের জমিদার বাড়ি, শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর জিউ আখড়া, দালালবাজার মঠ, খোয়াসাগর দীঘি, ঐদারা দীঘি, কমলাসুন্দরী দীঘি, রায়পুরের কেরোয়া গ্রামের জ্বীনের মসজিদ, বড় মসজিদ, রামগতির রানী ভবানী কামদা মঠ, শ্রীরামপুর রাজবাড়ি (রামগঞ্জ), শ্যামপুর দায়রা শরীফ, কচুয়া দরগাহ, হরিশচর দরগাহ, কাঞ্চনপুর দরগাহ।

জনসংখ্যা: ১৪৭৯৩১৭। মুসলমান ৯৫.৩১%, হিন্দু ৪.৬৬%, খ্রিস্টান ০.০১%, বৌদ্ধ ০.০১%, অন্যান্য ০.০১%। শিক্ষার গড় হার ৩৪.০%।

কুটির শিল্প: মৃৎশিল্প, কামার, বাঁশ বেতের কাজ, পাটিপাতার কাজ, কাঠের কাজ।

লোকসঙ্গীতের বর্তমান অবস্থা

কবিগান: বিপন্ন।
জারিগান: বিপন্ন।
সারিগান: বিপন্ন।
বিয়েরগান: বিপন্ন।
বারমাসিগান: বিপন্ন।
ভাটিয়ালিগান: বিপন্ন।

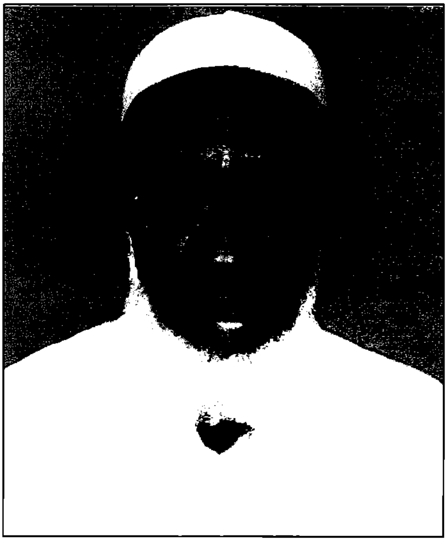

ফকির আশরাফুর রহমান

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর জেলায় আঞ্চলিক সঙ্গীত, ভাণ্ডারি সঙ্গীত, মুরশিদি, মারফতি, কীর্তন সঙ্গীতের Performance বর্তমানে হয়।

১. ফকির আশরাফুর রহমান: পিতা মরহুম হাজী আবদুর রহমান পেশকার, মাতা-আনোয়ারা বেগম। পিতা চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার শরীফের খলিফা ছিলেন। লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে দরবার শরীফের মাহফিল-জলসা করতেন। ছোট বেলা থেকে ফকির আশরাফুর রহমান পিতার অনুসারী হিসেবে মাহফিলে-মাজারে আসা যাওয়া করতেন এবং মাইজভাণ্ডারের মুরীদ ও পরে খলিফা হন। সে থেকে সঙ্গীতের সাথে তার সম্পর্ক শুরু হয়। তিনি কাওয়ালি, মারফতি, দেহতত্ত্ব ও নবীতত্ত্ব, মুর্শিদি, পল্লী গীতি, আঞ্চলিক গানে পারঙ্গমতা অর্জন করেন। লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি ও সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের সঙ্গীত আসর ছাড়াও ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত ও মাইজভাণ্ডার শরীফের কাজে জড়িয়ে থাকেন। নিজের লেখা ও সুরে তিনি গান গাইতে ভাল বাসেন। প্রায় ৪ শত গান, সাড়ে ৩ শত কবিতা ও বিষাদ তরঙ্গ নামের একটি কাব্য গ্রন্থ ফকির আশরাফ রচনা করেছেন। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা ছাড়াও তিনি 'বেঞ্জু' নামক একটি চাইনিজ বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। তবে চট্টগ্রামের আবু কাওয়াল থেকে সঙ্গীতের পূর্ণতা লাভে কিছুটা সুযোগ নিয়েছেন। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জের দুলাল কাওয়াল ও রামগতির ফকির দুলালসহ তাঁর ৭/৮ জন শিষ্য রয়েছেন। তিনি প্রায় ৬০ বছর লোকসঙ্গীতের সাধনা করছেন। তাঁর রচিত গানের নমুনা নিম্নরূপ:

আঞ্চলিক

১. ও চাচ্‌তো ভাই কাইল্‌লারে/আঁরে ওগ্‌গা জলপই দেসনারে
গাছে বই বই বেগ্‌গোন খাইলি/দানা হালাস আঁর লাইরে,
ও চাচ্‌তো ভাই ...
নুন মইচ্‌চের গুঁড়া আইন্‌চি/বাই-বইন খাইবার লাই,
গাছে বই বই মজা মারোছ/হাক্‌না জলপি হাইরে,
ও চাচ্‌তো ভাই ...

২. মনারে তালগাছ তলে তাল হড়ছে আন্‌তি যা
ওগ্‌গা, দু'গা তিনগা হড়ছে চাতি যা-ঐ মনারে
আঁধারইয়া যাইচ না মনা হারিকল লই যা
হাঁপে জোঁকের ভর আছে ভুতের আস্তানা
তাড়াতাড়ি যারে মনা বালা করি টোগাইস যা
মনা রে...

পল্লীগীতি

৩. চুরি করি নিলি আমার মন, প্রাণ বন্ধুরে, চুরি করি নিলি...
চোরা যে কি দুষ্ট, কথা তার কি মিষ্ট, পষ্ট করি বলিত যখন,
তার মিষ্টি কথায় ভুলিয়া, পাগলিনী সাজিয়া
জাতি কুল মান হারাইলাম সকল
চুরি করি নিলি আমার মন।

আধ্যাত্মিক (মারফতি)

৪. আহারে মন নিশার স্বপন ভাঙ্গবে রে দু' চারদিন পর
ও তুই দিয়া কি নিয়া গেলি জমা-খরচার হিসাব কর- ঐ
যতই কর বাবু আনা, চশমা-ঘড়ি ফুল বিছানা
হাতের ছড়ি চাবি খানা, পাউডার মাখো মুখের পর
ও তোর বুড়া কালে কি রূপ হইল আয়না ধরে বিচার কর

৫. আমি তো একজন, তুমি তো আরেক জন।
আরেক জন হইলে তোমার রূপ নাই কেন?...

৬. কুন মোহাম্মদ শব্দ কে বলিল, কুন মোহাম্মদ বলি কোথায় খোদা লুকাইল

www.pathagar.com

হায়দর আলী বয়াতি (ক্রস চিহ্নিত)

২. **হায়দর আলী বয়াতি**: ১৯৫০-এর দশক থেকে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গান গাইতেন হায়দর আলী বয়াতি। সাধারণত তিনি বিয়েসহ স্থানীয় অনুষ্ঠানসমূহে ফরমায়েশি গান পরিবেশন করতেন। এছাড়া হাট-বাজারে ঔষধ বিক্রেতার জমায়েতে সহযোগিতামূলক গান গেয়েছেন। রায়পুর উপজেলার গাউয়ার চর গ্রামে হায়দর আলী বয়াতির জন্ম। ছোট বেলা থেকে লোকসঙ্গীত তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনি জারিগান ও পালা গানে (কবির লড়াই) লক্ষ্মীপুর জেলায় কিংবদন্তিতুল্য। তাৎক্ষণিক গানের কথা তৈরী করা, গানের কথায়, বাজনায় ও দেহ ভঙ্গিমায় গায়ক-দর্শক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার এবং দর্শকদের নির্মল আনন্দ দেয়ার অপূর্ব ক্ষমতা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছায়। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য্য ও ধর্মজ্ঞান দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি নিরক্ষর। পালা গানে (কবির লড়াই) প্রতিপক্ষকে কাবু করার জন্য তাঁর কৌশলী প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়ার শৈল্পিক উপস্থাপনা দীর্ঘ সময় মনে রাখার মতো। হায়দর আলী বয়াতি তাঁর সাগরেদ শহীদ উল্যা বয়াতিকে প্রস্তুত করেছেন এক সাথে পালা গানের জন্য। সম্প্রতি বয়োবৃদ্ধ হায়দর আলী বয়াতি সঙ্গীতের জগতে না জ্বললেও তাঁর সাগরেদ খানিকটা ওস্তাদের সুনাম রক্ষা করে চলছেন। কাঠের চাকা চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে জিপসীর মতো করে 'খুঞ্জুরা' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন হায়দর আলী বয়াতি। এটি সব সময় তাঁর হাতের শোভা ছিল। তাঁর ভাবশিষ্য ও দোহার হিসেবে রায়পুর উপজেলার শায়েস্তা নগরের মৃত আব্দুল কাদের, চরপাতার আব্দুল মিয়া, দেনায়েত পুরের মৃত ভোলা বয়াতি, রাখালিয়ার মৃত আব্দুল লতিফ সরকার, রামগতি উপজেলার হাজির হাটের কামাল উদ্দিন ও মঈন উদ্দিন এবং পশ্চিম লক্ষ্মীপুরের হোসেন বয়াতি কাজ করেছেন। হায়দর আলী বয়াতি প্রায় ৫০ বছর লোকসঙ্গীত সাধনায় একনিষ্ঠ ছিলেন।

বারমাসী ১. কত পাষান বান্দাইছ তুমি পতি মোহন বৈদেশেতে।
জ্যৈষ্ঠতে অমূল্য ফল আষাঢ়েতে নিশান জল/শাওন কাটাইলা তুমি
সায়রে সায়রে। ভাদ্রতে তালের পিঠা আশ্বিনেতে শশা মিঠা
ওরে কার্তিক মাস কাটাইলো কাতরে কাতরে ॥ অঘ্রাণে নবান্ন ভাতে
পৌষেতে শীতেরি রাত/ধৈয্য না মানে কাল মাঘেতে। ফাল্‌গুনে নয়ন
কালা চৈত্রেতে রোদের জ্বালা/ধৈয্য আনে কাল বৈশাখে ॥

২. সকালে মিলছে মেলা, বিকালে ভাঙ্গিয়া যায়
প্রেমময় প্রেম সাগরে প্রেমের মানুষ ভাসিয়া যায়।

www.pathagar.com

৩. মাওলা করে দয়া কইরাছে
পীরিতির বান মাইরা, ঘরের বাহির কইরাছে
ওরে আমার মাবুদ মাওলা, দিনে দিনে হইলাম দেনা
দেনা শোধতো হইলো না, তোমার নামে হইলাম দিওয়ানা।

৪. দয়াল নবীজি আমার পারেরি কাণ্ডার
চিনলাম নাগো আমার সেই নবীজীকে....

৫। আমার ঘর ছাড়িয়া মন উড়া পাখি পালাবে যখন।
আমার দেহ কাঁদিয়া করছে আলাপন।
পাখি আমার ঘোর জঙ্গলে করছ আগমন
ও তুই নুন খাইয়া গুন গাইলিনা নিদয়া নিষ্ঠুরের মতন।

৬। আল্লা আমিন বল ভাইরে ওরে মমিন ভাই
পার করো আল্লাজির নামে মিছা দুনিয়ায়
আল্লার নামটি লইয়া মানুষ যে যেখানে যায়
সাপে নাহি দংশন করে বাঘে নাহি খায়।

৩. হোসেন বয়াতি: লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামে হোসেন বয়াতি জন্ম গ্রহণ করেন। ১০-১২ বছর বয়স থেকে একই গ্রামের নিজ বাড়ীর পার্শ্ববর্তী ওস্তাদ মো: জালাল মিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি লোকসঙ্গীতের পথে পা রাখেন। তিনি ওস্তাদের সাথে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান এবং হাট বাজারে কবিরাজী ঔষধ বিক্রিকালে জারিগান, পল্লীগীতি, মারফতি, মুর্শিদি, কবিতার বই (স্থানীয় কোনো ঘটনার ছন্দোবদ্ধ, রসাত্মক ও সুরে প্রকাশ) পড়া ও আঞ্চলিক গান গেয়ে বেড়ান। গত ২৫ বছর তিনি লক্ষ্মীপুর ছাড়াও ভোলা, বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন ছোট-বড় শহর, হাট-বাজার ও গ্রাম, নদীর ঘাট তাঁর ভাবশিষ্য নিয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর দলে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা হলেন, হুমায়ূন (বাদক: নাল), আমিন, (গায়ক), জহর আলী (বাদক: কাসার জুড়ি) সুব্রত পোদ্দার (বাদক: ঢোল) প্রমুখ। সম্প্রতি লক্ষ্মীপুর জেলার লোকসঙ্গীতে যারা নিজেদের জড়িয়েছেন তাদের মধ্যে হোসেন বয়াতি খ্যাতিমান। কণ্ঠ ও সুরের যাদু দিয়ে লোক সমাগম করা কিংবা সমাবেশ ধরে রাখার মন্ত্র তিনি জানেন। একটি দোতারা হোসেন বয়াতির হাতের সম্বল। অতি যত্নে দোতারাটি পুষে রাখেন। সঙ্গীতকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। লক্ষ্মীপুর শহরের থানা রোডের দৈহিক প্রতিবন্ধী অহিদ উদ্দিন রতন (ইকবাল মাইক সার্ভিসের মালিক, প্রতিবন্ধী সংগঠনের নেতা ও সঙ্গীত প্রেমী) হোসেন বয়াতিকে গানের ক্যাসেট/সিডি বের করার সুযোগ করে দেন। অহিদ উদ্দিন রতন রচিত ও সুরারোপিত আঞ্চলিক গান নিয়ে 'কলিকালে গান' নামে হোসেন বয়াতির

হোসেন বয়াতি

www.pathagar.com

ক্যাসেট/সিডি বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এ ছাড়া 'মজিদ-মালতির কবিতা' নামে একটি ক্যাসেট এ অঞ্চলে আলোচিত হয়েছে।

আঞ্চলিক: ১. ও পুত কি কাম করলি রীতিমত স্কুলে ন যাই
ও তুই লেহা-পরা না শিখি তুই নিজের দিওছ কোয়াল খাই
হারুন্যার মার হোলা যেগ্যা এম এ হাস কইচ্যে
হেইগ্যা তো তোর হোয়ারে এক শেণীর হইয্যে
তোর কোয়ালে জাটার বাড়ী স্কুলের তন গিয়েস দাই
লে হাপরা না শিখি তুই নিজের দিওছ কোয়াল খাই

২. ইলিশ মাছ রাইনছে মায় আমরা যে খামু
হাঁকে দি মেজবান আইছে নানা আর মামু

৩. বাইসাব আঁই ঢাকা যাইয়াম/চাকুরীত কইরয়াম যুইন
ঢাকার তোন আই বিয়া কইরয়াম/আঁর খালতো বইন

ধর্মীয়: ৪. পঞ্চ রসে রাখাল বেশে ফুটলো ফুল আবদুল্লার ঘরে
তারে চিনতে ক জন পারে, তারে ধরতে ক জন পারে
ছিল ফুল আরশেতে কেউ নারে চিনিতে পারে
আচম্বিতে ফুটলেরে ফুল মা আমিনার ঘরে।

লনী মোহন দাস (মৃত): রামগতি উপজেলার চর ডাক্তার গ্রামে লনী মোহন দাস জন্ম গ্রহণ করেন। একজন সাধারণ কৃষক লনী মোহন একাধারে লোকসঙ্গীতের একজন গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। পল্লীগীতি, বাউল গান, সারি গান লিখে, সুর করে ও গেয়ে তিনি নিজগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অত্যন্ত সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে তাঁর গানে প্রেম-বিরহ ও শ্রেণী-শোষণের চিত্রকল্প উঠে আসে। তিনি একতারা, দোতারা, খুঞ্জরা, করতাল, খমক ইত্যাদি বাজিয়ে গান গাইতেন। তাঁর গানের কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

১. পাইতানা পাইতানা বন্ধুরে, ও বন্ধু যতকর আশা
ঘরের পিচে বইসা বন্ধুরে, যত মার মোশারে

বাউল: ২. তারা তিন পাগলে যুক্তি করি।
খেললো রসের খেলারে
কার লাইগা হইলাম পাগলরে...

সারি: ৩. (ধুঁয়া) প্রথম প্রভুর নাম, ওরে ভাইরে নামে কর সার।
বিপদে পড়িলে গুরু করিও উদ্ধার। জোয়ানেরাও...
জালে জালে যুক্তি করি, জল আনিতে যায়
কারখান চোড-কারখান বড়, ডান্ডা মাপি চায়
মায় বলে ফুলবান ফুলবান, বাপে বলে ঝি
এক্কই রহিতে সাতখান কাপড় কেমনে ভিজাইলি

৪. আবদুল মান্নান সরকার: সদর উপজেলার রাজিবপুর গ্রামে আবদুল মান্নান সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। হাটে-বাজারে মাঠে-ঘাটে-রাস্তার উপর পল্লী কবিতার বই বিক্রি করে বেড়াতেন। দর্শক ও ক্রেতা আকর্ষণের জন্য কবিতার সুর করে গাইতেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ, সুর ও দেহ ভঙ্গিমা তাঁকে পরিচিতি এনে

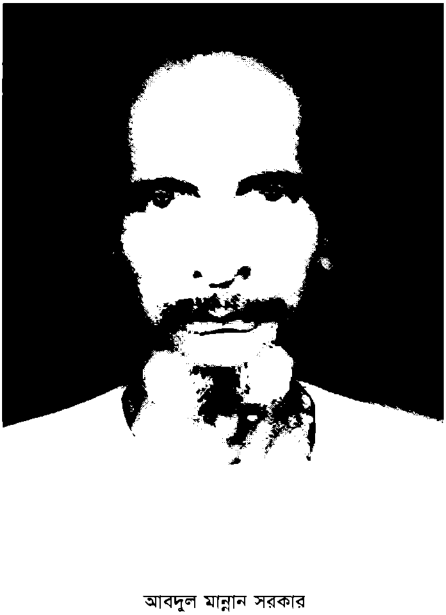

আবদুল মান্নান সরকার

www.pathagar.com

দেয় এবং পেশার প্রসার ঘটে। সাম্প্রতিক সময়েও মান্নান সরকারের কবিতায় ও গানে সনাতন বাংলার ছবি ফুটে উঠে। তিনি পল্লীগান ও বারমাসী গানে প্রেম, বিচ্ছেদ এবং জারি গানে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখতেন ও সুর দিতেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন নিজ গ্রামের আরশাদ উল্যা (ঢোল), বশির উল্যা (জুড়ি) ও দীন মোহাম্মদ (দোতারা)। তাঁর গানের কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

১। বন্ধুরে বাঁশীর সুরে মন উদাসী
ঘরে রইতে পারি না
বাজাইয়া তার বাঁশের বাঁশি
আমার মন কইরাছে দেওয়ানা।

বারমাসী ২. এসো এসো প্রাণের বন্ধু এসো তাড়াতাড়ি
ইতিমধ্যে না আসিলে গলায় দিব ছুরিরে
ফালগুনে নয়গুন জ্বালা যৈবন দিছে মোড়া
যেই নারীর ঘরে সোয়ামী নাই সদাই তার কপাল পোড়ারে
চৈত্র মাসে পুষ্পের গতি কুকিলে কুহুরে
সদাই মনে হু হু করে মন টিকে না ঘরেরে
বৈশাখে কৃষকের ক্ষেতি মাঠে বুনে ধান
রাখালিয়ার গান শুনিয়া বিদরে পরান রে
জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় পিপাসা গাছে পাকে আম
কারে লইয়া খাইতাম আমি ঘরে নাই মোর শ্যাম রে
... ...
এই পর্যন্ত বারোমাসী ক্ষান্ত দিয়া যাই
মান্নান বলে পাইবা পতি ধৈর্য্য ধরো ভাই রে

বারমাসী (বিপরীত কথা)

৩. বৈশাখ মাসে ফুল ফুটে নানা রসে, ভোমরা মধু খায় ফুলের মাঝে বসে
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম ফল সর্বলোকে খায়, নারীয়ে চিপিয়া দেয় পতির খানায়

জারি: ৪. (ক) হাসান-হোসেনের জারি
(খ) শরীয়ত ও মারফতের জারি
(গ) হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি জারি
(ঘ) দুনিয়া সৃষ্টি ও কেয়ামত জারি
(ঙ) আদম-হাওয়ার জারি
(চ) বিদ্যা-বুদ্ধির জারি
(ছ) স্বর্ণ-লোহার জারি

৫. কৃষ্ণ কুমার মজুমদার: লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চররুহিতা গ্রামের একজন কৃষিজীবি (সাধারণ) কৃষ্ণ কুমার মজুমদার। বয়স প্রায় ১০৫ বছর। স্থানীয় বিয়ে-উৎসব অনুষ্ঠানে এককভাবে কিংবা দলবল নিয়ে গান গাইতেন। নিজেই গান লিখতেন, সুর করতেন। তাঁর গানে সাধারণ ঘরের প্রেম, বুড়ো-বুড়ির প্রেম, বখে যাওয়া সন্তানের বাবা-মার সাথে সম্পর্কের ব্যঙ্গ চিত্র, বন্যা-ঝড়ের কিংবা পল্লীর দৈনন্দিন রঙ্গ-রসের ব্যঞ্জনা হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। শতাধিক বছরের বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণ কুমার মজুমদার এখনও যৌবনের স্বপ্নঝরা দিনগুলি স্মরণ করে কিছু কিছু স্মৃতি ধরতে পারেন। তাঁর গানের কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

১. জাইল্লার মাথায় জালের বোঝা, মরা মাছের খারি
কিবা প্রেম শিখাইলি জাইল্লারে ... ...

www.pathagar.com

২. বুড়ী কেমনে আইলি ধাইয়া, শশুর বাড়ী যাত্রা কইরলাম আমি
হারিকেন ভেজাইয়া, চৈত্র মাস হরবের কালে বুড়ী ভোঁতা
কাঁড়ল খাইয়া ... ...
৩. ঘোর কলিতে থাকবে না আর মানির মান
পুতে পরে উলের ধুতি বাপে পরে নেংটি খান
কলির বর্তমান, বৌকে পরায় পাটের শাড়ি, মাকে পরায় ছিঁড়াখান

বন্যা ৪. ও আমি ভাবতে ভাবতে যাই ভাবিয়া না পাই
ঘর-বাড়ী ভাসাইলো খেরের হারা ভাসাই নিলো নারার হারা নাই
মহিষ গরু ছাগল ভেড়া ভাসাই নিলো, দুধের গরু নাই... ... ...
৫. আমি ভাবতে ভাবতে যাই রবিবারে লক্ষী পূজার গান গাইতে যাই
আমার ভাগিনা হেমন্ত বাবু গানের ছিল রাজা
রাত যখন দশটা হইল করিয়া ছিল মানা
নিবারনে নাইকল কোরায়, কামিনী ধরে আঁচ্চা
রঙ্গ মাঝি উঠিয়া বলে এই কথাটি হাঁচা
গঙ্গা খিলে চঙ্গারে ভাই, কামিনী ধরে বাঁশ
নিবারনে মইধ্যে হড়ি কইরলো সর্বনাশ
৬. সোনার তরী রঙ্গিলা বাদাম কোন ঘাটে যাও বাইয়া
তরীর আগায়-পাছায় লখের বাতি জ্বলে রইয়া রইয়া
তরীর মাঝখানেতে ছইয়া, সে খানেতে বসত করে মাঝিমাল্লা লইয়া

৬. কৃষ্ণ গোপাল বাউল: রামগঞ্জ উপজেলার চাঙ্গির গাঁও গ্রামে লোকসঙ্গীতের অনন্য ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণ গোপাল বাউল জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় একজন শিক্ষক। দোতারাকে সাথী করে এ অঞ্চলের সঙ্গীত ভুবনকে তিনি জয় করেছেন। প্রায় ৮০ বছরের জীবন এখনও স্বচ্ছন্দে বয়ে বেড়াচ্ছেন। একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হিসেবে কৃষ্ণ গোপাল বাউল বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। সমসাময়িক কালে তিনি লালন ফকিরের জীবন কাহিনী, কিংবদন্তি এবং সাধারণ মানুষের মানস মূর্তিকে রূপায়িত করেছেন।

৭. পণ্ডিত প্রভাত চন্দ্র দাস (মৃত): রামগতি উপজেলার চর ডাক্তার গ্রামের গ্রাম্য কবিরাজ ও শিক্ষক প্রভাত চন্দ্র দাস লোকসঙ্গীতের একজন নক্ষত্র। তিনি প্রচুর গান লিখেছেন। নিজের লেখা গান তিনি সুর করে গাইতেন। রাগ-রাগিনীর উপর তাঁর অনেক দখল ছিল। সাধারণ বৈষ্ণব গান, মানুষের গান, দেশের গান, কীর্তন, পূজার গান গেয়ে নিজ এলাকায় ব্যাপক সমাদৃত ছিলেন। স্থানীয় আসরে মন্দিরে ও বাড়ীতে বাড়ীতে দলবল নিয়ে গাইতেন। বিভিন্ন ধরনের গান লিখতেন যেমন, দারিদ্র্য, দুঃখ, দেশ বন্দনা, বাউল, ও ধর্মীয় গান। যেমন,

১. মাগো গরীবের সুখ নাই কপালে
বদলা দিয়ে মা বাজারে গেলে
বাবুর কাছে দামটি চাইলে, বাবু টাকা নেই বলে পকেট আছাড়ে
মাগো ধনী লোকের নাই মা ঠেকা
এক মন বেচিলে হয় ষোল টাকা
বার টাকায় কিনতে পারে শাড়ী
আর চার টাকার মাছ তরকারী
দই তৈল তামাক-পান-বিড়ি।
২. মা তোর লীলা ক্ষেত্র ভারত ভূমে
কালক্রমে কত লীলা হয়... ... ...
৩. মা তোর পূর্ব বঙ্গ ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ বাউল পরগনা
জয় দেবপুর, কালি নারায়ণ রায়... ... ...

www.pathagar.com

৪. বসে বকুল ডালে/রাধা কৃষ্ণ বলে ডাকে কোকিল পাখি
নিত্য চিত্ত পুলকে ডাকে যে স্বরে, অতি কুইরে কয় বিধুমুখী
৫. বর্শিকেন বাহিতেছি আমি/ মন বলে তোমার সঙ্গে দেখা করি
প্রতিদিন/উপলক্ষ কিছু বিনে কেমনে আসিব বল শুনি
৬. একদিন নাগর কানাই গো চারণে/গিয়াছে রাখাল সনে
কাননে যমুনা কুলে/তখন রাধার কথা মনেতে পড়ে
অতি কাতরে সুবল বলে/ আমার প্রাণেরশ্বরী রাইকিশোরী

বিয়ের গান/ছড়া/ শ্লোক

হিন্দু মেয়ের বিদায়ঃ বিয়ের সময় কন্যা নিয়ে অনেক ধরনের গান বানানো হয়। তার মধ্যে কন্যাকে বরের বাড়ী বিয়ের পর নিয়ে যাবে-এ সত্যকে 'দুঃখ ও বিয়ের সুখের' দু'ধরনের রস আশ্রিত গীত গেয়ে বিয়ে বাড়ির পরিবেশ তুলে ধরে। যেমন,

বাল্যকালে পালছিগো সীতা/দুধ ভাত দিয়া
এখন কেন নিতে আইলো/বুকে শেল দিয়া।...

মুসলিম মেয়ের বিয়েঃ

মেন্দির বাগানে/কিসের বাদ্য বাজে
কেবা আমার আঁইসের আপা/নিতো নাকি সাজে
আমার বাবার কাঁদনে/গামছার আঁচল বিজেরে (ভিজে)
আমার ফুফুর কাঁদনে/শাড়ির আঁচল বিজেরে (ভিজে)
আমার মায়ের কাঁদনে/চুলার আগুন নিবেরে (নিভে)

ছেলের কথাঃ বর/ছেলের পক্ষের মহিলা বা কিশোরীরা সুর করে গায়। এটি কোনো দুঃখের গীত নয়। এটি বিয়ের পরিবেশে মধুর আমেজ আনার জন্য অনেক গীতের একটি

যখন কালে আরশাদ মিয়া/মেন্দি সাজন সাজে
তখন কালে রাইলা বিবি/মেন্দি ধরি কাঁন্দে
কাইন্দো না গো রাইলা খাতুন/তোমার আল্লার কিইরা গো
তোমারে ছাড়িয়ে করমু/দোসরা নহে বিয়া গো

শ্লোকঃ বিয়ের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর বরকে কনের গৃহে যখন নেয়া হয় তখন এসব শ্লোক পরিবেশন হয়। প্রথমে ঘরের দরজায় আটকিয়ে কনের ছোট ভাই, বোন বা আত্মীয় প্রশ্ন উত্তরের মাঝে এসব শ্লোক বলে। পরে ঘরে নিয়ে অনুরূপভাবে শ্লোক দিয়ে অপর পক্ষকে আটকানো হয়। কিংবা প্রতিপক্ষ উত্তর দিয়ে নিষ্কৃতি পায়। এসবের পর বর কনেকে এক বিছানায় বসিয়ে দেখাদেখি করা এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন থেকে প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়। এসময় বর কনেকেও উপহার (টাকা-আংটি) দেয় এ-ধরনের একটি কথোপকথন নিম্নরূপ:

কনেপক্ষ: আচ্ছালামু আলাইকুম এন/জামাই আইছে বিয়া কৈত্ত আমনেরা আইছেন কেন?
বরপক্ষ: ওয়ালাইকুম সেলাম ওবা/দুলা আইছে বিয়া কৈত্ত আমরা আইছি শোভা
কনেপক্ষ: বড় বাড়ির হোলা তুমি/সবাই তারিফ করে
উল্টা হাড়িত হাঁড়া দিয়া/ জাতি নষ্ট করে
বরপক্ষ: ওলি গাছের ডুলি হাতা/আকাশেরও তুলি
কোন বুবুজান গরে আছেন/দুয়ার দেন গো খুলি
কনেপক্ষ: গরে (ঘরে) গরম বাইরে ঠাণ্ডা
দুলাবাই খাড়াই থান দুই-চাইর গন্টা (ঘন্টা)

www.pathagar.com

বরপক্ষ: অক্কির লতা শুকাইল/বাবি (ভাবী) আমার লুকাইল
যদি বাবি (ভাবী) আমার হন/দুয়ার খুলি গরে (ঘরে) লন।

কনেপক্ষ: মেহমান বইছেন চেয়ারে
কনছেন মেহমান, শরবত খাইতে কি কি লাগে

বরপক্ষ: বড় গরুর দুর্দ (দুধ) লাগে, মইন্নারী দোয়ানের চিনি লাগে
বড় একটা গ্লাস লাগে, সুন্দরী বাবির (ভাবি) আত (হাত) লাগে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফি, সাধক, ফকির দরবেশদের মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক বিচিত্র ধরনের সংস্কৃতি। মাজারে ফাতেহা পাঠ ও ওরস, জেয়ারত ও মানতের মাধ্যমে সন্তান, রোগমুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি কামনা এই সংস্কৃতির অংশ। তাছাড়া মাজারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের লোকসঙ্গীত। এসব সঙ্গীতের চর্চা, লালন ও বিকাশে মাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী অঞ্চলে সুফি সাধকদের অনেক মাজার রয়েছে। ফেনীর বিখ্যাত সুফি সাধক পাগল মিয়ার মাজারে বার্ষিক ওরস পালিত হয়। ভক্তবৃন্দ মাজার জেয়ারতে আসেন। মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য মানত করেন। কিন্তু এখানে কোনো গান বাজনা হয় না। নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের অনেক মাজারেও গান বাজনা হয় না। জনসাধারণের রক্ষণশীল ধর্মীয় মনোভাব এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়। তাই এই অঞ্চলে মাজার কেন্দ্রিক সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য চর্চা ও বিকাশ হয় নি।

সবশেষে বলা যায় যে, কোনো দেশের Folklore বা লোকঐতিহ্য একেবারে হারিয়ে যায় না। নতুন রূপে সংস্কৃতি টিকে থাকে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ Dan Ben Amos বলেন, "Folklore never dies out, it mutates and changes" ফোকলোর গবেষকের কাজ হচ্ছে ফোকলোর-এর উপাদান পরিবর্তিত রূপে কীভাবে সমাজে অস্তিত্বশীল তা অনুসন্ধান করা। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির "সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রকল্পের" আওতায় গবেষকদের এই অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, সঙ্গীতের স্রষ্টা সনাক্তকরণ ও মেধাস্বত্ব নির্ধারণের কাজও ত্বরান্বিত হবে।

তথ্যসূত্র

বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩।
সঙ্গীতা সৌখিন শিল্পী গোষ্ঠী, পরশুরাম, ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।
অধ্যাপক রফিক রহমান ভূঁইয়া, ফেনী।
পরিমল চন্দ্র বণিক, সংলাপ নাট্যদল, ফেনী।
লোককবি আক্তারুজ্জামান, ফেনী।
মোহাম্মদ হাশেম, নোয়াখালী।
মোঃ মাইন উদ্দিন পাঠান, শিক্ষক, সাংবাদিক, ও সংস্কৃতি গবেষক, লক্ষ্মীপুর। (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করছেন)।
কাজী মোস্তফা কামাল, সংস্কৃতিকর্মী, ফেনী।
নান্টু দত্ত, গ্রাম-বারাহীপুর, ফেনী।

www.pathagar.com

২

খুলনা অঞ্চল

২.১ কুষ্টিয়া জেলার লোকসঙ্গীত

সাইমন জাকারিয়া

ভূমিকা: পদ্মা, গড়াই আর হিসনা নদীর স্রোতধারায় স্পর্শধন্য কুষ্টিয়া জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ওই সকল নদীর বিস্তীর্ণ-চঞ্চল, কখনো কখনো শান্ত-সমাহিত স্রোতভঙ্গির মতোই উদার, মহান, বিশাল ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। শিল্পে-সাহিত্যে-সাংবাদিকতায় এ জেলাতে সময়ের প্রয়োজনে আবির্ভাব ঘটেছে প্রতিভাশালী মহৎ ব্যক্তিদের। ঐতিহ্যের সায়রে অবগাহন করে কুষ্টিয়ার বুকে এসেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাউলসম্রাট লালন সাঁই, গগন হরকরা, মীর মশাররফ হোসেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, জলধর সেন, কাজী মিয়াজান, কবি দাদ আলী, বাঘা যতীন, কবি আজিজুর রহমান প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের পদচারণায় কুষ্টিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতি, এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য, দেশপ্রেম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্টিয়া জেলা দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা ও তার পার্শ্ববর্তী মানুষের জীবন চেতনার নির্যাস নিয়ে রচিত হয়েছে 'সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি'; সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে অমর আখ্যান 'বিষাদ সিন্ধু'; অন্তর প্লাবিত করা সুর ধ্বনিত হয়েছে ফকির লালন সাঁইয়ের একাতারাতে, গানে গানে প্রান্তর জনপথ ভরে দিয়েছেন কাঙ্গাল হরিনাথ। এতসব ঐতিহ্যিক তৎপরতার সঙ্গে কুষ্টিয়ার গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের আদি ও আসল ঐতিহ্যের প্রবাহ এখনও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। কুষ্টিয়া জেলার প্রধান পরিচয় সারা দেশবাসীর কাছে লালনসঙ্গীত ও বাউলগানের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত হলেও অন্যান্য বহু ধরনের লোকসঙ্গীত যেমন– পদ্মাপুরাণ গান, কীর্তন গান, রামায়ণ গান, গাজীর গান, মানিকপীরের গান, অষ্টগান ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে।

জেলা পরিচিতি (ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক, জনসংখ্যাগত, গোষ্ঠীগত, পেশাগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কাহিনী-কিংবদন্তি, লোকশ্রুতি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য)

কুষ্টিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত জেলা। এ জেলার উত্তরে পদ্মা নদী, দক্ষিণে ঝিনাইদহ জেলা, পূর্বে পাবনা জেলা, রাজবাড়ী জেলা, পশ্চিমে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ-বিভাগের পূর্বে কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার একটি মহকুমা ছিল। দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমা নিয়ে কুষ্টিয়া জেলা গঠিত ছিল।

প্রাচীন হিন্দু যুগে বাংলাদেশ বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় প্রভৃতি নামে বিভক্ত ও পরিচিত ছিল। কুষ্টিয়া পঞ্চম শতাব্দী থেকে সমতট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়। দশম ও একাদশ শতকে এটা পাল রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাল বংশের পতনের পর সেন রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২০২ (মতান্তরে ১২০৪) খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুষ্টিয়া জেলা মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ১৬১১

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়া মুঘল শাসনাধীনে আসে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয়ের সাথে তাই এ জেলার স্মৃতি জড়িত।

বাংলার ইতিহাসে নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহের ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত নীলের এক অষ্টমাংশ কুষ্টিয়া অঞ্চলে উৎপাদিত হতো। ছোট বড় মিলিয়ে এ অঞ্চলে প্রায় অর্ধশত নীল কুঠি ছিল। ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকেরা নীল বিদ্রোহে এক বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করে। কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার সদরপুরের প্রজাদরদী মহিলা জমিদার প্যারীচাঁদ সুন্দরী কৃষকদের একাংশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়া, কুমারখালীর সাংবাদিক-সাহিত্যিক কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার অত্যাচারিত নীলচাষীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

ওহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনেও কুষ্টিয়া জেলার গৌরবময় অবদান রয়েছে। কুমারখালী কাজী মিয়াজান ওহাবি আন্দোলনে বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে কুষ্টিয়ার অবদান অত্যন্ত গৌরবময়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল কুষ্টিয়া জেলা।

কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। এ জেলার খোকসা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল বলে জানা যায়। হিন্দু সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে গোস্বামী দুর্গাপুরের রাধানগর প্রাচীন মন্দিরে, ফুলবাড়ি মাঠে জগতি টেরাকোটা মন্দিরে, কুমারখালীর কালীবাড়িতে ও শিলাইদহের গোপীনাথ মন্দিরে। এক সময় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রসার ঘটেছিল এ অঞ্চলে। কুমারখালী ও কুষ্টিয়া শহরে ব্রাহ্মণ সমাজের উপাসনা মন্দির ছিল বলে জানা যায়। খ্রিস্টধর্মের নানা নিদর্শন এ জেলার বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। বল্লবপুর ও কুষ্টিয়ার গির্জা, কুমারখালী ও কুষ্টিয়ার প্রাচীন গোরস্থান এখনো খ্রিস্টধর্মের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতির বহু স্মৃতিচিহ্ন এ জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ঝাউদিয়ার শাহী মসজিদ, সাতবাড়িয়ার বাদশাহী মসজিদ, হরিনারায়ণপুরের সুলতান সুজার মসজিদ, বিত্তিপাড়া ও আলমপুরের মসজিদ সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি)

কুষ্টিয়া জেলায় বহু ধরনের লোকসঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা নিম্নরূপ:

১. লালনসঙ্গীত ও বাউলগান, ২. পদ্মার নাচন, ৩. পদ্মাপুরাণ গান, ৪. পদাবলী কীর্তন, ৫. রামকীর্তন বা রামমঙ্গল, ৬. মানিকপীরের গান, ৭. একদিলপীরের গান, ৮. অষ্টগান, ৯. নছিমন গান, ১০. শব্দগান বা ভাবগান, ১১. মুসলমানির গান, ১২. বিয়ের গান বা মেয়েলি গীত, ১৩. লেটো গান ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এ সকল লোকসঙ্গীতের সুরে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি পরিবেশনারীতিতেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অত্র তালিকার অধিকাংশ লোকসঙ্গীতের পরিবেশনাই আখ্যানধর্মী ও নাট্যমূলক। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দু'একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রচলিত প্রায় সকল ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতকেই নাট্যমূলক লোকসঙ্গীত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ পর্যায়ে সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা যেতে পারে:

১. লালনসঙ্গীত ও বাউলগান: কুষ্টিয়া জেলার সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য হচ্ছে লালনসঙ্গীত ও বাউল গান। এই গান মূলত তত্ত্বভিত্তিক। আসলে, নানা তত্ত্বের সমন্বয়ে যেমন বাউল ধর্মমত, ধর্মচিন্তা এবং ধর্মাভ্যাস গড়ে উঠেছে তেমনি বাউল গানে প্রতিফলিত হয়েছে নানা তত্ত্বের সমাহার। বাউল ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিত্ব ফকির লালন সাঁই বাউল গানের পথিকৃৎজন ও প্রধান রচয়িতা। তাঁর রচিত গান সাম্প্রতিক লালনসঙ্গীত নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। সে যাই হোক, বাউল গানের ভাবধারা বিশ্লেষণ করলে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি পর্বে ভাগ করা যায়। আসলে, বাংলা গানের সাঙ্গীতিক কাঠামো অনুসরণেই অধিকাংশ বাউল গান রচিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি বাউল গানে কোনো না কোনো ভাবের পূর্ণাঙ্গ

www.pathagar.com

লালন সঙ্গীত

প্রকাশ ঘটেছে। ধূয়া বা অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ– প্রধানত এই চতুরঙ্গের কাঠামোতে বাংলা গানের ভাব বিন্যস্ত করা হয়। গানের সূচনাত্মক এক বা দুই চরণ ধূয়া বা অস্থায়ী। অন্তরা ও সঞ্চারীতে ভাবের বিস্তার এবং আভোগে সমাপ্তি ঘটে। তিনটি স্তরেই ধুয়ার পুরাবৃত্তি হয়। ব্যতিক্রম ভিন্ন বাউল গানে এই কাঠামো অনুসৃত হয়ে থাকে। বাউল গানে ভনিতার ব্যবহার থাকে। প্রধানত আভোগে ভনিতা যুক্ত হয়ে থাকে। কোনো গানে ধুয়াতেও ভনিতা যুক্ত হতে দেখা যায়। বাউল গানে সাধারণত বাউল ধর্ম সাধনার গুহ্য কথার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে বলে অনেক সময় বাউল গানের ভাব রহস্যময় থাকে এবং সর্বসাধারণের কাছে তা বোধগম্য হয় না। বাউল গান পরিবেশনার সময় অনেক সময় নাচ প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধারণত দেশীয় বাদ্যযন্ত্র একতারা, দোতরা, মৃদঙ্গ, করতাল, প্রেমজুড়ি, খমক ইত্যাদি সহযোগে বাউল গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। কুষ্টিয়া জেলাতেই সর্বাধিক সংখ্যক বাউল সাধক ও বাউল গানের শিল্পী প্রত্যক্ষ করা যায়।

২. পদ্মার নাচন: কুষ্টিয়া অঞ্চলে পদ্মার নাচনের আরও অসংখ্য দল রয়েছে, যারা প্রায় সারা বছর পেশাজীবীর ভিত্তিতে এ ধরনের নৃত্য-নাট্য-গীত পরিবেশন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি দল হচ্ছে–ভেড়ামারা থানার পরানখালি গ্রামের হায়দার আলী, মিরপুর থানার নওদাখারারা গ্রামের আক্তার পরামানিক ও কেউপুর গ্রামের হোসেন আলী'র পদ্মার নাচন দল।

'পদ্মার নাচন' মূলত বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকদেবী মনসা বা পদ্মাপুরাণ গানের একটি নৃত্যপ্রধান পরিবেশনা আঙ্গিক। এধরনের পরিবেশনা আঙ্গিকের শিল্পী-কলাকুশলীদের সবাই মুসলমান বলেও ভিন্নতর গুরুত্বের দাবি রাখে।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা ও মিরপুর থানাতেই মুসলমান গায়কদের 'পদ্মার নাচনে'র অসংখ্য দল প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ধরনের পরিবেশনা মূলত পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত পদ্মাপুরাণ গান থেকে অপেক্ষকৃত আধুনিক কালে সৃষ্টি হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা-মিরপুর থানায় প্রচলিত পদ্মার নাচনের অধিকাংশ গায়েন-শিল্পীরা জানান, এ ধরনের পরিবেশনা প্রথম প্রর্বতন করেন মিরপুর থানার কেউপুর গ্রামের রিয়াজউদ্দিন মালিথা। কথিত আছে যে, 'পদ্মার পার পাবনা থেকে পদ্মার নাচন গানকে তিনিই প্রথম মিরপুরে আনেন।' পাবনা অঞ্চলে তাঁর গুরু ছিলেন সন্তোষ পাল। পরবর্তীতে তাঁর (রিয়াজউদ্দিন মালিথা) শিষ্য ও বংশধর পদ্মার নাচন পরিবেশনা কুষ্টিয়া ছড়িয়ে দেন।

www.pathagar.com

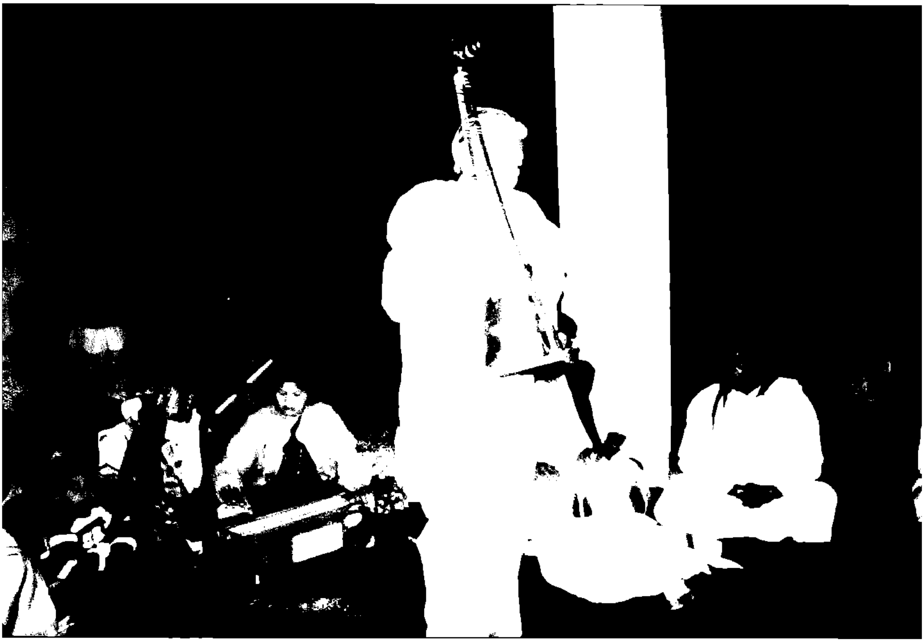

বাউল সাধক করিম সাঁই

বর্তমানে পদ্মার নাচনের প্রবর্তক হিসেবে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কেউপুরের প্রয়াত রিয়াজউদ্দিন মালিথার নাম শোনা যায়। পরবর্তীকালে তাঁর সন্তানের মধ্যে প্রয়াত জের আলী ফেলু এবং বর্তমানে জীবিত আব্দুল কাদের মালিথা এ ধরনের পরিবেশনা উক্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান রিয়াজউদ্দিন মালিথার বংশধরের মধ্যে তাঁর দৌহিত্র অর্থাৎ আব্দুল কাদের মালিথার ছেলে হোসেন আলী (৪০) ও নাতি চঞ্চল ফকির (২৮) নিয়মিতভাবে পদ্মার নাচনের আসর করে থাকেন।

৩. পদ্মাপুরাণ গান: লোকায়ত দেবী পদ্মা বা মনসা বিষয়ক আখ্যানের পরিবেশনা আঙ্গিক 'পদ্মাপুরাণ গান' কুষ্টিয়া অঞ্চলের কম জনপ্রিয় নয়। সাধারণত বাংলা বছরের শ্রাবণ-সংক্রান্তি, অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষের পনের থেকে সাত, তিন বা এক দিন এই গান কুষ্টিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের গান পরিবেশনার জন্য কোনো স্থায়ী মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত বাড়ির বাইরের উঠান এবং মন্দির প্রাঙ্গনের খোলা স্থান বা চতুর্দিক খোলা নাটমন্দিরেই এ ধরনের গান পরিবেশন করা হয়। কুষ্টিয়া অঞ্চলের পদ্মাপুরাণ গান-এর পরিবেশনারীতি সাধারণত দুটি পর্ব থাকে। যার প্রথম পর্বে আখ্যানপূর্ব পরিবেশনা এবং দ্বিতীয় পর্বে থাকে আখ্যান পরিবেশনা। এক্ষেত্রে প্রথম পর্বের আখ্যানপূর্ব পরিবেশনাতে আবার থাকে কয়েকটি স্তর, যথা–কনসার্ট ও কুশীলবদের অবস্থানগ্রহণ, এ পর্যায়ে বাদ্যের আওয়াজের সাথে সকল কুশীলব অর্ধবৃত্তাকারে উত্তর বা মন্দিরমুখী পাশাপাশি সারিবদ্ধ হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপর মূলগায়েন ও সকল কুশীলব সম্মিলিত বাদ্যের সঙ্গে মনসার ধ্যান করে মনসার প্রণাম মন্ত্র পাঠ করেন। তারপর আসে রামস্তবমূলক গান এবং বন্দনা। বন্দনা পরিবেশনের শেষে শুরু হয় মূল আখ্যান পরিবেশনা। এ ধরনের পরিবেশনারীতির যে সব বিশেষত্ব রয়েছে, সেগুলো হলো–ধুয়া, বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য, পদ্য এবং সংলাপাত্মকগীত, গদ্য, পদ্য ইত্যাদি। প্রথমেই বলা যাক ধুয়া সম্পর্কে। ধুয়া বা ধ্রুবপদ, যা একটি নির্দিষ্ট গীতমধ্যে বারবার গাওয়া হয়। এই রীতি বা পদ্ধতিটি সমস্ত পরিবেশনায় একটি সাধারণ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রূপে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। আখ্যান পরিবেশনার প্রত্যেকটি খণ্ডাংশের বা ঘটনার শুরুতে রয়েছে

www.pathagar.com

বর্ণনাত্মক গীত। এই গীতের শুরুতেই গাওয়া হয় দু'টি স্থায়ী ধ্রুবপদ বা ধুয়া। মূলগায়েনের গীতবর্ণনার প্রতিটি দুই অথবা চার চরণ পরপর দোহার-বাদ্যযন্ত্রীগণ ধুয়া গেয়ে চলেন। তাদের ধুয়াগীতি মধ্যে মূলগায়েন আখ্যানের বর্ণনাত্মকগীত শুরু করেন। প্রতিটি একক ঘটনা পরিবেশনার জন্য উল্লেখিত রীতি অনুযায়ী প্রতিটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট ধুয়া পরিবেশিত হয়।

৪. **পদাবলী কীর্তন:** বৈষ্ণব মতের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার প্রেমলীলা বিষয়ক নাট্যমূলক জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হচ্ছে 'পদাবলী কীর্তন'। এক বা একাধিক মহাজন কর্তৃক পরিবেশিত পদ-গানকে সাধারণত 'পদাবলী কীর্তন' বলা হয়। এ ধরনের পরিবেশনায় ব্যবহৃত গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছিল এবং তা পৃথক গান হিসেবেই গাওয়া হতো। তাই প্রত্যেকটি গানের পৃথক অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। গায়কগণ পরে এই পৃথক অস্তিত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে লীলাপ্রসঙ্গের পূর্বায়ত রূপ দিয়ে এক একটি ঘটনা বা আখ্যানের রূপ দিয়েছেন। এ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বা পালা প্রকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা মঙ্গলগানের প্রভাব রয়েছে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কীর্তনীয়া লোচনদাস ছিলেন মঙ্গলগায়ক। তাছাড়া 'নাটগানে'র প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে। এ ধরনের কীর্তনে সাধারণত বৃন্দাবনে প্রকটিত রাধা, কৃষ্ণ, সখা, সখী, গোপ, গোপী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে বিলাসসূচক ঘটনাগুলিকেই লীলা বলে বর্ণিত করা হয়। বৈষ্ণব-ভক্তদের মতে, লীলা প্রকৃতপক্ষে ভগবৎরূপের খেলা, লীলার আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি নাই, দুঃখ নাই, আনন্দময় অবিশ্রান্ত একটি নিত্যধারা। ভগবৎস্বরূপের প্রকট অবস্থার সমস্ত কর্মই লীলা। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের লীলাপ্রসঙ্গ নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। এই লীলাসূত্রকে অবলম্বন করে নানাবিধ গান রচনা করেছেন মহাজনগণ তাঁদের কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভবের গভীরতার সহায়তায়। পৃথকভাবে এ গানগুলি হলো লীলাকীর্তনের আঙ্গিক–লীলা প্রকরণটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য। বিভিন্ন পদকর্তার ঐ লীলা সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ সংগ্রহ করে গায়ক তাঁর আত্মিক অনুভূতি ও শৈল্পিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা দ্বারা একটি আস্বাদনীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে–এই লীলাকীর্তনেরই অপর নাম 'পালাকীর্তন'। পদাবলী কীর্তনের আসরে মূলগায়ক বা কীর্তনীয়া উপস্থিত হবার আগেই বাদ্যযন্ত্রীগণ আসরে আসেন। প্রথমেই আসর প্রণাম করে তারা বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন। এরপর বাদ্যযন্ত্র বেহালা, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম ও মন্দিরা-করতালের সুর সমন্বয়ে কিছুক্ষণ সম্মিলিত বাদন করেন। কয়েকটি ভাগে এই যন্ত্রসঙ্গীত চলতে থাকে। এর মাঝে কীর্তনীয়া আসরে এসে প্রথমে, আসরে রাখা কৃষ্ণমুরতির অঙ্কিত ছবিতে প্রণাম করেন এবং এরপর সকল বাদ্যযন্ত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করে রাধা-কৃষ্ণ স্মরণে মূল আখ্যান পরিবেশন করেন।

৫. **রামকীর্তন বা রামমঙ্গল:** রামায়ণ গানের কীর্তনাঙ্গিকের পরিবেশনা রীতিকে সাধারণত রামকীর্তন বলা হয়ে থাকে। কুষ্টিয়া জেলার গ্রামের মানুষের মাঝে রামকীর্তনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সকল জেলাতে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন মানতে ও পূজা-পার্বণ উপলক্ষে রামকীর্তনের আসর বসে থাকে। রামকীর্তনের আসরের জন্য তেমন কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। রামকীর্তনের আসরের জন্য সাধারণত বাড়ির খোলা উঠানে বা মন্দির প্রাঙ্গণে দু-চারটি পাটি বিছিয়ে তার উপর কাঁথা মেলে মঞ্চ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে কখনো কখনো মঞ্চের চার দিকে চারটি খুঁটি পুঁতে সামিয়ানা দিয়ে মঞ্চের উপরে একটি ছাউনি ব্যবস্থা করা হয়, কখনোবা খোলা আকাশের নিচেই মঞ্চ নির্দিষ্ট হয়। মঞ্চের চারদিকে দর্শকদের বসার জন্য খড়, চট বা পাটি বিছানো থাকে। দর্শকগণ মঞ্চের চারদিকে বসেই রামকীর্তনের আসর উপভোগ করে থাকেন। সাধারণ বৈদ্যুতিক আলোতেই রামকীর্তনের আসর করা হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা না থাকলে বিকল্প হিসেবে হ্যাজাক লাইট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রামকীর্তনের মূলগায়ক সাদা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরিধান করে আসরে আসেন। তবে, এই পোশাকের সঙ্গে কাঁধে সাধারণত সাদা রঙের উত্তরীয় ব্যবহার করতে দেখা যায়। অপরাপর গায়ক বা দোহার, যন্ত্রীগণ দৈনন্দিন পোশাকে আসরে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

রামকীর্তনের আসরের জন্য গায়ক, দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদের সাজের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে, গায়েন-বাদ্যকার কুশীলবগণ কখনো কখনো কপালে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে পালা পরিবেশনের জন্য আসরে

www.pathagar.com

এসে থাকেন। যেহেতু সাজ-সজ্জার খুব একটা প্রয়োজন হয় না সেহেতু সাজঘরেও প্রয়োজন পড়ে না। অভিনয় উপকরণ হিসেবে রামায়ণের গায়কগণ সাধারণত একটি চামর, উত্তরীয় ও মন্দিরা ব্যবহার করে থাকেন। রামকীর্তনের আসরে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলো হলো–মৃদঙ্গ, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশি ও ঘুঙুর।

রামকীর্তন পরিবেশনার সময়কে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণের জন্মোষ্টমীতে বিভিন্ন মন্দির-প্রাঙ্গণে পদাবলী কীর্তনের পাশাপাশি রামকীর্তনের অনুষ্ঠানও ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, সারা বছরই বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড উপলক্ষে, যেমন–শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাসন, আরোগ্যমুক্তির মানতে নিয়মিতভাবে রামকীর্তনের অনুষ্ঠান আগে হতো এবং আজো হয়। দিনের বেলায় সাধারণত রামকীর্তনের আসর বসে না, বসে সন্ধ্যার পর–একটু রাত হলে। গান চলে ভোর পর্যন্ত। আসলে এই রামকীর্তন রাতেই হয়। দিনে খুব একটা হয় না।

রামকীর্তনের কুশীলবদের সকলেই বঙ্গভূমির মাটি ঘেঁষা মানুষ। চাষী, মজদুর, ছোট চাকুরে। এই শিল্পীদের মধ্যে দুএকজন ছাড়া অধিকাংশ নিরক্ষর, কিন্তু নাচ গানে তারা সুপটু। এদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু তবে, তারা অধিকাংশই বৈষ্ণবপন্থী।

রামকীর্তনের শুরুতেই থাকে সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান। আর মৃদঙ্গ, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশির সেই ঐক্যতানের সঙ্গে মূলগায়েন তার পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের ধ্বনিকে কিছুক্ষণের জন্য একসঙ্গে মিলিয়ে দেন। তারপর হারমোনিয়ামটি কাছে টেনে নিয়ে ভরাট কণ্ঠে দেব-দেবী বন্দনা করেন। দেব-দেবী বন্দনার পর আসে রামের আগমনী গান–'এসো রাম-সীতা।' এরপর একে একে গায়েনের গুরু স্মরণ, পিতা-মাতা স্মরণ ও দর্শকভক্তদের প্রণাম জানিয়ে মূলপালায় প্রবেশ করা হয়। আর এ পর্যন্ত সবটুকু পরিবেশনা চলে গানের সুরে সুরে। এক্ষেত্রে গীতের মধ্যে প্রতিটি চরণে চরণে বাদ্যযন্ত্রী-দোহারগণ সুরে সুরে ধুয়া গেয়ে চলেন। দোহারগণের ধুয়া গীতের আশ্রয়ে বন্দনাপর্ব শেষ করে মূলগায়েন রামকীর্তনের মূলপালাতে আখ্যানমূলক বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করেন। বর্ণনাত্মক আখ্যান গীতের পর কথা বর্ণনা, সংলাপ, ব্যাখ্যা ও সেই সঙ্গে একক অভিনয়যোগে রামকীর্তনের আসর অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের আসরের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ভার থাকে মূলগায়েকের হাতে, তাই তিনি আসরে উপস্থিত ভক্তদের চাহিদা মোতাবেক পালা পরিবেশনের সময় বাড়িয়ে ও কমিয়ে থাকেন।

সম্মিলিত বাদ্য বাদন শেষে আগমনী গান ও বন্দনা শেষ হলে মূলগায়েন রামকীর্তনের আখ্যান পরিবেশনার সূচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র মোহন্ত গোসাঁইয়ের এই রামকীর্তন পরিবেশনায় উচ্চারিত প্রতিটি গান, বাক্য বা কথাকে কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বহুমুখী অর্থ দান করতে করতে এগিয়ে যান। এই ব্যাখ্যায় তিনি একই সঙ্গে মিশিয়ে দেন সমকালীন মানুষের সামাজিক বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিভিন্ন ধর্মের সারকথা, এদেশের ভূখণ্ডগত বৈচিত্র্যের সাথে প্রকৃতি বর্ণনা ও তার সাথে রামকাহিনীর প্রকৃতি বর্ণনার মিল-অমিল। এমনকি বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার প্রসঙ্গ এবং রামকাহিনীর সঙ্গে তার মিল-অমিলের বর্ণনাকেও তিনি উপেক্ষা করে যান না। যে কারণে, শ্রীরামচন্দ্র মোহন্ত গোসাঁইকৃত রামকীর্তনের পালা শুধু শুধু সুদূর কোনো কালের মহাকাব্য হয়ে থাকে না, বরং তা হয়ে যায় সমকালীন এবং প্রাণবন্ত একটি নতুন কাহিনী।

৬. **মানিকপীরের গানঃ** বাড়ির মানুষ-গরুর মঙ্গল কামনা করে সাধারণত বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরেই মানিক পীরের গান গীত হয়। সুর করে বাড়ির উঠানে এই গান পরিবেশিত হয়ে থাকে।

এ ধরনের পরিবেশনায় মূলগায়েন প্রথমে একটি ধুয়া গেয়ে গান শুরু করেন। দোহারগণ বৃত্তাকারে মূলগায়েনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দুই-দুইটি চরণ শেষে ধুয়াতে গতি আরোপ করেন। পুরো আখ্যানের প্রথম পর্বের কাহিনীগীতি শেষে গীত হয়-'ওই ওরে এক বাড়িরও কার্য নাই গো আরাক বাড়িত যায়।/ওই এ বাড়িরও ওই মানুষ-গরু থাকুক বরজায় (বজায়)।' এই গীতবর্ণনা শেষে মূলগায়েন দর্শকদের উদ্দেশ্যে গদ্যে বর্ণনা করে বলেন-'এ বাড়ির কার্য নাই আরেক বাড়ি যায়। এ বাড়িরও মানুষ-গরু থাকুক বরজায়। একেন'তে আরেক বাড়ি চলে গেল।' এবার শুরু হয় নতুন ধুয়া। নতুন ধুয়ার সঙ্গে কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব শুরু

www.pathagar.com

মানিকপীরের গান

হয়। সে পর্বের শেষে এসেও গায়েন একই কথা বলেন। মোট পাঁচটি পর্বে পাঁচটি ধুয়াযোগে মানিক পীরের গানের এক একটি পর্ব এক এক বাড়িতে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

৭. **একদিলপীরের গানঃ** বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পীরের মধ্যে একদিল পীর উল্লেখযোগ্য। কুষ্টিয়া ও মানিকগঞ্জ অঞ্চলে এই পীর মাহাত্ম্যের আখ্যান ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এটা মুসলমানদের ধর্মীয় দলীয় লোকসঙ্গীত। সাধারণত ৭ থেকে ৮ দিন ধরে এই পালা করা হয়। এই গানে একজন মূলগায়ক এবং পাঁচ থেকে ছয়জন দোয়ারকি থাকে। দোয়ারকিরা গোল হয়ে বসে। মূলগায়ক তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদিল পীরের গান পরিবেশন করে থাকেন। এক্ষেত্রে আসরে বসে থেকেই পাইল দোহারগণ মূলগায়েনকে সাহায্য করেন। উল্লেখ্য, একদিল পীরের গানে কাউকে ছুকরি সাজানো হয় না। এ রকম গানের অনুষ্ঠানের চারদিকে ভক্তপ্রাণ দর্শকগণ অবস্থান করেন। একদিল পীরের গান পরিবেশনায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খোল, জুড়ি ও করতাল ব্যবহৃত হয়। একদিল পীরের গানের সঙ্গে লোকায়ত ইসলামপন্থীদের অন্যান্য বেশ কয়েকটি পীর-কাহিনীও জড়িয়ে আছে। যেমন একদিল পীরের মূলপালার সঙ্গে এই পরিবেশনারীতিতে কালুগাজীর পালা, রঞ্জনা পালা, মাদার পালা, মানিক পীরের পালা, নবীর মেহেরাজ পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। একদিল পীরের গানের সাতটিখণ্ডের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, প্রতিটি পালায় এক একজন পীরের কাহিনী ব্যক্ত করা হয়। আর এক এক পীরের স্বতন্ত্র কাহিনী নিয়ে একদিল পীরের গানের এক একটি খণ্ড রচিত হয়। তাই এই পালার কাহিনী লিখতে গেলে সাতটি আলাদা আলাদা কাহিনী লিখতে হবে। তবে, যেহেতু একদিন পীর এই পালার মধ্যে প্রধান হিসেবে গণ্য করে পুরা পালার নাম রেখেছে একদিল পীরের পালা।

বছরের যে কোনো সময় একদিল পীরের গান পরিবেশিত হতে পারে এবং এর কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। এই গান সাধারণ অসুখ-বিসুখের কারণে মানত করা হয়, যেমন–বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনায়ও এই পালা মানত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও গ্রামবাসীরা মন-খুশি মতো শোনার জন্যও কখনো কখনো একদিল পীরের গান আয়োজন করে থাকে। পালাটি সম্মানীর বিনিময়ে করা হয়ে থাকে। গ্রামবাসীরা সাধারণ পোশাকেই এই পালা করে থাকে। তবে, মূলগায়েন সাদা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পাগড়ি অথবা টুপি পরে।

www.pathagar.com

৮. **অষ্টগান:** কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রণয়লীলা বিষয়ক আখ্যান ও লোকপুরাণ অবলম্বনে 'অষ্টকগান' বা 'অষ্টগান' পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশনাতে গ্রামের ছেলেরা কৃষ্ণ, রাধা ও রাধা-সখি সেজে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গান ও নাচ সহযোগে সাধারণত রাধা-কৃষ্ণের নৌকাবিলাস পালার গান অভিনয় সহযোগে পরিবেশন করে থাকেন। অষ্টকগানের নামকরণ সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এতে আটটি বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ আছে, কেউ বলেন আটজনে মিলে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাট্যধর্মী গীত পরিবেশন করা হয় বলে এর নাম অষ্টকগান। ভিন্ন মতে জানা যায়, এটি শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রহরের লীলা-সংক্রান্ত নাট্যগীতি বলে একে অষ্টকগান বলা হয়।

গ্রামের শিশু-কিশোর-যুবক, ক্ষেত্রবিশেষে বয়স্করা চৈত্রসংক্রান্তি বা জন্মাষ্টমীর কৃত্যাচার হিসেবে অষ্টকগান পরিবেশন করে থাকে। স্বাভাবিকভাবে কৃত্যাচারকেন্দ্রিক অষ্টকগান পরিবেশনের সঙ্গে বায়নার কোনো সম্পর্ক থাকে না। তবে, মানত বা আনন্দ উৎসবে আমন্ত্রিত হলে অষ্টকগানের শিল্পীগণ বায়না নিয়ে থাকেন। অষ্টকগান বছরের সুনির্দিষ্ট দু'একটি সময়ে, যেমন–চৈত্রসংক্রান্তি ও জন্মোষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কুষ্টিয়া সদর থানা, মিরপুর ও ভেড়ামারা অঞ্চলে এ ধরনের পরিবেশনা সাধারণত দিনের বেলাতেই অধিক হয়ে থাকে।

বাড়ির বাইরের বা ভেতরের উঠানই অষ্টক পরিবেশনার জন্য অধিক উপযোগী। অষ্টকগানের আসর করার জন্য মঞ্চের সুনির্দিষ্ট কোনো আকৃতি তৈরি করা হয় না, বাড়ির ভেতর বা বাইরের উঠানকে অভিনেতা বাদ্যকরগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে অভিনেতা, বাদ্যকরগণ দাঁড়িয়ে থেকে নেচে গেয়ে অভিনয় করেন এবং দর্শকগণও উঠানে দাঁড়িয়ে বা ঘরের বারান্দায় বসে আসর উপভোগ করেন। সাধারণত দিনের বেলায় খোলা আকাশের নিচে এই অভিনয় চলে বলে কৃত্রিম কোনো আলোর প্রয়োজন হয় না। তবে, রাতের বেলায় পরিবেশনের ক্ষেত্রে হ্যাজাক বা বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার করা হয়। অষ্টকগানের শিল্পীগণ সাজ-সজ্জায় অতিরঞ্জিত রঙ ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে

অষ্টগান

www.pathagar.com

নাট্যাখ্যানে বর্ণিত শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, বড়াই এবং রাধা-সখিদের চরিত্র উপযোগী সাজ গ্রহণে অভিনেতাগণ মুখে চোখে ও পায়ে যথাক্রমে স্নো, পাউডার, জিঙ্ক অক্সাইড, কাজল, আলতা ইত্যাদি ব্যবহার করেন। সাধারণত গ্রামের কোনো গাছতলাতে কিংবা কোনো ঘরের খোলা বা ঘের দেওয়া বারান্দাতে বসেই অভিনেতাগণ সাজ গ্রহণ করেন।

অষ্টকগানের দলে আগে যে সব কুশীলব অভিনয় করতো এবং বর্তমানে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের একটা করে নাম আছে। যেমন–যে সব কিশোর যুবা শাড়ি পরে মেয়ে সেজে আসরে এসে বন্দনাগানসহ অন্যান্য যৌথ ও একক গান গায়, অভিনয় করে তাঁদের নাম ছুকরি বা সখি। এই গানের কুশীলবগণ সাধারণত বর্ণিল পোশাক পরিধান করে থাকেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ চরিত্র জরির কাজ করা আঁটোসাটো একটি কটি-বস্ত্র গায়ে চাপিয়ে বর্ণিল ধূতি পরে অভিনয় করেন। আর রাধা ও রাধার সখি চরিত্রে রূপ দানকারী কুশীলবগণ গ্রামের মেয়েদের কাছে সংগ্রহ করা উজ্জ্বল রঙের প্রিন্ট শাড়ি পরিধান করেন। অপরাপর বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পোশাকের বাইরে নিজের তুলে রাখা রঙিন পোশাক করে অষ্টকগানের আসর করে থাকেন। অষ্টকগানের অভিনয় অনুষঙ্গরূপে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি হলো হারমোনিয়াম, খোল বা মৃদঙ্গ, করতাল, ঘুঙুর ইত্যাদি। এই বাজনদার নামও আছে, যথা–খুলি, হারমোনিয়াম মাস্টার বা হারমোনিবাদক ইত্যাদি। অষ্টকগানের কুশীলবদের সকলেই বঙ্গভূমির মাটি ঘেঁষা মানুষ। চাষী, কামলা বা মজদুর, সাধারণ স্কুলের ছাত্র, মুদিদোকানদার ইত্যাদি। এই শিল্পীদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া অধিকাংশ নিরক্ষর, কিন্তু নাচ গানে তারা সুপটু। এদের মধ্যে সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে দিনের বেলায় এরা পেশাজীবী চাষী, দোকানদার আর রাতের বেলায় মাস্টার ম্যানেজারসহ নিজেদের বাড়ির উঠানে অভিনয় অনুশীলন করেন।

অষ্টকগানে একজন প্রধান গায়েন, একজন কৃষ্ণবেশী বালক ও আরেকজন রাধাবেশী বালক থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাধার ভূমিকায় মেয়ে শিশুরা গান করে থাকেন। এছাড়া অষ্টকগানের দলে একজন প্রোমটার এবং আরও তিন বা ততোধিক পরিবেশনকারী থাকে। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা অষ্টকগানে গীতাভিনয় আকারে পরিবেশন করা হয়। অষ্টকগানের ভ্রাম্যমাণ দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান পরিবেশন করে থাকেন। প্রথমেই থাকে সম্মিলিত বাদ্য বাদন। অষ্টকগান সূচনার আগে কোনো বাড়ির উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাদ্যযন্ত্রিগণ জনপ্রিয় একটি দেশাত্মবোধক গানের সুরে সম্মিলিত বাদ্য বাদন শুরু করেন। সম্মিলিত সেই বাদ্য বাদন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে উঠানের এক পাশ থেকে কৃষ্ণ, রাধা ও তার অষ্ট সখি দুই বাহু তুলে বাদ্যের তালে নাচতে নাচতে বাদ্যযন্ত্রীদের সামনের অভিনয়স্থানে এসে বৃত্তাকারে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করেন। তার মধ্যে সম্মিলিত বাদ্য বাদন শেষ হয়। আর অমনি কৃষ্ণ এবং রাধাসহ সখিগণ দুই দল বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান। আসে বন্দনা পর্ব। অষ্টগানের শিল্পীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী অভিনেতার মুখোমুখি রাধা ও রাধা-সখিগণ জোড় হাতে বসে বন্দনার সূচনা করেন। বন্দনার একটি অন্তরা শেষে রাধা ও রাধা-সখিগণ বসা অবস্থা থেকে জোড় হাতে দেহের উপরের অংশ ঘোরাতে ঘোরোতে উঠে দাঁড়ান। তারপর বন্দনার দ্বিতীয় অন্তরা শুরুর আগেই তারা আবার কৃষ্ণ চরিত্রের মুখোমুখি বসে যান এবং বন্দনার নতুন অন্তরা কণ্ঠে তুলে নেন। সরস্বতি ছাড়া পিতা-মাতা, শিক্ষাগুরুর বন্দনা করা হয় অষ্টকগানের শুরুতে। বন্দনার পর অষ্টকগানের পালা শুরু করা হয় মূলগায়েন-এর বর্ণনা দিয়ে, যিনি একই সঙ্গে বর্ণনাকারী-গায়েন এবং কৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন।

৯. **নছিমন গান:** আখ্যানধর্মী গীতি-নাট্য। স্বতন্ত্র সুর বৈশিষ্ট্যের কারণে নছিমন গানকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে 'নছিমন গান' নামে এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্য পালার প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে এই গান উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। নছিমন গানের পরিচালক ও দলপ্রধানদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, 'রূপভান গানের এক অংশ আর কমলার বনবাসের এক অংশ মিলে নছিমন গান সৃষ্টি

www.pathagar.com

নছিমন গান

হয়েছে।' নছিমন গানের মূল চরিত্র বা নায়িকা হচ্ছে নছিমন। আর এর কাহিনীতে জানা যায়–এক সময় এক দেশে জালেম নামে এক প্রজা উৎপীড়ক বাদশা রাজত্ব করতেন। খাজনা আদায়ের নিমিত্ত তিনি লুণ্ঠন ও শারীরিক নির্যাতন চালাতেন দরিদ্র প্রজাদের উপর।

প্রজাদের দুঃখে বিগলিত এক পীর একদিন কৃষকের ছদ্মবেশে বাদশার নির্মমতা পরীক্ষা করতে এলেন। জালেম বাদশা তাঁকে চাবুকের আঘাতে অর্ধমৃত করলে পীর এই বলে অভিশাপ দিলেন যে, স্বীয় পুত্রের দশবছর পূর্ণ হবার আগেই অপঘাতে বাদশার মৃত্যু হবে, এমনকি তার পুত্র আলম এই অভিশাপে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তবে জালেম বাদশা তাঁর ছেলেকে বাঁচাতে পারবেন এক শর্তে, দশ বছর পূর্ণ হলে আলমকে বিয়ে করাতে হবে এবং বিয়ের রাতে স্ত্রীর মুখদর্শন না করে তাকে চলে যেতে হবে বাণিজ্যে। একদিন, কণ্ঠনালী দিয়ে রক্ত উঠে জালেম বাদশার মৃত্যু হলো। আলম পিতৃহারা হলো। নছিমনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল বিদ্যালয়ে। আলম গটক-ঘটকী পাঠাল নছিমনের মায়ের কাছে। মা বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে বিবাহ হলো আলম-নছিমনের। কিন্তু দৈব অভিশাপের ভয়ে স্ত্রীর মুখদর্শন না করেই সে চলে গেল বাণিজ্যে। এদিকে ফকির প্ররোচিত করলেন আলমকে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলনে। আলম গোপনে রাতে এসে অন্ধকারে মিলিত হন নছিমনের সঙ্গে, আবার গোপনেই গেল চলে সে। যথাসময়ে নছিমন গর্ভবতী হলো, অপবাদ রটল, স্বামীর অনুপস্থিতিতে গর্ভ সঞ্চারের। নছিমন বলল, তার উদরে আছে বৈধ সন্তান, বললো আলম সাধু গোপনে রাতে এসেছিল তার ঘরে, কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। নিয়মমত নছিমনের বনবাস হলো। বনবাসে গিয়ে নছিমন আশ্রয় লাভ করল এক জংলী রাজার ঘরে। যথাসময়ে তার কোল আলো করে এক এক পুত্র সন্তান। বহুদিন কেটে গেল। আলম সাধু যথারীতি বাণিজ্য শেষে গৃহে ফিরে এল। নিরপরাধ স্ত্রীর বনবাস হয়েছে শুনে আলম দুঃখ পেল, সে বেরিয়ে পড়ল নছিমনের খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল আলম তার স্ত্রী-পুত্রের। অবশেষে মহাসমারোহে তারা ফিরে এল নিজ রাজ্যে। সচরাচর ভূমিসমতল বৃত্তমঞ্চ, চৌকোণ মাত্রামঞ্চে এ পালা অভিনীত হয়। সবমিলিয়ে দোহার ব্যতিরেকে এতে অভিনেতা অভিনেত্রীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ-তিরিশ। দোহার দলে থাকে জনা পাঁচ-ছয় গায়েন বায়েন। পুঠিয়া অঞ্চলে ছেলেরাই এ

www.pathagar.com

নাট্যে স্ত্রীবেশ ধারণপূর্বক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। এত সর্বত্র যথাযথ রূপসজ্জা গৃহীত হতে দেখা যায়। বাঘের ক্ষেত্রে মুখোশ ব্যবহৃত হয় (রূপবানের পালায়ও তাই) নছিমনের পালায় জংলী রাজা পৃষ্ঠদেশে আমের শাখা বন্ধন করে। রূপসজ্জার ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছাপ অন্যত্র খুবই স্পষ্ট। চরিত্রের বেশবাসে প্যান্ট, গেঞ্জি এমনকি নছিমনের হাতে ঘড়ি দেখা যায়।

১০. শব্দগান বা ভাবগান: বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সংমিশ্রণে কুষ্টিয়া অঞ্চলে শব্দগান নামে এক ধরনের লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের লোকসঙ্গীত 'বিচারগান' নামেই সমধিক পরিচিত। এ ধরনের পরিবেশনাতে মূলত ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বহুবিধ বিষয় আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত হয়। শব্দগানের আসরে এর পরিবেশনারীতির নিয়মানুযায়ী আবশ্যিকভাবে দুই জন প্রতিপক্ষ গায়েন এবং তাদের নিজস্ব বাদক ও সহকারী-দোহারগণ উপস্থিত থাকেন। দুই জন প্রতিপক্ষ গায়েন সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে বাদক ও সহকারী-দোহারদের সহযোগিতায় হাদিস, কোরআন, বেদ-বিজ্ঞান, বাইবেল, সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি ঘেঁটে-ঘুঁটে তর্ক-বির্তকের নাটকীয় উপস্থাপনে বিচারগানের মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকেন। আসরের অগণিত ভক্ত শ্রোতা-দর্শকগণ গায়েনদ্বয়ের উপস্থিত বুদ্ধি ঝলকানো গানে ও কথায় বিস্মিত হতে হতে রাত পার করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই 'শব্দগান' আরও বেশ কিছু নামে পরিচিত। খুলনা বিভাগের ফরিদপুর অঞ্চলে এই গান 'বিচারগান' হিসেবে পরিচিত ও প্রচলিত থাকলেও যশোর-নড়াইল অঞ্চলে এই গান 'ভাবগান' বা 'তত্ত্বগান' নামেই অধিক পরিচিত। অন্যদিকে তা চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে 'কবির লড়াই' নামে প্রচলিত। আবার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই গান 'বাউলার লড়াই' নামে পরিচিত। আসলে গানে-কথায় দুই গায়েন-কবির তর্ক বা তত্ত্ব আলাপ হচ্ছে এই গানের প্রধান বিশেষত্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিষয়কে আশ্রয় করেই বিচারগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। সে দিক দিয়ে অনেকেই শব্দগানকে আধ্যাত্ম সঙ্গীত বলে থাকেন। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব মিশ্রিত বাউল গানের মাধ্যমে শব্দগান করা হয়ে থাকে। তবে, বিচারগানের আসরে মাঝে মধ্যে ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদ গানও পরিবেশিত হয়।

১১. মুসলমানির গান: কুষ্টিয়া জেলার কিছু লোকসঙ্গীত পরিবেশনকারী হাজাম গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে মুসলমানি দিতে গেলে মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে এক ধরনের মুসলমানির গান পরিবেশন করে থাকেন। এ ধরনের গানের মূল লক্ষ থাকে মুসলমানি দেওয়ার জন্য নির্বাচিত ছেলেটার মুসলমানির প্রতি ভীতি কমানো এবং একই সঙ্গে হাজাম হিসেবে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু সম্মানী আদায় করে নেওয়া। এ ধরনের গানে সাধারণ ওই অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত পদ্মার নাচনের কিছু গানের কথা ঈষৎ বদলে নিয়ে একই সুরে গাওয়া হয়ে থাকে।

১২. বিয়ের গান বা মেয়েলি গীত (গীত-গান): আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীতের একটি জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে–বিয়ের গান বা মেয়েলীগীত। বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী এসে জড়ো হয় বর বা কনের বাড়িতে। সকলের মনে তখন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আর তার মাঝেই শুরু হয় বিয়ের গানের জমজমাট আসর। অবিরাম ও অজস্র ধারায় সে সঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় সারা বাড়ি মুখরিত হয়ে ওঠে। বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমনগায়ে হলুদ, গোসল বা স্নান, বর বা কনের সাজ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সাধারণত বিয়ের গান পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিয়ের গানের বাণী বা কথাবস্তু বিশেষভাবে সম্পর্কিত থাকে। এ জাতীয় গানের মধ্যে গায়ে হলুদের গান, গোসলের গান, বর বা কনে সাজানোর গান, কনে বিদায়ের গান ইত্যাদি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে 'গীত-গান' নামে বিশেষ এক প্রকারের বিয়ের গান প্রচলিত রয়েছে। উক্ত অঞ্চলে কারো বাড়িতে কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে বিয়ের ক'দিন আগে থেকেই গ্রামের সঙ্গীত-রসিক প্রবীণ নারীরা মিলে গীত-গানের আসর করে থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে এই গানের আসর শুরু হয় এবং গভীর

www.pathagar.com

রাতে তা শেষ হয়। সাধারণত বিয়ে বাড়ির ভেতর উঠানে বা রান্না ঘরের খোলা বারান্দায় পাটি বিছিয়ে কোনো ধরনের কৃত্রিম আলো ছাড়াই গীত-গান পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের নারীরা গীত-গান পরিবেশনের জন্য বিছিয়ে দেওয়া পাটিতে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে বৃত্তাকারে বসে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে একটার পর একটা 'গীত-গান' গেয়ে চলেন। এ সময় বিয়ে বাড়ির পক্ষ থেকে তাঁদেরকে পান সাজিয়ে দেওয়া হয়। একটার পর একটা গান গাওয়ার অবসরে গীত-গানের শিল্পীরা এই পান খেয়ে রসালো কিছু আলাপ-সংলাপ বা আড্ডা দিয়ে নেন। তারপর আবার নতুনভাবে বিয়ের গান শুরু করেন।

১৩. **লেটো গান:** কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কয়েকটি গ্রামে বিলুপ্ত প্রায় লোকসঙ্গীত 'লেটো গান' এখনও বেঁচে রয়েছে। এক সময় বর্ধমান-বীরভূম-হুগলী-মেদিনীপুরের পাশাপাশি এই লেটো গান নদীয়া পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লে তা কুষ্টিয়াতে প্রচলিত হয়ে ওঠে বলে ধারণা করা যায়। সাধারণত গ্রামীণ জীবনের কোনো ঘটনা নিয়ে সুরে তালে নেচে নেচে এই গান পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রামীণ অভিনয়ের রীতি অনুযায়ী ছেলেরা মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে।

সনাক্তকৃত প্রতিটি লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল

লালনসঙ্গীত ও বাউল গান	কুষ্টিয়া
পদ্মাপুরান গান/পদাবলী কীর্তন/পদ্মার নাচন	পাবনা
রাম কীর্তন	কুষ্টিয়া
অষ্টগান	নদীয়া
শব্দগান	ফরিদপুর
নছিমন গান	কুষ্টিয়া
মুসলমানি গান	কুষ্টিয়া

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতি-স্থল বা ব্যবহার এলাকা

লালনসঙ্গীত ও বাউল গান	সারা বাংলাদেশ ও পৃথিবীর আরও বহু দেশে বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়।
পদ্মাপুরান গান/পদাবলী কীর্তন/রাম কীর্তন	কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর।
পদ্মার নাচন	কুষ্টিয়া
কামকীর্তন	কুষ্টিয়া
অষ্টগান	কুষ্টিয়া
শব্দগান	সারা বাংলাদেশ
নছিমন গান	কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, বগুড়া ও রাজশাহী
মুসলমানি গান	কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জ
খৃস্টীয় কীর্তন	মেহেরপুর

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের স্রষ্টাদের তালিকা (যেক্ষেত্রে একক স্রষ্টা আছেন)

১. পদ্মার নাচন: এই গানের একক স্রষ্টা হিসেবে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কেউপুর গ্রামের রিয়াজউদ্দিন মালিথার নাম জানা যায়।

২. নছিমন গানে: এই গানের একক স্রষ্টা হিসেবে রেজাউল হক সলকের নাম জানা যায়।

সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকা

১. লালনসঙ্গীত ও বাউল গানের শিল্পী: বাদের শাহ, করিম শাহ, নহির শাহ, মহররম শাহ, মনোহর শাহ, শফি মণ্ডল, জামালউদ্দিন টুনটুন শাহ, রব শাহ, আলাউদ্দিন বিশ্বাস, আনোয়ার হোসেন আনু, বজলু শাহ, বলাই শাহ, আকলিমা বেগম, অঞ্জলি ঘোষ দুর্গা, চুমকি, বিউটি, সালমা প্রমুখ।

www.pathagar.com

২. পদ্মাপুরাণ গান/পদাবলী কীর্তন/রাম কীর্তনের শিল্পী: রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই, মাধব গোঁসাই প্রমুখ।

৩. পদ্মার নাচনের শিল্পী: হায়দার আলী, হোসেন আলী, চঞ্চল ফকির, আক্তার হোসেন, পাথর হাজাম প্রমুখ।

৪. কবিগানের শিল্পী বা কবিয়াল: রমজান আলী বিশ্বাস, কসেম উদ্দিন, নূর ইসলাম প্রমুখ।

৫. শব্দগানের শিল্পী: রেজাউল হক সলক, মায়ারাণী, হোসেন আলী, বাউল নূরুল, ঝন্টু বাউল, সিরাজ বাউল, রঞ্জিত শাহ, শায়েরা পারভীন, মাহমুদ সরকার প্রমুখ।

৬. মুসলমানি গানের শিল্পী: পাথর হাজাম, হায়দার হাজাম প্রমুখ।

৭. গাজীর গানের শিল্পী: সোহরাব উদ্দিন।

৮. খ্রিস্টীয় কীর্তন: সুজিত মণ্ডল বিশা, বাকুল মণ্ডল, রাজ কুমার, সুকেশ মণ্ডল, শেরাফিন, বাবলু খান, ঝোটা, সুকচাঁদ দফাদার, বাদল মণ্ডল প্রমুখ।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের পরিচিতি

১. **পদ্মাপুরাণ গান/রাম কীর্তন/পদাবলী কীর্তন:** সাধারণত একই দল এই তিনটি সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। তাছাড়া, এই তিনটি সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ও এর আয়োজন-দর্শকদের মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কুষ্টিয়া জেলায় এই তিনটি সঙ্গীত ঘারানার বিখ্যাত দল রয়েছে হরেকৃষ্ণপুরের শ্রীরামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাইয়ের। আগে এই দলটির মূলগায়ক এবং পরিচালক ছিলেন তাঁর পিতা নিমাই গোঁসাই। বর্তমানে শ্রীরামচন্দ্র মোহন্ত এই দলের প্রধান হলেও মাঝে মধ্যে তার ভাগ্নে মাধব গোঁসাইকে এই দল পরিচালনা করতে দেখা যায়।

২. **পদ্মার নাচন:** পদ্মাপুরাণ গানের বহুবিধ পরিবেশনা আঙ্গিক সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান থাকলেও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা-মিরপুর অঞ্চলের মতো অন্য কোথাও এতো ব্যাপকভাবে মুসলমানদের অংশগ্রহণে পদ্মা পুরাণের আখ্যান পরিবেশন করতে দেখা যায় না। পরাণখালি গ্রামের হায়দার আলী, বারইপাড়া গ্রামের হোসেন আলী, বালিশিশা গ্রামের পাথর হাজাম, দওদাখারারা আক্তার প্রামাণিকের দল প্রায় নিয়মিতভাবে 'পদ্মার নাচন' দেখে থাকেন।

৩. **মানিক পীরের গান:** কুষ্টিয়া জেলায় মানিক পীরের গানের একাধিক দল রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি দলের পরিচয় তুলে ধরা হলো। প্রথম দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও মূলগায়েন হচ্ছেন–কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার বালিশিশা-শেরপুর গ্রামের জহুরুল ইসলাম। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫০ বছর। তিনি ধর্মসূত্রে মুসলমান। গান গওয়ার পাশাপাশি তিনি পেশাগতভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তিনি মানিক পীরের গানের এই দল গঠনের ইতিকথা সম্পর্কে জানান,–তাঁর বাবা পাঞ্জুয়ার মালিথা ছিলেন মানিক পীরের গানের একজন গায়ক। নিজের বাবা এবং একই এলাকার আরেক বিখ্যাত শিল্পী আকবর আলী বিশ্বাসের মানিক পীরের গানের পরিবেশনা দেখতে দেখতে তিনি নিজেই এক সময় মানিক পীরের গানের শিল্পী হয়ে ওঠেন। তারপর এলাকার কিছু লোকজন সঙ্গে করে এই গানের দল গঠন করেন। জহুরুল ইসলাম আরো বলেন–মানিক পীরের গান শেখার জন্য তাকে কোনো গুরু শিক্ষার সাহায্য নিতে হয়নি। কেননা, জন্ম থেকেই ওই অঞ্চলের মানুষের প্রাণের সঙ্গে মানিক পীরের গানকে তিনি মিশে থাকতে দেখেছেন এবং তার প্রাণের মাঝেও গুরু শিক্ষা ব্যাতিরেকেই মানিক পীরের গানের স্থায়ী অবস্থান গ্রন্থিত হয়েছে। জহুরুল ইসলামের দল প্রধানত চারটি পালাতে মানিক পীরের গানের আসর করে থাকে, পালাগুলোর নাম হচ্ছে–'জন্মপালা', 'বিদায় বা ফোকরে পালা', 'জাহিরি বা ভিক্ষে পালা' এবং 'মৃত্যু ও জিলানে পালা'। এই দল গত ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন গ্রামে মানিক পীরের গানের প্রায় পাঁচ শতাধিক আসর করেছে। বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত এই দলের বর্তমান সদস্যগণ হলেন–মূলগায়েন: জহুরুল ইসলাম ও আকবর আলী বিশ্বাস; দোহার: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আবু বকর মালিথা, আবেদ আলী ও চাঁদ আলী মণ্ডল; ছুকরি: মুক্তার আলী; বাদ্যযন্ত্রী: লস্কর

www.pathagar.com

গাজীর গান

আলী (হারমোনিয়াম মাস্টার), নূর আলী (জুড়ি) ও আবদুল্লাহ (ডুগি)।

কুষ্টিয়া জেলার মানিক পীরের গানের দ্বিতীয় দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও মূলগায়েন হচ্ছেন– ভেড়ামারা থানার লক্ষ্মীধড়দিয়াড় গ্রামের পোলাই মণ্ডল। এছাড়া, এই দলের অন্যান্য গায়েন হচ্ছেন– পোলাই মণ্ডলের বড় ভাই পিয়ার আলী মণ্ডল এবং বাবুল আক্তার, ইসমাইল, কাসেম মণ্ডল, জুলমত মালিথা, আজিজুল মালিথা, ইব্রাহিম, খবির উদ্দিন প্রমুখ।

৪. **একদিল পীরের গান:** কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার মুনা ঢুলি ও তার ওস্তাদ ক্যারা কারিগর একদিল পীরের গানের বিখ্যাত দুই গায়ক। এছাড়া, ক্যারা কারিগরের ওস্তাদ ভ্যাগল গায়েনও একদিল পীরের গানের প্রধান গায়ক হিসেবে উক্ত অঞ্চলে ব্যাপক প্রসিদ্ধ। এরা সকলেই অশিক্ষিত।

৫. **রামকীর্তন:** কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন হরেকৃষ্ণপুরের রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই ও মাধব গোঁসাই গ্রামে গ্রামে বা মন্দির প্রাঙ্গণে এখনো গানে, কথায় এবং অভিনয়ের মাধ্যমে রামায়ণের আখ্যান পরিবেশন করেন। তাঁর পিছনে থাকে বাদ্যযন্ত্রী দল ও দোহার।

৬. **গাজীর গান:** কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার আবদালপুর গ্রামে সোহরাব উদ্দিনের গাজীর গানের একটি প্রসিদ্ধ দল রয়েছে। এছাড়া, মিরপুর থানার বারইপাড়া গ্রামের হোসেন আলীর আরেকটি গাজীর গানের দল রয়েছে।

৭. **অষ্টগান:** অষ্টগানের একটি প্রধান দল কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার বারইপাড়া গ্রামের হোসেন আলীর দল। এই দলের মূলগায়েন হোসেন আলী ছাড়া অপরাপর সদস্যগণ হলেন– চঞ্চল ফকির, জিন্নাত আলী মণ্ডল, তালেব, মোফাজ্জেল মালিথা, নাজিম মালিথা, আরব আলী, তোতা মালিথা, টুটুল, রিপন ও নাজিম।

৮. **খ্রিস্টীয় কীর্তন:** বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিস্টানদের ধর্মীয় লোকসঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি বিবেচনা করে দেখতে কুষ্টিয়ার খ্রিস্টান লোকসঙ্গীতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর অঞ্চলে খ্রিস্টান লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধ কিছু ধারা প্রচলিত রয়েছে। উক্ত অঞ্চলে

www.pathagar.com

খ্রিস্টান ধর্মীয় কীর্তন ও পালাগান পরিবেশনের অনেকগুলো দল বর্তমান। তার মধ্যে ভবেরপাড়া গ্রামের খ্রিস্টান ধর্মীয় কীর্তন গানের দলগুলো হলো–১. বাবুল মণ্ডল কীর্তন দল, মূলগায়েন- রাজ কুমার; ২. গোপাল বিশ্বাস কীর্তন দল, মূলগায়েন- সুকেশ মণ্ডল; ৩. শেরাফিন কীর্তন দল, মূলগায়েন- শেরাফিন; ৪. বাবলু খান কীর্তন দল, মূলগায়েন- ঝোটা; ৫. পিটার খান কীর্তন দল, মূলগায়েন- সুকচাঁদ দফাদার। এছাড়া, বল্লভপুর গ্রামে খ্রিস্টান ধর্মীয় কীর্তন গানের দলগুলো হলো– ১. সংকীর্তন দল, মূলগায়েন সুজিত মণ্ডল বিশা ও ২. ঘাটপাড়া কীর্তন দল, মূলগায়েন বাদল মণ্ডল।

সনাক্তকৃত সামষ্টিক (দলীয়) সঙ্গীতের তালিকা

রামকীর্তন, পদাবলী কীর্তন, পদ্মাপুরাণ গান, পদ্মার নাচন, অষ্টগান, গাজীর গান, মানিকপীরের গান, একদিল পীরের গান, নছিমন গান, বিয়ের গান ইত্যাদি

সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা

লালনসঙ্গীত, বাউলগান, মুসলমানির গান ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত লোকবাদ্য যন্ত্রের তালিকা

একতারা, দোতরা, মন্দিরা-করতাল, মৃদঙ্গ-খোল, ঢোল, খমক, প্রেমজুড়ি (কাঠজুড়ি), আড়বাঁশি ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

লালনসঙ্গীত, বাউলগান, পদাবলী কীর্তন, নছিমন গান ইত্যাদি।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬)

লালনসঙ্গীত ও বাউল গান: দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত লোকউৎসবে আমন্ত্রিত লালনসঙ্গীত ও বাউল গান পরিবেশনের জন্য বছরে প্রায় পনের-বিশ বার লালন একাডেমীর শিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রতিটি আমন্ত্রণে লালন একাডেমী শিল্পীদের জন্যে পনের থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত শিল্পী সম্মানী নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বছরে প্রায় তিন লক্ষ (৩,০০,০০০/=) টাকা পর্যন্ত শিল্পী সম্মানী অর্জিত হয়। এছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে লালনসঙ্গীতের বহু শিল্পী কুষ্টিয়া থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিতভাবে আমন্ত্রিত হয়ে গান পরিবেশন ও লালনসঙ্গীতের শিক্ষা দান করে থাকেন। যাতে আর প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার শিল্পী সম্মানী অর্জিত হয়।

প্রচলিত অন্যান্য লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান: কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য লোকসঙ্গীত মূলত কৃত্যাচারমূলক সঙ্গীত এবং তার ভিন্নতর বাণিজ্যিক মূল্যমান আছে। গ্রামের সাধারণের মধ্যে তা ভক্তি ও বিশ্বাসের কারণেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর সে সকল সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তারা যথা-উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করে থাকে। অতএব, এ সকল সঙ্গীতের মূল্যমান নিরূপণের জন্যে গ্রামের জনসাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকাচারকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

সনাক্তকৃত বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

মানিক পীরের গান, একদিল পীরের গান, ষাটমার পালা, কবিগান ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা

বসন্তঠাকুরের গান, বৃষ্টি নামানোর গান ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা (ব্যক্তি/সমাজ)

লালনসঙ্গীত ও বাউল গানের শিল্পী: প্রধানত লালনপন্থী সাধুগুরুরাই কুষ্টিয়া অঞ্চলের লালনসঙ্গীত ও বাউল গানের মেধাস্বত্বের মালিক। এছাড়া, ব্যক্তিগত যে কণ্ঠশিল্পী এ ধরনের গান পরিবেশন করেন তাকেও কিন্তু মেধাস্বত্বের মালিক বলা যেতে পারে। কেননা, তিনি এ ধরনের সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে নিজেকে সাধনায় তৈরি করেছেন এবং শিল্পী হিসেবে তা লোকসমাজে উপস্থাপন করে থাকেন।

www.pathagar.com

অন্যান্য লোকসঙ্গীত: কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরিবেশনকারী শিল্পীগণই মেধাস্বত্বের মালিক।

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ: অডিও-ভিডিও এবং লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে সংগ্রহের জন্যে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

খ. সংরক্ষণ: আধুনিক প্রযুক্তিতে সংরক্ষণ এবং একই সঙ্গে সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের ধারাসমূহ প্রবহমান রাখতে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

গ. উপস্থাপন: যথাযথভাবে আমাদের লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারাকে আজও দেশবাসীর কাছেই যেখানে উপস্থাপন করা হয়নি সেখানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনের তো প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রযুক্তির যেমন প্রসার ঘটেছে তেমনি প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার, এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এদেশের লোকসঙ্গীতকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারলে একই সঙ্গে লোকসঙ্গীতের ধারাসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং এদেশের ভাবমূর্তি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সুধীসমাজে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

ঘ. মেধাস্বত্ব প্রদান: লোকসঙ্গীতের প্রবহমান ধারা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে মেধাস্বত্ব প্রদান করা জরুরি।

উপসংহার: কুষ্টিয়া জেলার লোকসঙ্গীত চর্চার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, এখানকার অধিকাংশ লোকসঙ্গীত সর্বধর্মীয় সমন্বয়ের চারিত্র ধারণ করে আছে। মূলত বৈষ্ণবীয় দর্শনের স্রোতধারার প্রাণকেন্দ্র নদীয়ার সঙ্গে কুষ্টিয়ার নিবিড় যোগাযোগ ও পরবর্তী ফকির লালন সাঁইয়ের বাউলধর্ম প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে এবং তারও পরবর্তীতে কিছু সুফিসাধকদের পদচারণায় কুষ্টিয়ার লোকসঙ্গীত উদার ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। এক্ষেত্রে কুষ্টিয়ায় প্রচলিত সনাতন ধর্মীয় রামায়ণ গান কিংবা পদাবলী কীর্তনের আসরেও সনাতন ধর্মের পাশাপাশি ইসলামধর্মের তুলনামূলক আলোচনা প্রযুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, সনাধর্মীয় অনেক আখ্যানগীত কুষ্টিয়া অঞ্চলের মুসলমানরা এখন চর্চা করে ফিরছে। যেমন, লোকায়ত সর্পদেবী পদ্মার আখ্যান ভিত্তিক পদ্মার নাচনের ধারণ, বাহন ও প্রচলন সবই এখন মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়া, কৃষ্ণের লীলাগীতি অষ্টগানের চর্চা এখন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এই জেলার মুসলমানদের মধ্যে। এ সকল দিক বিবেচনায় এনে কুষ্টিয়ার লোকসঙ্গীত নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার সূত্রপাত করা যেতে পারে। যার জন্যে আমাদের খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে এমনটা মনে হয় না। কেননা, এই জেলায় বেশ কিছু উদ্যমী প্রবীণ-নবীন লোকসঙ্গীত গবেষক রয়েছেন। যারা হয়তো অচিরেই সে গবেষণা সম্পাদন করবেন।

তথ্যসূত্র

১. ড. আবুল আহসান চৌধুরী, "কুষ্টিয়া: ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি", মো: হারুন-আল-রশিদ সম্পাদিত *কুষ্টিয়া পরিক্রমা*, (কুষ্টিয়া: জেলা তথ্য অফিস), জুন ১৯৯৫।

২. মো: আবদুল মান্নান (সম্পাদক), *জেলা উন্নয়ন পরিক্রমা: কুষ্টিয়া (২০০১-২০০৫)*, (ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), অক্টোবর ২০০৫।

৩. রোকনুজ্জামান রুনু, হিসনা থিয়েটার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

৪. রেজাউল হক সলক, তমা শিল্পী গোষ্টী, খাদিমপুর বাজার, বহল বাড়িয়া, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

৫. রহমত রিজভী, কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি, যায়যায়দিন।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা	উৎপত্তিস্থল	বিস্তৃতি	বাণিজ্যিক মূল্য	বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা	লুপ্ত সঙ্গীতর তালিকা	মেধাস্বত্বের মালিক
লালনসঙ্গীত	কুষ্টিয়া	সারাদেশে	মূল্যবান	---	---	লালনপন্থী ফকির-সাধু
বাউলগান	কুষ্টিয়া	সারাদেশে	মূল্যবান	---	---	বাউলধর্মালম্বীগণ
পদ্মার নাচন	পাবনা	কুষ্টিয়া	মূল্যবান	---	---	পালাকার-শিল্পী
পদ্মাপুরাণ গান	পাবনা	পার্শ্ববর্তী জেলা	মূল্যবান	---	---	পালাকার-গায়ক
পদাবলী কীর্তন	নদীয়া	কুষ্টিয়া	মূল্যবান	---	---	কীর্তনীয়া-শিল্পী
রাম কীর্তন	কুষ্টিয়া	পার্শ্ববর্তী জেলা	মূল্যবান	---	---	পালাকার-শিল্পী
নছিমন গান	কুষ্টিয়া	পার্শ্ববর্তী জেলা	মূল্যবান	---	---	পালাকার-শিল্পী
মুসলমানির গান	কুষ্টিয়া	পার্শ্ববর্তী জেলা	---	---	---	হাজাম-গায়ক
খ্রিস্টীয় কীর্তন	মেহেরপুর	মেহেরপুর	মূল্যবান	---	---	খ্রিস্টান গায়ক
				ষাটমার পালা	---	পালাকার-শিল্পী
				মানিক পীরের গান	---	পালাকার-শিল্পী
				একদিল পীরের গান	---	পালাকার-শিল্পী
				কবিগান	---	কবিয়ালগণ
				শব্দগান	---	বয়াতীগণ
					বসন্তঠাকুরের গান	---
					বৃষ্টি নামানোর গান	---
					ঝিনঝিনিয়ার গান	---

মাঠ সমীক্ষার তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০০৬

গ্রাম: বালিশিশা-শেরপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

মূল গায়েন: আকবর আলী বিশ্বাস ও জহুরুল ইসলাম।

দোহার: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আবু বকর মালিথা, আবেদ আলী, চাঁদ আলী মণ্ডল।

বাদ্যযন্ত্রী: লস্কর আলী (হারমোনিয়াম), নূর আলী (জুড়ি), আবদুল্লাহ (ডুগি)।

ছুকরি: মুক্তার আলী (ছুকরি), অনুপস্থিত ছিলেন।

মানিকপীরের গান।

www.pathagar.com

২.২ খুলনা বিভাগের লোকসঙ্গীত

মিজানুর রহমান

ভূমিকা: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের বিভাগ খুলনা। ২২,২৭৩.২১ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এ বিভাগের উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, দক্ষিণের বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ব অংশে ঢাকা ও বরিশাল বিভাগ, আর পশ্চিমাংশ জুড়ে আছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। এ বিভাগের সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট জেলার দক্ষিণাংশে আছে বিস্তৃত সুন্দরবন। ১০ টি জেলা নিয়ে খুলনা বিভাগ, এগুলো হলো- সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর। মোট জনসংখ্যা ১,৪৪,৬৮,৮১৯ জন। পুরুষ ৫১.০৫% ও মহিলা ৪৮.৯৫%।

সনাক্তকৃত লোক সঙ্গীতের তালিকা: খুলনা বিভাগে বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়। এর কিছু বর্তমানে টিকে আছে, কিছু লুপ্ত হয়েছে আর কিছু লুপ্তপ্রায়। এখানে লোক সঙ্গীতের পেশাদার ও অপেশাদার উভয়শ্রেণীর গায়ক-গায়িকা আছে। পেশাদার গায়করা কোন বাণিজ্যিক দলে ভিড়ে অথবা নিজে উদ্যোগী হয়ে দল গঠন করে গানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। গ্রামাঞ্চলে যে মৌসুমী যাত্রানুষ্ঠান হয় তাতে বিবেকের পাঠে অংশ নিয়ে বেশ কিছ সঙ্গীত শিল্পীর আয়ের ব্যবস্থা হয়। কিছু বাউল আছে যারা শিষ্য পরম্পরায় গান গেয়ে বাউল ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছে। এ অঞ্চলে একটা শ্রেণী আছে যারা গানের মাধ্যমে ভিক্ষা করে। এরা বোষ্টম-বোষ্টমী হিসেবে পরিচিত। কবির লড়াই এখানে এখনো বুদ্ধিভিত্তিক বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। বৃহত্তর খুলনায় বিভিন্ন প্রকার লোক সঙ্গীতের যে পরিচয় মেলে তা হলো:

বাউল: সমগ্র কুষ্টিয়া,যশোর ও খুলনাতে বাউল সঙ্গীতের ব্যাপক প্রসার রয়েছে। বাউল সম্প্রদায় একটি লৌকিক আধ্যাত্মাদী সাধনভজন সম্প্রদায়। আউলিয়া শব্দের প্রভাবযুক্ত ওয়ালী বা আউলিয়া শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি বলে গবেষকরা অভিমত দিয়েছেন। সঙ্গীত-এর মাধ্যমে এ সম্প্রদায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হয়। খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া জেলায় বাউল গানের চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। বাউল গানে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। কুষ্টিয়া অঞ্চলের খ্যাত বাউল কবি লালন ফকির। কুষ্টিয়া জেলার মলম কারিকরের বাড়ি ছেউড়িয়াতে লালনের স্থায়ী অবস্থান হয়। পরবর্তীকালে এ স্থানটি মরমি সাধকদের তীর্থস্থান। তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্য পরবর্তীকালে গান রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। লালনের গানে যে অধ্যাত্মবাদের পরিচয় মেলে তা উচ্চমার্গের। যেমন-

কারবা আমি কে বা আমার
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি।

লালনের শিষ্য দুদুশাহের (১৮৪১-১৯১৯) বেশ কিছু জনপ্রিয় গান বাউলভক্ত মানুষের কাছে আদরের সাথে সমাদৃত হয়ে আসছে। তার গানেও অধ্যাত্মবাদের পরিচয় মেলে। যেমন-

ছোট বলে ত্যাজো কারে ভাই
হয়তো ওর রূপে লালন ব্রজের কানাই,
শূদ্রচাড়াল বাগাদি বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ
কালের খাতায় হইবে বিলীন
দেখছি রে তাই।

www.pathagar.com

নড়াইলে বিজয় সদনে কবিগান

উল্লিখিত বাউল ছাড়াও এ অঞ্চলে আরও অনেক খ্যাত বাউলের সন্ধান মেলে। এদের মধ্যে চণ্ডিদাস গোঁসাই, জহরউদ্দীন শাহ (১৮৪২-১৯৪২), ঈদু বিশ্বাস, মেহেরচান, হাকিমচান বয়াতি, সোনাউল্লাহ বয়াতি (১৮৮০-১৯৬২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বনবেষ্টিত সুন্দরবনাঞ্চলে বেশ কিছু লোকজ দেবতার নামে পালা গানের পরিচয় মেলে। এর কিছু লুপ্ত আর বেশ কিছু লুপ্তপ্রায়। এ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হলো–

গাজীর গান: সুন্দরবনাঞ্চলের জনপদে বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাটে গাজীর গান বিশেষ জনপ্রিয়। সুন্দরবনে যে সব মৌয়াল, কাঠুরিয়া বাওয়ালি, জেলে, শিকারি যায় তাদের অনেকেই গাজীকে লোকজ দেবতা মানে। শিন্নি দেওয়া, তাকে দোহাই মানা, পুজো করা, গাজী-কালু চম্পার নাম জপ করা এসব পেশাজীবী মানুষের কাছে আচার। গাজীর জনপ্রিয়তার কারণে এ অঞ্চলের বহুস্থানে গাজীপুর, গাজীর হাট, গাজীর থান, গাজীর দরগা, গাজীর মাজারের সৃষ্টি হয়েছে। গাজী-কালু-চম্পাবতীর নামে গাওয়া অনেক গানই এখন লুপ্ত হয়েছে। তবে তারপরও এ বিষয়ক বেশ কিছু খণ্ডিত চরণের পরিচয় এখনও এসব এলাকাতে শোনা যায়।

বনবিবির পালা: বনে যাদের জীবন ও জীবিকা তাদের অনেকেই বনবিবিকে দেবতা হিসেবে মানে। গহীন বিপদ সঙ্কুল বলে বনবিবি তাদের ত্রাণকর্ত্রী হিসেবে উদ্ধার করবে এ বিশ্বাস অন্তরে লালন করে বনাঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক। সাধারণের কাছে বনবিবি মা হিসেবে পরিচিত। বনবিবির নামে বেশ কিছু গান সুন্দর বনাঞ্চলে বিশেষ করে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে শোনা যায়। যেমন–

মা বলে বনেতে যে ডাকিবে আমারে
তখনি যাইয়া আমি উদ্ধারিব তারে।

দক্ষিণা রায়ের পালা: দক্ষিণা রায়ের নামে যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল অঞ্চলে বেশ কিছু পালা গান পাওয়া যায়। গত শতকের পঞ্চাশ-ষাট এর দশকেও দক্ষিণারায়কে নিয়ে বসতো পালা গান, পুঁথিপাঠ, পাঁচালী

www.pathagar.com

পাঠের আসর। দক্ষিণা রায়কে ভাটি অঞ্চলের ঈশ্বর হিসেবে চিত্রণ করে তাকে এ অঞ্চলের নগরপত্তনকারী পুরুষরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার নামাঙ্কিত গান:

এখানে দক্ষিণারায় ভাটির ঈশ্বর
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর ॥

পাঁচালী গান: খুলনা বিভাগের বেশ কিছু অঞ্চলে পাঁচালী গানের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব পাঁচালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, শীতলার পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, বনবিবির পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী, মা চম্পার পাঁচালী* ইত্যাদি। সুন্দরবনাঞ্চলে কবি রামধন শর্মা বিরচতি যে *সত্য নারায়ণের পাঁচালী* পাওয়া যায় তা ব্যাপক জনপ্রিয়। এই পাঁচালী লেখক পুঁথিতে যে আত্ম পরিচয় দিয়েছেন তাতে জানা যায় তিনি ছিলেন শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুরের নিকটস্থ মামুদপুরের অধিবাসী। তাঁর কথানুযায়ী–

যশোর ঈশ্বরী নাম তাহার নিকটে গ্রাম
যমুনার পশ্চিম ধারে ঘর।
মামুদপুরেতে ধাম দ্বিজ রামধন নাম
বিরচিল কবিতা সুন্দর

এখনো এ অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে সন্ধ্যাকালে বসে পাঁচালী পাঠের আসর।

পালাগান: পালাগান সনাতন ধর্মের বিশেষ কোনো উপাখ্যান নিয়ে রচিত গান, *শিব, দুর্গা, পার্বতী, রাম, লক্ষণ* ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয় পালাগান। শেষ চৈত্রের চড়কপূজা উপলক্ষে সাধারণত পালাগান গীত হয়ে থাকে। সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার যোগেন্দ্রনাথ পালাগান রচয়িতার উল্লেখযোগ্য গায়ক ও শিল্পী। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪৮ সালে। তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র সুধীরনাথ বাবার যোগ্য শিষ্য ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের উল্লেখযোগ্য বালা উপাখ্যান রচয়িতা ও শিল্পীরা হলেন- স্বরূপ চন্দ্র সেন, সুবল নাথ, ষষ্ঠীধর, নিত্যানন্দ,

পালাগান পরিবেশনরত আবু দাউদ

www.pathagar.com

মদন সরকার, ধনবর, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, গঙ্গাপ্রসাদ, সুবল সেন, ফনিভূষণ। শ্যামনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বালাগানের চর্চা আছে। এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য পালা শিল্পীরা হলেন অনিল জোয়াদ্দার (হেঞ্চি), ন্যাটারাম মণ্ডল (আড়পাঙ্গাশিয়া), সুপদ মণ্ডল (দুর্গাবাটি), বাবুরাম বিশ্বাস (পাতাখালী), ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহিম চন্দ্র মণ্ডল, অবিনাগ মণ্ডল, যতীন মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মুন্সিগঞ্জ), ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, বনোচারী মণ্ডল, দীনেশ মণ্ডল (বড়কুপোট), ফকির মণ্ডল, বাকের মণ্ডল, বাবুলাল, দেবনাথ (চণ্ডিপুর)। পালা গান-এর প্রকৃতি কতকটা কবির লড়াইয়ের অনুরূপ। এ গানে এক পক্ষ গানে গানে শাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রতিপক্ষ তার জবাব দেয়। গানের আসরে ত্রিশূলধারী বেশ কিছু সন্ন্যাস থাকে কারা কোরাসের আদলে মাঝে মাঝে বলে ওঠে, 'বল বাবা শিব, দূর্গা, ভোলানাথ, শিব মহাদেব' এ গানের অংশবিশেষ।

সীতাহরণ

হেথা পঞ্চাশটি রাম করেন স্থিতি সঙ্গেতে লক্ষণ সীতা।
যে রূপে সীতা করিল হরণ, শুনহ তাহারি কথা।
স্বর্ণামৃগ দেখি সীতাতো কৌতুকী, বলেন রামের প্রতি
কি সুন্দর সাজ দেখ মৃগরাজ ধরে দেহ শীঘ্র পতি।
শুনি সীতার বাণী, প্রভুর ঘুমনি, ধনুকে জুড়িয়ে বাণ
আকর্ণ টানিয়ে সন্ধান পুরিয়ে মৃগেরে বধিতে প্রাণ।

ভাসান গান: সাপের দেবী মনসা ও বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী অবলম্বনে এ অঞ্চলে এক শ্রেণীর পালা গানের প্রচলন আছে। এ গান পরিচিত ভাসান গান হিসেবে। সাপ উপদ্রুত বনাঞ্চলে বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলার তালা, আশাশুনি, কালিগঞ্জ, শ্যামনগর বর্ষাকালে এখনো ভাসান দলের গাওয়া গান শোনা যায়। লুপ্তপ্রায় ভাসান গান টিকিয়ে রেখেছে প্রধানত মহিলারা। গ্রাম্য মহিলারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গঠন করে ভাসান দল। এ গানের সাথে হাততালি ও মৃদু বাদ্যযন্ত্রের চল আছে।

আলোমতির পালা: কাহিনীর আকারে গীত হয়ে থাকে আলোমতির পালা। নাটুকে ঢং ও সংলাপ থাকলেও এ উপাখ্যান মূলত পালাগানের। লোকজ এ উপাখ্যানে আছে অসম প্রেম কাহিনী। প্রণয় হয় প্রাণ কুমারের সাথে আলোমতির। প্রাণকুমার রাজপুত্র। তার পিতা বিজয় সিংহ। অন্যদিকে আলোমতি বিজয় সিংহের এক কর্মচারীর কন্যা। সংলাপের আকারে গীত এ পালা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। পালার সংলাপ:

আলোমতি – আমি আলো একা থাকি ঘরে
আমার মাতা-পিতা চাকরী করে
মহারাজার বাড়িতে আমি আলো একা থাকি ঘরে। (২)
আমার যৌবন বয়সে কত আনন্দ আসে
আমার বন্ধু নাই কোনো
প্রাণ কুমার – জল খাইতে গিয়াছিলাম দীন ভিক্ষারীর বাড়ি
কে যেন জল এনে দিল মানুষ না পরীরে
প্রাণ কাঁন্দে তাহার লাগিরে।

সাগরভাসা পালা: দক্ষিণবঙ্গে এক সময় সাগরভাসা পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এ পালা লুপ্তপ্রায়। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া অঞ্চলে এখনো কালে-ভদ্রে এ পালা অনুষ্ঠিত হয়। কাহিনীভিত্তিক এ পালা রচিত হয়েছে রণজিৎ রাজা ও সত্যবানের পুত্র সাগরের কাহিনী নিয়ে। এর অংশ বিশেষ:

শোনেন শোনেন মহারাজ আমি আপনার গরীব রাজা।
ও কি রাজন গো দয়া করে সাহায্য দ্যান গো আমারে(২)
সাহায্য যদি নাদ্যান মোরে খালি হাতে যাবো ফিরে।।

www.pathagar.com

পটগান ও হালুই গান পরিবেশন করছেন রাজু ও তাঁর দল

গুনাই বিবির পালা: জমিদার লাল মিয়ার পুত্র তোতা মিয়া ও গুনাই বিবির মধ্যকার প্রণয়কাহিনীভিত্তিক পালা গান গুনাই বিবির পালা। সমগ্র দেশব্যাপী এ পালার ব্যাপ্তি থাকলেও গত শতকের আশির দশক পর্যন্ত গুনাই বিবির পালা দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। এ পালাতে প্রণয়ের পাশাপাশি জীবন্ত হয়েছে জমিদার-এর অত্যাচার চিত্র। যেমন–

ভাইজান আর যাব না ঐ স্কুলে পড়তে
লাল মিয়ার পুত্র তোতা মিয়া পথে দেয় কাটা
পড়াবার যদি সখ থাকে ভাইজান গো
ও ভাইজান বাড়ি মাস্টার রাখো।

দুখের পালা: দুখের পালার কাহিনী গড়ে উঠেছে সওদাগর তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী গুলাল বিবি, এ বিবির সন্তান শাহাজাঙ্গুলি ও বনবিবিকে নিয়ে। সুন্দরবনাঞ্চলে এখনও শীতের রাতে গ্রামবাসী আয়োজন করে দুখের পালার।

শাঁখমাল গান: এ গানের সাথে জড়িত পৌষ-সংক্রান্তি ও ফসলের মৌসুমের বিষয়। মাঠের ফসলে যাতে কীট-পতঙ্গ না লাগে বা মুক্ত থাকে কু-প্রভাব থেকে সেজন্য আশ্বিন-কার্তিক মাসে গায়ক দল মাঠে যেয়ে মাঠকে মন্ত্রপূত করে। আর ঘরে ফসল উঠলে গান গেয়ে পারিশ্রমিক ফসল আদায় করে। এ গানের দুটো চরণ:

নন্দ গেছে বাথানেতে যশোদা জলের ঘাটে।
শূন্য ঘর পাইয়া কৃষ্ণ ননীর ভাণ্ড লোটে ॥

মানিকী গান: দক্ষিণবঙ্গে মানিকপীর লৌকিক দেবতা হিসেবে চিত্রিত হয়ে আছেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ করে কৃষকের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত লৌকিক দেবতা। গবাদি পশুর রক্ষাকর্তা দেবতা হিসেবে মানিকপীর শক্তিশালী মিথে পরিণত হয়েছে। গাজীর মতো জনপ্রিয় এই লৌকিক দেবতার নামে এলাকায় অনেক স্থান নাম আছে। যেমন- মানিকখালী, মানিকপুর, মানিকগঞ্জ। সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলা সংলগ্ন

www.pathagar.com

স্থানে এক গম্বুজবিশিষ্ট তিনটি বিশেষ ধরনের ইমারত মানিক পীরের দরগা হিসেবে পরিচিত। মানিকী গানে ঘুরে ফিরে বার বার উচ্চারিত হয়েছে গবাদি পশুর বিষয়টি। যেমন–

বোম বোম বলিয়া মানিক ছাড়িল জিকির।
কানু ঘোষের মা বলে ঐ হলো ফকির ॥
মানিক যায় যায় ফিরে ফিরে চায়,
গজ মানিক উঠে বলে পীর মানিক ভাই।
মরেছে কাঙালের গরু বাঁচাই চলো যাই ॥

বেয়ারা গীত: দক্ষিণবঙ্গে পালকি চেপে বিয়ের রেওয়াজ অনেক পুরনো। গত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ও বিয়ের বাহন পালকির কোনো বিকল্প ছিল না। সামর্থ্য অনুযায়ী পালকি সাজানো বা চার বেয়ারা, আট বেয়ারা, ষোল বেয়ারার ব্যবস্থা করা হতো। দরিদ্রের বিয়েতেও তেমন সাজের বাহার না থাকলেও পালকির ব্যবস্থা থাকতো। অভিজাতশ্রেণী চলাচল করতো পালকিতে চেপে। বিয়ের সময় কাহার বা বেয়ারারা হাতে-পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বিশেষ ভঙ্গিমায় নেচে-গেয়ে সাধারণের মনোরঞ্জন করতো। বর্তমানে পালকিপ্রথা লুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে লুপ্ত হচ্ছে এ বিষয়ক গান। দক্ষিণবঙ্গের একটি বেয়ারা গীতের অংশ বিশেষ:

শীত গেল বসন্ত এলো সামনে ফাগুন মাস
বিরহীদের মনের আগুন জ্বলে বার মাস ॥
তুমি যাইবা দূর দেশে বন্ধু আমারে ছাড়িয়া
রেখে গেলে ভরা যৌবন এসে পাইবা না ॥

ফকিরের গীত: দক্ষিণবঙ্গে এক শ্রেণীর সাধক আছে এঁদের সাধনা পদ্ধতি *মাইজভান্ডারি* আদলের। গানের মাধ্যমে এঁরা শরিয়ত, হকিকত, তরিকত, মারেফত এসব তত্ত্বকথা প্রচার করেন সাধারণ্যে। এসব গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢুগি, তবলা, ঘুঙুর, একতারা। সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার মিয়াজান ফকির এ ধারার একজন গায়ক। তাঁর একটি গানের উল্লেখযোগ্য অংশ–

মক্কার ঘাটে ঘন্টা পড়ে ডাকিছে মোমিন
ইশা, মুসা, দায়ুদ, রাসূল একমা নাহি কভু ভুল
এরা রেখে গেছেন শরিয়তের চিহ্ন

ভাবগান: এ ধারার গান প্রধানত সনাতনধর্মের শাস্ত্রীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। ভাবনার বুদ্ধিদীপ্ততা এ গানে বিশেষ প্রভাব ফেলে। *বেদ, উপনিষদ, পুরাণ,* ইত্যাদি ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ এ ধারার গানগুলো। বাউল ঘরানা থেকে বের হয়ে এ ধারার গান পরবর্তীকালে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। যশোরের কাজেম ফকির, ঝিকরগাছার চান্দার গহর সা, তালার হারান ফকির, মাদার ফকির, টেনা ফকির, বিশ্বনাথ সরকার বাঁকড়ার কানাই ফকির, কাঙালমতি প্রমুখ এ ধারার উল্লেখযোগ্য গীতিকার ও শিল্পী। এখানে দুজন ভাবশিল্পীর দুটো পদ উল্লেখ কার হলো।

(মন) তুমি সাধু তত্ত্বের ভাব জান না।
হিংসা তোমার গেল না ॥
(ও মন) এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি,
তা কি তুমি জান না।
একটি বৃক্ষের তিনটি ফুল।
দুটি শাখা একটি মূল ॥
বিধাতার এ কি কারখানা,
একে দুই দুইয়ে তিন,
এক বিনে মিলন হবে না ॥

www.pathagar.com

হারান বলে ও মাদারে
কি দিয়ে বুঝবো তোরে,
মনে প্রবোধ মানে না
একছাড়া দুই ভাবিলে (তোর)
মিলন হবে না ॥ (হারান ফকিরের পদ)
এবার গুরুচাঁদের চরণ ধরে
কাঙাল মতি কহিছে কাতারে।
একবার কৃপাদৃষ্টি করে রেখ হে আমারে
আমি কেবল তোমার চরণ ভিখারী ॥ (কাঙালমতির পদ)

সারিগান: নদীবিধৌত দক্ষিণবঙ্গের জেলে, মাঝি, মজুরদের কণ্ঠে এক ধরনের গান শোনা যায়। এগুলো সারিগান। এখনো গুন টানার সময় বা কোনো ইমারত নির্মাণকালে শ্রমিকরা সুর করে তালে তালে গান গেয়ে টিকিয়ে রেখেছে এ গানের ঐতিহ্য। করাতিরা যখন করাতের সাহায্যে গাছের গুঁড়ি চেরে তখন তারা সুর করে তালে তালে জারিগান গায়। এ গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবীদের কণ্ঠে ভিন্ন ধরনের সারিগান গীত হয়। ইট নির্মাতা শ্রমিকের মুখে ঐ গান বর্তমানে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

জারিগান: এ গানের বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হলো এর বিষয়ভিত্তিক নির্বাচন। বিষয় হিসেবে এ গানের অনুসঙ্গে উঠে এসেছে সামাজিক, পৌরাণিক. ঐতিহাসিক নানা বিষয়াদি। দক্ষিণবঙ্গে জারি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান।

মাছধরা গান: দক্ষিণবঙ্গে উৎসবের মাধ্যমে মাছ ধরার রেওয়াজ ছিল বলে জানা যায়। নদীতে ছিপে মাছ ধরার সকল প্রস্তুতি নিয়ে গায়ক গান গাইতেন তারপর জলাশয়ে ছিপ ফেলা হতো। বর্তমানে এ গান ও সংস্কৃতি লুপ্ত। এ ধারার একটি গান উদ্ধার করেছেন অরবিন্দু মৃধা। গানটি তিনি উদ্ধার করেছেন শ্যামনগরের মুছা গাজীর কাছ থেকে। গানের অংশ বিশেষ–

পাঙাশ মারার আশা করে
ভেদাখালী ফুঁড়ে চলো মজতের গোড়ায়
সুত ফেললাম ঘোলে আর কোলে
মাজা নেড়ে ওঠরে পাঙাশ মজতের কোলে
আমার বাড়ি লোক বেশি কেমনে দিবরে
পাঙাশ তোর গালে বর্শি।

পটগান: পট এঁকে দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে এক প্রকার গানের প্রচলন আছে দক্ষিণবঙ্গে। এ গান পরিচিত পটগান হিসেবে। গত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত লৌকিক দেবতা গাজীকে নিয়ে যে গাজীর পটের চল ছিল দক্ষিণবঙ্গে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। গাজীরপটের চল এখন লুপ্ত। তবে এ ধারাকে অবলম্বন করে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা টিকিয়ে রেখেছে পটগানের ঐতিহ্য। ব্যক্তি পর্যায়েও এ গানের চল আছে। দক্ষিণবঙ্গে পটগান চর্চা করে এমন একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত সংগঠনের নাম শেকড়। এদের গানে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক তথ্যাদি আছে।

কিন্নরগীত: যশোরের উলসি অঞ্চলে কিন্নর সম্প্রদায়ের দশ ঘর বাসিন্দা আছে। এদের নিজস্ব কিছু গান ছিল। এগান কিন্নরগীত হিসেবে পরিচিত। এগুলো মূলত ঢপকীর্তণ। মধুসূদন কিন্নর এ গান গেয়ে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর কিন্নর সম্প্রদায় এখন আর গান-বাজনা করে না। মধুসূদনের গায়ক খ্যাতি বাংলাদেশ ছাড়িয়ে ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছিল। তার একটি পদ–

কেন রব কীত্তনজ্বলী।
করে যাও হে অন্তরজ্বলী ॥

www.pathagar.com

খুলনার পটগান (নব পর্যায়)

আজ আমাদের শুভযাত্রা।
আমরা করি গঙ্গাযাত্রা ॥
বধূ ফিরে দেখ তাই।
কেন সুজন বলে কেন জ্বলি।
এমন জ্বলা ঘরী ॥

গাতার গানঃ যশোরের চৌগাছা অঞ্চলে এক ধরনের গানের প্রচলন ছিল, এগান গাতার গান হিসেবে পরিচিত। ধান মাড়াই, ধান রোয়া ইত্যাদি কাজে শ্রমিককে গানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা ছিল এ গানের লক্ষ। একক বা দলীয় পদ্ধতিতে এ গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এ গানের জন্য মহাজনের কাছে গাওয়ার পূর্বেই চুক্তিবদ্ধ হতেন গায়ক বা দলীয় প্রধান। গাতার গান এখন লুপ্ত।

ফলৌগানঃ যশোরের চৌগাছা অঞ্চলে বিশেষ ধরনের একটি মেয়েলি গীতের চল ছিল, এ গান পরিচিত ফলৌগান হিসেবে। ফসলের মৌসুমে গৃহস্থ বাড়িতে যেয়ে গানের মাধ্যমে ফসল সংগ্রহ করতো গায়করা। এ গান বর্তমানে লুপ্ত। চৌগাছা অঞ্চলে পাওয়া একটি ফলৌ গানের অংশবিশেষ–

১. চলো নগরবাসী
দেখে আসি
গ্রাম চানপাড়ায়
হঠাৎ একটি জোড়া মেয়ে
হয়েছে উদয়।।

২. মোকাম ছাতেনতলা
আজবলীলা
দেখলাম সেখানে
তোলার কচন
নাইরে বাচন

www.pathagar.com

গা জ্বলে রাগে
ধুয়োগান
১. মনে হিল্লেলে
করিম বিশ্বাস বলে
ইরশাদ আলী
তুমি শুনেও শোননি।
ইংরেজ গভর্নর
করেছেন তৈয়ার
পক্ষীর আকার
উড়ু জাহাজখানি।।
ঐ যখন চলে ফেরে
ঘর ঘর করে
ও দেখতে তার পাইনে নিশানী।।
২. আসো তমেজমোল্লা করিপাল্লা
আমি তোমার সঙ্গেতে
এক তারিখে গিয়েছিলাম
সুলতান পুরেতে।।
৩. কানা ঘোড়ায় ভাত পায়না
মোল্লা পাতে টুপি
মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো
তারাই করে মাতববারি
তোমরা ভেবে করবা কি?

সুপারিশমালা

সংগ্রহ সম্পর্কিত: খুলনা বিভাগে বেশ কিছু লোকসঙ্গীত ইতোমধ্যে লুপ্ত হয়েছে, কিছু লুপ্তপ্রায়। লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের বেশ কিছু টিকে আছে বয়োবৃদ্ধদের মুখে। এগুলো আশু সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে 'লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় লোকসঙ্গীত সংরক্ষণ' প্রকল্প করে এর আওতায় সংগ্রহের উদ্যোগ নিলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। মিডিয়া ও সংবাদপত্রের সাহায্যে সংগ্রহের খবরটি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে।

সংরক্ষণ সম্পর্কিত: সংগৃহীত লোকসঙ্গীত সংরক্ষণ করা জরুরি। *লোকসঙ্গীত কোষ* নামে কোষগ্রন্থ করা যেতে পারে। কোষগ্রন্থ অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় এনে তার একাধিক সংস্করণ করতে হবে। সংগৃহীত লোকসঙ্গীত যথাযথ সংরক্ষণের জন্য সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এর স্থায়িত্ব দীর্ঘ হবে।

উপস্থাপনা সম্পর্কিত: সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে *লোক সঙ্গীত মেলা* আয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপিত সঙ্গীত অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সঙ্গীত ও শিল্পী বাছাই করতে হবে।

মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: সংগৃহীত লোকসঙ্গীত প্রচারের যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। মিডিয়া, সিডি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্য অর্থ প্রকৃত শিল্পী বা গীতিকারের প্রাপ্য সম্মানী সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। স্বত্ব থেকে আহরিত অর্থ নিয়মিত পেলে উৎসাহিত হবেন অবহেলিত লোকজ শিল্পীবৃন্দ।

তথ্যসূত্র

১. সারগাম, ...
২. স্থানীয়ভাবে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

২.৩ যশোর জেলার লোকসঙ্গীত

মহসিন হোসাইন

ভূমিকাঃ ভূমির গঠন লোকবসতির প্রাচীনত্বের বিষয়টি বিবেচনায় আনলে যশোর একটি প্রাচীন জনপদ। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদি ও ধর্মীয় পুরাণের আলোচনায় যশোরভূমিকে প্রাচীনত্বের কারণে সংস্কৃতির লালনভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই জনপদে আমাদের শিল্পের নানামাত্রিক সৃজন, নির্মাণ ও বিস্তৃতি ঘটেছে প্রাচীনকাল থেকে। এখানকার সাহিত্য সঙ্গীত আর সঙ্গীতের নানা মাত্রিক শ্রেণী মানুষকে যুগে যুগে আন্দোলিত করেছে। এখানকার প্রকৃতিই যেন সুরে ও ছন্দে কথা বলতে অভ্যস্ত। বহুকাল থেকে যশোরের মানুষ শিল্প-সংস্কৃতির যেমন নির্মাতা তেমনি প্রচারক। এখানকার সব গানই যে লিখে রাখা হয়েছে তা নয়। লেখার বাইরেও মানুষের রচিত সুর ও কথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে অবলীলায়। এইগুলো হলো যথার্থ লোকসঙ্গীত। সঙ্গীত রচয়িতার নাম, ধাম, পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তার প্রাণের আর্তি 'লোকসঙ্গীত'কে।

যশোর লোকসঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। আধুনিক ফোকলোর বিশ্লেষকেরা যশোরকে অভিহিত করেন চারণকবিদের অঞ্চল বলে। যুগ যুগ ধরে এই জনপদের লোকসঙ্গীত রচয়িতাদের বাণী ও সুর একটি ভিন্ন স্বাদের আবহ নির্মাণে সহায়তা করেছে।

যশোরের পেশাদার-অপেশার লোকসঙ্গীতের নির্মাতাদের নানা নামে নানা পরিচয়ে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কয়েকটি পরিচয় হলো জারিগানের বয়াতি জারিয়াল, জারিগানের গায়ক রচয়িতাও হতে পারে এরা সাধারণভাবে বয়াতি নামে পরিচিত। কবিগানের গায়ক কবিয়ালারা কবিগানের রচয়িতা সরকার। তেমনি আছে ভাবগানের বয়াতি, ভাবগানের সরকার। ঢপগানের রচয়িতা ঢপগাইয়ে বা ঢপগায়ক। এইভাবে কীর্তনগানের গায়ক কীর্তনীয়া–তেমনি রামায়ণের কাহিনীগায়ক রামায়ণগায়ক নামে পরিচিত।

ব্যাপক শহরায়ন ও শিল্পায়নের থাবায় যশোরের গ্রামীণ লোকসঙ্গীতের কয়েকটি ধারা বিলুপ্ত হয়েছে, কয়েকটি ধারা আজো চলমান। বর্তমান প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর যশোরের লোকসঙ্গীত রচয়িতা, গায়ক, বাদক ও ভোক্তাদের সমস্যা ও সাফল্য উঠে আসবে।

যশোর জেলা (বহত্তর) পরিচিতি

ভৌগোলিক পরিচিতি ও সীমাঃ যশোর জেলার উত্তরে কুষ্টিয়া, দক্ষিণে খুলনা, পূর্বে ফরিদপুর জেলা ও পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। যশোর জেলা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ২৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত। আয়তন ৬,৬৭৪ বর্গ কিলোমিটার বা ২,৫৩৮ বর্গমাইল। এর মধ্যে ১৫৬ বর্গকিলোমিটার বা ৬০ বর্গমাইল নদী এলাকা।

যশোর একটি প্রাচীন ব-দ্বীপ। এই অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে পদ্মা ও ভাগীরথী ব-দ্বীপের অংশ হিসেবে। মূলত প্রাচীনকাল থেকে পদ্মার পলি জমে এই ভূমিখণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল। নড়াইল, মাগুরা ও সদর যশোরের কিছু এলাকা নিয়ে পূর্বাঞ্চল। পশ্চিমাঞ্চলের নদ নদীগুলো আগেই স্রোত হারিয়েছে। পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো এখনও কিছুটা বহতা। এখানকার প্রবাহিত নদীগুলো পদ্মা ও তার শাখা নদীগুলো থেকে বিকশিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব যশোরের নদনদীগুলো তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। পূর্ব ও পশ্চিম যশোরের নদনদী বালু পলি ও কঠিন মাটির স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক পরিচয়ঃ যশোর ভূ–খণ্ডে কতকাল আগে মানববসতি শুরু হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। প্রাচীনকালে যশোর অঞ্চল উপবঙ্গ নামে পরিচিতি পায়। আর আগে এই অঞ্চলকে বলা হতো বাগড়ি, বঙ্গ,

www.pathagar.com

গঙ্গ ইত্যাদি। প্রাচীন বাগড়ি রাজ্যের রাজধানী ছিল শংখনাট বা বর্তমান শেখহাটি। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ মহাভারত, কালীদাসের রঘুবংশ ও বাৎসায়নের কামশাস্ত্রে বঙ্গরাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও ভূগোলবেত্তা টলেমির রচনায় আছে, বর্তমান যশোর জনপদ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শাসনামালে বাংলার অন্যান্য অংশের মতো সমতট ও তার শাসনাধীনে আসে। এই সমতটের একটি বড় অংশ হলো বর্তমান যশোর জেলা জনপদ। এরপর পাল শাসনামল, সেন শাসনামল, সুলতানি শাসনামল, মুঘল শাসনামলে যশোর ধারাবাহিকভাবে দিল্লি সাম্রাজ্য কখনো বা স্বাধীন বাংলার শাসনাধীনে ছিল।

১৭৫৭ সালে বাংলার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইজারা গ্রহণ করে। যশোর এভাবে কোম্পানি শাসনামলের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরে যশোর ইংরেজ শাসনাধীনে চলে যায়। ১৯৪৭ সালে যশোর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের একটি অন্যতম জেলা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আবার ১৯৭১ সালের মুক্তিযদ্ধের সময়ে যশোরবাসী লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে ৭ ডিসেম্বর যশোর হানাদারমুক্ত হয় এবং যশোর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মুক্ত এলাকা হিসেবে সার্বভৌম বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সামাজিক বিবরণঃ মানুষ মাত্রই সমাজবদ্ধ জীব। সমাজেই মানুষের অস্তিত্ব। মানুষের সামাজিক অবস্থাকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। অর্থনৈতিক বিচারে সামাজিক অবস্থা, জাতিতাত্ত্বিক বিচারে সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি। তবে যশোরের সামাজিক অবস্থা আবর্তিত হচ্ছে পেশাভিত্তিতে। যেমন, ব্যবসায়ীসমাজ, কৃষিজীবীসমাজ, চাকরিজীবীসমাজ ইত্যাদি।

নৃ-তাত্ত্বিকঃ নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, যশোর জেলার মানুষ আর্য-দ্রাবিড়, মঙ্গোলিয়া রক্তধারা বহন করছে। আবার কোনো কোনো এলাকার মানুষের মধ্যে সেমেটিক রক্তধারার জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যএশিয়ার নরগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার বহনকারী মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যশোরের পূর্বাঞ্চলীয় মানুষ ও পশ্চিমাঞ্চলীয় মানুষদের মধ্যে একটি পার্থক্য সহজে লক্ষ করা যায়। যশোরের পূর্বাঞ্চলীয় মানুষেরা বসবাস করে বর্তমান নড়াইল, মাগুরা ও যশোর সদরের পূর্বাংশে। এরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, ফর্সা ও শক্তিমত্তার অধিকারী। পশ্চিমাঞ্চলীয়রা পূর্বাঞ্চলের বিপরীতমুখি আকৃতির অধিকারী। যশোরের কেশবপুরে আছে ভগবানীয়া সম্প্রদায়ের লোক। এবং উলশি এলাকায় আছে কিন্নর উপসম্প্রদায়ের লোকজন। এই দু'টি সম্প্রদায় হিন্দু কিংবা মুসলিম কোনো সম্প্রদায়ের দায় না দিয়ে নিজেরাই দু'টি পৃথক উপধর্মের অনুসারী।

জনসংখ্যাঃ ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বৃহত্তর যশোরের জনসংখ্যা ৪৮,৪৮,০২৩ জন। সমগ্র বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫.০২%। এই জনসংখ্যার মধ্যে ২৪,৯২,২৩৫ জন পুরুষ, ২৩,৫৫,৭৮৮ জন নারী। যশোরের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ।

বংশ, গোষ্ঠী ও ধর্মবিশ্বাসঃ যশোরের প্রধান জনগোষ্ঠী মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। এ ছাড়া রয়েছে কিছু খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী ও বিকৃত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী বুনো, বাগদি ও মুর্দাফরাস ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর লোক। সামান্য সংখ্যক শিয়া সম্প্রদায়ের লোকও রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। বাকিরা উচ্চবর্ণ হিন্দু ও নবশাখ সম্প্রদায়ের।

পেশাঃ যশোরের অধিকাংশ লোকের পোশা কৃষিকাজ। সমগ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বিচারে এরা শতকরা ৭৫ জন। এ ছাড়া বাকিরা উচ্চ ও নিম্ন মানের চাকরিজীবী।

সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণঃ বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি হলো মানুষের চিন্তা ও আচরণের বহির্প্রকাশ। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট সংস্কৃতির মিশ্ররূপ হলো যশোরের সংস্কৃতি। সহজ কথায় বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পারস্য, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে যশোরের সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে।

www.pathagar.com

কাহিনী-কিংবদন্তি-লোকশ্রুতি: যশোরের সমগ্র জনজীবনের সঙ্গে মিশে আছে প্রবাদ, লোকশ্রুতি, কিংবদন্তি ও লোককাহিনী। এই কাহিনী-কিংবদন্তির রয়েছে যশোর সদরের গডকালীর কিংবদন্তি-কাহিনী, নড়াইলের রূপগঞ্জের নিশিনাথ তলার কিংবদন্তি কাহিনী, কালিয়া উপজেলার কলাবাড়িয়ার ঠাকুরভিটে বা কেলাবাড়ির কাহিনী-কিংবদন্তি অন্যতম। এখানে সংক্ষেপে বলছি গডকালীর কিংবদন্তি। যশোর শহর হয়ে ভারতের সীমান্ত পথে যাওয়ার সময়ে ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালি একটি বাজার আছে। পশ্চিমদিকে যাওয়ার পথে ছোট একটি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। মুঘল আমলে এক হার্মাদ দস্যু এক হিন্দু যুবতীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে। সে তার খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে কালীর উপসনা শুরু করে বলে স্থানীয় লোকেরা জানায়। হার্মাদ দস্যু দেবী কালীকে বলতো গডকালী। সেই গড কালীর মন্দির আজো আছে গদখালির মন্দির হিসেবে। স্থানের নামটিও গদখালি।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উৎপত্তি ও বিস্তৃতিস্থল

১. **জারিগান:** জারিগান ফারসি শব্দ। এর অর্থ হলো প্রচার। মূলত মধ্যযুগের মুসলিম সম্প্রদায়ের শাসকেরা রাষ্ট্রীয় খবরাখবর প্রচারের এলান বা ঘোষণা জারি করতেন। এইভাবে জারি শব্দটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়। জারি যখন গান অর্থে ব্যবহার হয় তখন তা মহররম মাসে কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনীর আশ্রয়ে গড়ে ওঠে। জারি তখন একটি জনপ্রিয় গানের নাম। প্রায় পৌণে দুইশত বছর আগে জারিগান উৎপত্তি লাভ করে মধ্য যশোর এলাকায়। জারিগান বিস্তৃত লাভ করে বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা জেলায়।

২. **কবিগান:** কবিগান হলো দুই পক্ষের তর্কযুদ্ধ সমবেত সঙ্গীত। চতুর্দশ শতাব্দীতে কবিগান প্রাচীন যশোরের ভাটকলাগাছি গ্রামে প্রথম পরিবেশিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যশোরের মোহাম্মদপুরে

কবিগান (নব পর্যায়)

www.pathagar.com

কবিগান পরিবেশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবিগান বর্তমান পশ্চিম বাংলা বিশেষত মহানগরী কলকাতায় বিস্তৃতি লাভ করে। কবিগান যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ঢাকা প্রভৃতি এলাকায় আজো ব্যবহার হয়ে থাকে।

৩. **ধুয়াগানঃ** টানা সুরের গানকে ধুয়াগান বলা যায়। ধুয়াগানের বৈশিষ্ট্যে একটি পদ একাধিকবার গাওয়ার রীতি রয়েছে। ধুয়া শব্দটি অনুজ্ঞা অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। ধুয়াগান কবিগান ও জারি গানের বড় ধরনের গায়কী অংশ। কবিগানের সঙ্গে ধুয়াগান যশোর এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে। এরপর সারা যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, কুষ্টিয়া, পাবনা, ভারতের চব্বিশপরগনা প্রভৃতি এলাকায় ধুয়াগান ব্যবহার হয়ে আসছে।

৪. **হালুই গানঃ** যশোর এলাকায় পৌষ-সংস্কৃতিতে হালুই গান গীতি হয়। হালুই গান মূলত বাস্তুপূজার গান। গায়কেরা বড় বড় লাঠির আঘাতে তাল ঠুকে ঠুকে এই গান সমবেতকণ্ঠে গেয়ে থাকে। হালোই গানের উৎপত্তি কোথায় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এই গান যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত আছে।

৫. **পটের গানঃ** মোটা কাগজের পটে বিভিন্ন ছবি এঁকে গুছিয়ে রাখা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির কয়েকদিন আগের থেকে হিন্দু কিশোর কিশোরিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পটের ছবি দেখিয়ে যে গান করে তা-ই পটের গান নামে পরিচিত। গৃহস্ত রমণীরা পটের গান গায়ক-গায়িকাদের চালডাল দিয়ে বিদায় করে। পরে এই চালডাল দিয়ে তারা বনভোজন করে খায়। যশোরসহ পটের গান দক্ষিণ-মধ্য বাংলাদেশ ও ভারতে বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত আছে।

৬. **সারিগানঃ** সারিগান যশোরে উৎপত্তি লাভ করেছে বলে বয়সী লোকেরা দাবি করে থাকেন। সারি গানকে বলা হয় কর্মের গান। সাধারণ বাইচের নৌকার মাঝি-বাইছারা সারিগান গাইতো। এ ছাড়া যশোরের কর্মরত কৃষকেরা জমিতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারি গান গেয়ে থাকে।

৭. **গাজীর গানঃ** ইতিহাস ও কিংবদন্তি ঘেরা গাজী সাহেবের ফকিরি জীবনের কাহিনী নিয়ে গাজির পালা গীত হয়ে আসছে বহুকাল থেকে। অনুমান করা যায়, চার শতাধিক বছর পূর্ব থেকে সাধারণ হিন্দু

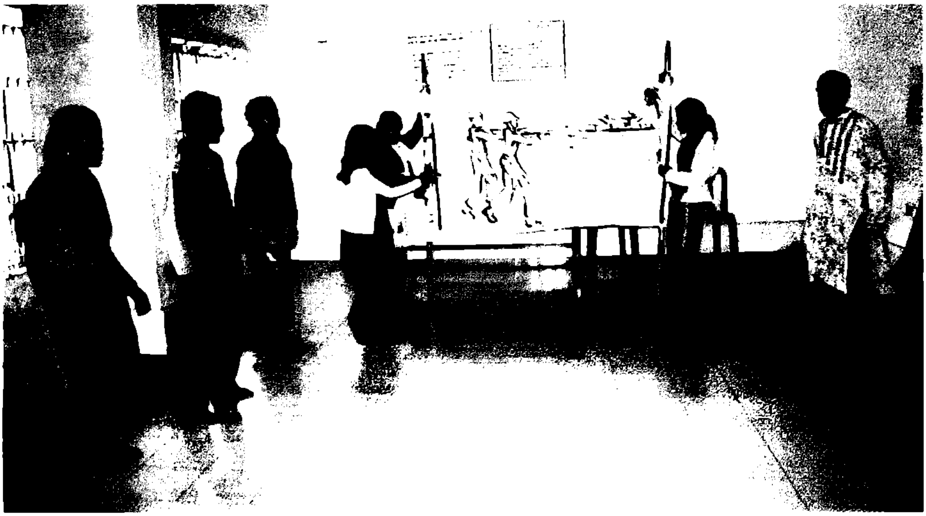

পটগান (নব পর্যায়)

www.pathagar.com

গাজী-কালু চম্পাবতী

মুসলিম গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী যেমন ভক্তিভরে শুনতো তেমনি তাদের মধ্যে গীত অভিনয় অভ্যাস গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই গাজীর পালার গীতাভিনয়ই গাজীর গান নামে পরিচিতি পায়। গাজির গান যশোরের মধ্যাঞ্চলে উৎপত্তি হয়েছে। এই গানের বিস্তৃতি আছে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশালসহ অন্যান্য এলাকায়।

৮. **মানিক পীরের গানঃ** মানিক ফকিরের উপাখ্যান নিয়ে যে পালা লৌকিকভাবে প্রচলিত আছে তা-ই মানিক পীরের গান। মানিক পীরের কাহিনী গাজি সাহেবের কাহিনীর মতোই। মানিক পীরের গানের উৎপত্তি হয় যশোরের পশ্চিম এলাকায়। মানিক পীরের পালা ও গান এখন প্রচলিত আছে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ভারতের চব্বিশ পরগনা ও নদীয়ায়।

৯. **জাগরণের গানঃ** যশোর জেলায় হিন্দু রমণীরা মনস্কামনা পূরণের জন্য সারা রাত জেগে যে গান পরিবেশন করে সেটাই জাগরণ গান। সাধারণত সধবা রমণীরা এই গান পরিবেশন করে। সঙ্গে থাকে কুমারীরাও। দেবী কালীকে উদ্দেশ্য করে পরিবেশিত হয় জাগরণ গান।

১০. **মুর্শিদি গানঃ** মুসলমানেরা খোদার সান্নিধ্যলাভের জন্য একজন পথ নির্দেশক বা মুর্শিদ গ্রহণ করে। এই মুর্শিদ হলো ভক্তের পীর বা পথনির্দেশক। এই পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান হলো মুর্শিদি গান। মুর্শিদি গান যশোর ফরিদপুর জেলায় বিকাশ লাভ করে বলে জানা যায়। তবে এই গানের বিস্তৃতি রয়েছে ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লাসহ সারা বাংলাদেশে।

১১. **ভাবগানঃ** ভাবগান, কড়চা গান ও বিচার গান সমার্থক লোকসঙ্গীত। যতদূর জানা যায়, এই গানের উৎপত্তি হয়েছে ফরিদপুর-কুষ্টিয়া জেলায়। গভীর তত্ত্বানুসারী এই গান। ভাবের বাণী দিয়ে এই গানের দেহ নির্মিত। সারা যশোর এলাকায় এই ভাবগান পরিবেশিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

১২. **কীর্তন গান / পদাবলী কীর্তন পালা:** কীর্তন গানের সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগে। তবে নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে কীর্তন নতুন পর্যায়ে গীত হতে থাকে। সেটি গৌড়ীয় কীর্তন কিংবা পদাবলীকীর্তন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো যশোর জেলা এলাকায়ও বেশ কয়েকটি কীর্তন পালার দল আছে।

১৩. **যাত্রাপালা বা যাত্রাগান:** আদিকালে যাত্রা গান বলে পরিচিতি পেলেও মধ্যযুগে যাত্রাপালা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যাত্রাপালা বা যাত্রাগান বিশেষ কোনো একসময়ে বিশেষ কোনো কালে সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানুষের অবিরাম চেষ্টার ফল হলো আধুনিক যাত্রা। যশোর জেলায় বেশ কয়েকটি যাত্রাদল রয়েছে– দলগুলি নিয়মিত গান পরিবেশন করে থাকে।

১৪. **বারোমাসি গান:** বারোমাসি গান গ্রাম্য রমণীর বিরহগাঁথা। বছরের ১২টি মাসের বর্ণনা করে বিরহিণী রমণীর আর্তি-আর্তনাদই হলো বারোমাসি গান। লৌকিক ধারায় এই গানের বিকাশ ও উৎপত্তি। যশোর খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ এলাকায় বারোমাসি গান শুনতে পাওয়া যায়।

১৫. **বারাসে গান:** যশোর এলাকায় বারাসে অর্থ অসময়ের কোনো বিষয়কে বুঝায়। গ্রাম্য রমণী যখন তার প্রেমার্তি স্বামী কিংবা প্রেমিকার শূন্যতা অনুভব করে সেই বক্তব্যের গানকে বলে বারাসে গান। বারাসে গানে থাকে নারীউক্তি কিন্তু তা গেয়ে থাকে গ্রাম্য চাষী, চাষবাসের কাজের সময়ে বা বর্ষাকালে ধান নিড়াতে কিংবা পাটকাটার সময়ে দক্ষিণ-মধ্য বাংলার সর্বত্র বারাসে গান পরিবেশিত হয়ে থাকে।

১৬. **মারফতি গান:** ইসলামি তত্ত্বীয় গানকে বলে মারফতি গান। এই গানের মধ্যে থাকে ধর্মের নিগূঢ় গোপন সংবাদ। মারফতি গানের উৎপত্তি কোথায় তা জানা যায় না। তবে এই গান যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশালসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে পরিবেশিত হয়ে আসছে। মারফতি গানকে যশোর ও ফরিদপুর এলাকায় ফকিরি গানও বলা হয়ে থাকে।

১৭. **গার্শির গান:** আশ্বিন-সংক্রান্তির রাতকে বলা হয় গার্শির রাত। বলা যায়, এই রাতে পালিত হয় একটি লৌকিক উৎসব। এই লৌকিক উৎসব বা গার্শির রাতে যে গান পরিবেশিত হয় তা-ই গার্শির গান। হিন্দুদের মতো যশোর জেলার অনেক মুসলিম পরিবারেও গার্শির উৎসব বা গান পরিবেশন করে থাকে। গার্শির গান বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশিত হয়ে থাকে।

১৮. **য়্যাচড়া পূজার গান:** ফাল্গুন মাসের শেষ ৩ দিন য়্যাচড়া পূজার নির্দিষ্ট বেদীস্থলে হিন্দু কুমারীদের কণ্ঠে য়্যাচড়া গান শোনা যায়। গানের বিষয় হলো, হিন্দু কুমারীর শিবের মতো বর বা স্বামী প্রার্থনা। য়্যাচড়া পূজার গানের প্রচণ্ড প্রচলন রয়েছে যশোর এলাকায়।

১৯. **দেহতত্ত্ব গান:** হিন্দু ও মুসলিম কিছু আধ্যাত্মিক সাধক আছে যারা বিশ্বাস করেন, 'যা আছে দেহভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। অর্থাৎ দেহকে চিনতে পারলে স্রষ্টাকে চেনা যায়। এই চিন্তার বিষয় নিয়ে যে গানগুলো পরিবেশিত হয় তাই দেহতত্ত্ব গান।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা:

১. **পাঞ্জুশাহ:** পাঞ্জুশাহ মূলত মরমি সাধক ও গান রচয়িতা। তিনি লালন শাহের সমসাময়িক। পাঞ্জু ১৮৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন যশোরের ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানার হরিষপুর গ্রামে। মৃত্যুবরণ করেন ১৯১৪ সালে।

২. **দুদ্দুশাহ:** দুদ্দুশাহ মরমি লোককবি। তিনি লালন ফকিরের শিষ্য। জন্ম যশোরের ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানার বেলতলা গ্রামে ১৮৪১ সালে। মৃত্যুবরণ করেন ১৯১৯ সালে।

৩. **চণ্ডিদাস গোসাঁই:** চণ্ডিদাস গোসাঁই যশোরের বিশিষ্ট লোককবি। জন্ম যশোরের কামারহাটি গ্রামে। মৃত্যু ১৩৪১ সালে। জন্ম সাল জানা যায় নি।

www.pathagar.com

৪. **পাগলা কানাই:** পাগলা কানাই যশোরের ঝিনাইদহের নেবুতলা গ্রামে ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট জারিগানের বয়াতি। মৃত্যু: ১৮৮৯ সালে।

৫. **ঈদু বিশ্বাস:** ঈদু বিশ্বাস বিখ্যাত জারি ও ধুয়াগানের বয়াতি। যশোরের মাগুরার বন্যাতল গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুও ঐ শতাব্দীতে।

৬. **মেহের চাঁন:** মেহের চাঁন জারিগানের বয়াতি। যশোরের মাগুরায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঈদু বিশ্বাসের সমসাময়িক।

৭. **হাকিম চাঁন:** হাকিম চাঁন বিখ্যাত জারির বয়াতি। যশোরের মাগুরার বাটাজোড়ে জন্মগ্রহণ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

৮. **সোনাউল্লাহ বয়াতি:** যশোরের কালিয়া থানার ডুমুরিয়ায় জন্ম গ্রহন করেন সোনাউল্লাহ ১৮৮০ সালে। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬২ সালে।

৯. **পাঁচু শাহ:** পাঁচু শাহ যশোরের কালিয়া উপজেলার পহরডাঙ্গা গ্রামে ১৩১২ জন্মগ্রহণ করেন– মৃত্যুবরণ করেন ১৪০০ সালে। তিনি ভাবগান বা বিচার গানের রচয়িতা।

১০. **ত্রিনাথ রায়:** ত্রিনাথ রায় যশোরের কালিয়া থানার মাউলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিনাথের গান রচয়িতা। জন্ম ১২৬৫ সন, মৃত্যু ১৩১৫ সন।

১১. **রুক্মিনী রায়:** লোককবি রুক্মিনী রায় যশোরের মাউলি গ্রামে ১৩১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ১৩৭১ সালে।

১২. **রমজানউল্লাহ বয়াতি:** রমজানউল্লাহ জারিগানের বয়াতি। যশোরের নড়াইলের ঝিকড়া গ্রামে ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন কালিয়ার দেয়াড়াঙ্গায় ১৯০৮ সালে।

১৩. **ইরফান মোল্যা:** ইরফান জারিগানের বয়াতি। জন্ম কালিয়া উপজেলার দেওয়াডাঙ্গা গ্রামে ১৩০৫ সালে মৃত্যু ১৩৪৯ সালে।

১৪. **মোক্তাদের ফকির:** মোক্তাদের ফকিরের জন্ম যশোরের কালিয়া থানার হাডিয়ার ঘোপ গ্রামে ১২৭৯ সালে মৃত্যু ১৩৫৮ সালে। তিনি ভাবগান রচয়িতা।

১৫. **পাগলা অধীর মালো:** অধীর মালো ভাব ভাটিয়াল গানের রচয়িতা। অধীর ১৯১২ সালে যশোরের রায়গ্রাম কলাগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু ১৯৫৯ সালে।

১৬. **মাছিম মোল্যা:** মাছিম যশোরের কালিয়া থানার দেয়াডাঙ্গা জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৪ সালে। তিনি জারি ও ধুয়াগানের বয়াতি।

১৭. **বিজয় সরকার:** বিজয় যশোরের নড়াইলের ডুমুদি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত কবিয়াল। জন্ম ১৯০৩ সালে, মৃত্যু ১৯৮৫ সালে।

১৮. **তারক সরকার:** তারক সরকার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। তিনি যশোরের লোহাগড়া থানার জয়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১২৪৫ সালে। তাঁর 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থটি মতুয়া সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে পঠিত। মৃত্যুবরণ করেন ১৩১২ সালে।

১৯. **মসলেম বয়াতি:** মসলেম বয়াতি বাংলাদেশের অন্যতম জারির বয়াতি। তিনি যশোরের নড়াইলের তারাপুর গ্রমে ১৩১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ১৩৯৪ সালে।

২০. **প্রফুল্ল গোসাঁই:** প্রফুল্ল গোসাঁই শত শত লোকগানের রচয়িতা। যশোরের কালিয়া উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে ১৩০৭ সালে ভূমিষ্ঠ হন, ১৩৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

২১. **মওলান খাঁ:** জারিগানের বয়াতি মওলান খাঁ যশোরের কালিয়া উপজেলার রামপুরা গ্রামে ১৯০৩ সালে ভূমিষ্ঠ হন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৩ সালে।

www.pathagar.com

২২. তফু মোল্লাহ সরকার: তফু মোল্লা ধুয়াগানের রচয়িতা। যশোরের কালিয়া উপজেলার সরসপুর গ্রামে ১৮৪৭ সালে ভূমিষ্ঠ হন, ১৯২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

২৩. মুন্সি মোজাহারউদ্দিন: যশোরের কালিয়া উপজেলার টোনা গ্রামে শত শত বিচারগানের রচয়িতা মুন্সি মোজাহার ১৮৬৭ সালে ভূমিষ্ঠ হন। ইন্তেকাল করেন ১৯৪৮ সালে।

২৪. রসময় সরকার: যশোরের নড়াইলের হাড়িয়ার ঘোপ গ্রামে রঙ্গময় ১৯২১ সালে ভূমিষ্ঠ হন। দীর্ঘদিন তিনি কবিগান পরিবেশন করেছেন।

২৫. আবুল হাশেম: যশোরের কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রামে লোকগীতি রচয়িতা হাশেমের জন্ম ১৯৩০ সালে। মৃত্যু ১৯৮২ সালে।

২৬. অজিত ঘোষ: অজিত ঘোষ যশোরের লোহাগড়া উপজেলার চরদিঘলিয়া গ্রামে ১৯১৭ সালে ভূমিষ্ঠ হন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৬ সালে। তিনি বহুলোক গীতির রচয়িতা।

২৭. মুকুন্দ ঘোষ: মুকুন্দ ঘোষ শত শত লোকগীতি রচয়িতা। তিনি যশোরের লোহাগড়া থানার লুটিয়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন ১৯১৫ সালে। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৭ সালে।

২৮. ফজর বিশ্বাস: জারিগানের প্রাচীন বয়াতি ফজর বিশ্বাস। জন্ম যশোরের কালিয়া থানার বাগডাঙ্গা গ্রামে ১৮৬০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪৫ সালে।

২৯. নেপাল সরকার: নেপাল সরকার বহু গণচেতনামূলক লোকগীতি রচনা করেছেন। তার জন্ম যশোরের নড়াইল উপজেলার ব্যানাহাটি গ্রামে ১৯১২ সালে। মৃত্যু ১৯৯৯ সালে।

৩০. মধু মোল্যাহ সরকার: বহু লোকগীতির রচয়িতা মধু মোল্যাহ যশোরের লোহাগড়া থানার কামঠানা গ্রামে ১৩১৬ সনে ভূমিষ্ঠ হন। মৃত্যুবরণ করেন ১৪০০ সালে।

৩১. আবদুর রাজ্জাক মিয়া: লোকগান ও কবিতার রচয়িতা আবদুর রাজ্জাক মিয়া যশোরের কালিয়া উপজেলার কলাবাড়িয়া গ্রামে ১৯২২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭০ সালে।

সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকা

১. **বিনোদ গোসাঁই:** বিনোদ গোসাঁই যশোরের কালিয়া উপজেলার নলামারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন– তিনি মতুয়াসঙ্গীত ও বিচ্ছেদী গান পরিবেশনে দক্ষ।

২. **হাবিবুর রহমান বয়াতি:** হাবিবুর যশোর জেলার কালিয়া উপজেলার বাঐসোনা গ্রামের অধিবাসী। তিনি ভাব বা বিচার গানের গায়ক।

৩. **সুরোত খাঁ:** সুরোত বিখ্যাত ধুয়াগানের বয়াতি। তিনি যশোর জেলার কালিয়া উপজেলার কুঞ্জপুর গ্রামের বাসিন্দা।

৪. **মজিবর বয়াতি:** মজিবর জারিগানের বয়াতি। যশোর জেলার কালিয়া থানার কুঞ্জপুর গ্রামের বাসিন্দা।

৫. **আকরাম বয়াতি:** আকরাম বয়াতি জারিগানের শিল্পী। তিনি যশোর জেলার দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা।

৬. **অসীম বিশ্বাস:** ভাটিয়ালি-বিচ্ছেদি ও কীর্তন গানের শিল্পী অসীম বিশ্বাস। তিনি কালিয়া উপজেলার মাউলি গ্রামের বাসিন্দা। জন্ম ১৯৪৫ সালে।

৭. **কাঙাল কেবর:** জারিগানের উচ্চ শিক্ষিত শিল্পী কাঙাল কেবর। তিনি যশোর জেলার নড়াইল থানার মির্জাপুর গ্রামের বাসিন্দা। জন্ম ১৯৪২ সালে।

৮. **ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস:** ভাটিয়ালি গান ও বিচ্ছেদ গানের শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ যশোর জেলার নড়াইল সদর উপজেলা বাঁশভিটার বাসিন্দা। জন্ম ১৯৫০ সালে।

৯. **কানাই কুণ্ড:** ভাটিয়ালি ও কীর্তন গানের শিল্পী। তিনি যশোরের লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। জন্ম ১৯৫২ সালে।

www.pathagar.com

১০. ভাসিনীমোহন: কীর্তন গানের শিল্পী। তিনি নড়াইল থানার টাবরার অধিবাসী। জন্ম ১৯৫০ সালে।

১১. মনোজ বিশ্বাস: নামকীর্তন, কীর্তন ও ভাটিয়ালি গানের শিল্পী। তিনি নড়াইল উপজেলার টাবরা গ্রামের বাসিন্দা। জন্ম ১৯৬০ সালে।

লোকসঙ্গীতের দলের তালিকা

১. সমীরণ সরকারের কবিগানের দল, ঠিকানা: গ্রাম+পোষ্ট: নড়াইল
২. নারায়ণ সরকারের কবিগানের দল, ঠিকানা: গ্রাম: ডুতকুরা, কালিয়া
৩. নিখিল সরকারের কবিগানের দল, ঠিকানা: আটটাকি, মাগুরা
৪. আশু সরকারের কবিগানের দল, ঠিকানা: মাগুরা সদর
৫. আঃ জব্বারের জারিগানের দল, ঠিকানা: ছোট কালিয়া, কালিয়া
৬. আঃ কাদেরের জারিগানের দল, ঠিকানা: হাড়িভাঙা, কালিয়া
৭. রওশন আলীর জারিগানের দল, ঠিকানা: তারাপুর, নড়াইল
৮. পাবেল বয়াতির জারিগানের দল, ঠিকানা: খড়রিয়া, নড়াইল
৯. সাইফুল বয়াতির জারিগানের দল, ঠিকানা: খড়রিয়া, নড়াইল
১০. লালন বয়াতির ভাবগানের দল, ঠিকানা: পাখিমারা, কালিয়া
১১. কবির বয়াতির ভাবগানের দল, ঠিকানা: সরসপুর, নড়াগাতি
১২. ধীরেন বিশ্বাসের কীর্তন দল, ঠিকানা: বাঁশভিটা, নড়াইল
১৩. রেখারানীর কীর্তন দল, ঠিকানা: শ্রীপুর, যশোর
১৪. নিখিলের নামকীর্তনের দল, ঠিকানা: রায়পুর, যশোর
১৫. স্মৃতিকণার কীর্তন দল, ঠিকানা: বাঁশভিটা, যশোর
১৬. আলোকার কীর্তন দল, ঠিকানা: বালিয়াডাঙ্গা, যশোর
১৭. বিপ্লব বিশ্বাসের রামায়ণের দল, ঠিকানা: টাবরা, নড়াইল
১৮. অশোক চক্রবর্তীর কীর্তন দল, ঠিকানা: ডুতকুরা, নড়াগাতি
১৯. মালতি রাণীর কীর্তন দল, ঠিকানা: সদর নড়াগাতি
২০. কালীপদ মাস্টারের রামায়ণ দল, ঠিকানা: নন্দকোল, নড়াইল
২১. অসীম সরকারের কীর্তনের দল, ঠিকানা: মাউলি, কালিয়া
২২. নিশিকান্ত সরকারের কবিগানের দল, ঠিকানা: মাগুরা সদর, মাগুরা
২৩. সঞ্জয় সরকারের কবিগানের দল, ঠিকানা: নোয়াপাড়া, যশোর
২৪. ত্রিলোচন শাঁখারীর নামকীর্তনের দল, ঠিকানা: দক্ষিণ চাকলাপাড়া, ঝিনাইদহ
২৫. কৃষ্ণচন্দ্র দাসের নামকীর্তনের দল, ঠিকানা: সাইটবাড়িয়া, ঝিনাইদহ
২৬. আরতি রাণীর নামকীর্তনের দল, ঠিকানা: ব্যাপারিপাড়া, ঝিনাইদহ
২৭. নারদ সরকারের রামায়ণের দল, ঠিকানা: ফনিয়া, ঝিনাইদহ

সামষ্টিক সঙ্গীতের তালিকা:

১. পালা গান, ২. জারিগান, ৩. কবিগান, ৪. যাত্রাগান, ৫. কীর্তনগান, ৬. সারিগান, ৭. হালুই গান, ৮. সয়লা গান, ৯. পটের গান, ১০. ভবানী বিষয়ক, ১১. মালসি গান, ১২. সখি সংবাদ, ১৩. গোষ্ঠ গান, ১৪. হাবোইড় গান, ১৫. গাজির গান, ১৬. মানিক পীরের গান, ১৭. জাগরণ গান, ১৮. ভাবগান, ১৯. বিচারগান, ২০. বেহারার গান, ২১. ত্রিনাথের গান, ২২. দোলপূজার গান, ২৩. অষ্টগান, ২৪. বিয়ের গান, ২৫. পাটোই উৎসবের গান ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা

১. পেলাম রে ভাই স্বাধীনতা খাসা, ২. ভাবভয় অভয় দেমা তারা, ৩. কী করে পার হবি তুই ত্রিবিনায়, ৪. পরের প্রেমে পরান দিয়ে মজবো না রে প্রাণসখি, ৫. ভজন করবো বলো কোন প্রকারে, ৬. প্রেমেরই সাধন জানে সেইজন, ৭. কী যেন কী দিলেরে আল্লা রাসুলের মাঝারে, ৮. এসো নন্দলা বংশীয়ালা শ্যাম সুন্দর, ৯. পোষাপাখি উড়ে যাবে সজনী, ১০. তোমার নামে নয়নে মোর অশ্রু ঝরে সেই, ১১. পরবাসীরে বড়ো দাগা দিয়ে গেলি আমার মনে, ১২. নিশিথে স্বপ্নদেখে নন্দরাণী নন্দরাজার কাছে কেন্দে কেন্দে কয়, ১৩. পাখির দয়া নেই মায়া নেই রে, ১৪. বিদেশে এসেছ ভাই গাফিলি না থাকাচাই, ১৫. হুকুমে এসেছে বান্দা তলবে যাবে, ১৬. কতো রঙ দেখলাম আমি কলিকালে, ১৭. কোথা আছে তারের গোড়া, ১৮. আমার মন কান্দে যার লাগিয়া, দেহ প্রাণ কান্দে যার লাগিয়া, ১৯. তেত্রিশকোটি দেবতা গরুর গায়, ২০. ফুটলোরে ফুল আরবের গুলবাগিচায়।

লোকবাদ্য যন্ত্রের তালিকা

১. ঢোল, ২. ঢাক, ৩. জয়ঢাক, ৪. খোল (মৃদঙ্গ), ৫. বাঁশি, ৬. মোহন বাঁশি, ৭. খিলে বাঁশি, ৮. চাকি, ৯. ঘন্টা, ১০. জুড়ি, ১১. প্রেমজুড়ি, ১২. চটা, ১৩. দোতারা, ১৪. একতারা, ১৫. সারিন্দা, ১৬. শানাই, ১৭. চিতোরবাইড়, ১৮. বেহালা, ১৯. খোমক, ২০. কাশি, ২১. ডুগডুগি।

মূল্যবান লোকসঙ্গীতের তালিকা

যশোর জেলার লোকসঙ্গীতের বেশ কিছু ধারা লুপ্ত হয়েছে। আর কোনো কোনো সঙ্গীত ধারা বিলুপ্তির পথে। তবে বাণিজ্যিক ভাবে মূল্যবান কিছু লোকসঙ্গীতও রয়েছে, এইগুলি হলো: ১. কবিগান, ২. কীর্তনগান, ৩. জারিগান, ৪. ভাব বা বিচার গান, ৫. রামায়ণ গান ৬. যাত্রাগান ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান

যশোর এলাকায় পেশাদার শিল্পীরা গান বাজনা শুরু করে কার্তিক মাসে। আসর চলতে থাকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত। বাণিজ্যিক ভাবে একটি গানের দল গড়ে মাসে ২০ দিন গান পরিবেশন করে অর্থাৎ বছরে ১৪০ দিন। এই ভাবে দুটি কবিগানের দল একরাতে গড়ে ১৫,০০০/- হাজার টাকা পারিশ্রমিক পায়। তাতে দুটি দল গড়ে বছরে ২১,০০,০০০ টাকা উপার্জন করে। প্রতিদল বছরে সম্মানী পায় সাড়ে ১০ লাখ টাকা। এই পর্যায়ে বছরে যশোরের প্রতি কীর্তন দল উপার্জন করে ৭ লাখ টাকা। প্রতি জারিগানের দল উপার্জন করে ৮ লাখ টাকা। ভাবগানের দল পায় ৬ লাখ টাকা। প্রতি রামায়ণের দল বার্ষিক উপার্জন করে ৪ লাখ টাকা।

বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

১. গজল, ২. সাপের ওঝার গান, ৩. শীতলার গান, ৪. গাছঠেলার গান, ৬. ধুয়াগান, ৬. সখি সংবাদ, ৭. মাথুর, ৮. সারি গান, ৯. মনসার গান ইত্যাদি।

লুপ্তসঙ্গীতের তালিকা

১. হাবৈইড় গান, ২. সয়লা গান, ৩. বারোমাসি গান, ৪. গুরু পদের গান, ৫. কাকোই পূজার গান ইত্যাদি।

সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক

যশোরে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক রচয়িতা নন। রচয়িতা বা লোককবি নিজের স্বাধীন চিত্তচিন্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গান রচনা করেছেন তা ব্যবহার করছেন কণ্ঠশিল্পীরা রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে, অডিও, সিডির মাধ্যমে। এমন কী লোককবির অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারীরা কোনো অর্থ পায় না। এই অর্থ পায় সিডি, অডিও নির্মাতা শহুরে ব্যবসায়ীরা। তারাই প্রকৃতপক্ষে স্বত্বের অধিকারী।

www.pathagar.com

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ সম্পর্কিত: সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেধাবী ও পরিশ্রমী যুবক-যুবতীদের লোকসঙ্গীত সংগ্রহের প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্রুত অডিও ভিডিও মাধ্যমে ব্যবহার করে জেলাওয়ারি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ কাজ শুরু করা যায়।

খ. সংরক্ষণ সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীত শুধু সংগ্রহ করলে হবে না এর জন্য চাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণাগার বা অডিও সিডি লাইব্রেরি স্থাপন ও তার যথাযথ ব্যবহার।

গ. উপস্থাপন সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীতকে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা চলবে না। একে দেশ গঠন ও নীতিনৈতিকতা সৃষ্টিতে নতুনভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

ঘ. মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: লোককবিদের গান রেডিও, টিভি, অডিও, সিডি কোম্পানি হরহামেশা ব্যবহার হয়ে আসে। এর বিনিময় মূল্য পায় গায়ক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে সংসদে আইন করে রচয়িতাদেরও সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উপসংহার: শহরায়ণ ও শিল্পায়নের দ্রুত প্রসারণে যশোরের লোকসঙ্গীত হুমকির মধ্যে আছে। তাই একে সংরক্ষণ, প্রচার, সংকলনের কাজ দ্রুত করা প্রয়োজন। তা না হলে জাতি হিসেবে আমরা একসময় অন্তঃসার-শূন্য জাতিতে পরিণত হয়ে যাব।

তথ্যসূত্র

শেখ রোস্তম আলী, সাক্ষাৎকার, কালিয়া, যশোর।
কমলকৃষ্ণ সরকার, সাক্ষাৎকার, ঝিনাইদহ সদর।
হাসমত আলী, সাক্ষাৎকার, টোনা, কালিয়া, যশোর।
ড. তপন বাগচী, সাক্ষাৎকার, ঢাকা।
ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, সাক্ষাৎকার, গোপালগঞ্জ।
ডা. খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাক্ষাৎকার, লোহাগড়া, কালিয়া।
মানিক বিশ্বাস, সাক্ষাৎকার, মাউলি, কালিয়া।
নাসির হেলাল, সাক্ষাৎকার, চৌগাছা, ঝিনাইদহ।
এ জামান, 'যশোরের লোককবি', যশোর।
মোঃ আবু তালিব, 'কিংবদন্তির যশোর', যশোর।
ড. তপন বাগচী (সম্পা.), 'কবি মহসিন হোসাইন: সজ্ঞায় প্রজ্ঞায়', জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা।
ড. তপন বাগচী, 'বাংলাদেশের যাত্রাগান: জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর যশোর', সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
মহসিন হোসাইন, 'বৃহত্তর যশোরের লোককবি চারণকবি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মহসিন হোসাইন, 'নড়াইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য', গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা।
মহসিন হোসাইন, 'কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মহসিন হোসাইন ও তপন বাগচী (সম্পা.), 'স্বভাবকবি প্রফুল্ল গোসাঁই গীতিসমগ্র', গতিধারা, ঢাকা।
মহসিন হোসাইন, 'বাংলাদেশের লোকগীতিসম্ভার' (যন্ত্রস্থ)।

www.pathagar.com

৩

চট্টগ্রাম অঞ্চল

৩.১ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

মুহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী

ভূমিকা: বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগরী চট্টগ্রাম। এটিকে 'প্রাচ্যের রাণী' এবং 'বাংলাদেশের প্রবেশের পূর্বদ্বার' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। সমুদ্র, পাহাড়, প্রাকৃতিক সমুদ্র বন্দর, নদীনালা, উপত্যকা, বন-বাদাড় ইত্যাদি নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ অঞ্চল পরিণত হয়েছে প্রকৃতির লীলা নিকেতনে। চট্টগ্রামের এ রূপ ও পরিবেশ বহিঃর্বিশ্বের মানুষকে স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে বসতি গড়তে আকৃষ্ট করেছে। ফলে এ অঞ্চল নানা বর্ণের নানা জাতের ও নানাদেশের মানুষের বসতি ও মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলটি আরাকানিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের সংস্কৃতি এ অঞ্চলের জনমানুষের মননে বহমান। মোগল ও মুসলিম শাসনের কারণে এখানে ফার্সি ভাষা এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি প্রবেশ করেছে যত্রতত্র। বৃটিশ শাসনের সময়কালে ইংরেজিও ঢুকেছে অবলীলায়। বন্দরের কারণে পর্তুগিজ, ফরাসি, আরবি নানা ধারনের সংস্কৃতির ছোঁয়া পেয়েছে এ অঞ্চল। ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

সংস্কৃতির মিলনের মাধ্যমে যে আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে তারই নাম 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি'। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সঙ্গীত একটি প্রধান বিষয়। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত, সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকারের সন্ধান এ অঞ্চলে পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম পরিচিতি: প্রাচীনকাল থেকে পশ্চিমাংশে সাগরঘেরা সমতলভূমি ও পূর্বাংশে গভীর অরণ্য আবৃত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল চট্টগ্রাম ভূ-ভাগ। পশ্চিমাংশ ছিল হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। আর পূর্বাংশ তেরটি বহিরাগত মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত উপজাতির নিবাস। ইংরেজ শাসনকালে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলকে অনগ্রসরতার অজুহাতে পৃথক করে নতুন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলা' গঠন করা হয় এবং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'চট্টগ্রাম' ও 'পার্বত্য চট্টগ্রামের' মধ্যে স্থায়ী সীমারেখা টানা হয়। মূল ভূখণ্ড ছাড়াও সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেষখালী, মাতারবাড়ি, সোনাদিয়া, শাহপরী, সেন্টমার্টিন ও ইদানীংকার উড়কিরচর নামের এই আটটি দ্বীপও চট্টগ্রামভুক্ত ছিল। এভাবে সুদীর্ঘকাল প্রশাসনিক কার্যক্রম চলার পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ সাবেক 'দক্ষিণ চট্টগ্রাম' অর্থাৎ মাতামুহুরী নদীর সমগ্র ভূ-ভাগ ও উল্লিখিত দ্বীপগুলো নিয়ে 'কক্সবাজার' জেলা সৃষ্টি করে। দীপাঞ্চল সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়।

চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি: ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোঘলরা আরাকানিদের হটিয়ে এ এলাকা দখল করে নিয়ে নাম রাখে 'ইসলামাবাদ'। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর কাসিম আলী খানের কাছ থেকে এ জেলাটি অধিগ্রহণের পর ব্রিটিশরা এর নামকরণ করে 'চিটাগাং'।

www.pathagar.com

আবদুস সাত্তার চৌধুরী

চট্টগ্রাম 'চাটিগাঁও' অথবা 'চাটগাঁও' নামেও পরিচিত। এই নামের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বহু মত বিদ্যমান। বৌদ্ধদের ধারণা, চট্টগ্রাম নামটা 'চৈত কেয়াং' বা 'চৈত গ্রাম' শব্দের অপভ্রংশ। চৈত-গ্রাম অর্থ বৌদ্ধ কীর্তিস্তম্ভের আবাসস্থল। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনস্ বলেছেন এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর ক্ষুদে পাখি 'চট্গা' থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।

কারো কারো ধারণা, বৌদ্ধদের স্বর্ণ যুগে শহর ও আশেপাশের এলাকাকে আরাকানিরা 'চিটাগুং' (Tsit-ta-gung) নামকরণ করেন। একইভাবে মুসলমানরা ব্যবসায়িকসূত্রে চট্টগ্রাম বন্দরে আসাযাওয়া শুরু করলে এই শহরকে 'চিরসবুজ বন্দর' বা 'মদিনাতুল আকছার' বলে উল্লেখ করেন। পারসি কিতাব মকজান-উল-আদউইয়ায় চট্টগ্রামকে 'সবুজ নগরী' বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ এর চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্ব থেকে চট্টগ্রাম 'চাটিগাঁও' বা 'চাটগাঁও' নামে পরিচিত। এর সঙ্গে হযরত বদর শাহ'র (র.) আধ্যাত্মিক কাহিনী জড়িত। ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত বদর শাহ্ (র.) চট্টগ্রাম এসে দৈত্যদানবের কাছ থেকে এক 'চাটি' পরিমাণ জায়গা এবাদত করার জন্য চেয়ে নেন। সাহিত্য ও সাধারণ মানুষের উচ্চারণে 'চাটিগা' নামটি এখনো সজীব। এখানে দৃশ্যমান রয়েছে পাহাড়-গিরি, মালভূমি, সমভূমি, শৃঙ্গ, নদী-নালা, হ্রদ ও দীঘি পুকুর, ঝরণা, ভূতত্ত্বীয়, গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখি, আবহাওয়া-জলবায়ু।

আজকের পৃথিবীতে অঞ্চলগতভাবে বহুজাতির বাস। চট্টগ্রামেও আরবি, আফগানি, তুর্কি, ইরানি, বর্মি, ফিরিঙ্গি, বাঙালি প্রভৃতি জাতির লোকসহ পৃথিবীতে আরো যত জাতি আছে, তত জাতির চেহারা-ছুরতের লোকই চট্টগ্রামে বিদ্যমান এবং দৃশ্যমান। চট্টগ্রামবাসীর স্বভাব-চরিত্র, আচার ব্যবহার সবকিছুতে বিভিন্নতা ও বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যের সমাবেশ সর্বক্ষণ সক্রিয়।

১৪৬ খ্রিস্টাব্দে আরকানের প্রথম রাজা মাগধী চন্দ্রসূর্যের চট্টগ্রাম অভিযানকালে আগত হিন্দু-বৌদ্ধ সৈনিকদের সংমিশ্রণের উদ্ভব হয় নিম্নবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধ অধিবাসীর। অষ্টম শতক থেকে আরবিয়গণ বাণিজ্য উপলক্ষে, কেউ কেউ ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্য চট্টগ্রামে আগমন করেন। আরো পরে গৌড়াগত হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণরা চট্টগ্রামে আসেন। এরপর ১৬-১৭ শতকে পর্তুগিজ বণিকদের থেকে মেটে ফিরিঙ্গির উদ্ভব হয়। সব মিলে চট্টগ্রাম প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, ফিরিঙ্গি, খ্রিস্টান অধিবাসীদের আবাসভূমি।

জেলার অধিবাসীদের মধ্যে নানা পেশার লোক রয়েছে। সেসব পেশাভিত্তিক গোত্রদের মধ্যে ভইয়া, নউর গা, তেলি, বাজিকর, মুজারি, খোন্দকার, মিজ্জি, হাজাম, কাজি, কাগজি, নাপিত, ধোপা, বারৈ, কুমার, কামার, সাহা, যোগী, বণিক, জেলে, হাড়ি, কাহার, সূত্রধর, গণক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মুসলমনদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঃ মহররম, ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর, শব-ই-বরাত, কদর-মেরাজ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি, ফাতেহা-এ দোয়াজ দোহম ও ফাতেমা-ই-এয়াজ দোহম প্রভৃতি।

www.pathagar.com

হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান: দূর্গাপুজা, লক্ষ্মী, স্বরসতী, কালী, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বকর্মা, গঙ্গা, কার্তিক, মনসা প্রভৃতি নামে পূজা হয়।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান: আষাঢ়ী পূর্ণিমা, পিণ্ডদান উৎসব। তাঁরা প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিকে নানা কারণে পবিত্র মনে করে এবং পূজা উৎসব পালন করে।

কক্সবাজার জেলা: বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে কক্সবাজার জেলার অবস্থান। জেলার উত্তরে চট্টগ্রাম ও পূর্বে পার্বত্য বান্দরবান জেলা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আন্তর্জাতিক নদী 'নাফ'। জেলার বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে ছোট বড় পাহাড়-পর্বত। উল্লেখযোগ্য নদী মাতামুহুরী, বাঁকখালী, রেজু ও নাফ নদী।

মলয় ঘোষ দস্তিদার

জেলার নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে জেলার প্রাচীন নাম ছিল 'প্যানোয়া', 'পালংকি', 'পালোয়ানচি' ও 'অংখেচ্ছা'। আবার কারো কারো মতে, বাকলিয়া ছিল প্রাচীন নাম।

চকরিয়া উপজেলার উপকূলীয় রাজাখালী ইউনিয়নের সীমানা থেকে টেকনাফ উপজেলার বদর মোকাম পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৮০ মাইলব্যাপী সমুদ্র উপকূল বিস্তৃত। জেলার সর্ব দক্ষিণে দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন বা জিনজিরা, মূল ভূখণ্ড শাহ পরীর দ্বীপ হতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এছাড়া উপজেলা দ্বীপ কুতুবদিয়া ও মহেশখালী সগৌরবে জেলার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থান করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম: ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে পৃথক একটি জেলায় উন্নত হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে স্থায়ী সীমারেখা টানা হয়। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। এর মোট আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩,১৮৪ বর্গ কিঃ মিঃ। ভৌগোলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও মায়ানমারের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ভারতের মিজোরাম রাজ্য এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের সমতল উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অবস্থিত।

নৃতাত্ত্বিক এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উভয়দিক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিশেষ বৈচিত্র্যের অধিকারী। অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক গঠন ও সংস্কৃতিতে সমভূমি অঞ্চলের লোকদের সাথে যেমন রয়েছে অমিল, তেমনি আবার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টনের দিক থেকেও সমভূমি অঞ্চলের সাথে রয়েছে বৈসাদৃশ্য।

১৯৯১ সালের জরিপ মতে এ অঞ্চলের মোট ৯,৬৭,৪২০ জনের মধ্যে ৪,৯৮,৫১৫ জনই অবাঙালি বা পাহাড়ি। পাহাড়িরা প্রায় ১৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা জাতিসত্তায় বিভক্ত; যাঁদের মধ্যে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা আদিবাসী প্রধান। ধর্মীয় দিক থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। বাঙালিরা প্রধানত মুসলমান। উপজাতির মধ্যে চাকমা, মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরা হিন্দু, লুসাই প্রভৃতি আদিবাসীরা খ্রিস্টান। অন্যান্যরা নানা ধর্মের অনুসারী। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই তিনটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। এর মোট আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩,১৮৪ বর্গ কি.মি.।

www.pathagar.com

ভৌগোলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও মায়ানমারের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে মায়ানমারের আরকান প্রদেশ, উত্তর ও উত্তর পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের সমতল উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত।

নৃতাত্ত্বিক এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উভয়দিক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিশেষ বৈচিত্র্যের অধিকারী। অধিবাসীদের নৃ-তাত্ত্বিক গঠন ও সংস্কৃতিতে সমভূমি অঞ্চলের লোকদের সাথে যেমন রয়েছে অমিল, তেমনি আবার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টনের দিক থেকেও সমভূমি অঞ্চলের সাথে রয়েছে বৈসাদৃশ্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান নিয়ে পার্বত্য এলাকা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামে খ্যাত। এ জেলার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় রাঙ্গামাটিতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর দপ্তর রাঙ্গামাটিকে 'রাঙ্গামাটি জেলা' বহাল রেখে ১৯৮১ সালে 'বান্দরবান জেলা' ও ১৮৮৩ সালে 'খাগড়াছড়ি জেলা' নামে তিনটি জেলা স্থাপিত হয়।

রাঙ্গামাটি: রাঙ্গামাটি ১৮৮৩ সালে মহকুমা থেকে জেলায় উন্নত হয়। এই জেলার উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে বান্দরবান জেলা, পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমারের চীন প্রদেশ, পশ্চিমে খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম জেলা। কর্ণফুলী এর প্রধান নদী। ৬১১.১৩ বর্গ কি. মি. আয়তনবিশিষ্ট রাঙ্গামাটি জেলার জনসংখ্যা ৬৫,২৯৪। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা মৎস্য, কৃষি শ্রমিক, অকৃষি শ্রমিক, শিল্প, ব্যবসা, চাকরি।

বান্দরবান: বান্দরবান ১৯৮৩ সালে জেলায় উন্নীত হয়। এই জেলার উত্তরে রাঙ্গামাটি, দক্ষিণে আরাকান (মায়ানমার), পূর্বে চীন রাজ্য (মায়ানমার) এবং রাঙ্গামাটি জেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা। এটি বন-পাহাড় ও সমভূমি দ্বারা আবৃত। শংখ এর প্রধান নদী ও গিরাঞ্জা প্রধান গিরি। ৪,৪৭৯ বর্গ কি. মি. আয়তনবিশিষ্ট বান্দরবান জেলার জনসংখ্যা ২৯২৯০০। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি, বন।

আবদুল গফুর হালী

খাগড়াছড়ি: 'খাগড়াছড়ি' নামের একটি ছোট্ট নদীর নাম থেকেই খাগড়াছড়ি জেলার উৎপত্তি। জেলার মোট আয়তন ১০৯৩ বর্গমাইল। উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত দুটি পর্বতশ্রেণী দ্বারা এ জেলার ভৌগোলিক কাঠামো গঠিত। নদী-উপত্যকাগুলো ৮ থেকে ১০ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি মতে জেলার জনসংখ্যা ২,০০,৬৭২ জন। তৎমধ্যে ১,৯০,৬৫৯ জন আদিবাসী এবং ৯০,০১৩ জন বাঙালি ও অন্যান্য।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা: প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজ থেকেই লোক সঙ্গীতের উদ্ভব। নিজের বিশেষ ভঙ্গিমাকে ভিত্তি করে উদ্ভব হয়েছে বাণী ও ধ্বনি। লোক সঙ্গীতের দু'টি ধারা: অলিখিত ও লিখিত। সে আদিকাল থেকে মুখ-পরম্পরায় আমাদের সময় পর্যন্ত চলে আসা সঙ্গীতকে বলে অলিখিত লোকসঙ্গীত। যেসব সঙ্গীত লিখিতরূপে সুরারোপভাবে চলে এসেছে সেসব সঙ্গীত হলো লিখিত লোকসঙ্গীত। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে

www.pathagar.com

রমেশ শীল

পারে আস্কর আলি, হামিদালি, খায়েরজ্জমা, আবদুল হাদী, রমেশ শীল, আবদুল গণি প্রমুখ। এই উভয়বিধ সঙ্গীত শুধুমাত্র নিরক্ষর বা স্বশিক্ষিত জনগণের ভিতরেই বসবাস করতো না। শিক্ষিত জনগণের বক্তব্যও এই সংগীতে তুলে ধরা হতো। এতে আঞ্চলিক ভাষা ও আঞ্চলিক মানসিকতার প্রতিফলন হয়। এলাকার সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো।

পুঁথিগান: পুঁথিগান চট্টগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এক আনন্দময় অনুষ্ঠান। পুঁথি পাঠের আসরে সব শ্রেণীর মানুষের সমাগম ঘটত। বিশেষ করে নানা কর্ম উপলক্ষে এ আসর অনুষ্ঠিত হতো। পুঁথি পাঠ প্রাচীন সঙ্গীতগুলোর মধ্যে একটি কাহিনীকেন্দ্রিক দীর্ঘতম লোক সঙ্গীত। মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে আবিষ্কৃত পুঁথিগুলোর মধ্যে শাহ মুহাম্মদ সগীর বিরচিত "ইউসুফ জোলেখা'ই আদি কাব্য।" কাব্যখানি রচিত হয় ১৩ থেকে ১৪ খ্রিস্টাব্দে। এটির রচনা স্থান বৃহত্তর চট্টগ্রামের কোনো এক গাঁয়ে। এ সূত্রমতে, পুঁথি সঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রামে। পরে ক্রমাগত সারা বাংলায় এর চর্চা গড়ে ওঠে।

বন্দনা গীতি: হিন্দুরা গ্রন্থসূচনায় দেবদেবীকে এবং মুসলমানেরা পীর পয়গাম্বরকে বন্দনা করে থাকেন। এরূপ বন্দনা গীতিতে তাঁদের ধর্মভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। তাঁরা নিজেদের শক্তি অপেক্ষা দৈবশক্তির উপর বেশী করে নির্ভর করতেন। আবার কোনো কোনো কবি পূর্বসূরিদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেও ভুল করতেন না। যেমন চট্টগ্রামের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা'য় আল্লাহ রসূলের বন্দনা রয়েছে এভাবে:

"প্রথম প্রণাম করো পরবর্দিগার।
যে আল্লা বকশিন্দা খোদা করিম ছত্তার॥
জীবাত্মায় পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তুমি হৈল অনুপাম॥
তান প্রেম অনুভাবে সৃজিলা জগত।
কহিতে পারিএ কথা তাঞি যে মহৎ॥
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবিকুল।
মোহাম্মদ তান মধ্যে প্রধান আদ্যমূল॥

....
দ্বিতীয় প্রণাম কঁরো মাও বাপ পাএ।
যার দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধায়॥
পিপিড়ার ভয়ে মাও ন থুইলা মাটিতে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, *বন্দনা গীতির উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রাম*। পরে সারা দেশে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পালা গান: একইভাবে পালাগানের কথায় আসি। এ সঙ্গীতের সুর বর্তমান প্রজন্মের কাছে একেবারে অপরিচিত। প্রাচীন পালা সাহিত্যে এটি কিভাবে রূপ গ্রহণ করেছিল তা জানা যাবে চট্টলার পালাগায়ক গৌরাঙ্গ চন্দ্রের ভাষায়–

"সভাজনে প্রণাম করি ঠাইয়াজির মোকাম।
ছোডরে মান্যতা জানাই বড়রে ছালাম॥

www.pathagar.com

তোমরা সবে গুণবন্ত আমি অধমজন।
বুড়াবুড়ির কাছে আমি ছাওয়ালের মতন।"

পালার উৎপত্তি ও আবিষ্কৃত পালা গানগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৩ থেকে ১৮ শতকের মধ্যে এর উদ্ভব ঘটেছে। ময়মনসিংহ জেলার হাওড় অঞ্চলে এ ধরনের গানের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। এতদসত্ত্বেও আমরা দেখছি, চট্টগ্রামে ১৬ শ' শতক থেকে পালাগানের ছড়াছড়ি। নানা তথ্য প্রমাণে বলা যায়, *পালা গানের উৎপত্তিস্থল মূলত চট্টগ্রাম*। এ সঙ্গীত ক্রমে দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

উল্টা বাউলের গান: বাউল গীতসমূহ বৈরাগ্যপূর্ণ এবং বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিকতা মজ্জায় গঠিত। কিন্তু চট্টগ্রামের উল্টা বাউল গানগুলো কর্মসঙ্গীতের প্রকারভেদ মাত্র। ভাদ্র মাসের মধ্যেই আমন ধানের চারা রোপণ শেষ করতে হয়। তাই গ্রামের বড় বড় চাষারা যথাসময়ে রোপণ শেষ করার জন্য বেগার (বিনা বেতনে কাজের লোক) সংগ্রহ করে। ওরা একইদিনে গৃহস্থের ১ দ্রোণ জমিতে ধানের চারা রোপণ শেষ করে। চারা (জালা) রোপণের সময় বেগারদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে তোলার জন্য উল্টা বাউলের দরকার হয়। এই জাতীয় গায়ক ঢোল ইত্যাদি নিয়ে মাঠে যায় এবং সকলে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ধুয়া ধরে গ্রামকে মুখরিত করে তোলে ও সাথে সাথে গায়ক গেয়ে ওঠে:

না মাথাৎ দি জুইর বাইরাম
গাঙে নাইরে পানি।
ভোজা বিলাই বাঘটা ধরি
করের টানাটানি॥

এটির উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রাম। তবে এটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে তেমন প্রভাব ফেলে নি।

হাতি খেদার গান: এই হাতি খেদা নিয়ে চট্টগ্রামে রচিত হয়েছে গীতিকা, পথ কবিতা ও গান। চট্টগ্রাম লোকসঙ্গীত ভুবনে 'হাতি খেদার গান' বিশ শতকের মধ্য সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চলের লোকদের জনপ্রিয় সঙ্গীত হিসেবে গীত হতো।

১৫/১৬শ শতক থেকে বিগত ছয় দশক পর্যন্ত বৃহত্তর চট্টগ্রামের পূর্বাংশের গভীর অরণ্যে খেদা বসায়ে শত শত হাতি ধরা হতো এবং ধৃত হস্তীগুলো দিল্লীশ্বরের পিলখানা প্রভৃতি রাজা-বাদশার দরবারে পৌঁছে যেত। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এই অঞ্চলের হাতিগুলোর প্রশংসা বাণী শুনতে পাই। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের মধ্যসময়ে হাটহাজারীর অধিবাসী হাতিখেদা বিশারদ গোলবদন জমাদারের দুঃসাহসিক বিভিন্ন অভিযানের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁকে নিয়ে গাইনে গায়:

ওরে গোলবদন জমাদার মস্ত পালোয়ান
সক্কলর ছরদার মিঞা আকল ভালা তান,
হাতী খেদা গানগুলোর একটি–
ধুয়া... নছিব হায়রে হায়
আহন মাসে খোয়া ঝরের, ধানে নৈল পাক
করল ডেঁয়ার মুড়ার মাঝে, শুইনলুম হাতির ডাক
পাহাড়ীর মুখ শুকাইল, খেত গেল ভাবনা বিস্তর।
জুম্মা উডিল মোচার উয়র, বাঙ্গাল নৈল ঘর....
কাইচনীর মা বুড়ী বলে আঁয়ার ছইয়র ডুয়া কই।

এটিও চট্টগ্রাম থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রভাব ফেলেছে।

জারি গান: স্মৃতিমূলক করুণ শোকগাঁথা বিষয়ক কাহিনীর উৎস থেকে জারি গান রচিত হয়। বিশেষ করে হাসান হোসেনের স্মৃতি কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে পুঁথি কাব্য 'মক্তুল হোসেন'। এর রচনা সাল ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে রচয়িতা চট্টগ্রামের মর্সিয়া কবি মোহাম্মদ খাঁ। *এ সূত্রে বলা যায়, জারী গানের উৎপত্তি চট্টগ্রামে*।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক হাসন হোসেনের জারিগান বৎসরের যেকোনো সময়ে গাওয়া হয়। একসময় মহররম মাসের প্রথম দশ দিন পাড়ায় পাড়ায় জারি-পুঁথি চট্টগ্রামের মুসলমানি সমাজে আগ্রহ সহকারে পঠিত হতো। এ গানের প্রভাব ক্রমে ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ভাটিয়ালী গানকে উত্তর চট্টগ্রামে হালদা ফাটা গান নামে অভিহিত করা হয়। হালদা উত্তর চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ নদী। হালদা নদীতে মাঝিরা নৌকা ও সাম্পান নিয়ে যাবার সময় গলা ছেড়ে যে ভাটিয়ালি সুরের গান গায় তাকে হালদা ফাটা গান বলা হয়। কালক্রমে এ সুর রাখালের, কৃষকের, গাড়োয়ানের উদাত্ত কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায়। এখানে হালদা ফাটা শুধু একটি বিশেষ ধরনের লোকসঙ্গীত নয়, এটি একটি বিশেষ অঞ্চলের পরিচয়ও বহন করে। এ সঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল হালদা নদী। *হালদা ফাটার সুর প্রাচীনও বটে। এটি ভাটিয়ালী গান হিসেবে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আছে।*

শেফালী ঘোষ

হাইল্যা সাইর (হালিয়া সারী): সেকালে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ধান রোপণ উপলক্ষে সারি গান গাওয়া হতো। চট্টগ্রামে একে হাইল্যা সাইর বলা হতো। চাষে পিছিয়ে পড়া সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থরা তারিখ নির্দিষ্ট করে ৪/৫ কানি জমিতে এক সাথে ধান রোপণের ব্যবস্থা করত এবং পাড়া-পড়শি লোকজনকে বেগার (বিনা পারিশ্রমিকে) দেবার জন্য বলে দিত। ঐদিন সে পরিবার বেগারদের জন্য নাস্তা ও ভাল খাওয়ার বন্দোবস্ত করত। সকালে ৩০/৪০ জন পাড়া-পড়শি বেগার এসে ধান রোপণ করত। সে সময় সারিগান গাইবার জন্য গায়ক আনা হতো। গায়ক সারিগান গাইতো, সাথে ধুয়া ধরতো দোহার। আর মধ্যে মধ্যে সবাই মিলে 'বদর' দিত। বেগাররা গান শুনে শুনে রোয়া রোপণ করত। নিম্নে একটি সারিগান উদ্ধৃত করা হলো:

ওরে ঘুমরে লাড়ুম ঘুম
সোনা দি মোড়াইয়ে লাড়ুম,
রূপা ঝুম ঝুম।
ওরে সোনাদি মোড়াইয়ে লাড়ুম
গলায় চিক দড়ি।
উত্তর মিথ্যা যাইয়ারে লাড়ুম
লইল গড়াগড়ি।

সে প্রাচীনকাল থেকে এ সঙ্গীত কৃষকের মুখে শোভা পেতো। এ সঙ্গীতটির উৎপত্তিও চট্টগ্রামে। দেশের অন্যান্য জেলায়ও এর প্রচলন আছে।

পাইন্যা সাইর: সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-থানা, বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অবস্থিত। এই কৃষিপ্রধান এলাকাটিতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আমন ধান রোপণের মওসুম। বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সেখানকার সঙ্গতিপন্ন চাষী পরিবার বৃষ্টি বাদলহীন দিন দেখে ধান রোপণ উপলক্ষে 'পাইন্যা সাইর' গানের বন্দোবস্ত করত। তখন পার্শ্ববর্তী চাষী পরিবারে তা সংক্রমিত হত। শেষ পর্যন্ত পাঁচ সাত গ্রামের চাষী পরিবারগুলোর মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়তো এবং দু'দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় রূপ নিত। তখন রোয়া জমি থেকে পাইন্যা

www.pathagar.com

শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব

সাইরের আসন কোনো হাট-বাজারে স্থানান্তরিত হতো দু'চার দিনের জন্য। ঐ এলাকায় বিত্তশালী পরিবারগুলো তখন সেখানে লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করত। গ্রামবাসীরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেখানে এসে খাওয়া-দাওয়া করত আর 'পাইন্যা সাইর' শুনে আনন্দ উপভোগ করত। সন্দ্বীপে এ গানের উৎপত্তি হলেও দক্ষিণ চট্টগ্রামেও এর প্রভাব দেখা যেত। এ বিষয় ও উৎস থেকে সৃষ্ট সঙ্গীতের কয়েক চরণ:

আমানুল্লাহ গ্রাম আমার হুমুর প্রতিবেশী,
ঘরে যার বান্ধা আছে একশ' ছাগল খাসী।
জমি জমা কত আছে লেখা-জোখা নাই,
হাজার টাকা দিব মিঞা
পাইন্যা সাইরের লাই।

কীর্তন: বর্তমানের ন্যায় অতীতে চট্টগ্রামে কীর্তন গান খুব জনপ্রিয় ছিল। এটি চট্টগ্রামে গত শতকের ষাট-সত্তর দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ পালাকীর্তন চট্টগ্রামে মধ্য যুগ থেকে চলে আসছে। বর্তমানেও অনেক কীর্তায়ান দল বৃহত্তর চট্টগ্রামে রয়েছে এবং সারা দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই গীত গাওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক গীত: বাংলাদেশের লোকগীতির একটি উল্লেখযোগ্য শাখা আনুষ্ঠানিক লোকগীতি। আনুষ্ঠানিক লোকগীতিকে আবার ব্যবহারিক লোকগীতিও বলা হয়। সামাজিক ও পারিবারিক কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক গীতি একাধিক কণ্ঠে স্বরে গীত হয়, তাই এ জাতীয় সঙ্গীতকে আনুষ্ঠানিক গীত বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বনে অনেক প্রকারের আনুষ্ঠানিক গীতি প্রচলিত। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম আনুষ্ঠানিক গীতিকে প্রধান পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন: (১) বৃষ্টির প্রার্থনায় আনুষ্ঠানিক গীতি (২) নবজাতক সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক গীতি (৪) বিয়ের গান (৫) মানত সম্পর্কিত গীত।

এ গান সে আদিকাল থেকে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সারা বাংলায় কম বেশি এর প্রচলিত আছে।

বৃষ্টির গান: বাংলাদেশের কৃষি অনেকটাই প্রকৃতিনির্ভর। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক বছরই মাঠ ক্ষেত-খামার ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আবার অনেক সময় অতিবৃষ্টিতে মাঠ পানিতে থৈ থৈ করে। এইসব উপলক্ষ করে বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজে বৃষ্টির গানের উৎপত্তি। চাষীরা আকাশের পানে চেয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে, "আল্লা মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে তুই।" এভাবে আকুতি মিনতি করে স্রষ্টার কাছে। বৃষ্টির গান:

"বেল তলে গলা পানি
কচু তলে হাঁডু পানি
কুলার আগাত বেতর বান
ঝর ঝরাইয়া পানি আন"

এটিও চট্টগ্রামের নিজস্ব লোক সঙ্গীত। যদিও বাংলার সর্বত্র এটির প্রভাব রয়েছে।

ঢাকিবাদ্য ও নাচ: চট্টগ্রামের ডোম বা জেলে সম্প্রদায়ের পেশা ছিল দু'টি। প্রথম মাছধরা। দ্বিতীয়ত বাদ্যবাদন ও নাচগান। ঢোল বাদক জেলেরা চৈত্রমাসের শেষ পনের দিন থেকে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত ঢাকি

www.pathagar.com

নামে খ্যাত হতো এবং এই সময়ে ঢোল বাদককে 'ঢাকিবাদ্য' বলা হয়। এই দু'সপ্তাহে ঢাকিরা গ্রাম-চট্টলার হিন্দু মুসলমান পাড়ায় পাড়ায় 'ঢাকি বাদ্য' বাদন ও নাচ দেখিয়ে ধান, চাউল, পয়সা বখশিস আদায় করত। এটিও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় চট্টগ্রামে সে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

বারমাসি গান: বারমাসি গানে বছরের বার মাসের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকাঙ্ক্ষা নিরাশার কথা বর্ণনা করা হয়। বারমাসি অপেক্ষাকৃত লম্বা গান। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে এই গানের বর্ণনা শুরু হয়। এ গান পরিবেশনের কোন বাঁধা ধরা নিয়মনীতি নেই। বছরের সব ঋতুতেই এই গান পরিবেশিত হয়। এ গানের বর্ণনাকার অধিকাংশ সময়ই নারী। সে বার মাসের প্রাকৃতিক বর্ণনাসহ তার দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলে। এই শ্রেণীর গান মধ্য যুগের পুঁথি সাহিত্যে রয়েছে। সুতরাং এটির প্রাচীনত্ব সতত স্বীকার্য। *উৎপত্তিও চট্টগ্রাম অঞ্চল* বলা যায়। তবে এটির প্রভাব বাংলার সব অঞ্চলে রয়েছে।

মেয়েলি গীত: বাংলাদেশের লোকগীতির একটি উল্লেখযোগ্য ধারা মেয়েলিগীত। লোকগীতির অন্যান্য ধারার মতো মেয়েলি গীতের সৃষ্টি, ব্যক্তি প্রচার ও প্রসার জনগণের মুখে মুখে। নারী জীবনের আশা আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি, মেয়েলি গীতের বিষয়। মেয়েলিগীত কেবল মেয়েরাই পরিবেশন করে থাকে।

এ বিষয়ক সঙ্গীত চট্টগ্রামেও উৎপত্তি হয়েছে। যেহেতু এসব গীত অঞ্চলভিত্তিক আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্টি হয়। মেয়েলি গীতের একটি শাখার নাম 'হঁঅলা'। এ শ্রেণীর গান বিয়ের গান নামেও খ্যাতি হয়।

বেদের গান: বেদের গানকে ভাসান গানও বলা হয়। সাধারণত বেদে বেদেনীরা নৌকা করে গ্রামে গ্রামে চুড়ি, আয়না, চিরুনি বিক্রি উপলক্ষে এ গান পরিবেশন করে থাকে। ময়মনসিংহ, সিলেট ও নোয়াখালী অঞ্চলে এ গান 'ভাসান গান' নামে পরিচিত।

উল্লিখিত অঞ্চলে যদিও বেদের গানের উৎপত্তি, সে অনেক কাল ধরে চট্টগ্রামের গ্রাম অঞ্চলে তার প্রভাব চলে আসছে।

ঝাঁড়ফুকের গান: এ গানের মন্ত্রগুলো চট্টগ্রামী ভাষায় রচিত হলেও মূলত এর উৎপত্তিস্থল আসাম ও শ্যাম দেশ। চট্টগ্রামের মানুষ ঐ রাজ্যের গুণীদের কাছ থেকে নানা মন্ত্র শিখে নিজে বড় গুণী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহারিক মন্ত্র রচনা করে গুরুরা শিষ্যদের বিলায়ে দেন। শিষ্যরা নানা অঞ্চলে গিয়ে জ্বীনে পাওয়া লোকদের চিকিৎসা করতেন। এখন কোথাও কোথাও ব্যবহার হচ্ছে শুনা যায়। যেমন ক'টি গানের চরণ:

মানস পাল চৌধুরী

জ্বীন হাজির গানের আসর:
"কালে কালে কলি চরে
কালো কালি কলিকা
শীঘ্র আয় চলিয়া
শীঘ্র আয় চলিয়া
দোহাই আল্লার"।
হাট বসনি বা সাচা বসা
"আইরে মা মঘিনী মইঘ্যা রাজার ঝি

www.pathagar.com

সোনার নাধং কানত দি
তোয়ার জয়গান গাইতে মাগো
আঁয় জলস যায়।
... ...
কন নজর আছে এই রুগীর উপর
ছোড় কাগজে হবে এই আসনের পর"

লোকসঙ্গীতে বদর পীর: বদর পীর সাধারণত সমুদ্রের অধিপতি হিসেবে খ্যাত। বাংলার সব জাতির মাঝি-মাল্লারা নদী বা সাগর পথে বাণিজ্যে যাত্রাকালে পাঁচ পীর বদর বদর নাম উচ্চারণ করে। তাদের বিশ্বাস এ সময় ঝড়-তুফান থেকে রক্ষা পেতে বদর শাহের সাহায্য পাওয়া যায়। তাই তারা বিপদকালে গেয়ে থাকেন:

"আমরা আছি পোলাপাইন,
গাজী আছে নেগাবান
আল্লাহ নবী পাঁচ পীর"
'আগাপাছা ঠিক রাখিয়া
মাঝি সাবধানে চল
মাঝ দরিয়ায় উঠল তুফান
বদর বদর বল'

চট্টগ্রাম শহর সহ সারা বাংলার নদী, সাগরে মাঝি মাল্লারা যাত্রাকালে বা বিপদের সময় এ শ্রেণীর গান গেয়ে বদর পীরের দোয়া প্রার্থনা করেন।

মারেফতি গান: চট্টগ্রামের মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে অজস্র মারেফতি গান রচনা করেছিলেন। সেকালে এই প্রকার গানগুলো চট্টগ্রামে গীত হত। 'মুসলিম কবির পদ সাহিত্য' গ্রন্থে ড. আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে এরূপ বহু গান। এই ধারার মারেফতি গানের উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হলেন আনোয়ারা থানার ওশখাইন গ্রাম নিবাসী সাধক কবি আলী রজা ওরফে কানু ফকির। তিনি কয়েক শত মারেফতি গান রচনা করেন বলে জানা যায়। ওশখাইনের দরগাহে ওরস উপলক্ষে কানু ফকিরের গান সারা রাত ধরে ভক্ত জনেরা গেয়ে থাকেন। সাধক কবি আলী রজা ওরফে কানু ফকির আঠার ঊনিশ শতকের লোক ছিলেন।

এম এস আখতার

ফুলপাট গান: প্রাচীন চট্টগ্রামের ঢোল বা জেলেরা ছিল জাত শিল্পী। ফুলপাট গান তাদের নিজস্ব সৃষ্টি। নাচ আর গান ফুলপাট গ্রামের প্রধান আকর্ষণ। ফুলপাট ও গাজীর গানের নাটুয়া পোলা'র যোগান দিত জেলে সম্প্রদায়।

কবি গান: সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবি গান প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত নদীয়া জেলার শান্তিপুরে কবি গানের উৎপত্তি ও বিকাশ বলে মত প্রকাশ করেন। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার বিভিন্ন অংশে। উনিশ শতকের

www.pathagar.com

গোড়ার দিকে ক্রমে কুমিল্লা নোয়াখালী হয়ে চট্টগ্রামে তার চর্চা শুরু হয়। এ সময়ে গঙ্গাচরণ জলদাস, প্রাণ কৃষ্ণ জলদাস, নবীন ঠাকুর, আজগর আলীর সাক্ষাৎ মিলে। বিশ শতকে এসে কবিয়াল করিম বক্স, কবিয়াল সম্রাট রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, মনি সাধু, এয়াকুব আলী প্রমুখ কবিয়াল কবিগানে বিশেষ অবদান রাখেন।

ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এই গানের স্রষ্টা। গানের স্রষ্টাকে কবিয়াল বলে সম্বোধন করা হয়। এটি এমন এক ধরনের গান যার মধ্যে সৃজনশীলতা, কবি প্রতিভা এবং সঙ্গীত সাধনার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। কবি গান দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আসরে প্রশ্ন উত্তর ও জয়-পরাজয়ের ব্যবস্থা থাকে। প্রতি দলের কবিয়ালের দোহার থাকে। তারা ধুয়া অংশটুকু গেয়ে থাকেন। বর্তমানে চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই গান মাঝে মধ্যে শোনা যায়।

মোহাম্মদ নাসির

যাত্রা গানঃ অভিনয় রীতিনীতির ও আঙ্গিক উপকরণের ভিত্তিতে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: যাত্রা এবং নাটক। যাত্রা আমাদের দেশের প্রাচীন সম্পদ। বহুকাল ধরে এর প্রচলন চলে আসছে। বাংলার গ্রামগঞ্জে এর আনন্দ রস যুগ যুগ হতে আছড়ে পড়ছে। বিংশ শতাব্দীতেও এর প্রচলন ফুরিয়ে যায় নি। প্রাচীন চট্টগ্রামে যাত্রা গান খুব জনপ্রিয় ছিল। পালা কীর্তনের অভিনয়ে এটার উপস্থিতি। এই যাত্রা গান উনিশ শতকে কলকাতায় সূচনা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিশ শতকের গোড়ার দিকে পটিয়ার সুচক্রদণ্ডীর রামাচরণ ভট্টাচার্যের দল এক সময়ে চট্টগ্রামে ও আরকানে জনপ্রিয় ছিল। চট্টগ্রামে গত শতকের গোড়ার দিকে যাত্রা দল শুরু হয়ে সত্তর দশকে বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়। বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়ার যাত্রা গানের দলটি ছিল চট্টগ্রামের বৃহত্তম দল।

বাউল গানঃ বাংলাদেশের লোকগীতির একটি প্রধান ধারার নাম বাউল গান। সংসার ত্যাগী বা সংসার বৈরাগী এক সাধক সম্প্রদায়কে বলা হয় বাউল সাধক। বাউলরা এক প্রকার অধ্যাত্মবাদী ও উদার মানবতাবাদী ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবেও পরিচিত। বাউল সাধকদের দ্বারা রচিত গানকেই বলা হয় বাউল গান। কুষ্টিয়ার বাউল সম্রাট লালন শাহ থেকে বাউল গান সৃষ্টি হলেও পরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এর প্রভাব চট্টগ্রামেও পড়েছে। তবে চট্টগ্রামের বাউলরা সংসারী। এ ধারায় পণ্ডিত আসকর আলীকে চট্টগ্রামের বিখ্যাত বাউল বলা হয়। সাধারণত বাউলরা রূপকার্থে গানের মধ্যে দিয়ে তাদের তত্ত্ব প্রকাশ করে। যেমন বাউল আসকর আলী গায়:

> "ডালেতে লড়ি-চড়ি বইও চাতকী ময়নারে
> গাইলে বৈরাগীর গীত গাইও।-- এমন উপমা।"

বিয়ের গানঃ বিয়ের গান ব্যবহারিক বা আনুষ্ঠানিক গীতি পর্যায়ের গান। বিয়ের আচার বিস্তৃত ও জটিল। বিয়ে সামাজিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

বিয়ের পূর্বঃ পান-চিনি, গায়ে হলুদ, মেহেদি তোলা, পান খিলি, বর স্নান, বরণ ডালা ইত্যাদির সময় গান পরিবেশন করা হয়। তবে একথা সত্যি যে, দেশের এক এক অঞ্চলে এক এক সাজে তা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

মূলকুতের রহমান

মুর্শিদি-মারেফতি: মুর্শিদ অর্থ পথ-প্রদর্শক। যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যস্থতাকারী। এই মুর্শিদ বা গুরুর প্রতি ভক্তি বিষয়ক সঙ্গীত মুর্শিদি গান। মুর্শিদি গানের উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রাম। মধ্য যুগ থেকে হাজার হাজার গান রচনা হয়েছে এ চট্টল ভূমি থেকে। দেশের অন্যান্য জেলায়ও এর চর্চা রয়েছে।

মাইজভান্ডারী গান: মাইজভান্ডারী গানের উৎপত্তি উনিশ শতকের শেষদিকে। ফটিকছড়ি থানার মাইজভান্ডার নিবাসী হযরত গৌসুল আজম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ সাহেব প্রবর্তিত মাইজভান্ডারি তরিকা বা মতবাদের সাধক সঙ্গীত হিসেবে মাইজভান্ডারী গানের উদ্ভব। এই মতবাদের অনুসারীরা দলবদ্ধভাবে ঢোলকের তালে তালে বিশেষভাবে রচিত যে ভক্তিমূলক গান গেয়ে নৃত্য বা হালকা জিকির করে থাকে, তা হল মাইজভান্ডারী গান। মাইজভান্ডারী গানের সৃষ্টি পীর মুর্শিদকে কেন্দ্র করে। মাইজভান্ডারী গানের বাণী ও সুর শ্রোতার মনে অধ্যাত্ম চেতনা সৃষ্টি করে। সে জন্য এ গানের আবেদন এ দেশের মানুষের হৃদয়ের গভীরে গ্রথিত। এ গান আজ সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। মাইজভান্ডারি গানের জনপ্রিয় রচয়িতা হলেন মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মাওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী, বজলুল করিম মন্দাকিনী, কবিয়াল রমেশ শীল প্রমুখ। গায়কদের মধ্যে আছেন গুরুদাস ঠাকুর। মলকুতুর রহমান, টুনু কাওয়াল, শেফালী ঘোষ, আহমদ নূর প্রমুখ। কয়েকটি জনপ্রিয় মাইজভান্ডারী গান:

চলরে মন ত্বরাই যাই, বিলম্বের আর সময় নাই
গাউছুল আযম মাইজভান্ডারী স্কুল খুইল্যাছে।

(কবিয়াল রমেশ শীল)

'গাউছ ধনের চরণ ধুলা, যে করেছে শিরধার,
কোটিপতি শত্রুদলে, কি করিতে পারে তার॥
ত্রিজগতে নাহি ভয়, যথা ততা পরে জয়,
যার হৃদে প্রবেশিছে, প্রেম শাহা মাইজভান্ডার॥"

(মাওলানা আবদুল হাদী)

'মাইজভান্ডারি সাংস্কৃতিক পরিষদ' সূত্রে স্বনামধন্য মাইজভান্ডারি গবেষক ড. সেলিম জাহাঙ্গীরের সংগ্রহে ৮৪ জন গীতিকারের আট সহস্রাধিক গানের সন্ধান মেলে।

'মাইজভান্ডারি মরমীগোষ্ঠী' এ পর্যন্ত ৫২ জন গীতিকারদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার লোকগান বা মাইজভান্ডারি গান সংগ্রহ করে উক্ত গোষ্ঠীর সংগ্রহ শালায় সংরক্ষণ করেছে। এছাড়া ইতিমধ্যে ৭০ জন শিল্পীর ঠিকানাও সংগ্রহ করে রেখেছে। মাইজভান্ডারি গান কেবল আনন্দের জন্য নয়, আত্মার উন্নতি ও নৈতিক চরিত্র পরিশুদ্ধি অর্জনে এ মরমীগান সাধারণ মানুষের জন্য একটি হাতিয়ারও। এ গান শুধু উপভোগ্য নয়, উপলব্ধির বিষয়ও। এ গানের সূচনা হয় মাইজভান্ডারি সঙ্গীতের পুরোধা মাওলানা ছৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মাওলানা ছৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী ও মাওলানা ছৈয়দ আবদুস ছালাম ভূজপুরীর মতো তিন উজ্জ্বল নক্ষত্রের হাতে। ড. সেলিম জাহাঙ্গীর সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামের সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী হলেন এ গানের আদি রচয়িতা।

www.pathagar.com

ইসলামী সঙ্গীতঃ প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামে কাওয়ালি, গজল, হামদ-নাত ইত্যাদি ইসলাম ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভক্তিগীতির চর্চা হয়ে আসছে। এ ভক্তিমূলক গীত গেয়ে যাঁরা সাধারণ মানুষের চিত্তে আজো স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে আবু কাওয়াল, উকিল কাওয়াল, রশীদ কাওয়াল প্রধান। বর্তমানে সেলিম নেজামী, আবদুল মন্নান, আহমদ নূর প্রমুখও কাওয়ালি পরিবেশন করে থাকেন।

নৌকা বাইচঃ সাম্পানের মাঝিরা সময় সময় গানের তালে তালে হালিশে টান মারে। এ গান কেউ কেউ সাময়িক আনন্দ উপভোগের জন্য গাইত। আবার কেউ কেউ গাইত দেহ-মনে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনে। দেখা গেছে, হালিশ টানতে টানতে তার শরীর বেয়ে মাথার ঘাম পায়ে এসে পড়ছে, তবুও সে গন্তব্য ঘাটে পৌঁছার লক্ষ্যে গানে বিভোর হয়ে থাকে। মনে হয় এ যেন দুর্বল শরীরে অধিক শক্তির যোগান। গত দু'তিন দশকে এ গান তেমন আর দেখা যায় না। কারণ প্রায় সাম্পান এখন যন্ত্রচালিত হয়েছে। এই ছোট নৌযানটি বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা ছাড়া বাংলার অন্য কোনো জেলায় তেমন একটা দেখা যায় না।চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে সাম্পান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামেও ব্যবহৃত হয়েছে। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বছরে একবার। কার্তিক ও অগ্রহায়ণের কোনো এক সপ্তাহে নদীর প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে এ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। প্রতিযোগিতায় মাত্র ক'খানি নৌকা অংশ নেয়। বিশেষ স্থান থেকে নৌকা ছাড়া হয় এবং বিশেষ স্থানে পৌঁছে গিয়ে উভয় স্থানের গ্রাম্য গায়ক দল বাদ্যযন্ত্র নিয়ে উপস্থিত থাকেন। সময়মত দলের নারী পুরুষ দ্বৈত কণ্ঠে গান পরিবেশন করে। এ সময় শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধাসহ গৃহবধুরা পর্যন্ত নদীর দু'ধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নৌকা বাইচের আনন্দ উপভোগ করে। এ উপলক্ষে হালদার মৎস্য প্রজনন উৎসব ও প্রচারণা একই সঙ্গে প্রদর্শন হয়। উল্লেখ্য, রামুর বাঁকখলীতেও নৌকা বাইচ প্রদর্শন হয়।

কক্সবাজারের নতুন সংস্কৃতিঃ দেশবিভাগের পর কক্সবাজারের সংস্কৃতি অঙ্গন ধীরে ধীরে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে। এসময় নানা স্থানে গান রচনা কিংবা চর্চার পাশাপাশি নাটক মঞ্চায়নের হিড়িক পড়ে যায়। এই উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে মহারাজ নন্দকুমার, মনি কাঞ্চন, আওরঙ্গজেব, কংকাবতীর ঘাট, মেঘে ঢাকা তারা, টিপু সুলতান, নবাব সিরাজ-দৌলা, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এ অঞ্চলে ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা হয় সঙ্গীত সমিতি। ১৯৬১ সালে সঙ্গীতায়ন প্রতিষ্ঠা হয়। এ সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন শ্রী মনমোহন সেন ও সম্পাদক ছিলেন জনাব নূরুল হুদা চৌধুরী। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এ জেলায় নাটক মঞ্চস্থ হয় প্রায় শতাধিক। এ জেলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে আছে হাতি খেদার গান, হাইল্যাছাড়ি, ভাইট্যাল গীত, বিয়ের গান, কান ফুড়ানি গান, পালা গান, হঁঅলা (যা সপ্তাহব্যাপী নৃত্যের তালে তালে গীত হতো)। হঁঅলা গানের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মালকা বানুর হঁঅলা এখনো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এ হঁঅলা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশন করা হয়।

এ জেলার ক'জন শিল্পীদের মধ্যে শ্রী মিহির লালা, নাছিমা বানু মঞ্জু, রায়হান, ধর্মদর্শী বড়ুয়া, মীনা বড়ুয়া, মকবুল আহমদ, আহমদ কবির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুতুবদিয়ার তোরাবুদ্দীন গাইনের কথা স্মরণ করা যায় এভাবেঃ

গীত গাই মাসী গাই পদর পাইলাম সাইন
সকল গানের ওস্তাদ মানব তোরাবুদ্দীন গাইন।

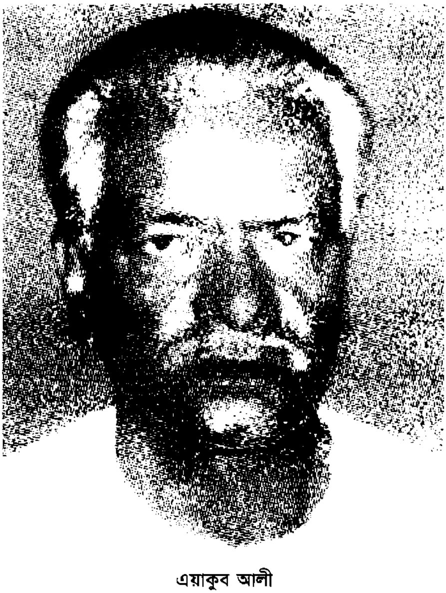

এয়াকুব আলী

www.pathagar.com

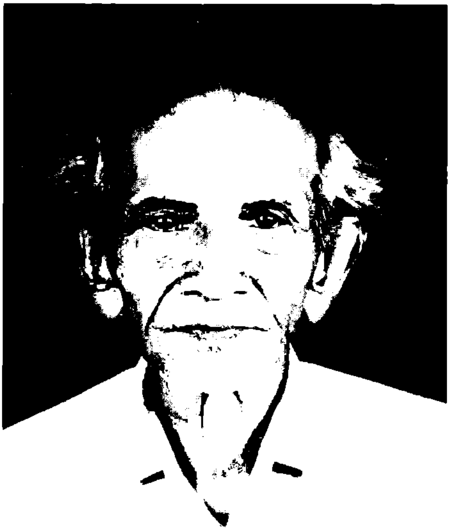

সুবল চন্দ্র মিত্র

লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা

গীতিকার হিসেবে যাঁদের নাম পরিচয় জেনেছি সেই সবের সময়কাল থেকে বিশ শতক পর্যন্ত। নিম্নে এঁদের নামের তালিকা তুলে ধরা হলোঃ মীর ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ মর্তুজা, সৈয়দ সুলতান, শেখ আলাউল, যোগীবল্লভ, দ্বীজ রঘুনাথ, শংকর, আলী রজা, এশাদুল্লাহ, শর্ফুতুল্লাহ, বকসা আলী, আসকর আলী, বালক ফকির, মোহাম্মদ হালিম, এবাদুল্লাহ, খায়ের জামাল, ইব্রাহিম, বাছা মিঞা, আবদুল মজিদ, হরিদাস রুদ্র, কাবির আহমদ ফকির, আবদুর রশিদ, নজু মিয়া, মোঃ হাসান আলী, প্রতাপ চন্দ্র, নাদির আলী, জমিয়ত আলী, সুলতান আহমদ, সেকান্দার আলী, হাবিব, নুর উদ্দিন, আমীন শরীফ, আবদুল হাকিম, মকবুল আলী পন্ডিত, মোশাররফ, জলিল শিকদার, জাহাঙ্গীর, সলিম, আইনুদ্দিন, তোরাবুদ্দিন, গৌরাঙ্গ চন্দ্র, আবদুল গফুর হালী, ননী গোপাল, রমেশ শীল, মলই গোষ দস্তিদার, আবু নঈম, ইয়াকুব আলী, এম. এন. আকতার, ফণী বড়ুয়া, মোহন লাল, লক্ষীপদ আচার্য্য, মোহাম্মদ নুরুল আলম, শাহাদাত আলী, নাসির মোহাম্মদ, আতর আলী পন্ডিত, আস্কর আলী পন্ডিত, আবু কাওয়াল, উকিল কাওয়াল, রশীদ কাওয়াল, মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মাওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী, মাওলানা বজুলুল করিম মন্দাকিনী, মাওলানা আবদুচ সালাম ইছাপুরী, মাওলানা আমিনুল হক হারভাঙ্গেরী, মাওলানা আমিরুজ্জামান, ডা. শফী সুমন, সৈয়দ মহিউদ্দিন 'মহি-আল ভান্ডারী', সিরাজুল ইসলাম আজাদ, কালা মিঞা গাইন প্রমুখ বাংলার লোকমনে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকের গানের সংকলন ও গানের বই প্রকাশ হয়েছে। অনেকের গানের পান্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত।

লোকশিল্পীদের তালিকা

লোক সঙ্গীত স্রষ্টারা শুধু গীতিকার নন, তাঁদের অনেকে সুরকার ও কণ্ঠ শিল্পীও। যে গীতিকাররা গীত বা গান গেয়ে আজও সঙ্গীতমনা জনমনে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের নামের একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো:

আবদুল ওয়াহেদ	হাশিমপুর	চন্দনাইশ
নাছির আহমদ	খাগড়িয়া	চন্দনাইশ
আবদুল ওদুদ	হালিমপুর	ডবলমুরিং
মোহাম্মদ নাছির	সরাইপাড়া	ডবলমুরিং
আবু জাফর	গোমদন্ডী	বোয়ালখালী
সৈয়দর রহমান	হোরার বাগ	বোয়ালখালী
নুরুল হুদা	গহিরা	হাটহাজারী
সিদ্দিক আহমদ	মির্জাপুর	হাটহাজারী
কাদির বক্স পন্ডিত	সোলতানপুর	রাউজান
মুজিবুর রহমান মিঞা	নোয়াপাড়া	রাউজান

www.pathagar.com

গীতিকার বাছা মিঞা	শোভনদন্ডী	পটিয়া
সুলতান আহমদ	ধর্মপুর	সাতকানিয়া
সৈয়দ আহমদ	দরগাহ মুড়া	সাতকানিয়া
শফিকুর রহমান	সাধনপুর	বাঁশখালী
আকতার আহমদ	বাঁশখালী	বাঁশখালী
বশিরুল্লাহ	সদরঘাট (চট্টগ্রাম শহর)	কোতোয়ালী
অচিন্তকুমার চক্রবর্তী	সদরঘাট	---
আমিনুল হক	পরৈকোড়া	আনোয়ারা
আবদুর রশিদ	মাহাতা	আনোয়ারা
মোজাহেরুল্লাহ	জোরারগঞ্জ	মীরশরাই
গৌরাঙ্গ চন্দ্র	মীরশরাই	---
দেলওয়ার হোসেন	দরবেশকাটি	চিরিঙ্গা
বদিউল আলম	চিরিঙ্গা	---
আবদুল মজিদ ফকির	চন্দ্রঘোনা	রাঙ্গুনিয়া
আবদুল কাইউম	পোমড়া	রাঙ্গুনিয়া
নীরদ মুনি চাকমা	তংকাবতী	বান্দরবান
অর্পণা চরণ চাকমা	সোয়ালক	বান্দরবান
নির্মল বিহারী চাকমা	দীঘিনালা	খাগড়াছড়ি
অক্ষয় মুনি চাকমা	দীঘিনালা	খাগড়াছড়ি
রফিক উদ্দিন	শিয়ালবুক্যা	রাঙ্গামাটি।

উল্লিখিত শিল্পীদের সকলেই বিশ শতকের গোড়ার দিকে জন্ম। আরো যাঁদের নাম আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তাঁদের অনেকেই প্রয়াত এবং এখনও যাঁরা জীবিত থেকে সঙ্গীতচর্চা করে চলছে সেসব শিল্পীর মধ্যে পটিয়ার সফরমূলক বদিউর রহমান, মোহাম্মদ ইউনুচ, কাদির বক্স, আবদুস সোবহান, আবদুল মজিদ, আশরাফ জামান, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, বাদশা ফকির প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। হাটহাজারীর মলই ঘোষ দস্তিদার, জেবল হোসেন পণ্ডিত, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, বোয়ালখালীর শেফালী ঘোষ, বাঁশখালীর মোহাম্মদ হারুন, রাউজানের আকতার আজাদ প্রমুখ আরো অনেকের নাম স্মরণীয়।

লোকসঙ্গীত দলের তালিকা

বৃহত্তর চট্টলার নানা অঞ্চলে লোক সঙ্গীতের যেমন সৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীত গেয়ে শোনাবার জন্য দলেরও সৃষ্টি হয়। দলগতভাবে তারা নানান স্থানে নানা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের গান পরিবেশন করে লোক মনে চিত্তবিনোদনের ও রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে অবদান রেখে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে অনেকগুলো সঙ্গীত দল বা গোষ্ঠীর নাম জানা গেছে। এসবের মধ্যে কতকগুলোর নাম মাত্র স্মৃতিময় হয়ে আছে। কতকগুলো এখনো পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বিলুপ্ত দলগুলো হলো: রঙ মহল, চট্টগ্রাম শহর, তামাসাখানা, দেয়াঙ্গ, জলসাগর, চট্টগ্রাম শহরের ফিরিঙ্গি বাজার, মুজরার আসর, জমিদার বাড়ি পরৈকোড়া আনোয়ারা, নাচঘর ভাঙ ঘুট চট্টগ্রাম শহর, বুলবুল চৌধুরী ও তাঁর দল, চট্টগ্রাম শহর, আশুতোষ চৌধুরী ও তাঁর দল বোয়ালখালী, মোহাম্মদ নাসির ও তাঁর দল ডবলমুরিং, আশকর আলী ও তাঁর দল পটিয়া, হামিদুল্লাহ খাঁর সাহিত্য আসর কাতালগঞ্জ ইত্যাদি। এগুলো ১৯-২০ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চালু ছিল। বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের নানান অঞ্চলের আরও অনেক সঙ্গীত দলের আবির্ভাব ঘটে। যেমন: আর্য সঙ্গীত চট্টগ্রাম শহর, সুচরিত চৌধুরী পরিচালিত সঙ্গীত আসর চট্টগ্রাম শহর, আমীর ভান্ডার মরমী শিল্পীগোষ্ঠী পটিয়া, রমেশ শীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বোয়ালখালী,

www.pathagar.com

গৌরাঙ্গ চন্দ্র জলদাস

মাইজভাণ্ডারি সাংস্কৃতিক পরিষদ ও মাইজভাণ্ডার মরমী শিল্পী গোষ্ঠী ফটিকছড়ি, আওয়ামী শিল্পীগোষ্ঠী চট্টগ্রাম শহর, কানু সঙ্গীতের মরমী সাহিত্য গোষ্ঠী আনোয়ারা, উদীচী শিল্প গোষ্ঠী চট্টগ্রাম শহর, গাউছিয়া আহমদিয়া সংস্কৃতি গোষ্ঠী, মাইজভাণ্ডারি রহমানিয়া শিল্পীগোষ্ঠী, এস.এম. আলম ও তার দল (কবিয়াল দল) পটিয়া, এছাড়া চট্টগ্রাম শহরে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীগোষ্ঠী, সঙ্গী ভবন, সঙ্গীত পরিষদ, রক্ত কবরী, মরমী সঙ্গীত শিল্পগোষ্ঠী, লোক সঙ্গীত সমিতি পরিষদ ইত্যাদি। আহমদ নূর ও তাঁর দল পটিয়া, ফজল আহমদ ও তাঁর দল পটিয়া, শিল্পী সেলিম ও তাঁর দল পটিয়া, বোয়ালখালী থানায় শিল্পগোষ্ঠীদের মধ্যে আবাহন মানস রঞ্জনী শতদল ক্লাব, বৌদ্ধ ত্রিরত্ন সমিতি, লাল পাক বিহারী সঙ্গীত শিল্পী, রমেশ শীল জাগরতি ক্লাব, আবুর খায়ের মরমী শিল্পীগোষ্ঠী, ইছা আহমদ মরমী শিল্পীগোষ্ঠী, মজু ভাণ্ডার মরমী শিল্পীগোষ্ঠী ইত্যাদি।

দলীয় সঙ্গীতের তালিকা

যেসব গান দুই বা ততোধিক শিল্পী দলগতভাবে পরিবেশন করেন তাই সামষ্টিক (দলীয় সঙ্গীত) বোঝায়। নিম্নে প্রচলিত কতেক দলীয় সঙ্গীতের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ যেমন-বারমাসী গান, উল্টা বাউলের গান, খুঁটি গাড়ার গান, সারি গান (ছাদ পেটানো গান), নৌকা বাইচের গান, কীর্তন গান, কবি গান, যাত্রা গান, আনুষ্ঠানিক গান, বিয়ে অনুষ্ঠানের গান, ভইয়্যা গান, পালকি-বিহারার গান, নারী পুরুষের পাল্টা গান, পুঁথি পাঠে ঘোষা গান ইত্যাদি।

এসব গান পরিবেশিত হয় নানাভাবে, যেমন দ্বৈত, সমবেত, সাম্প্রদায়িক ও সর্বঅঞ্চলীয়, মৌসুমী ও সর্বকালীন, নারী ও পুরুষ ভেদে। হরেক রকম সঙ্গীতের ছড়াছড়ি রয়েছে সমস্ত গ্রাম বাংলার ন্যায় সবুজ চট্টলার বুক জুড়ে।

উল্লেখ্য, উল্লিখিত নানা বিষয়ক ১৭৬৭ খানি লোকসঙ্গীত বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরী সংগ্রহ করেন। এগুলো একাডেমীর আর্কাইভে (১৯৬১-৬৬ সালে) সংরক্ষিত হয়।

একক সঙ্গীতের তালিকা

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত এই জনপদের লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। এই সঙ্গীত চট্টগ্রামের জনবসতি থেকে শুরু। চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত বাংলার লোকসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। চট্টল লোকসঙ্গীতে আছে বিচিত্র প্রকারভেদ। এই প্রকারভেদের সংখ্যাও আছে। অনুসন্ধানে জানা যায় এর সংখ্যা ষাটোর্ধে। এসবের একক সঙ্গীতের তালিকা নিম্নে দেয়া গেল।

মারফতি গান, ভাটিয়ালি গান, মাইজভাণ্ডারি গান, মেয়েলী গান, বর্গ গান, চাষীর গান, জারি গান, প্রশ্ন গান, বন্ধুয়া গান, পদবন্দী চিঠির গান, বিচ্ছেদ গান, ধুয়া গান, মুর্শিদি গান, সাপের বিষ ঝাড়ার গান, গাছা গান, মা মগনী গান, ছোটন গান, টপ্পা গান, পান-গুয়ার গান, মাঝির গান, রাখালী গান, গাড়োয়ালী গান, মনসার গীত, পটুয়া গান, বিলাপ গান, প্রেম সঙ্গীত, বন্দনা গান, হঅঁলা, বৈটকী গান, পালা গান, গাজীর গান,

আবদুল জলিল

ফকিরি গান, দেহতত্ত্বের গান, হালকা গান, রমেশ শীলের গান, ছড়া গান, আনুষ্ঠানিক গান, রোদের গান, বাউল গান, আধ্যাত্মিক গান, ভইয়া গান, নাট্যোয়া গান, দুখের গান, মায়ের গান, ভক্তিমূলক গান, শোলকী গান, ভাব গান, তর্জাগান, ঢাকী বাদ্য, আদিবাসী সঙ্গীত, মর্ছিয়া গান, সোহাগ কাটা, হালদা পফাটা গান, হাইল্যা সাইর, পাইন্যা সাইর, ফুলপাট গান, হাতি খেদার গান, উলটা বাউলের গীত, হাইল্যা ভোঁওর, তোরাবুদ্দিন, গাইনের বন্দনা, মনি সাধুর গান, দূর্গা পূজার গান, কালি পূজার গান, কাকি ব্রতের গ্রান, চড়কার গান, নবজাতকের দোলনার গান, ঘুমপাড়ানি গান, শরীয়ত-মারেফতি গান ইত্যাদি।

লোক বাদ্যযন্ত্রের তালিকা

লোকগীতির সুরে মাধুর্য আনার প্রয়োজনে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব হয়েছে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র। কোন বস্তুকে কুশলী স্পর্শ বা আঘাত করলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তাই বাদ্য। তবে সঙ্গীতের বেলায় এই শব্দে থাকতে হবে তাল-লয়-সুরের ব্যঞ্জনা। কাজেই যে বস্তুকে আঘাত করলে সুর সহযোগে শব্দ বা ধ্বনি বের হয় তাকে বলা হয় বাদ্যযন্ত্র। লোকবাদ্য যন্ত্রের তালিকায় দেখতে পাই একতারা, দোতারা, সারিন্দা, ঢাক, ঢোল, করতাল, বাঁশি (বেনু বা মুরালি), খোল, মন্দিরা, সানাই, কাঁসর, জয়ঢাক কাড়া, নাকাড়া, কোঁদ বাঁশি, পাতা বাঁশি, ভেঁপু বাঁশি, বীণা, শঙ্খ, পটহ, বাদল, বারন্ত, বাসালা, দুন্দুভি, ডমরু মৃদঙ্গ, ডুমুর, ঘন্টা-শিঙ্গা, খমক, খোল ইত্যাদি।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীত

চট্টগ্রামের গীতিকার যাঁদের অসংখ্য গানের ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের গান বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান। এঁরা হলেন:

ক. গীতিকারের নাম: আসকর আলী পণ্ডিত, মনমোহন দাস, এ.এন. আখতার, আবদুল গফুর হালী, নুরুল আলম, আবদুর রশীদ কাওয়াল, বুলবুল আখতার, সনজিত আশ্চার্য, আহমদ বশীর, সিরাজুল ইসলাম আজাদ, মৌ. মহিউদ্দীন মহি আল ভাণ্ডারি, শেফালী ঘোষ, রমেশ শীল, রমেজ দেওয়ান, আহমদ মুছা, এমতেয়াজ, মলয় ঘোষ দস্তিদার, অচিন্ত আচার্য, রাধা রমন, মৌ. হাদী, ড. শফি সুমন, দীপক আচার্য, লক্ষীপদ আচার্য, ইউনুচ বাঙ্গালী, এস.এম. ফরিদ, খাইরুজ্জামান, সোনা মিঞা, এম.আই. মাহবুব, রকি শীল, মাস্টার মফিজ রহমতুল্লাহ, আজম চৌধুরী, বাউল শাহজাহান প্রমুখ।

খ. ক্যাসেটের নাম ও শিল্পীর নাম:

১. পাষাণ বন্ধু– সেলিম নেজামী

মানুষ হয় বেইমানি, আগুন জ্বালাইয়া গেলি, আমার মা যেন কান্দেনা, কি পাষাণ হইলিরে তুই, ঝিক ঝিকা চলেরে, আমার কপালে সুখ হইল না, দয়াল আরতো কেহ নাই, কে বলে পিরিত ভাল, থাকতে যদি না পাই দেখা, আমি কি পাগল হইয়াছি, দেখতে দেখতে দিন ফুরায়, ওরে সাম্পান ওয়ালা,

www.pathagar.com

নাতিন বরই খাঁ, যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম, মন কাছারা মাঝি, কারলাই পরান কান্দে, মনের বাগানে ফুটিল, ও পরানের তালত ভাই, পালে কি রং লাগাইলা, ঢোল বাজেরে আর মাইক বাজে, বাইন দুয়াদ্দি না আইস্য তুঁই, আঁর বউয়েরে আঁই কিলাই, সোনা বন্ধু তুই আমারে

৩. পরানের বন্ধু– জাহাঙ্গীর-এস্তফা

আঁরে এত হারাইল, লাল শাড়িয়ানে তোয়ারে, এস্ত ফা তোয়ারে বিয়া গজ্জি, পুরুষ মাইস্যর বিশ্বাস নাই, অঁরে টেকসির ড্রাইভার, অ নানা আঁরে বলে, এস্ত ফায়ে যাইবানিরে, বউত দিন পরে ও সুন্দরী, বাইল মারি মারি আঁরে, ছাওয়া ছাওয়া কি বিয়া

৪. বিয়ার কথা– বুলবুল আখতার

সোনা দিয়ারে, জোয়ান বুড়া বেয়াগুনে, যদি কেয়াই কিনি দিত vঅনইয়া ভাবীরে vঅবন্ধু আঁইও তুঁই চলি, শান্তি নাইরে শান্তি নাই

৫. জনম দুঃখিনী মা– জাহাঙ্গীর আজাদ

দরদী মারে তোয়ারে, মা ছাড়া পোয়ার মন, আঁর কথা ধর, যার তুন মা নাইরে, আঁরে ফেলাই চাইলা, কনে লইবোরে, মা গরের পরে ছড়ি

৬. গিরাইল্লা কচুর লতি– পারভেজ

টেকনাইপ্যা ফুয়ানা, গিরাইল্লা কচুর লতি, ছোট ছোট ঢেউ তুলি, অভাবী ভাবী অবদ্ধা, সূর্য উডেল্লে ভাই, তুই মুখ কা গইল্যা কালা, আঁরা চাডগাইয়াতে

৭. চোখের পলকে– সেলিম নেজামী

চোখের পলকে আমার, ভ্রমর কইও গিয়া, ডাকি দয়াল তোরেরে, বিচ্ছেদের অনলে সদাই, আমি না পাই যদি তোমারে, আমি কি ভুলিতে পারি, আমার গাউছুল আজম, চল যাই অমরপুরে

৮. কি মাইয়া লাগাইলা– মোঃ হারুন

এইবার তুরে বন্দি করিলাম, বাঁশি বাজেরে হৃদ মন্দিরে, বেইমান বন্ধুরে, হাওসের যৌবন আমার যাইবার কালে মাতাইয়া, তুফান আসিল নিদান কালে

৯. সুজন বন্ধু– সেলিম নেজামী

সুজন বন্ধু, কলংক অলংকার, মনের মাঝে কিন্তু, ভান্ডারী ভুলাতে কি চাইলো

১০. দরদী বন্ধু– সেলিম নিজামী

চিনিনাতো বন্দের বাড়ী, আমার সাড়ে তিন হাত, একটু দাড়াও মাকে দেখি, আমি পারব আর বারিতে, নতুন ঘরে যাব, আমারে করিয়অ পার

১১. এক টুকরো মাটি– সেলিম নিজামী

একটুকরো মাটির মাঝে, ও তুই কাদিসনা কাদিসনা, গাড়ী আসলে চলে যাব, আমিতো বেকাই আছি, বেজার গইল্লাম আমার বন্ধুরে, সুখের মত সুখরে, আমার বন্ধু যে এলনা কইও আমার বন্ধুর দেখা পাইব, এই জগতে পাইলাম নারে, তোর ফিরিতি কেমন করে ভুলি, আমায় এত রাতে কে ডাক দিলি

www.pathagar.com

১২. বাবা ভাণ্ডারি– শিমুল শীল	মাইজভাণ্ডারে সোনার পুরি, নৈবাস কইরনা বাবা, প্রেমেরই পূজারই আমি, আজই আসিয়াছি, হায়রে মুর্শিদ ভাণ্ডারি, তুমি আমার দয়াল মুর্শিদ
১৩. জেয়ারতে মোহছেন আউলিয়া– শিমুল শীল	কে যাবি আয় তোরা, আষাড়া মাসে ছয় তারিখে, আঁর জানত্তুন বেশী জানি, বটতলীতে শাহ মোহছেন, শাহ মোহছেন আউলিয়ারে, ২০শে জুন রবিবার, চলো চলো সবাই, ও বাবা মোহছেন আউলিয়া, অনাবাদী আবাদ করলো
১৪. নূরে সাত গাছিয়া– আহমদ নূর আমিরী	আল্লাহ করেন নবীন মান, ত্রিজগতে সৃষ্টি মূলে, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা মদিনার গোলামী আমায় দে, নুরুন নবী তুমি ছাড়া, বাবা রহমান করোনা গো, সাত গাছিয়া পাহাড় চুড়ায়, সুলতানপুরী আল্লাহর অলি, ইউনুছ বাবা বিরহে তোমার, একবার কি ইচ্ছে হয়না
১৫. আয়শা ভাণ্ডারি	পূণ্য ভূমি এই চট্টলা, জিয়াউল হক ভাণ্ডারি, হাত তালিতে রসিক মিলে, অধম বাঙ্গালীনি vওরে বাবা মাওলানা নুরের শহর নূরের লহর, অনন্ত ভ্রমান্তে তুমি, কেরামতি দেখাইলেন, হক ভান্ডারী হক ভান্ডারী, আমার আরশে আযম
১৬. চেয়ারম্যান সাব– সিরাজুল ইসলাম আজাদ	চেয়ারম্যান সাব, ডাক্তার সাব তোমারে জ্বালাই, পোয়া কিল্লাই মারির, অভাইনা ভাইনারে বউ পালিবি ক্যান গড়ি, বিয়া মানি বন্দী অই যঅন, এ যুগত মানুষ চিনন দায়, আয়রে এতদিন আপন, তুঁই পুতরে জনম দিল
১৭. আশেকের বুলবুল হযরত কেবলা– শাহাজাহান	মাইজভাণ্ডারি নূর বাগান, এই কূলে আর ঐ কূলে, চলরে মাইজ ভান্ডার গ্রামে, নবুয়াতের পরে নবী, তুমি জ্ঞানের আলো, জাতি ধর্ম নির্বিমেষ

চট্টগ্রাম শহরে রেয়াজউদ্দিন বাজারস্থ কালাম মার্কেটে আমিন ষ্টোর সমগ্র চট্টগ্রামের জন্য ক্যাসেটের বড় দোকান। এই ষ্টোর এই পর্যন্ত প্রায় ৯০০ ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি বের করে। পাশাপাশি-বিনিময় ষ্টোর ৪০০, শাহ্ আমানত ১০, জাহেদ ইলেকট্রনিক ১০০, এস এম অডিও কমপ্লেক্স ৩০ এবং কক্সবাজার আলাউদ্দিন রেকডিং হাউস ৩০০।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীত

এলাকার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান মাইজভাণ্ডারিসহ বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান ধারণা করা যায়। ২০০৬ সালে এর আনুমানিক বিক্রয়মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

যে সব গান এখনো কম বেশি গাওয়া হয় সেইসবের মধ্যে এমন কতেক সঙ্গীত আছে যেগুলো অবস্থা অত্যন্ত বিপন্ন। যেমন: ভাটিয়ালি গান, জারী গান, সাপে ঝাড়ার গান, মা মগনি গান, টপ্পা গান, মনসার গীত, বিলাপ

www.pathagar.com

জেবুল হোসেন কুলাল

গান, বন্দনা গান, হওঁলা, ছড়া গান, বাউল গান, দুঃখের গান, ঢাকী বাদ্য, কীর্তন, মর্চিয়া, সোহাগ কাটা, হালদা ফাটা গান, হাইল্যা সাইর, পাইন্যা সাইর, ফুলপাট গান, হাতি খোদার গান, উলটা বাউলে গীত, হাইল্যা ভোঁওর, তোরাবুদ্দিন গাইনের বন্দনা ইত্যাদি।

লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা

সেই আদিকাল থেকে বৃহত্তর চট্টল অঞ্চলে কত ভাবের কত বিষয়ে হাজার হাজার সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু সঙ্গীত ঝিঙে ফুলের ন্যায় ক্ষণেক কাল থেকে কখন যে হারিয়ে গেল বুঝবারও সময় রাখে নি। যেমন, উনিশ শতকের শেষের দিকে হঠাৎ করে *পথ কবিতার* আবির্ভাব হয়। বিংশ শতকের আশির দশকে এসে শেষ হয়ে যায়। যেন তার প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু এমন বহু সঙ্গীত এখনো বেঁচে আছে। যার প্রবহমান ধারা আরো অনেক অনেক কাল বয়ে থাকবে। এখানে লুপ্ত এবং লুপ্ত-প্রায় সঙ্গীতগুলো একটি তালিকা দেয়া হচ্ছে:

বর্গ গান, চাষীর গান, প্রশ্ন গান, বন্ধুয়া গান, পদ বন্দীর চিঠি গান, ধুয়া গান, গাছা গান, ছোটন গান, পান-গুয়ার গান, রাখালী গান, গাড়োয়ালি গান, পটুয়া গান, পালা গান, গাজীর গান, রোদের গান, ভইয়া গান, নাট্যোয়া গান, তর্জা গান, আদিবাসী সঙ্গীত, মনি সাধুর গান, চড়কার গান ইত্যাদি।

মেধাস্বত্বের মালিকানা প্রসঙ্গ

মেধাস্বত্বের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনদের অজ্ঞতার কারণেই নির্ধারিত হয় না বললেই চলে। যেহেতু লোক স্রষ্টাদের সৃষ্টির মালিকানা তথা মেধাস্বত্ব এবং সৃষ্ট অভিব্যক্তির মূল্যমান সম্পর্কে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ নিয়ে দেশের কোন অঞ্চলেই এ যাবত কোনো বিশেষ কর্মশালা হয় নি, তাই এতদ্‌বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সুপারিশমালা

ক. দেশে প্রতিটি অঞ্চল থেকে এখনো যে সব লোকসঙ্গীত মানুষের স্মৃতিতে ধারণ করা আছে সে সব অঞ্চলে মাঠকর্মী নিয়োগ দিয়ে তৃণমূলীয় মাঠজরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সুপারিশ রা হলো।

খ. যেসব লোক সঙ্গীত সংগ্রহ করা হবে সেসব সংগ্রহ, তথ্য-উপাত্ত আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হলো।

গ. সময় সময় জাতীয় বা আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির বিভিন্নমুখী পাঠ-চর্চা-গবেষণাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সুপারশ করছি।

ঘ. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালার মাধ্যমে জাতীয় সুরকার শিল্পীদের যথাযথভাবে অবহিত করানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

উপসংহার: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও চট্টগ্রাম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র বিশেষত্বে সতত সমৃদ্ধ। এরই এক উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ লোকসঙ্গীত। 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রকল্প'-এর আওতায় লোকসঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত এই আধুনিক পদ্ধতির গবেষণা চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মৌলিক বিশেষত্ব উদ্‌ঘাটন করে এর যথার্থ চিত্র উপস্থাপনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট ছকে চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতের গবেষণার এই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্তসমূহ শুধু চট্টগ্রমের লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়; বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা, পরস্পরের সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়।

সৈয়দ আবু আহমদ

তথ্য সূত্র

বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

চট্টগ্রামে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, আবদুল হক চৌধুরী বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানে ব্যবহৃত শব্দ বৈচিত্র ও সমাজ ভাবনার রূপ। মনিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (পাণ্ডুলিপি) ২০০৪, জুন

চট্টগ্রাম প্রথম মানবভূমি, আলাদীন আলী নূর চট্টগ্রাম, ১৩৮৪ বাংলা।

বাংলাদেশের লোক গীতি, আবদুল ওয়াহাব সরকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

হাজার বছরের চট্টগ্রাম, মোহাম্মদ খালেদ, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫।

বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য, ওহীদুল আলম, চট্টগ্রাম, ১৯৬৩।

কক্সবাজারের ইতিহাস কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, ১৯৯০।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন, মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক, ঢাকা, ২০০১

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান (ইডি), কল্যাণী ঘোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

বাংলার লোক সংস্কৃতি, ওয়াকিল আহমদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

দেব, চিত্তরঞ্জন, পল্লীগীতি পূর্ববঙ্গ, কলিকাতা, কতকথা, ১৯৫৩।

হক, মুহাম্মদ এনামুল (লোকসাহিত্য), বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা (১ম সংখ্যা, ১৩৭৭-৭৮)।

হক মুহাম্মদ এনামুল, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকতা, ১৩৩৫।

সুবর্ণ স্বাক্ষর, সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন পরিষদ '৯৭ চট্টগ্রাম, ১৯৯৭।

পটিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এস.এম.এ.কে জাহাঙ্গীর, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪।

লোক সাহিত্যের ভিতর ও বাহির। মনিরুজ্জামান, ঢাকা, ২০০২।

আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ সম্ভার, সম্পাদক মুমিন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

বাংলা একাডেমী ফোকলোর আরকাইভস্ মৌখিক সাহিত্যের তালিকা ও সূচি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক আবদুল হাফিজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন: ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ চট্টগ্রাম গীতিকা ১-৫ম), সম্পাদক মোমেন চৌধুরী বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

মরমী কবি পাঞ্জুশাহ: জীবন ও কাব্য, খন্দকার রিয়াজুল হক ,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী: শত বর্ষের আলোকে ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ২০০৭।

www.pathagar.com

৩.২ চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত

মালিক সোবহান

১. প্রসঙ্গ-কথা

চট্টগ্রাম' নামটি একটু বিভ্রান্তিকর। শুনতে মনে হয় কেমন যেন গ্রাম। কিন্তু ৬৮ হাজার গ্রামের বাংলাদেশে এরূপ 'গ্রাম' দ্বিতীয় বিরল। মধ্যযুগের কবি বাহারাম খাঁয়ের ভাষায়:

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পূরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোভাব মনোরম অমরা নগর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস।
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদীতট
শুভপুরী অতি দিব্যধাম।
চৌদিকে পর্বত গড় অধিক উচ্চতর
তাত শাহা বদর আলাম।

(শরীফ: ১৯৮৪: *লাইলী মজনু)*

বস্তুত প্রকৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনন্য সম্মিলন চট্টগ্রামেই রচিত হয়েছে। অনিন্দ্য-সুন্দর ভূ-প্রকৃতি, বিস্তৃত সমুদ্রকূল ও জলরেখা, অরণ্য ও লোনাজলপ্রসূত অর্থসৌধ, আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর ও আন্তদেশীয় সীমারেখা দ্বারা চট্টগ্রামের বিশ্বপ্রেক্ষিত সুসংহত। এখানকার অসাম্প্রদায়িকতা, আতিথেয়তা, বন্ধু-বাৎসল্য, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য বিশ্ববিদিত।

বিশ্বসভ্যতায় সারভাইভ্যাল অব ফিটেস্ট বা যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন স্থানের মূলে আছে সংস্কৃতি। এজন্য নিজনিজ সাংস্কৃতিক সম্পদ সনাক্তকরণ, মূল্যমান ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে উন্নত বিশ্ব সরব। বাংলাদেশে জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা-ই এ বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণার পথিকৃৎ (হুদা: ২০০৫)। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রবচন-সংকলন ও লোকসঙ্গীত-সম্মেলন-২০০৮ অনুরূপ-চিন্তা ও গবেষণাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে 'চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত' সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ও সুপারিশমালা উপস্থাপন এই প্রবন্ধের অভিপ্রেত।

২.১. আবহমান চট্টগ্রাম: ভূগোল ও ইতিকথা

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি জেলা ও মেট্রোপলিটন শহর। এটি আবহমান চট্টগ্রামেরই এক ভগ্নাংশ মাত্র। আবহমান চট্টগ্রাম বলতে বুঝায়, উত্তরে ফেণী নদী থেকে দক্ষিণে নাফ নদী, পূর্বে ভারতের আসাম-ত্রিপুরা সীমানা থেকে পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে আন্তর্জাতিক জলবিভাজিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিন, শাহপরি, মহেশখালী, মাতারবাড়ী, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, উরির চর ও সন্দ্বীপ নামের ৮টি দ্বীপও এর অন্তর্গত। এই সুবৃহৎ এলাকা প্রায় দুইহাজার বছর যাবৎ অখণ্ড চট্টগ্রাম হিসেবে সনাক্ত ও শাসিত ছিল। তখন এর আয়তন ছিল প্রায় ৯ হাজার বর্গমাইল। সময়ের পথ-পরিক্রমায় সেই চট্টগ্রাম হয়েছে খণ্ডবিখণ্ড, ভূগোল ও মানচিত্রে সংকোচিত হয়েছে তার আকৃতি।

www.pathagar.com

আবহমান চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলীয় প্রায় ৬ হাজার বর্গমাইল অরণ্য ও পাহাড়ি এলাকা নিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। 'রেইড় অব ফন্টিয়ার ট্রাইভস এ্যাক্ট ১৮৬০' সূত্রে এটি উপজাতি-আদিবাসী জনপদ হিসেবে সংরক্ষিত। ১৯৮১-১৯৮৩ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি পৃথক জেলায় বিভাজিত হয় যথাক্রমে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। ১৯৮৪ সালে দক্ষিণাংশের প্রায় ৯০০বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হয় কক্সবাজার জেলা। এভাবে চট্টগ্রাম কালে কালে পাঁচটি প্রশাসনিক জেলা ও ৫৪টি উপজেলায় বিভাজিত হয়।

মালিক সোবহান

২.২. ধর্ম-গোত্র ও পেশা

বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলাসহ গোটা চট্টগ্রামে জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি। এদের সিংহভাগ মুসলিম। এরপর হিন্দু ও বৌদ্ধ। এরপর আছে যথাক্রমে চাকমা, মারমা, রাখাইন, টিপরা, বোম, পাংখোয়া, খ্যাং, ম্রো, চাক, খুমি, লুসাই প্রভৃতি তেরটি আদিবাসী-উপজাতি। কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও আছে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও রাখাইনদের বসবাস মূলত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকায়। উপজাতি ও আদিবাসীদের নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়।

এখানকার মুসলমানদের প্রধান পেশা কৃষি। এরপর ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি চাকরি, শিক্ষক, আমলা, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, আলেম-ওলামা, পীর-মুর্শিদ, মৎস্যজীবী, কুটির শিল্প, লবণ চাষী, নৌমাঝি, জেলে, কাঠুরিয়া, মিস্ত্রী, চিত্রকর, তেলি প্রভৃতি। হিন্দুদের পেশা ব্যবসা, চাকরি, কামার, কুমার, জেলে, নাপিত, ধূপি, সুতার, চামার, ডোম ইত্যাদি। আদিবাসী-উপজাতিদের পেশা জুমচাষ, মৎস্য ও জীবজন্তু শিকার, কুটির শিল্প, তাঁতবোনা ইত্যাদি।

২. ৩. ভাষা

চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতির ভিত্তি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা। যুগেযুগে বহিরাগত নানান জনগোষ্ঠীর বুলির সংমিশ্রণে এ ভাষার সৃষ্টি। তাই এ ভাষায় পৃথিবীর ভাষা সমূদয়ের শব্দভাণ্ডার দেখা যায়। উচ্চারণ, ধ্বনিবৈচিত্র্য ও অর্থগতভাবে এটি পুরো বাংলাও নয়, বাংলা-বিচ্যুতও নয়, দুই-এর মাঝামাঝি, অভিনব ও স্বতন্ত্র। এভাষা 'এমনই একরূপ শুনায় যে, বক্তার চেহারা না দেখিলে আড়াল হইতে মুখের কথা শুনিয়া কাহারও জাতি বা শ্রেণী নির্ণয় করা অসম্ভব। এমনই অদ্ভুতভাবে উচ্চারিত হয় যে, ভিন্ন জেলার লোক চট্টগ্রামবাসীর সহিত বহুদিন একত্রে বসবাস না করিলে, ইহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিবে না (হক: ১৯৯১: ৪৮৫ / ৪৮৭)। কিন্তু চট্টগ্রামবাসী নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও মনমানসের প্রকাশ এ ভাষায় যেভাবে করতে পারে, অন্য ভাষায় সেভাবে পারে না। তাই শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই আঞ্চলিক ভাষার প্রতি দুর্বল।

২.৪. চট্টগ্রাম-নামা

'চট্টগ্রাম' নামটির বয়স মাত্র সহস্রাধিক বছর। তবে তার ভূ-রাজনৈতিক ও নৃ-তাত্ত্বিক অতীত প্রাগৈতিহাসিক। ভিন্ন নামেই এ ভূ-খণ্ডের ভাঙ্গাগড়া চলছিল। তাই প্রাচীন নিদর্শনাদিতে এ ভূ-খণ্ডের পরিচিতি আছে বিচিত্র নামে। যেমন: জ্বালনধারা, সামন্দর, সুদকাওয়ান, রম্যভূমি, চৈত্যগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চক্রশালা, চিতাগঞ্জ, শ্রীচট্টল, রোসাং, ইসলামাবাদ প্রভৃতি।

www.pathagar.com

একদা তপ্ত-জলীয় অঞ্চল হিসেবে চট্টগ্রামকে বলা হতো 'জ্বালনধারা'। সীতাকুণ্ড ও বাড়বকুণ্ডে পাহাড়ি ঝর্ণা এই নামের উৎস অনুমিত। সিদ্ধ বৌদ্ধ-সিদ্ধা হাঁড়িপা এখানে এসে সাধনা করেছিলেন বলে তাঁর নাম 'জ্বালন্ধরী'। 'জ্বালনধারা' শব্দের আরবি 'সামন্দর'। তাই আরব-ইতিহাসে চট্টগ্রামের নাম 'সামন্দর'। মরক্কোবাসী দুনিয়া পর্যটক বতুতার বিবরণে চট্টগ্রামের নাম 'সুদকাওয়ান'। এখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মীয় কিংবদন্তি সূত্রেই চট্টগ্রাম-নামের দাবিদার।

বৌদ্ধদের মতে, প্রাচীনকালের অসংখ্য বৌদ্ধ-চৈত্য (বিহার/কিয়াঙ) থেকে এর নাম চৈত্যগ্রাম~চট্টগ্রাম। হিন্দু মতে, চট্ট-দের (কুলীন ব্রাহ্মণ) নিবাস-ভূমি ছিল বলে এর নাম চট্ট-গ্রাম। মুসলিম মতে, প্রাচীনকালে জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলে সাধক-পুরুষ বদর শাহ চাটি (মৃৎবর্তিকা) জ্বালিয়ে জ্বীন-পরী তাড়িয়েছিলেন বলে এর নাম চাটিগ্রাম~চট্টগ্রাম। এভাবে নামের সংখ্যা তিন ডজন ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কোনো নামের সঙ্গেই পাঁচজনের ঐক্য মেলে না। (চৌধুরী: ১৯৯৫: ৮৫)। তাই ইতিবেত্তাগণ কিংবদন্তি বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রেই চট্টগ্রাম নামের তত্ত্ব তালাশ করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের নির্ভরযোগ্য সূত্র দু'টি নিম্নরূপ:

এক. শ্যাতগঙ্গ > চট্টগ্রাম: খ্রিস্টীয় নবম শতকে আরব-বণিকরা চট্টগ্রামকে গঙ্গানদীর মোহনাস্থ ব-দ্বীপ মনে করে বলত 'শ্যাতগঙ্গ'। আরবিতে 'শ্যাত' অর্থ ব-দ্বীপ, আর 'গঙ্গ' অর্থ নদী। এই 'শ্যাতগাঙ্গ'-এর উচ্চারণ বিকৃত রূপ-ই ইবনে বতুতার 'সাতকাওন' বা বর্তমান চাটগাঁও~চট্টগ্রাম। (শরীফ: ২০০১: ১৬)।

দুই . চিৎ-তৎ-গঙ্গ > চট্টগ্রাম: প্রাচীন চট্টগ্রামের দখল নিয়ে বিভিন্ন নৃ-পতির মধ্যে বহু যুদ্ধ হয়। ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এক যুদ্ধজয়ের স্মারক স্বরূপ আরাকানরাজ সুলতৎ-ইং-চন্দ্র চট্টগ্রামের উত্তর সীমানা (বর্তমানে কুমিরা) বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করে তাতে আরাকানি ভাষায় 'চিৎ-তৎ-গঙ্গ' (অর্থ যুদ্ধ করা অনুচিত) বাণী উৎকীর্ণ করেন। এই 'চিৎ-তৎ-গঙ্গ' এর উচ্চারণ বিকৃত রূপ-ই 'চট্টগ্রাম' (সাহিত্যবিশারদ: ১৯৯৭: ৭)।

২.৫. নৃ-তত্ত্ব ও জাতধর্ম

নামের প্রচীনত্ব যা-ই হোক, চট্টগ্রামে মানব-বসতির অতীত প্রাগৈতিহাসিক। গ্রীক ভূ-গোলের কিরাদ রাজ্য, মহাভারতের কর্ণের পুত্র বিকর্ণের রাজত্ব-রাজধানী কাঞ্চনগরের সঙ্গে (চৌধুরী: ১৯৯৪: ৫-৬), অশোকের স্বর্ণভূমি (আধুনিক পেগু) কিম্বা অস্টেথ্রা-এশিয়াটিক নব্য-প্রস্তরযুগের সঙ্গেও চট্টগ্রামের সম্পর্ক মেলে (কানুনগো: ১৯৯৫: ২৩)। তবে অস্টেথ্রা-এশিয়াটিক ও ভোট-চীনা লোকের বসতিই এখানে প্রাচীন। প্রায় দুই হাজার বছর আগে তারা আসে (শরীফ: ২০০১: ২০)। ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে মগধাগত সামন্ত রাজবংশ চন্দ্রসূর্য চট্টগ্রামসহ আরাকান দখল করে। এরা ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু। বংশানুক্রমে ৫১৩ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রাম-আরাকান অভিন্ন রাজ্যরূপে শাসন করে (চৌধূরী: ১৯৯৫: ৬-৭)। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে চট্টগ্রাম সমতটের খড়্গ ও দেব রাজবংশের, অষ্টম শতকে পাল ও নবম শতকে হরিকেল রাজ্যভুক্ত হয়। দশম শতকের চট্টগ্রাম আরব-বাণিজ্য কেন্দ্র ও ঔপনিবেশে পরিণত হয় (হক: ১৯৯১: ৫০৭)। একাদশ-দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের পঁগা রাজ্যভুক্ত হয়। ত্রয়োদশ শতকে আরাকান-ত্রিপুরা ও সমতট রাজবংশের মধ্যে চট্টগ্রামের দখল-বেদখল চলে। চতুর্দশ শতকে পুনরায় আরাকানের দখলে যায়। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারকশাহ চট্টগ্রামে গৌড়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কখনো গৌড়, কখনো ত্রিপুরা বা আরাকানের অধীনে ছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তাখানের নেতৃত্বে মুগল অধিককৃত চট্টগ্রাম 'ইসলামাবাদ' নামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬০ খ্রি. থেকে ইংরেজ অধিকৃত পরবর্তী ইতিহাস সবার জানা। এই সুদীর্ঘ ইতিহাস পরম্পরায় চট্টগ্রামে কত জাত-ধর্ম ও গোত্র-বর্ণের আগমন ঘটে তার বর্ণনা দিয়েছেন মধ্যযুগের কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল:

নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিসরী শামী তুরকী হাবশী রামী
খোরাসানী উজ্বেগী সকল।
লাহোরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মীরী দক্ষিণা সিন্ধী

www.pathagar.com

কামরূপী আর বঙ্গদেশী।
ভূপালী কুদংসরী কান্নাই মলআবারী
আচি কোচী কর্ণাটকবাসী।
বহু সৈদ সেখজাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি।
আভাঙ্গী বরমা শ্যাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি।
আরমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ
কাষ্টিলান আর ফরাসিস
হিসপানী আলমানী চোলদার নাসরানী
নানা জাতি আর পর্তুগীস।

(আলী আহসান: ১৯৬৮: *পদ্মাবতী: ৮৬*)।

আলাওলবর্ণিত রোসাঙ্গ ও চট্টগ্রাম ছিল অভিন্ন দেশ। সেখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধর্মগোত্র ও জাতি-সকল যাতায়াত করেছে। রাজ্য বিস্তার ব্যবসা-বাণিজ্য, মিশনারি ও রাজনৈতিকসূত্রে পর্যায়ক্রমে আসে বৌদ্ধ, হিন্দু, আরব, ফরাসি, পাঠান, তুর্কী, মুগল, পর্তুগিজ, নানান আদিবাসী-উপজাতি ও ইংরেজ। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম এবং শাসন-শোষণের গরজে এখানে নিবাস গড়েছে, জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা মিটিয়েছে। এভাবে নানা জাতির সংমিশ্রণে এখানে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম ও গোত্রের বিস্তার ঘটে।

২.৬. সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ

চট্টগ্রাম হচ্ছে বহুজাতিক সভ্যতার লীলাভূমি। এখানকার ধর্মীয় উদারতা ও দাম্পত্যসূত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আরব, তুর্কি, পাঠান, মোঘল, হিন্দু, বৌদ্ধ, মগ ও বর্মা শোণিতের সংমিশ্রণ রয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে মগ ও পার্বত্য আদিবাসী-উপজাতীয় রক্ত যে বিস্তর মিশেছে, তা পার্বত্য জাতি ও স্থানীয়দের চেহারায় প্রমাণিত হয় (হক: ১৯৯১: ৫০২)। এই বিচিত্র ধর্ম-গোত্রের সম্মিলিত আবাসভূমি চটগ্রাম বহুজাতিক সংস্কৃতিরও মিলনকেন্দ্র। এখানেই সম্ভব হয়েছে সাংস্কৃতিক বহুত্ব ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যসাধন। এখানকার মুসলমান পেয়েছে অসংখ্য পীর-আউলিয়ার পবিত্র দরগাহ্, হিন্দুরা পেয়েছে সীতাকুণ্ড ও আদিনাথের পুণ্যতীর্থসহ অসংখ্য মন্দির, বৌদ্ধরা পেয়েছে মহামুনি ও চক্রশালা চৈতসহ্ অসংখ্য কিয়াং, খ্রিস্টানগণ পেয়েছে গির্জা ও নানা আদিবাসীর নিজনিজ ভজনালয়। এখানে যেমন শোনা যায় আজানের সুমধুর ধ্বনি। তেমনি বুদ্ধের বাণী: বুদ্ধনং শরণং গচ্ছামি। এখানেই যেমন রচিত হয় *মহাভারত*, তেমনি *নবীবংশ-রসূল চরিত*। এই বহু ধর্ম-গোত্র ও সংস্কৃতির সহাবস্থান ও সৌভ্রাতৃত্ব চট্টগ্রামবাসীকে করেছে উদার, সরল ও অদৃষ্টবাদী, মানবতাবাদী, প্রগতিশীল ও অতিথি-পরায়ন। এদের ব্যবধান শুধু ধর্মগত। অন্যথায় ভাষা, জীবনাচার ও চিন্তাদর্শনে এরা অভিন্ন, একান্তই ঘরোয়া, খাস চাটগাঁইয়া। তাই নিজস্ব সংস্কৃতিকে এরা আঁকড়ে থাকে ধর্মের মতো।

২.৭. লোকসঙ্গীত: সংজ্ঞা

যে কোনো জাতির জীবনের সামগ্রিক রূপই তার সংস্কৃতি। বিভিন্ন উপকরণ ও অনুষঙ্গ সমন্বয়ে সংস্কৃতির রূপ গড়ে ওঠে। গান বা সঙ্গীত হচ্ছে সংস্কৃতির এক বিমূর্ত উপাদান। সঙ্গীত দুই প্রকার: শাস্ত্রীয় ও লোকসঙ্গীত। শাস্ত্রীয়সঙ্গীত হচ্ছে বিধিবদ্ধসঙ্গীত। লোকসঙ্গীত হচ্ছে বিধিমুক্ত বা অশাস্ত্রীয় সঙ্গীত। (গোস্বামী: ১৯৮৫: ৭৫৭/৭৭৯)। সংস্কৃতির আদিরূপ যেমন লোকসংস্কৃতি, তেমনি সঙ্গীতের আদিরূপও লোকসঙ্গীত বলে ধারণা করা যায়। 'লোকসঙ্গীত অর্থে, এক কথায় লোকজীবনের গান বোঝায়।... জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা এবং প্রত্যাশা পূরণেই এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট। (চক্রবর্তী: ১৯৯৫: ৪০৪)। অর্থাৎ 'বিশেষ

www.pathagar.com

ভৌগোলিক ও ভাষিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিমূর্ত অভিব্যক্তির নাম লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কোন আঞ্চলিক পরিবেশে সৃষ্ট লোকসঙ্গীত তার বৈচিত্র্য ও সংবেদনশীল আবেদন নিয়ে সর্বজনীন স্তরে উন্নীত হয়। এভাবে বাঙালি সংস্কৃতিতে বিপুল ঐতিহ্য ও তাৎপর্যবহ এক বিমূর্ত অভিব্যক্তির নাম 'চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত'।

৩. চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত: পুরাবৃত্ত

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত পরিমাণে বিপুল ও বৈচিত্র্যেসমৃদ্ধ। প্রকৃতিগতভাবে চট্টগ্রামের জনমানস ভাবুক ও কবি-প্রসূতি। সঙ্গীতপিপাসা চট্টগ্রামবাসীর মজ্জাগত ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গবেষকদের মতে: জনবসতির সূচনা থেকেই লোকসঙ্গীত চট্টগ্রামবাসীর ভূষণ হয়ে আছে। (গুপ্ত: ১৯৯৫: ১৩৬)। *চর্যাগীতি* -র কোনো কোনো গান ও দোহা চট্টগ্রামের তৎকালীন পণ্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধাচার্যদের রচনা বলে অনেকের বিশ্বাস (বড়ুয়া: ২০০৩: ৩১৪)। মধ্যযুগের চট্টগ্রামে কীর্তনের চর্চা ছিল ব্যাপক। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন চট্টগ্রামের কীর্তনীয়া পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি মুকুন্দ দত্ত। সেকালে মুসলিম সম্প্রদায়ে সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন:

প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে অনেক সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতের আবির্ভাব ও বহু সঙ্গীতগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। গ্রন্থগুলো 'রাগমালা' বা 'রাগতালনামা' নামে পরিচিত। তাহাতে রাগরাগিনীর পরিচয়াদি বর্ণিত আছে। ... সঙ্গীতগুলি রচয়িতৃগণের অধিকাংশই মুসলমান। তাহাতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা এমন সুন্দর যে, কবির নাম উঠাইয়া দিলে ঐ সকল পদ যে মুসলমান কবির লিখিত, তাহা বুঝা বড় কঠিন হয় (সাহিত্যবিশারদ: ১৯৯৭: ৫৮২)।

আহমদ শরীফের মতে:

সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে ১৯খানি 'রাগনামা' বা 'রাগমালা', ১৩ খানি 'রাগতালনামা'। ... রাগ'র বই 'রাগনামা' বা 'রাগমালা'; তাল-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম 'তালনামা' বা 'তালমালা' এবং রাগ ও তাল'র মিশ্র-গ্রন্থের নাম 'রাগতালানামা' বা 'মালা'। এসব গ্রন্থের রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী হিন্দু ও মুসলমান। (এতে প্রমাণিত হয়) মধ্যযুগের চট্টগ্রামে বহু মুসলমান সঙ্গীত চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এসব মুসলমান সাধারণ্যে পণ্ডিত নামে পরিচিত হতেন এবং তারাই স্ব স্ব মণ্ডলীতে সঙ্গীতবিদ্যা শেখাতেন। ... চম্পাগাজী, কমর আলী, জীবন পণ্ডিত, বকশ আলী, ওয়ারিশ পণ্ডিত, পারান পণ্ডিত, ফাজিল নাসির প্রমুখ আজও লোকস্মৃতিতে বিদ্যমান (শরীফ: ২০০০: ১৬৬)।

এই উত্তরাধিকার-ঐতিহ্য এখনও বিচিত্র সুর-লহরীতে প্রবহমান। অসাম্প্রদায়িক চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, আদিবাসী-উপজাতি সবাই গায়ক ও বাদক। চলার পথে, কাজের ফাঁকে, ব্যস্ততা ও অবসরে যে কেউ মনের অজান্তেই গেয়ে ওঠেন তার প্রিয় গান। তাই এখানকার হাটে-মাঠে-ঘাটে, বন-বাদাড়ে অহর্নিশি শোনা যায় বিচিত্র সুরের গান। এসব লোকসঙ্গীত বিচিত্র ভাব, সুর ও বাণীবিন্যাসে হৃদয়গ্রাহী। এতে কথার আলোড়ন, সুরের মূর্চ্ছনা ও ভাবের মাধুর্য শ্রোতাকে বিমোহিত করে। তাই দেশে-বিদেশে চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতের কদর অসামান্য। (শেফালী: সাক্ষাৎকার: ২০০৫)।

৩.১. চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত: বৈচিত্র্য

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত এখানকার আবহমান লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার চাপ ও আকাশ-সংস্কৃতির সর্বনাশা ছোবলে লোকসঙ্গীতের কিছু কিছু ধারা বিলুপ্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা সামগ্রিকভাবে চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতকে তিন পর্যায়ে সনাক্ত ও বিবেচনা করতে পারি।

১. বিলুপ্ত: ক. গাজীরগীত, খ. বারমাইস্যা, গ. হালদাফাড়া গান, ঘ. কর্মসঙ্গীত, ঙ. গাছাসঙ্গীত, চ. ঘুমপাড়ানি গান, ছ. ফুলপাট গান, জ. উল্টা গান

www.pathagar.com

২. বিপন্নঃ	ক.হাইল্লাসারি, খ. পাইন্নাসারি, গ. নৌকাবাইচ সঙ্গীত, ঘ. হঁ-অ-লা, ঙ. জারিগান, চ. বিলাপ, ছ. ক্যাম্পাছারর গান
৩. বর্তমান লোকসঙ্গীতঃ	ক. আঞ্চলিক, খ. মাইজভাণ্ডারি, গ. মারেফতি, ঘ. কবিগান, ঙ. উপজাতীয় গান

১.ক. গাজীর গীত

এলাকাভেদে গাজিরপালা, গাইনের পালা, গাইনের তামাশা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে। ওহীদুল আলমের মতেঃ ধর্মযুদ্ধে যারা লড়াই করে, বীরত্ব দেখায়, তারা গাজী। তাই গাজীর গান বীরত্বব্যঞ্জক গান। ইহাতে লড়াই ও শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণিত হয়। কিন্তু আবদুল হক চৌধুরীর মতেঃ গাজীর গানে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বা শৌর্যবীর্যের চেয়ে প্রেমবিরহের কাহিনীই বেশি। এখানে গায়ক বা গায়েন-ই গাজী। এখানে গাজী রূপক, এর অর্থ জ্ঞানী। অতএব গাজীরগান মূলত জ্ঞানীর গান (চৌধুরীঃ ১৯৯৫ঃ ৬২৯)।

কারও কারও মতে, গাজি মূলত কল্পিত বা গায়েবি পীর। সেকালের চট্টগ্রামের অদৃষ্টবাদী জনমানস রোগশোক, আপদবিপদ মুক্তি বা সন্তান কামনায় গাজিরগীতের আয়োজন করতো। এর মূল গায়ককে বলা হতো গাইন। একজন গাইন, একাধিক নাউট্টা (নাটুয়া), দোহারি ও বাদক নিয়ে গাজির দল গঠিত হতো। এরা রঙ-বেরঙের পোশাক ও মাথায় পাগড়ি পরে আসরে নামতেন। আসরের জন্য ছাইনিযুক্ত বর্গাকৃতির মঞ্চ তৈরি হতো। তাতে পাটি বিছিয়ে তার উপর একটা কুলায় রাখা হতো চাল, আমপাতা, দূর্বাঘাস, চাল, ডিম প্রভৃতি। একপাশে দোহারি ও বাদক এবং বিশেষ দূরত্বে চারদিকে বসতো শ্রোতার দল। এরপর বিশেষ পোশাকে সজ্জিত গাজি সামিসয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে অর্ধবলয় আকৃতির প্রায় সাড়ে চার ফুট লম্বা একটা লৌহদণ্ড গেঁড়ে দিতেন। এটাকে বলা হতো গাজির আসা (লাঠি)। এরপর গাইন বন্দনা দিয়ে আসর শুরু করতেন। (চৌধুরীঃ ১৯৯৫ঃ ৬৩০-৬৩৪)।

লোকসাহিত্যের ভাষায় গাজিরগান মূলত পালাগান। এটি দীর্ঘ লোককাহিনীর গীতরূপ। ইতিহাস-ঐতিহ্য, কিংবদন্তি ও লোককথা-রূপকথা আঞ্চলিক ভাষায় সুর ও ছন্দে পরিবেশিত হতো। এতে গণমানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, সফলতাব্যর্থতা, জীবনের পালাবদল ও বিপর্যয় কিম্বা নানান লোককথা-উপকথা নৃত্য ও বাদ্যবাজনা সহকারে গীত হতো।

কক্সবাজারের ভাইট্টাল গীত পরিবেশনায় মালিক সোবহান দুলাল আচার্য ও অন্যান্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে কুতুবদিয়ার তোরাবউদ্দিন গাইন সর্বপ্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। প্রায় সকল গাইন-ই তাঁকে ওস্তাদ মান্য করেন এভাবে:

গীতগাই মাসী গাই পদর পালাম সাইন
সকল গাইনর ওস্তাদ মানম তোরাবউদ্দিন গাইন

(মোমেন: ১৯৯৩: ভূমিকা)।

এ ছাড়া আশুর আলী, বরকেথা গাইন, কালা মিয়া, সেকান্দর আলী, আবদুল আলী, গৌরাঙ্গ জলদাস, সুলতান আহমদ, মকবুল আহমদ প্রমুখ চট্টগ্রামের বিখ্যাত গাইন। চট্টগ্রাম থেকে আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪) ও আবদুস সাত্তার চৌধুরী (১৯১৮-১৯৮২) বহু পালাগান সংগ্রহ করেন। এর কিয়দংশ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়* এবং *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলনে* (৫৪-৫৭. ও ৬০তম খণ্ডে) প্রকাশিত হয়। ডক্টর মোমেন চৌধুরী জানান: আশুতোষ চৌধুরী সংগৃহীত পালাগুলি লোকজীবন-ভিত্তিক আর সাত্তার চৌধুরী সংগৃহীত পালাগুলো রূপকাশ্রয়ী (মোমেন চৌধুরী: ১৯৯৩: ভূমিকা)। এ ছাড়া ওহীদুল আলম (১৯১১-১৯৯৮) ও মুহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী (জন্ম ১৯৫১) কিছু পালাগান সংগ্রহ করেন।

১.খ. বারমাইস্যা

মোমেন চৌধুরীর মতে এটি কৃষাণদের কর্মসঙ্গীত। এতে বাদ্যযন্ত্র লাগে না। ২০-৩০ জন কিষাণ স্থানিক সুরে গেয়ে থাকে। (মোমেন: ১৯৯৩: ভূমিকা)। এ ছাড়া জীবনসংগ্রামে পরাজিত গ্রাম্য নারীপুরুষ জীবনের শোকদুঃখ ও বিরহ-বেদনায় যে কোনো সময় এই গান গেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে মনে পড়ে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের ফুল্লরার বারমাস্যার কথা। ফুল্লরার মতো এখানেও সন্তান-বিরহে পিতামাতা, স্বামী-বিরহে স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা বছরের বার মাসের নানান স্মৃতি রোমন্থন করে বারমাস গেয়ে থাকে। এর সুর আঞ্চলিক ও বিরহকেন্দ্রিক। আবদুস সাত্তার চৌধুরী চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু বারমাইস্যা সংগ্রহ করেন। সে গুলো বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। (মোমেন: ১৯৯৩)।

১.গ. হালদাফাড়া গান

উত্তর চট্টগ্রামের হালদানদীর নামানুসারে এই গানের সৃষ্টি। নদীটি দেশীয় উন্নতজাতের রুই-কাতলার পোনা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। পোনা উৎপাদনের মৌসুমে জেলে ও মাঝি-মাল্লারা মনের আনন্দে গান গায়। বেশ উচ্চ কণ্ঠে গলা ছেড়ে গায় বলে নদীর আশপাশ এলাকা প্রকম্পিত হয়। এ জন্য এটার নাম হালদাফাড়া গান। যেমন:

হালদাফাড়া গান গাই / বিয়াগুনে ধান কাঁড়ি চল / হারা বিল মাতাই...
কাড়ি যাইয়ুম ধানর গোছা / নারা কাড়ি বাইন্দুম পোঁঝা /
গুরা গুরা পোয়া অঞ্চলে / ভাঁইরত লইব ধান তোয়াই ...

১.ঘ. কর্মসঙ্গীত

শ্রমিকদের সম্মিলিত কোরাস। এর উদ্দেশ্য দেহতৎপর শ্রম নিরসন। এর ভাষা অকিঞ্চিৎকর ও সুর পুনরাবৃত্তিমূলক।...একক কণ্ঠে একটি স্তবক গাওয়ার পর সম্মিলিত কণ্ঠে তাল নির্দেশক একই কথাগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফলে সৃষ্টি হয় সাঙ্গীতিক সুর মূর্চ্ছনা। যেমন:

এক বলে লালী / লালী, বল দিব হযরত / আলীরে.......
হেই হেই / হেইয়া, জোরে বল / হেইয়া
আল্লার নামে / হেইয়া, নবীর নামে / হেইয়া
জোরে বল / হেইয়া, আরও জোরে / হেইয়া ... প্রভৃতি।

www.pathagar.com

১.ঙ. গাছাগান

ঝাড়ফোঁক ও তান্ত্রিক চিকিৎসায় এই সঙ্গীত পরিবেশিত হতো। মেয়েদের হিষ্টিরিয়া রোগকে গ্রামাঞ্চলে ভূতের আছর বলে। এ ছাড়া যাদুটোনা প্রভৃতির বিশ্বাস ছিল প্রবল। এ সবের চিকিৎসা ছিল ঝাড়ফোঁক ও তন্ত্রমন্ত্র। এই চিকিৎসায় তাবিজ তুলা বা ভূত তাড়াতে জ্বিন-পরী হাজির করা হতো। এ জন্য তুলা রাশির জাতক কোনো নারী বা বালককে করা হতো গাছা। তান্ত্রিক বা বৈদ্য তন্ত্রমন্ত্র পড়ে গাছার গায়ে ফুঁ দেন আর বৈদ্যের সহযোগী ধাতব থালায় লৌহদণ্ডের তাল দিতে থাকেন। তখন শুরু হতো গাছার নৃত্য। নৃত্যের তালে তালে তান্ত্রিক-বৈদ্য নানা কথার মালা সাজিয়ে গাইতো গান। এ গানের ধূয়া হচ্ছে 'মারে আয় আয় আয়'। যেমন:

মইগঘা আইয়ের খালেনালে ? মঘনি আইয়ের কই ? /
মইগঘার ঝি মঘনি আইয়ের পিচ্ছা থুরুং লই / মারে আয় আয় আয়...

(সালমা: ২০০৭)।

১.চ. ঘুমপাড়ানি গান

শিশুদেরকে ঘুমপাড়ানোর গান। কান্নারত শিশুকে দোলনায় দিয়ে বা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে শিশুর শরীরে হাতের হালকা ছোঁয়ার তালে তালে মা, দাদি বা বড়বোনরা এই সঙ্গীতের মাধ্যমে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে দিতো। যেমন:

ক. অলিরে আলি অলি / ঘুম যারে কলি / ঘুমত্তুন উড়িলে অলি / খাইব দুধর নলি।
খ. ঘুম যারে দুধর বাচা / ঘুম যারে তুই / ঘুমত্তুন উড়িলে বাচা / বচ্ছু দিতুম মুই
গ. ন কাঁদিচলে দুধর বাচা / ন কাঁদিচলে তুই / কেলা গাছৎ বইসসে বাঁদর / ধাপাই দিমভই মুই
ঘ. আঁত্তু পুথু কই কই / পন্নাত গিয়ে গই / পন্নাত্তু আইয়ের পুতু / বারাই আনমভই

(সালমা: ২০০৭)।

১.ছ. ফুলপাট গান

নিঃসন্তানে সন্তান কামনায় এই গানের আয়োজন হতো। এই গানে গায়ক সাবলীল সুর, ছন্দ ও কথায় নারীর গর্ভবতী হওয়া থেকে সন্তানের ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত ক্রমবিবর্তন-ধারা বর্ণনা দিতেন। যেমন:

একমাসের কালে যাদু রক্ত ফোটাফোটা / দুইমাসের কালে যাদু রক্ত গোটাগোটা
তিনমাসের কালে যাদু চামড়া দিল ছানি / চারমাসের কালে যাদু রৌকের জানাজানি
পাঁচমাসের কালে যাদু হাড্ডিমাংশে জোড়ে/ ছয়মাসের কালে যাদু উলটেপাল্টে
সাতমাসের কালে যাদু হাদির খানা খায় / আটমাসের কালে যাদু আষ্টমোকাম পায়
নয়মাসের কালে যাদু নবদন্ত তিথি / দশমাসের কালে যাদু উদরে বসতি
দশমাস দশদিন যাদুর পূরণ হইল / উহুমাহু গরি যাদু কাঁদিতে লাগিল
কেমেল চিবি ধরলে মাগো কেমেল চিবি ধর / আল্লার না হুকুম অইলে পরান রক্ষা গর।

(নূরুল ইছলাম: ১৯৬৫: ৭৫-৭৬ / সংশোধন: সালমা: ২০০৭)।

১.জ. উল্টা গান

হাটবাজার ও গ্রামগঞ্জে দরিদ্র স্বভাব-শিল্পীগণ পেটের দায়ে এই গান গেয়ে বেড়াতো। সমাজ-সংসার ও প্রকৃতির নিয়ম-বিরোদ্ধ চিত্র এই গানে ফুটে উঠে বলে এর নাম উল্টা গান। যেমন:

১. রাতাকুরা শিয়াল দোঁ-ওঁ-রার / ওন্দুরে দোঁ-ওঁরার বিলাই /
মশা কঁ-অঁরাই মানুইষ মাইজ্জে / কন জবানাৎ আইলাম আঁই
২. মরদ পোয়ায় শারি পিন্দের / লঙ্কি বানাই
মাইয়া পোয়ায়ে বিচার দিয়ে / আদালতত যাই
এখন মাইয়া পোয়য়ে শাট গা-আ-ত দের / আদালতর বিচা পায়

www.pathagar.com

৩. কালা ইচা বিদেশ পাঠার / ইনুচি বানাই
বিদেশত্তুন খবর অইশসে / ব্যঙ লই যাইবাল্লায়
এখন বিলর ব্যাঙ তো বিদেশ যারগই / হাফর অইব কন উপায় ? (নিজস্ব স্মৃতি থেকে)।

২.ক. হাইল্লা সারি

জমিতে ধান রোপনের সময় কামলাদের সমবেত কোরাস। চট্টগ্রামে হালচাষের কামলাদের বলা হয় 'হাইল্লা'। তাই এর নাম হাইল্লাসারি। বরকেথা গাইনের একটি হাইল্লাসারির অংশ বিশেষ এ রকম:

হাইল্যা রইয়ে ছন ঘরত / গিরছ রইয়ে বর ঘরত /
নিত্তিপিত্তি ঝর পরেদ্ধে / হাইল্যার ঘরতঘানত / ও..ভাইরে,
দুখেসুখে রাইত কাড়াই / ফজর আইলে হাললই যাই /
পুগর বেইল পচিমে গেইয়ে / ভাতর দেখা নাই-/ ও.. ভাইরে-

(ইসলাম: ২০০৩: ৩৩)।

২.খ. পাইন্না সারি

এটিও একধরনের হাইল্লাসারি। সন্দ্বীপ অঞ্চলে প্রচলিত। আট থেকে দশজনের কৃষক দোহার সহযোগে তালে তালে সারিবদ্ধভাবে গেয়ে থাকে।

২.গ. নৌকা বাইচের গান

নদীতে নৌ-চালনা প্রতিযোগিতায় মাঝিদের সম্মিলিত কোরাস। বিশেষভাবে তৈরি সরু ও লম্বাটে এক একটি নৌকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক মাঝি জয়ধ্বনি সহকারে নৌকা ছেড়ে দিয়ে এই কোরাস গায় আর তালে তালে বৈঠা টানতে থাকে। ফলে বৈঠার ঠোকাঠোকি হয় না। বরং সম্মিলিত সঙ্গীতের তালে নৌকার গতি বাড়তে থাকে এবং পরস্পরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এই গানে মূল গায়কের কথার ফাঁকে অন্যরা শুধু 'হেই, হেই, হেইয়ো' বৃন্দধ্বনির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

২.ঘ. হঁ-অ-লা

বিয়ে-শাদি, কর্ণছেদন বা খৎনা উপলক্ষে মেয়েরা হঁ-অ-লা গাইতো। অন্দরমহলে মেয়েরা চারদিকে ঘুরে বসতো আর তাদের মাঝখানে কোনো একজন নৃত্য সহকারে পরিবেশন করতো। জনপ্রিয়তার ফলে, এক সময় অনেক পুরুষ ও হিজড়া এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতো। এরা রীতি মতো শাড়ি ও অলংকার পরে নৃত্য সহকারে হঁ-অ-লা গেয়ে আসর মাতিয়ে তুলত। হঁ-অ-লার ধূয়া হচ্ছে 'মরি হায় হায় রে'। বিভিন্ন লোককথা ও কিংবদন্তির কাহিনী হঁ-অ-লার বিষয়বস্তু হতো। এ ছাড়া যাকে উপলক্ষ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো, তার নামেও হঁ-অ-লা হতো। চট্টগ্রামের মলকাবানুর *হঁ-অ-লা* কিংবদন্তিতুল্য। পরিবানুর হঁ-অ-লা, আঁতুরা ও বেগমজানর হঁ-অ-লা প্রভৃতিও বেশ জনপ্রিয়। 'আঁতুরা ও বেগমজানর হঁ-অ-লা'র অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

বেগমজান: পথত কেল্লা পরি রইয়ছ আঁতুরা /
আঁতুরা রে পতথান ছারি দ..অ না রে / মরি হায় হায় রে...
আঁতুরা: তর ছ ভইনে ডিঁয়াই গেইয়ে বেগমজান /
বেগমজান রে তুইও ডিঁয়াই যা...নারে / মরি হায় হায় রে,...
বেগমজান: বুরাবুরির মানা আছে আঁতুরা /
আঁতুরারে পুরুষ ডিঁয়ন মা...না রে / মরি হায় হায় রে...

(মাষ্টার: ২০০২: ২৬)।

www.pathagar.com

কক্সবাজারের বিয়ের গান (শুক্কুর ও তার দল)

২.ঙ. জারি

বিয়োগান্তক ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনামূলক সঙ্গীত। একজন গায়ক কয়েকজন সহযোগী নিয়ে নানান দৃষ্টান্ত ও ঘটনা পরম্পরায় মূল কাহিনীর সাঙ্গীতিক বর্ণনা দিয়ে যান। সহযোগীরা গায়কের কথার ফাঁকে পুনরাবৃত্তিমূলক ধূয়া গাইতে থাকেন। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের ও রক্তপাত, বিশেষ করে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ে জারিগানের উদ্ভব ঘটে। তাতে বীররস ও করুণ রসের সংমিশ্রণ ঘটে (চক্রবর্তী: ১৯৯৫: ১৪৩)। প্রথমদিকে *নবী জীবনী, মা ফাতেমা, বিবি কুলসুম, হযরত বেলাল, হাসান-হোসেন, শহীদ কারবালা, আইয়ুব নবী, ইসমাঈলের কোরবানী, হানিফার লড়াই, বড়পীর, ছালেজঙ্গী, খাজাবাবা, ওয়াজ করনী, শাহজালাল, শেখ ফরিদ, ইউসুফ জুলেখা ইত্যাদির* জারি জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীতে সমকালীন নানান চাঞ্চল্যকর ঘটনাও জারিগানের বিষয় হয়েছে। বর্তমানকালে জন্মনিয়ন্ত্রণসহ সরকারের বিভিন্ন গণমুখী প্রচারকাজে জারিগান বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচলনকালে বহু-বিবাহের কুফল সম্পর্কে একটি জারি গানের সূচনা ছিল নিম্নরূপ:

আমার সুখ নাইরে...সুখ পরানের পাখি / আঠারটি বিয়া করলাম জেলায় জেলায় ঘুরি / আমার সুখ নাইরে (নিজস্ব স্মৃতি থেকে)

২.চ. বিলাপ

মহিলাদের ক্রন্দনসঙ্গীত। লোকবিজ্ঞানের ভাষায়: নারীর নিদ্ধকরুণ জীবনালেখ্য (চক্রবর্তী: ১৯৯৫: ৭৭)। সাধারণত বিয়ের দিন পিতামাতা, আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিয়ে পালকিতে চড়ার মুহূর্তে নারীরা বিচিত্র সুরে বিলাপ করে। পিতা-মাতা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বিয়োগেও মহিলারা বিলাপ করে। এতে পিতামাতা, ভাইবোন, দাদাদাদি বা সঙ্গীসখিদের উদ্দেশ করে ফেলে আসা জীবনের সুখস্মৃতি রোমন্থন করা হয়। নারীজীবনের শোক-দুঃখের সাঙ্গীতিক বর্ণনায় বিলাপ হয়ে ওঠে মর্মস্পর্শী। বিলাপে কয়েকছত্র কথার পর 'মারে ...মারে...মারে' ধ্বনির পূনরাবৃত্তি ঘটে।

www.pathagar.com

২.ছ. ক্যাম্পাছারর গান

তথাকথিত স্বপ্নপ্রাপ্ত বা গাছগাছড়া-উৎপাদিত ঔষধ একদা হাটেহাটে বিক্রি হতো। বিক্রেতারা তাদের ঔষধের গুনকীর্তন করতো বিভিন্ন গানে। হাঁড়ভাঙ্গা নিরাময়ের জন্য জনৈক ইসমাইলের উৎপাদিত তৈল বাজারজাত করার একটি গান:

ইছমাইলের হাড়ভাঙ্গা তেল বড় উপকারি /
বিষ-বেদনায় কষ্ট পাইলে / দিবা মালিশ গরি। (নিজস্ব স্মৃতি থেকে)

৩.ক. আঞ্চলিক গান

'বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক গান' ।(চক্রবর্তী: ১৯৯৫: ১৬)। চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতের মৌলিক সম্পদ এই আঞ্চলিক গান। আঞ্চলিক ভাষায় (ঈভনরনদঢ়) রচিত ও গীত বলেই এটা আঞ্চলিক গান। চট্টগ্রামাসীর নিজস্ব ধ্যানধারণা ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের এরূপ স্বতস্ফূর্ত মাধ্যম আর নেই। একটি দৃষ্টান্ত:

'মাইক বাজের আর ঢোল বাজের / আঁর পরানে কেন গরের/
কেন গরি যাইয়ুম পারের ঘর / যাইয়ুম পরর ঘর'

এই গানে সানাইয়ের করুণ সুরে পৈত্রিক নিবাস ছেড়ে যাওয়া নারী হৃদয়ের আর্ত হাহাকার অতুলনীয়। এভাবে চট্টগ্রামের চিরন্তন লোকজীবনের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তিই আঞ্চলিক গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবন ও লৌকিকতার সঙ্গ-অনুষঙ্গ, প্রেম-বিরহ, আত্মীয় বিয়োগ ও বিচ্ছেদ বেদনা, ঐতিহ্য ও স্বদেশপ্রেম, সর্বোপরি জীবন-জীবিকার হরেক প্রসঙ্গ এই গানের সম্পদ। এই গানের স্বাতন্ত্র সুর, ভাব ও বাণীর ব্যঞ্জনা। কাহারবা, ঝুমুর, খেমটা, গৌর খেমটা, একতালা, পোস্তা, ঠুংরি, বৃন্দাবণী, ছাপকা, আদ্ধা, কাশ্মিরী, দাদরা, তেতলা, প্রভৃতি তাল ও লয়ে এই গান গাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক অভিন্ন ব্যক্তি। ফলে এতে কৃত্রিকমতার সুযোগ নেই। (ঘোষ: ১৯৯৮: আট)। এ গানের সূত্রপাত কবে, কার হাতে- তা অনির্ণেয়। তবে চট্টগ্রামের আবহমান পুঁথির আসর, কবির লড়াই বা পালাগানের মাধ্যমে তার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। বর্তমানে এসব গানের সংখ্যা প্রচুর, তার গায়ক, গীতিকার ও সুরকার অনেক।

৩.ক.১. আঞ্চলিক গান: বিষয় ও বৈচিত্র্য

কল্যাণী ঘোষ বিষয়-বৈচিত্র্যে আঞ্চলিক গানকে ২০ভাগে বিন্যাস করেন (ঘোষ: ১৯৯৮: আট-নয়)। সামগ্রিক বিচারে আমাদের বিন্যাস নিম্নরূপ: (১). প্রেম-বিরহ, (২). স্বদেশ প্রেম (৩). ঐতিহ্যপ্রীতি (৪). সমাজ-ভাবনা (৫). বিবিধ।

৩.ক.১. প্রেম-বিরহ

নর-নারীর প্রেম-বিরহের নিঃসংকোচ প্রকাশ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। প্রেমের সফলতার চেয়ে বিরহের গান এখানে বেশি জনপ্রিয়। আসকর আলী পণ্ডিতের কথায়:

মন পাখিরে বুঝাইলে সে বুঝে না / প্রবোধ মানে না
আমার বন্ধু রাস্তা দিয়া যায় / ইঞ্চি ফাইলর ধুতি রে পিন্দি / মুরালী বাজায়

এ রকম অসংখ্য গান আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে মুখে শুনা যায়। এ সব গানে পুরুষের চেয়েও নারী হৃদয়ের আকুতি প্রকট। এর জন্য দায়ী এখানকার যুবকদের প্রবাস-জীবন। বর্তমানে যেমন মধ্য-প্রাচ্য, তেমনি একদা বার্মা-আরাকান বা রেঙ্গুন-ই ছিল চট্টগ্রামবাসীর জীবন-জীবিকার কেন্দ্র। তখন এখানকার যুবকদের যৌবনের সিংহভাগ সময় কেটেছে রেঙ্গুন প্রবাসে। নারীর বিচ্ছেদ-বেদনা তাই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন:

www.pathagar.com

রাখাইনদের প্রজাপতি নৃত্য (ক্যামং ও তার দল)

১. ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে.../ কনে খাইব রেঙ্গুনর কামাই / ওরে শ্যাম (কথা: আবদুল গফুর হালি)

২. সূর্য উডেরলে ভাই লাল মারি / বন্ধু যায় আঁর বুকত ছেল মারি (কথা: অচিন্ত্য চক্রবর্তী)

৩. আঁধার ঘরত রাইত কাড়াইয়ম কারে লই / বন্ধু গেলে গই (কথা: রমেশ শীল)

নব-বিবাহিতা স্ত্রী ফেলে স্বামী বিদেশে। সেখানে বর্মী তরুণীরা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। তারা সহজেই চট্টগ্রামী যুবকদের হৃদয় হরণ করে নিত। ফলে প্রবাসী স্বামী বা প্রেমিক বর্মী-তরুণীর রূপ-মুগ্ধ হয়ে দেশের স্ত্রী বা প্রেমিকার কথা ভুলে যেতো (আলম: ১৯৮৫: ৭১)। এই বিচ্ছেদ-বেদনা ছিল নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক পরিণতি। যেমন:

রেঙ্গুন রঙ্গিলার সনে / মজি রইলা মন /
এই মত দেবাইল্যা হইয়া / রইল কত জনরে / রেঙ্গুন রঙ্গিলারে.....

রেঙ্গুন প্রসঙ্গ ছাড়াও মানব-মনের বিচিত্র অনুভূতিপ্রবণ বহু প্রেমের গান অসম্ভব জনপ্রিয়।

১. ন মাতাই ন বুলাই গেলিরে বন্ধুয়া / মনর আশা ন পুরালি

২. বানুরে............. /জি ...... / আবানু .... / জি জি জি....

আই যাইয়ুম চাড়িয়া শহরত/ তোঁয়ার লাই আইন্নম কী?

ন লাগিব শাড়ি চুড়ি/ন লাগিব / কন কিছু ন লাগিব তোঁয়ারে পাই যদি (দ্বৈত কণ্ঠ)।

৩.ক.২. স্বদেশপ্রেম

মাটি ও মানুষের প্রতি আকৃত্রিম ভালবাসা আঞ্চলিক গানে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। যেমন: আবদুল গফুর হালীর চোখে চট্টগ্রামের তুলনা দুনিয়া-বিরল:

সারা দুইন্যাই ঘুরি চাইলাম/ ন পাইলাম চাড়িয়ার নান / চাড়িয়া আঁর পরানর পরান।

রমেশ শীলের গানে দেশবাসীর প্রতি হৃদ্যতা:

www.pathagar.com

আঁরে কনভুতে পাইয়ে/ হিন্দুস্থান যাইতাম / দেশইত্যা ভাই বন্ধু ফেলাই / কিল্যাই রিফুজি হইতাম

এম.এন আখতারের কথায় পীর বদরের মহাত্ম্য:

এক চাড়ি জাগা লইল/ বদর শাহ আউলিয়া / ওরে চেরাগ জ্বালাই /নাম রাইখ্যে ভাই জিলা চাড়িয়া

অজিত চক্রবর্তীর গানে অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য:

ও ভাই আরা চাটগাঁইয়া নওজোয়ান / আঁরা হিন্দু-মুসলমান /

দৈজ্জার কুলত বসত গরি/ সিনাদি ঠেকাই ঝড়-তোয়ান

৩.ক.৩. ঐতিহ্যপ্রীতি

ইতিহসি-ঐতিহ্য ও দৈনন্দিন জীবনের নানান অনুষঙ্গ আঞ্চলিক গানে মূর্ত হয়ে উঠে। ঘুরেফিরে আসে লোক-ঐতিহ্য নদী, সাম্পান ও মাঝি:

১. ছোড় ছোড় ঢেউ তুলি পানিত / লুসাই পাহাড়ত্তুন লামিয়রে / ঘারগই কর্ণফুলী। (কথা: মলয়ঘোষ দস্তিদার)

২. ওরে সাম্পানওয়ালা / তুই আমারে করলি দেওয়ানা (কথা মোহনলাল দাশ)

৩. পালে কি রং লাগাইল মাঝি / সাম্পানে কি রং লাগাইল /শঙখনদীর সাম্পানওয়ালা / আঁরে পাগল বানাইল (ইয়াকুব আলী)

বিভিন্নস্থানে উৎপাদিত খাদ্য-দ্রব্যের আকর্ষণ:

১. তরমুজ ভালা পতেঙ্গার / গয়াম মজা পটিয়ার / লাইল্যার হাঁড়র বঅর খানি /
কি মজার জিনিশ / খাইলে বুঝিবা / ন খাইলে পস্তাইবা (সনজীত আচার্য)

২. টেকনাইফ্যা ফোয়ানা সোয়ারি / মইশখাইল্যা পানরে / আদরগরি খাবাই দিয়ম / আঁর তালত ভাইয়রে

৩. যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম / বকসির হাইট্যা পানর খিলি তারে/ বানাই খাবাইতাম।

৩.ক.৪. সমাজ-চিত্র

আঞ্চলিক গানে সমকালীন দেশ-কাল ও সমাজ-চিত্রের বহু বর্ণিল প্রতিফলন রয়েছে। যেমন:

দরিদ্র ঘরের মেয়ের বিয়ে-ভাবনা:

ওরে ভইন বাঁচনি/ কনে কইব জামাই কোয়ালত আছে নি

মরদ পোয়ার যে দাম বাইজ্যে/ আল্লায় জানে কমে নি... (আবদুল গফুর হালী)

শহরবাসী কাজের বুয়ার জীবন-চিত্র:

আসকার ডিইর পুক পারে আঁর বাঙ্গাচোরা ঘর / হলইদ মরিচ ম-মসল্লা বাড়ি হোটেলর

বঅস্তি আর হানড়ি অলা/ মিড়া কথা কয় / ঠগা হাসি ভাইল দি চলি/ আই তারাল্লয় (সৈয়দ মহিউদ্দিন)

গ্রাম্য ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার বেহাল দশা:

ও মামুরে / হেড মাস্টরে তৌঁয়ারে তোয়ার.../ পোয়া উগ্‌গা পননাত দিলা / কেন পরে যাই ন চাইলা /

পরীক্ষাত ত ফেইল গইজ্জে পান লার / ও মামুরে... (সিরাজুল ইসলাম আজাদ)

৩.ক.৫. বিবিধ

বিচিত্র বিষয়াদি ছাড়াও বিবিধ ভাবের বহু আঞ্চলিক গান অসম্ভব জনপ্রিয়। যেমন:

১. বরই ফুলর থামি/ আর একখান গোল বাহার / যদি পাইতাম আঁই পিনতাম/
আনা ধরি চাইথাম/ আঁরে কেন কেন লার (এম.এন আখতার)

২. নাতিন বরইখা বরইখা হাতে লইয়া নুন / ঠেইল ভাঙ্গিয়া পইজ্যে নাতিন বরই গাছত্তুন (রমেশ শীল)

৩. ও জেড়া ফইরার বাপ/ ও জেড়া ফইরার বাপ / একদিন বুঝিবি জেড়া / একদিন বুঝিবি (সৈয়দ মহিউদ্দিন)

www.pathagar.com

৩.খ. মাইজভাণ্ডারি গান

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডারি তরিকার পীর সৈয়দ আহমদ উল্লাহর (১৮২৬-১৯০৬) আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতা কেন্দ্রিক এই গানের নাম স্থান-নাম অনুসারে মাইজভাণ্ডারি গান। চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত এবং সামগ্রিকভাবে বাংলার মরমী সঙ্গীতের ধারায় এ এক নতুন সংযোজন। যেমন:

দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে হইতেছে নূরের খেলা/ নূরের মাওলা বসাইছে প্রেমের মেলা/

আল্লাহ আল্লাহ রবে নানান বাদ্য শুনা যায় / গাউসুল আজম শব্দ করে আসেকানে হুঁস হারায়-

এই কথাতেই মাইজভাণ্ডারি গানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। সৃষ্টিকর্তা ও পীরের মহাত্ম্য এই গানের প্রতিপাদ্য। এর মর্ম ঐশী প্রেম, তবে ভাণ্ডারি বাবার মাধ্যম ও সুপারিশ তার কাম্য। (মনিরুজ্জামান: ২০০২: ৮২)। তাই তাঁর সান্নিধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রবণতা ভক্তদের মাঝে দেখা যায়:

১. একি চমৎকার/ ভাণ্ডারেতে আজগুবি কারবার / মানুষ ধরার কল বসাইছে/
আমার বাবা ভাণ্ডারী / সেই কলেতে পরলে ধরা/ তার থাকেনা ঘরবাড়ি /

২. মাইজভাণ্ডারির তরিক ধরি কর রে মন সাধনা / দেখবে তুমি তোমার মাঝে খেলবে রে আপন জনা

শুধু আহমদউল্লাহ মাইজভাণ্ডারি নয়, চট্টগ্রামের অন্যান্য পীরসহ সিলেটের শাহজালাল, ভারতের খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি কিংবা বাগদাদের আবদুল কাদের জিলানির শানেও এখানে গান হয়। সুর, তাল ও বাণী-বিন্যাসে সবগুলো গান প্রায় একই। সামগ্রিকভাবেই এগুলো মাইজভাণ্ডারি গান হিসেবে পরিচিত। শাহ মোহছেন আউলিয়ার শানে গানের কথা এ রকম:

১. কি ধন দিলা আল্লাহ তুমি আনোয়ারা থানাতে/ বটতলী গ্রাম রৌশন হইল সেই নুরের আলোতে...
আষাঢ় মাসের ছয় তারিখে হয়রে ঝড় তুফান/ মিলন মেলায় আসে কত হিন্দু-মুসলমান

২. রহমতের বৃষ্টি পরে আষাঢ় মাসের ছয়/ সে তারিখে শাহ মোহছেনের মিলন মেলা হয়
আশেক গণে জজবা হলে/ নাচে গানে তালে তালে / তার উছিলায় খোদাকে পায়/ ভক্ত প্রেমিক কয়...

ভাণ্ডারি গানের চেতনাটি সূফিতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই অনেকে মুর্শিদি-মারেফতি, হাছন বা লালনগীতির এর তুলনা করেন। কিন্তু হাছন বা লালনগীতির মতো ভাণ্ডারি গান কোনো একক সৃষ্টি নয়। অসংখ্য গীতিকারের অজস্র গানে সমৃদ্ধ হয়েছে এই গানের জগৎ (জাহাঙ্গীর: ১৯৯৬: ৫৪)। এই গান বিশেষ তরিকা ও স্থানগত বিশেষত্বের ওপর নির্ভরশীল।...ধর্মগত সংযোগটুকু ছাড়া এর সবটুকু আবহাওয়াই দেশজ ও লোকজ (মনিরুজ্জামান: ২০০২: ৮৪)। এ জন্যই মাইজভাণ্ডারি গান সূফিতাত্ত্বিক-মরমী ঘরানার হয়েও স্বতন্ত্র লোকসঙ্গীত। বিভিন্ন ওরশ, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ভক্ত-অনুরক্তরা ঢোল ও বাদ্যবাজনাসহ এই গানে আত্মহারা হয়।

৩.গ. মারেফতি

মাইজভাণ্ডারি গানের বহু আগেই চট্টগ্রামে মারেফতি গানের প্রচলন ছিল। সাতকানিয়ার মির্জারখিল ও আনোয়ারার কানু ফকিরের দরবারই এখানকার মারেফতি গানের উৎস বলে অনুমিত হয়। সপ্তদশ শতকের সাধক-কবি আলীরজা ওরফে কানু ফকির (১৬৮০-১৭৬৫) এ গানের আদি-প্রণেতাদের শ্রেষ্ট প্রতিনিধি। তিনি শ্যামাসঙ্গীতসহ সাত শতাধিক গানের স্রষ্টা। তাঁর প্রায় সব ক'টি গানেই তাঁর নাম আছে। যেমন:

গুরু কি ধন ন চিনিলি / যারগৈ চলি জোয়ানি / *কানুর* মন মজিলরে / চল এইবার তেদশে ফিরি
সাধন কর না মন হারাই রতন / বিধির বিধি সব কর যতন / গুরু কি ধন ন চিনিলি রে মন...

কানু ফকিরের ওরশে ভক্তরা তাঁর গানের জলসা বসায়। মির্জারখিল তরিকার পীর শাহসূফি মুখলেছুর রহমান (আঠার শতক) ও তাঁর পুত্র শাহ সূফি মোহাম্মদ আবদুল হাই (উনিশ শতক)। তাঁদের অনুসারিরা শরিয়ত ও তরিকতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান। তাঁরা সৌদি আরবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রোজা, নামাজ ও ঈদ

www.pathagar.com

আদায় করেন। তাঁদেরও রয়েছে নিজস্ব মারেফতি গান। যেমন:

১. আজ বান ডেকেছে প্রেমের দরিয়ায়/ প্রেম নগরে কে কে যাবি আয় /
প্রেমের লীলা প্রেমের খেলা/ চলবে যখন সারা বেলা / স্বর্গ এসে দেবে ধরা / মাটির দুনিয়ায়।

২. দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ / ঘাটে ঘাটে জারি আছে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ

এ ছাড়া পটিয়ার কাজী আমিরুজ্জামান শাহ (উনিশ শতক), আনোয়ারার শাহ সূফি আবুল খায়ের নকশাবন্দী, কানু ফকিরের পুত্র শরাফত উল্লাহ (আঠার শতক), সমকালীন কবি ফাজিল নাসির, উনিশ শতকের জীবন পণ্ডিত, কমর আলী, পটিয়ার আসকর আলী পন্ডিত (১৮৪০-১৯২৮), সাতকানিয়ার হেফাজতুর রহমান প্রমুখ বহু মারফতি গানের রচয়িতা।

ঐতিহ্যগতভাবে অদৃষ্টবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চট্টগ্রামের মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পীর-মুর্শিদের ভক্ত। তাই আধ্যাত্মিক কান্নার সুর এখানকার মারেফতি গানের বৈশিষ্ট্য। পীর-মুর্শিদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার কৃপা লাভের স্পৃহা এসব গানে ব্যঞ্জিত হয়। মাইজভাণ্ডারি গানের বৈশিষ্ট্যও প্রায় একই। পার্থক্য হচ্ছে কথা, সুর, ভাবাবেগ বা জজবায়। ভাণ্ডারি গানে 'বাবা ভাণ্ডারি', 'মাইজভাণ্ডারি', 'শানে বাবা' প্রভৃতি কথার পূনরাবৃত্তি থাকে। মারেফতি গানে তা নেই। ভাণ্ডারি গানের ভাবাবেগ বা জজবা বেশি। মারেফতি গানে জিকিরের ভাবই বেশি। এর জজবা বা আবেগ সংহত।

৩.ঘ. কবিগান

চট্টগ্রামের কবিগান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কবিগানের উদ্ভদ অষ্টাদশ-উনিশ শতকের কলকাতায়। সামন্তবাদের পতন ও পুজিবাদের উত্থানের মাঝামাঝিতে তৎকালীন সভাব কবিদের প্রতিভা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মাথা ঠুকে মরেছে। নবোত্থিত ধ্বনিক শ্রেণীর স্থুল মনোরঞ্জনেই তারা গান ধরেছিলেন। ফলে অশ্লীলতা ও খিস্তি-খেউড়ের প্রাবল্য তখনকার কাবিগানকে মার্জিত মর্যাদা দেয়নি। চট্টগ্রামের কবিগান সে অভিশাপমুক্ত। এখানকার কবিগান স্বদেশ ও স্বজাত্যবোধে উজ্জীবিত। যেমন:

১. আর কতদিন পরাধীন থাইবা বন্ধুগণ / ৪০ কোটি ভারতবাসী এখনও অচেতন

২. হিন্দু মুসলিম দাঁড়িমাঝি চালাও ঐক্যের নাওখানি / একযোগেতে করতে হবে স্বাধীনতার আমদানি।

এ সব গান নিয়ে একদা গোটা বঙ্গদেশ কাঁপিয়েছেন চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও ফনী বড়ুয়া। বস্তুত চট্টগ্রামের এই দুই কবিয়াল বাংলা কবিগানের যুগপ্রবর্তক জুটি। তৎপূর্বে কবিগান ছিল মিথ-ঐতিহ্য ও পুরান ভিত্তিক। প্রচলিত পালা ছিল: রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি। বন্দনা হতো পীর-ফকির বা দেব-দেবীর। সে ক্ষেত্রে রমেশ-ফণী বিষয় আনলেন কৃষক-জমিদার, শ্রমিক-মজুতদার, স্বৈরতন্ত্র-গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র প্রভৃতি। দেবদেবী ও পীর-ফকিরের পরিবর্তে বন্দনা গাইলেন স্বদেশ ও সমাজের, স্বাধীনতার বীর সেনানী ও কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের-। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রমেশ শীল গাইলেন:

বঙ্গভঙ্গ করো না হিন্দু মুসলিম ভাই / মিলে মিশে চল সবে অভিযানে যাই
পশ্চিমবঙ্গ ছুটে গেলে, শিক্ষা শিল্প যাবে চলে / পাট খেলে কি উদর চলে, ভেবে চাও সবে

আর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গাইলেন:

পাঁচগজ ধুতি সাত টাঁয়া/ দেহ টেকা হয়েছে কঠিন /
রমেশ কয়, আঁধারে মরি / পাই না কেরোসিন (শাহেদ: ১৯৯৩: ১৭, ভূমিকা)।

রমেশ শীলের এই রূপান্তর সম্পর্কে তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়া বলেন:

মাইজভাণ্ডারের ভক্ত ছিল কবিয়াল রমেশ
আমার টানে দেশভাণ্ডারে করিলেন প্রবেশ (শাহেদ: ১৯৯৭: ১২)।

রমেশ-ফণীর এই রূপান্তর কবিগানের প্রথাগত ধারারই রূপান্তর। তবে শুধু রমেশ-ফণী নয়, চট্টগ্রামের কবিগান সমৃদ্ধির পেছনে পূর্বাপর মোহন বাঁশি, চিন্তাহরণ, দুর্গাচরণ, অর্পনাচরণ, প্রাণকৃষ্ণ, রায় গোপাল

www.pathagar.com

প্রমুখ অসংখ্য কবিয়ালের অবদান স্মরণীয়। কিন্তু গবেষকদের দৃষ্টিসীমা কেবল রমেশ-ফণী কেন্দ্রিকতার ফলে চট্টগ্রামের কবিগানের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য পুরোপুরি অনুভবের অতীত। তাই সকলের সৃষ্টিসম্ভার সংগ্রহ্ ও মূল্যায়ন আবশ্যক।

৩.ঙ. আদিবাসী সঙ্গীত

পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে অন্তত ১৪টি আদিবাসী সম্প্রদায়। এদের সংখ্যা প্রায় ছয় লাখ। সংখ্যানুপাতে যথাক্রমে চাকমা ২৪.৭৫%, মারমা ১৪.৭১%, টিপরা (ত্রিপুরা) ৬.৩২%, তঞ্চঙ্গা ১.৯৯%, মুরং ২.২৮%, পাংখোয়া ০.৩৩%, খিয়াং ০.২%, বম (বনযোগী) ০.৭২%, চাক ০.২১%, খুমি ০.১৩%, লুসাই (কুকি) ০.০৬৮%, ম্রো ০.০১৩%, রাখাইন .০০৭%, সাঁওতাল ০.০২৬%। (শাওন: ২০০৬: ২৪)। চাকমা ও মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গা ও মুরংরা হিন্দু ধর্মানুসারি। বম, পাংখুয়ারা খ্রিস্টান। চাক, খুমি, ম্রো ও খিয়াংরা প্রকৃতিপূজক। আদিবাসীদের ধর্ম, সংসস্তৃতি ও জীবনধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের রয়েছে বিচিত্র পূজাপার্বন ও উৎসব। জন্ম-মৃত্যু, বিয়েশাদিসহ ধর্মীয় ও সামাজিকতা তারা পূজা-অর্চনা ও উৎসবের মাধ্যমে পালন করে। প্রত্যেক উৎসবেই নৃত্যগীত হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদতার কারণে তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সঙ্গীতগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন হচ্ছেনা। তাই এদের বিপুল লোকসঙ্গীতের সামান্যই আমাদের নজরে আসে। এখানে কয়েকটি আদিবাসী-উপজাতীয় লোকসঙ্গীত ও তার বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো:

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম ক্ষুদ্র আদিবাসী পাংখোয়াদের পেশা পশু শিকার। পশু শিকার করে তারা আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে। যেমন:

খিয়ে ঙাইলো এ খিয়ে / থলাং সংলের সৌ লৌ এ খিয়ে
ভান পামারাম চোয়াই এ ..এ / লুংলাই খের সৌ লৌ এ ..এ

ভাবানুবাদ: (চারদিকের মানুষ তোমরা শোন / আমি একটি পশু শিকার করেছি
গর্বে আমার বুক পর্বতের মতো উঁচু হয়েছে / আমার পিতাও গর্ববোধ করবে)

(উদ্ধৃত: শাওন: ২০০৬: ১২৫)।

২. পার্বত্য-রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলায় ঐতিহ্যবাহী রাখাইনদের অস্তিত্ব টিকে আছে। এদের নানান উৎসবে প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীত:

তাপাউং হশয়পাউং, কাউ এ্যান পাউং / পাউংলে রামাউ, পাউং পাউং টুংকা-লৌকা
রাউমাশা কোলাক্রী চামী ছেনথুক্রী / কাপারচী সানঝোজী, ঝোজী নেটকে
য়েইন য়েইন টংছো য়েইনলে য়েইন য়েইন / বেইন ছং সানমা ম্রাউ লোকা
মাকালো / কো-ফাঞো নান পেচেটমে

ভাবানুবাদ: বিনি ভাতের পিঠা তৈরি কর ভাবি/ পিঠা তৈরি কর
ভাবি তোমার খোঁপা কাঁপে / তোমার বড় চুল আর হাতের বড় চুড়ি
আর কানের সুন্দর দুল / ভাবি নাচতে তারে দাও
ভাবি নাচতে তারে দাও / নইলে বিয়ে দেব তোমায় / কো ফো এ্ঞার সাথে
ভাবি পিঠা তৈরি কর ভাবি / বিনি ভাতের পিঠা (উদ্ধৃত: মংছেন: ১৯৯৪: ৪৪)।

৩. পার্বত্য-ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সংসস্তৃতি বেশ সমৃদ্ধ। এদের অতীত-ঐতিহ্য ও জীবনচিত্রের প্রতিফলন ঘটে লোকসঙ্গীতে। যেমন:

ফায় ববয়ৈ আং বায় বাকসা / খাংগারায় রশনানি / তয়সা কৌরৈ তয়সা বুচুক
খাংগারায় রমনী ফায় / ফায় ববয়ৈ ফায়।

www.pathagar.com

তয়সা বুচুক থানতিয়ৈ / আ খাংগারায় রমতিন / হলং খুলিটয় হাকর খুরই
আথুক আগুড়ি রমতিন / বাকসা মিলিয়ৈ বাগন লান / ফায় ববয়ৈ ফায়।....

ভবানুবাদ: চল বন্ধু সবাই চলো / নদীর তীরে ছরার ধারে
মাছ-কাঁকড়া ধরবো মোরা / সারা দিনমান ধরে।
গর্ত খুঁড়ে ধরবো কাঁকড়া / পাথর তুলে ধরবো মাছ
ঝর্ণা তলে ভিজবো সবাই / সারাটা দিন ধরে।...(উদ্ধৃত: *দৈনিক আজকের কাগজ*)।

৪. মূল্যমান

বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে জটিল। কারণ বাজারি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় উৎপাদন ব্যয় অনুসারে। কিন্তু লোকসংস্কৃতি বা লোকসঙ্গীতের ব্যয় হিসাবের অতীত। মানুষের স্বভাব প্রতিভা-ই এর উৎপাদক। অতীতে এ নিয়ে কেউ ভেবেছেন বলে জানা নেই। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা-ই এদেশে এই চিন্তার উৎস (হুদা: ২০০৫)। বস্তুত মানবজীবনের প্রত্যেক বাস্তব কর্মের যেমন মূল্য আছে, তেমনি মানব-সংস্কৃতির প্রত্যেক উপকরণের মূল্য থাকাও যুক্তিযুক্ত। এতেই উত্তর উত্তর সমৃদ্ধ হবে দেশজ-সংস্কৃতি, ঘুচতে পারে অবহেলিত লোকশিল্পীর অভাব, বদলে যেতে পারে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য। তবে বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। স্বাভাবিক চিন্তার অতীত বলে বিষয়টি দুর্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু একটু খেয়াল করলে একজন কবি বা লেখকের কাব্য, গল্প বা উপন্যাসের মতো লোকস্কৃতির প্রত্যেক উপাদানেরও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। এ বিষয়ের তাত্ত্বিক পুরোধা মুহম্মদ নূরুল হুদার চিন্তাপ্রসুত সূত্র রয়েছে। তাঁর সূত্রানুসারে আমরা নিম্নরূপে চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতের বার্ষিক বাজার মূল্যের এক অনুমানিক হিসাব নির্ণয় করতে পারি।

বিভিন্ন শিল্পী, ক্রেতা ও বিক্রেতার তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ও মাইজভাণ্ডারি গানের ক্যাসেট ও সিডির চাহিদা ব্যাপক। চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় অডিও প্রতিষ্ঠান আমিন্স ইলেক্ট্রনিক্সসহ্ একাধিক খুচরা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, অডিও-সিডি বাজারে একটি মূল ক্যাসেট থেকে হাজার হাজার কপি পাইরেসি হয়। এই পাইরেসিসহ আঞ্চলিক ও মাইজভাণ্ডারি গানে বাজারে ৫লক্ষাধিক অডিও ক্যাসেট ও প্রায় ১লক্ষ সিডির চাহিদা রয়েছে। প্রতিটি অডিও ক্যাসেটের খুচরা মূল্য ৩০ টাকা হিসাবে মোট মূল্য (৩০৫)=১৫০ লক্ষ টাকা। অনুরূপ প্রতিটি সিডির খুচরা মূল্য ৫০ টাকা হিসাবে মোট মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। সে হিসাবে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ও মাইজভাণ্ডারি গানের বার্ষিক বাজারমূল্য আনুমানিক (১৫০ লক্ষ+৫০ লক্ষ) = ২কোটি। এভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত ও অনুষঙ্গিক খাতে প্রচলিত বাজারমূল্য বছরে (২০০৬) অনুমানিক ৬,২৯,০০,০০০/=(ছয় কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ টাকা প্রায়)। (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট - ৩)।

৫. মেধাস্বত্ব

লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্ব নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। কেননা, বাংলাদেশ কপিরাইট আইনে (সংশোধিত ২০০০, ২০০৫, ২০০৬) শুধু লেখক-শিল্পীর সাহিত্য ও শিল্পকর্মের কপিরাইটের কথা বলা হয়েছে। এই আইন শুধু শ্রম ও কুশলতালব্ধ সম্পদের উপর প্রযোজ্য। এটা লোকসংস্কৃতি বা লোকসঙ্গীতের কপিরাইট বিষয়ে কোনো সমাধান দিতে পারে না। কারণ লোকসংসশৃতি বা লোকসঙ্গীতের উৎস মানুষের স্বভাব-প্রতিভা ও চিন্ত াভাবনা।অথচ প্রচলিত আইনে 'চিন্তা বা ভাবনার কোন কপিরাইট নেই' (গাজী: ১৯৮৩: ৭)। ফলে লোকসঙ্গীত এখন কার্যত বেওয়ারিশ পণ্যে পরিণত হয়েছে। এত লোকসঙ্গীত দেদারসে চুরি বা আত্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে আর লোকশিল্পীগণ হচ্ছেন নাজেহাল। এর সর্ব সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন চট্টগ্রামের বর্ষিয়ান লোকসঙ্গীত-সাধক এম এন আখতার (জ. ১৯৩১)। (*দৈনিক প্রথম আলো*: ৬.১২.২০০৭)।

এম এন আখতার রচিত ও সুরারোপিত চট্টগ্রামের দুটি অবিস্মরণীয় লোকসঙ্গীত যথাক্রমে: 'কইলজার ভিতর গাঁথি রাইকখুম তোঁয়ারে' এবং 'যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম/মুইশখাইল্লা পানর খিলি তারে বানাই

www.pathagar.com

খাবাইতাম'। প্রথম গানটি প্রায় তিন দশক আগে দ্বৈতকণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ড করেন সাবিনা ইয়াসমিন ও এম এন আখতার। সম্প্রতি গানটি 'এনটিভির ক্লোজআপ ওয়ান' শিল্পী সালমা একক কণ্ঠে পরিবেশন করেন এবং অডিও প্রতিষ্ঠান 'গাঙচিল' তাদের 'বন্ধু আইও আইও' অ্যালবামে অন্তর্ভুক্ত করে বাজারে ছাড়ে। তারা মূল গানটির দু'টি অন্তরা বাদ দেন এবং সুর বিকৃতি করেন। কিন্তু রচয়িতা বা মূল শিল্পীর কোনো অনুমতি নেন নি, কোথাও তাঁদের নামও উল্লেখ করেন নি। একই ঘটনা ঘটেছে 'যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম' গানটির ক্ষেত্রে। এটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ও কল্যাণী ঘোষ সম্পাদিত *চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান* (১৯৯৮) বইয়ের ১০৮ নম্বর পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়। সাতের দশকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত *সাম্পানওয়ালা* চলচ্চিত্রে শিল্পী শেফালী ঘোষ গানটির কণ্ঠ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি উক্ত গানটিও নতুনভাবে নির্মিত *সাম্পানওয়ালা* ছবিতে ব্যবহার করা হয় ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল এনটিভিতে প্রচারিত হয়।। কিন্তু তাঁরা গীতিকার বা শিল্পীর কোনো অনুমতি নেন নি। এ ব্যাপারে এম এন আখতার নিজের পরিচয় দিয়ে *এনটিভিতে* ফোন করে জানতে চান যে, তাঁর গানটির গীতিকার ও সুরকারের নাম দেয়া হলো না কেন? *এনটিভির* পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, গানটি তাদের সংগ্রহের। সুতরাং নাম দেওয়ার দরকার নেই (আখতার: সাক্ষাৎকার: ২০০৭)।

বস্তুত চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত নিয়ে এ রকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। হালের ব্যান্ড-শিল্পীরা রিমিক্সের নামে এখানকার লোকসঙ্গীতের কথা ও সুর বিকৃতিসহ ব্যবহার করছেন ইচ্ছেমতো। ফলে এখানকার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতগুলোর অবস্থা এখন কাহিল। মূল শিল্পীর ক্ষতির কথা বলাইবাহুল্য। এই নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির জন্য এখানকার লোকসঙ্গীতগুলো সনাক্ত করে মূল্যমান ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা জরুরি। লোকসঙ্গীত শুধু ব্যক্তি বিশেষের সম্পদ নয়, ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা সমগ্র জাতির সম্পদ। ফলে লোকসঙ্গীত এক অর্থে সমগ্র জাতির সম্পদ। যে কোনোমূল্যে এই মহামূল্যবান সম্পদ রক্ষা করতে হবে। 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি' এ ব্যাপারে চিন্তার দুয়ার খুলে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। এ সুযোগে 'সোসাইটির' মাধ্যমে কিছু প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে পেশ করছি।

৬. সুপারিশমালা

৬.১. যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের বিকল্প নেই। তাই অবিলম্বে 'চট্টগ্রাম লোকসংস্কৃতি ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর কাজ হবে, চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতি ও তার উপাদান সনাক্ত, সংগ্রহ, অনুশীলন ও গবেষণা। লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতি একান্তই যেহেতু লোকজ বিষয়, তাই চট্টগ্রামের মৌলিক সন্তানদের এ কাজে লাগাতে হবে। উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারিভাবে অনুরূপ ইন্সটিটিউট রয়েছে।

৬.২. আঞ্চলিক ভাষা-ই চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতির প্রাণ। মুক্তবাজার অর্থনীতির চাপে এ ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে। আধুনিক শিক্ষিত ও ভিন্ন দেশে ভূমিষ্ট চট্টগ্রামের সন্তানরা চট্টগ্রামের ভাষা জানে না। ফলে চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতিও আজ হুমকির মুখে। তাই চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে সময় থাকতে আঞ্চলিক ভাষা রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.৩. আকাশ-সংস্কৃতির সর্বনাশা আগ্রাসনও সমূহ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতির উপাদানগুলে সনাক্ত করে সিডি ও গ্রন্থভুক্ত করতে হবে।

৬.৪. সঙ্গীত-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে চট্টগ্রাম বেতার ও টিভি কেন্দ্রকে আরও সক্রিয় করতে হবে। এ জন্য চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞকে এখানে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিতে হবে। উল্লেখ্য, বেতার-টিভিতে চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত- সংস্কৃতি ও লোকশিল্পীগণ চরমভাবে উপেক্ষিত বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

৬.৫. লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতির উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিলেবাসে *উত্তরবঙ্গের*

www.pathagar.com

মেয়েলীগীত, যশোর-খুলনার ছড়া, মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত হলেও, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য- সংস্কৃতির কোনো নিদর্শন স্থান পায় নি।

৬.৬. লোকসঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিত করতে শিল্পী-সাধকদের জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখানকার আশুতোষ চৌধুরী, ফণী বড়ুয়া, আসকর আলী পণ্ডিত, আবদুল গফুর হালী, এম এন আখতার, মলয়ঘোষ দস্তিদার, সুচরিত চৌধুরী, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, শেফালী ঘোষ, সৈয়দ মহিউদ্দিন প্রমুখ অবিস্মরণীয় লোকশিল্পী রাজধানীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি চিন্তার কাছে বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছেন। এই দুঃখ চট্টগ্রামবাসীর কোনো দিন যাবে না।

৬.৭. সাহিত্য ও শিল্পকর্মের জন্য যেভাবে কপিরাইট আইন প্রণীত হয়েছে, অনুরূপ লোকসঙ্গীতের জন্যও কপিরাইট আইন প্রণয়ন করতে হবে। যে ক্ষেত্রে লোকশিল্পী ও তার সঙ্গীত সনাক্তযোগ্য, সে ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব হবে সংশিলষ্ট শিল্পীর। অন্যথায় তার মেধাস্বত্ব ও কপিরাইট হবে জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের। এ জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে কাজ শুরু করে দিতে হবে।

পরিশিষ্ট - ১: উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পী-সাধক

১. পালাকার ও গাইন

১. তোরাবউদ্দিন গাইন (উনশ শতক), কুতুবদিয়া, ককসবাজার। চট্টগ্রামের অধিকাংশ পালাগাইনের ওস্তাদ।

২. মকবুল আহমদ (উনিশ শতক), রাউজান। উল্লেখযোগ্য পালা: *হাতিখেদার গান*।

৪. বরকেথা গাইন (১৮৯৯-১৯৬৫), কক্সবাজার। সনাক্তকৃত পালা: *হাইল্লারগীত, বিটিশ-জাপান যুদ্ধর কথা, ইমদ্দিন শিকদারর গান, নসরত আলী সিকদারর গান*।

৪. কালিকুমার গাইন (উনিশ শতক), পটিয়া।

৫. গৌরাঙ্গ জলদাস, (বিশশতক), পটিয়া। কালিকুমারের শিষ্য। পালাগায়ক। *সূর্যমণিকন্যা, চানমনি ও সূর্যমনি, পাঁচতোলা কন্যা, দুঃখরাজ ও সুখরাজ, হীরালাল ও পদ্মমনি, সুতমনি ও কাপাসপতি, সৈয়দ আমিন বাদশার পালা, ফরিদ মলইর পালা*।

৬. রাজচন্দ্র গাইন (বিশশতক), ভাটিখাইন। গায়ক: *মানিক সদাগর*।

৭. সেকান্দর গাইন (উনিশ শতক), পটিয়া। তাঁর শিষ্য কালা মিয়া।

৮. কালামিয়া গাইন (১৮৯০-১৯৯৩), পটিয়া। সেকান্দর আলীর শিষ্য। পালাগায়ক: *খুলনা কন্যা, আছফা কন্যা*।

৯. সুবল মিত্র (অনুমান ১৯১০-?), পটিয়া। সেকান্দর গাইনের শিষ্য।

১০. আবদুল আলী।

১১. সুলতান আহমদ (বিশশতক), পটিয়া। আবদুল আলীর শিষ্য। গায়ক: *সোনাই কন্যা, দেলবল কুমার*।

২. বারমাইস্যা গায়ক

১. হরিকৃপা চৌধুরী (১৮৮৩- ?), বোয়ালখালী। গায়ক: *নিমাইচাঁদের বারমাস*।

২. যতীন্দ্র বিশ্বাস (১৯০৩- ?), পটিয়া। গায়ক: *নীলার বারমাস, খলিলের বারমাস, রাধার বারমাস*।

৩. আহমদ মিয়া (১৯০৬- ?), ফটিকছড়ি। গায়ক: *গোলজানির বারমাস*।

৪. মকবুল আহমদ (১৯১৪- ?), রামু, ককসবাজার। গায়ক: *রাধিকার বারমাস, মুর্শিদের বারমাস*।

৫. মোহাম্মদ ইদ্রিস (১৯১৭- ?), খরন্দীপ। গায়ক: *ফুলকুমারির বারমাস, এতিমের বারমাস, মুর্শিদের বারমাস*।

৬. নূরনবী (১৯১৭- ?), আনোয়ারা। গায়ক: *উদবের বারমাস*।

৭. অপর্ণাচরণ চাকমা (১৯২৬- ?),বান্দরবন, পার্বত্যজেলা। গায়ক: *সীতার বারমাস*।

www.pathagar.com

৮. আবদুল মান্নান (১৯২৮- ?), রাউজান। গায়ক: *ঝড়তুফানের বারমাস*।

৯. আতর আলী পণ্ডিত (উনিশ শতক), আনোয়ারা। গায়ক: *উদবের বারমাস*।

৩. কবিগান ও কবিয়াল

১. উনিশ শতকে উল্লেখযোগ্য: নবীনচন্দ্র সরকার (বোয়ালখালী), চিন্তাহরণ সরকার, মকবুল পণ্ডিত (রাউজান), আজগর আলী, (জন্ম সন্দ্বীপ, পরে পটিয়ায় আগত), তাঁর শিষ্য করিম বখশ (১৮৭৯-১৯৩৮, পটিয়া), রসিক চন্দ্র নাথ (পটিয়া), রমেশ চন্দ্র নাথ (পটিয়া), দুর্গা কুমার শীল, সারদা কুমার শীল, দুদু মিয়া, সুবল ভট্ট, হরকুমার শীল, অন্নদা ভট্ট, সারদা বড়ুয়া (ফটিকছড়ি), রাইমোহন বড়ুয়া (ফটিকছড়ি), দুর্গাচরণ জলদাস, প্রাণকৃষ্ণ জলদাস, গঙ্গাচরণ জলদাস, ধীরেন সেন (কেলিশহর)।

২. মোহন বাঁশি (উনিশ শতক)। তাঁর সময় থেকেই চট্টগ্রামের কবিগানের ধারাবাহিকতা যায়। তাঁর সঙ্গে কবির লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই রমেশ শীলের কবিয়াল জীবনের সূচনা।

৩. রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭), বোয়ালখালী। একুশে পদকপ্রাপ্ত (মরণোত্তর, ২০০২)। মাইজভাণ্ডারি গানের আসরে তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। কবিগানে প্রগতিশীল মানবতাবাদী ধারার অবিসংবাদিত যুগপ্রবর্তক। কবিয়াল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৪৩)। অগণিত শিষ্যের মধ্যে ফণী বড়ুয়া ও রাইগোপাল দাশ বিখ্যাত। গানের বই: *আশেকমালা, ভাণ্ডারে মওলা, শান্তি ভাণ্ডার, নূরের দুনিয়া, সত্য দর্পণ, জীবন সাথী, মুক্তি দরবার, মানব বন্ধু, রমেশ শীল রচনাবলী* (বা/এ) প্রভৃতি।

৪. মনীন্দ্র লাল দাস (১৯০০-২০০০), চন্দনাইশ। ১৯২৭ থেকে সক্রিয়। একদা কয়িাল সমিতির সভাপতি ছিলেন। গানের বই: *গান্ধীজী শোক, কায়েদে আজমের কবিতা, নূরের ঝলক, অশ্রু, অবধূত বিধি, নিশ্চল গীতি*।

৫. সাবের সরকার (১৯০৬-?), রাউজান। তাঁর শিষ্য ইয়াকুব আলী।

৬. আবদুর রহমান পণ্ডিত (বিশ শতক), উখিয়া, ককসবাজার।

৭. নিরঞ্জন দাস (১৯১৩-?) বাঁশখালী।

৮. নূর আহমদ সরকার (১৯১৪-১৯৮৫)।

৯. শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী (১৯১৭-?)।

১০. রাইগোপাল দাশ (১৯১৮-১৯৮৭), বোয়ালখালী। ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম কবিয়াল সমিতির সম্পাদক ছিলেন। রমেশ শীলের অন্যতম শিষ্য। ফণী বড়ুয়া তাঁর জুটি ছিলেন।

১১. ইয়াকুব আলী (১৯৩১-), আনোয়ারা। গানের বই: *চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পল্লীগীতি, চাটগাঁয়ের আঞ্চলিক গান, মন্দের ছন্দ* (ভোটের গান), *বিচ্ছেদ তরঙ্গ, কবিগান*।

১২. ফণী বড়ুয়া (১৯১৩৫-), রউজান। রমেশ শীলের শিষ্যদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। কবিয়াল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৪৩)। গানের বই: *দেশের ডাক, হালজামানার গান, সর্বহারার জীবনসঙ্গীত, জনতার গান*।

১৩. মোহাম্মদ ছৈয়দ (১৯৩৬-২০০৬), আনোয়ারা। গানের বই: *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, অঞ্জলি, গ্রামীন পদাবলী*।

১৪. নূরুল হক (১৯৪৭), ভিংরোল, আনোয়ারা। ইয়াকুব আলীর শিষ্য। গানের বই: *আঁধা দেশর কানা রাজা* (১৯৮৮)।

১৫. আবদুল মন্নান (১৯৫১), দৌলতপুর, পটিয়া। ইয়াকুব আলরি শিষ্য।

www.pathagar.com

১৬. জীবনকৃষ্ন দাস, কানুনগোপাড়া, বোয়ালখালী।

১৭. মোশতাক আহমদ (১৯৫৩), আনোয়ারা। গানের বইঃ *যুগের তালে*। অডিও কেসেটঃ *শানে মোহসেন বাবা*।

১৮. বর্তমানে আরও যারা কমবেশি সক্রিয়ঃ মানিক শীল (মোহরা), রাখাল মালাকার (নোয়াপাড়া), দিলীপ দাশ ও অশ্বিনী দাশ (গুজরা), চক্রপানি ভট্টাচার্য ও কল্পতরু ভট্টাচার্য (রাঙ্গুনিয়া)

৪. মাইজভাণ্ডারি-মারেফতি-মরমী

১. আলীরজা ওরফে কানু ফকির (১৬৬০-১৭৬৫)। আনোয়ারা। আধ্যাত্মিক সাধক ও সঙ্গীতকার। শ্যামাসঙ্গীতসহ চট্টগ্রামের মরমীগানের আদিস্রষ্টা বিবেচিত। রচিত বইঃ *জ্ঞান প্রদীপ, শাহনামা, সৃষ্টি পত্তন, মিরাজ রসুল, যোগ কলন্দর, ঋতুচক্রভেদ, মনের মহিমা*।

২. শরাফত উল্লাহ (আঠার শতক), আনোয়ারা। আলী রাজা ওরফে কানু ফকিরের পুত্র ও শিষ্য।। বহু শ্যামা সঙ্গীত ও ভক্তিগীত রচয়িতা।

৩. ফাজিল নাসির (আঠার শতক), গানের বই *ধ্যানমালা*।

৪. রমেশ শীল (দ্রষ্টব্যঃ তালিকা ১ঃ কবিগান ও কবিয়াল)।

৫. জীবন পণ্ডিত (উনিশ শতক)

৭. কমর আলী (উনিশ শতক), করলডেঙ্গা।

৮. আসকর আলী পণ্ডিত (১৮৪০-১৯২৮), পটিয়া। গ্রন্থঃ *জ্ঞান চৌতিশা, পঞ্চসতী পেয়ারজান, নন্দ বিলাস, নন্দ বিহার, বর্ণশাস্ত্র*।

৯. আবদুল গণি কাঞ্চনপুরি (১৮৪৮-১৯৩৪), ফটিকছড়ি। মাইজভাণ্ডারি তরিকার আদি গীতিকার। সঙ্গীতগ্রন্থঃ *গুলশানে ওসসাক*।

১০. আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী। আবদুল গণি কাঞ্চনপুরির ছোটভাই। গানের বইঃ *রত্ন-সাগর*।

১১. গোলাম গণি চৌধুরী। আবদুল গণি কাঞ্চনপুরীর দৌহিত্র। গানের বইঃ *মাইজভাণ্ডারি গীতিমঞ্জরি* (২০০০)।

১২. ফজর আলী দরবেশ (বিশ শতক), মাইজভাণ্ডারি তরিকার গীতিকার ও গায়ক।

১৩. ইউসুফ দরবেশ (বিশ শতক), ঐ।

১৪. শাহ ফজলুর রহমান (বিশ শতক), ঐ।

১৫. আবদুল গণি পণ্ডিত (বিশ শতক), ঐ।

১৬. শাহ আমিনুল হক হারভাংগিরি (বিশ শতক)। গানের বইঃ *ফকির উল্লাস, ওফাতনামা*।

১৭. কাজী আমিরুজ্জামান শাহ (বিশ শতক), পটিয়া।

১৮. আবুল খায়ের নকশাবন্দী (বিশ শতক), আনোয়ারা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ *ফানা ফিল্লার পথে*।

১৯. বজলুল করিম মন্দাকিনি (হাটহাজারি)। উল্লেখযোগ্য বইঃ *প্রেমের হেম, প্রেমাঞ্জলি*।

২০. হেফাজতুর রহমান (১৮৮৮-১৯৬৫), চুনতি, সাতকানিয়া। মির্জারখিল তরিকার গীতিকার।

২১. আবদুল গফুর হালী (জ ১৯৩৬), পটিয়া। আঞ্চলিক-মাইজভাণ্ডারি গানের সংখ্যা প্রায় ২০০০।

২২. মুলকেতুর রহমান (? -২০০০), সৈয়দপুর, সীতাকুণ্ড।

২৩. শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব (১৯২৭-২০০৪), ফতেয়াবাদ, হাটহাজারি। প্রচুর কেসেট ও সিডি বের হয়েছে। বেতার টেলিভিশনে প্রচুর গেয়েছেন।

২৪. শেফালী ঘোষ (১৯৪৪-২০০৭)। স্বাধীন-বাংলা বেতার-শিল্পী। শ্যামসুন্দর-এর মানানসই সঙ্গীত জুটি। চলচ্চিত্র, বেতার-টেলিভিশনে প্রচুর গেয়েছেন। পাঁচশতাধিক কেসেট, সিডি ও রেকর্ড বের হয়।

www.pathagar.com

২৫. মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ.১৯৪৭), কক্‌সবাজার। কবি, লোকগবেষক ও মরমী গীতিকার। গানের বই: *সুরসমুদ্র* (২০০৫)।

২৬. সৈয়দ মহিউদ্দিন মহিয়াল ভাণ্ডারি (জ.১৯৫৩), ফটিকছড়ি।

২৭. সনজীত আচার্য (জ.১৯৫৩), পটিয়া। চলচ্চিত্র, বেতার-টেলিভিশনে প্রচুর গেয়েছেন। বেশ কিছু ক্যাসেট-সিডি বের হয়েছে।

২৮. আমান উল্লাহ (বিশশতক), সাতকানিয়া। বিখ্যাত গান: 'আইচ্ছা পাগল মন রে / দিন গেলে তুই ঘাড়ৎ বই বই কান্দিবি।'

৫. আঞ্চলিক গান

১. শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী (জ. আনু. ১৯১৭), পটিয়া।

২. সন্তোষ বড়ুয়া (১৯১০-১৯৮১), কীর্তনীয়া।

৩. মলয়ঘোষ দস্তিদার (১৯২০-১৯৮২), রাউজান।

৪. অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তী (১৯২৬-১৯৯৪), বাঁশখালী।

৫. মোহনলাল দাস (১৯২৬-১৯৭৪), ফটিকছড়ি।

৬. মোহাম্মদ নাসির (১৯০৩-১৯৭৯), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম শহর।

৭. এম. এন. আখতার (জ.১৯৩১) রাউজান। গানের বই: *মনুআ-১* (১৯৭৩), *মনুয়া-২, করুণার বাণী, তিরিশ দিনে সঙ্গীত শিক্ষা*।

৮. আবদুল গফুর হালী (জ.১৯৩৬)। দ্রষ্টব্য: তালিকা- ৪, মাইজভাণ্ডারি-মারফতি-মরমী।

৯. শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব (১৯২৭-২০০৪)। দ্রষ্টব্য: তালিকা- ৪, মাইজভাণ্ডারি-মারফতি-মরমী।

১০. শেফালী ঘোষ (১৯৪৪-২০০৭)। দ্রষ্টব্য: তালিকা- ৪, মাইজভাণ্ডারি-মারফতি-মরমী।

১১. শাক্যমিত্র বড়ুয়া (বিশ শতক), চন্দনাইশ।

১২. সৈয়দ মহিউদ্দিন প্রকাশ মহিয়াল ভান্ডারি। দ্রষ্টব্য: তালিকা - ৪, মাইজভাণ্ডারি-মারেফতি-মরমী।

১৩. সনজীত আচার্য (জ.১৯৫৩)। দ্রষ্টব্য: তালিকা - ৪, মাইজভাণ্ডারি-মারেফতি-মরমী।

১৪. আবুল হাশেম (জ.১৯৪৯), হাটহাজারি।

১৫. শফী সুমন (জ.১৯৬৩), চন্দনাইশ।

১৬. নূরুল আলম।

১৭. মানসপাল চৌধুরী (জ.১৯৫২), আমিরাবাদ, লোহাগাড়া।

১৮. উমা খান (জ. ১৯৫৫), চট্টগ্রাম শহর। বর্তমান অবস্থান নিউইয়র্ক। স্বাধীনবাংলা বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশনে প্রচুর গেয়েছেন। বেশ কিছু সিডি-কেসেট বেরিয়েছে।

১৯. কান্তা নন্দী।

২০. স্বপন কুমার দাশ, জন্ম ১৯৬৪, ফটিকছড়ি।

২১. আহমদ কবির আজাদ, মহেশখালী, ককসবাজার।

২২. বুলবুল আখতার, মহেশখালী, ককসবাজার।

২৩. দুলাল আচার্য্য, ঈদগাঁও, ককসবাজার।

২৪. সিরাজুল ইসলাম আজাদ, চকরিয়া, ককসবাজার।

৬. গণসঙ্গীত:

১. অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তী (১৯২৬-১৯৯৪), বাঁশখালী।

২. হরিপ্রসন্ন পাল (১৯২৬), হাটহাজারি। বাংলার 'পল রবসন' খ্যাত।

www.pathagar.com

৭. লোকবাদক

১. সুরেন্দ্রলাল দাস প্রকাশ ঠাকুর দা (১৮৯১-১৯৪৩), কাট্টলী, চট্টগ্রাম। সঙ্গীতজ্ঞ, অর্কেস্টথ্যা ও বংশী বাদক।

২. অনন্ত জলদাস (১৮৯৯-১৯৬৪), রাউজান। বিখ্যাত সানাইকার। ঢাকার সানাইশিল্পী চান্দ মিয়ার শিষ্য।

৩. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য (জ.১৯০৮), কক্সবাজার। তবলানেওয়াজ-খ্যাত।

৪. বিনয়বাঁশী জলদাস (১৯১২-২০০২) একুশে পদকপ্রাপ্ত (২০০১) বিখ্যাত ঢোলী ও মরমী শিল্পী।

৫. জগদানন্দ বড়ুয়া (জ ১৯২০)। সঙ্গীতগুরু। বিখ্যাত জলতরঙ্গী ও যন্ত্রী। বহু গ্রন্থপ্রণেতা। বিখ্যাত 'আর্য্য সঙ্গীত' এর প্রতিষ্ঠাতা।

৬. আবু নঈম (১৯২৬-১৯৮৪), এসরাজ বাদক।

৭. সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০-১৯৯৪), বোয়ালখালী। আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র। বংশীবাদক।

৮. আহমদ ছফা (১৯৪৩-১৯৯৮), চন্দনাইশ। বংশীবাদক।

৯. ক্যাপ্তেন আজিজুল ইসলাম, বংশীবাদক।

১০. ননীগোপাল দত্ত। শেফালী ঘোষের স্বামী। তবলাকার।

১১. আমান উল্লাহ (বিশ শতক), সাতকানিয়া। ম্যাণ্ডুলিন বাদক

৮. সংগ্রাহক-গবেষক:

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), পটিয়া। পুঁথি সংগ্রাহক-পণ্ডিত-গবেষক ও মধ্যযুগের অনন্য সঙ্গীতজ্ঞ। বহু প্রাচীন লোকশিল্পী ও সঙ্গীতগ্রন্থের আবিষ্কারক।

২. আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪), বোয়ালখালী। ৭৬টি পালা সংগ্রাহক, গীতিকারও নাট্যকার। *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* অন্যতম সংগ্রাহক।

৩. ওহীদুল আলম (১৯১১-১৯৯৮), ফতেয়াবাদ, হাটহাজারি। লোকসঙ্গীত ও পালাগান সংগ্রাহে আশুতোষ চৌধুরীর শিষ্য। লোকসঙ্গীত সমৃদ্ধ বই: *চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য* (১৯৮৫)।

৪. আবদুস সাত্তার চৌধুরী (১৯১৯-১৯৮২)। বহু পালাগান ও লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক।

৫. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)। মধ্যযুগের সাহিত্য- সংস্কৃতির অনন্য পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ। *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা (১৯৬১), মধ্যযুগের রাগ-তালনামা (১৯৬৭), বাউলতত্ত্ব (১৯৭৩)* প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

৬. কল্যাণী ঘোষ (জ.১৯৪৬), রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম। স্বাধীনবাংলা বেতার-শিল্পী। বাংলা একাডেমীর সাবেক পরিচালক। গানের বই: *চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান (১৯৯৮), গণসঙ্গীত (১৯৮৫)*।

৭. নূরুল ইছলাম চৌধুরী (১৯১১-১৯৮৪), পটিয়া। সাংবাদিক, লোকসংস্কৃতি গবেষক। গ্রন্থ: *চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৬৫), লোককাব করিম বখশ, চট্টগ্রামের ইতিকাহিনী*।

৮. মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৯৪৭), কক্সবাজার। সাবেক পরিচালক, বাংলা একাডেমী। বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা সংস্থা 'লোক-বাংলা'র সভাপতি। কবি ও কথাশিল্পী। মরমী-গানের জগতেও অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর সর্বসাম্প্রতিক গানের সংকলন: সুরসমুদ্র (২০০৫) ভক্তজগতে আলোড়ন তুলেছে। তবে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ বিষয়ের পথিকৃৎ গবেষক ও চিন্তাবিদ হিসেবেই তিনি দেশে-বিদেশে আলোচিত। তাঁর অভিসন্দর্ভ: *Identification, Valuation and Intellectual Property*

www.pathagar.com

Protection of Traditional Cultural Expressions of Bangladesh (2007), World Intellectual Property Organisation (WIPO) কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এতে লোকসংস্কৃতি সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের নীতিমালা ও খসড়া আইন প্রস্তাব করেন। এই আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীত দেশের সমৃদ্ধশালী সম্পদে পরিণত হবে। তাতে অবহেলিত লোকশিল্পীগণ উপযুক্ত সম্মান ও মূল্যায়ন পাবেন।

৯. এস এম নূর উল আলম (জ ১৯৫১), পটিয়া। গবেষক ও কবিয়াল। প্রকাশিত গ্রন্থ: *চট্টগ্রামের কবিগান ও কবিয়াল* (২০০৩)।

১০. মুহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী (জ ১৯৫২) পটিয়া। বহু পালাগান ও দুষ্প্রাপ্য লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক।

১১. মুহম্মদ নূরুল ইসলাম (জ. ১৯৫৭), ককসবাজার। বিস্মৃতপ্রায় লোকশিল্পী বরকেথা গাইনের আবিষ্কারক। গ্রন্থ: *ফেলে আসা দিন (১৯৮৭), বরকেতা গাইন (২০০৩)*।

পরিশিষ্ট- ২: চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত যন্ত্রাদি

ঢাক, ঢোল (জোরখাই), তবলা, ভাবের বাঁয়া (ডেবরি), খোল, করতাল, একতারা, দোতরা, বাঁশি (বেনু, মুরালি, মোহনবাঁশী), মারাককাস, সানাই, শঙ্খ, ঝাফ, ঝুমুর, হাতবাঁয়া, খঞ্জরি, খমক, বেহালা, হারমোনিয়াম।

পরিশিষ্ট -৩: চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতের প্রচলিত বার্ষিক বাজার মূল্য (২০০৬)

	বিষয়:	**শ্রেণী**	**পরিমাণ**	**দর (৳.)**	**মোট টাকা**
১.	মাইজভাণ্ডারি/মারফতি	ক্যাসেট	২,০০,০০০	৩০	৬০,০০,০০০
		সিডি/ভিসিডি	১,০০.০০০	৫০	৫০,০০,০০০
		প্রকাশনা	৫,০০০	১০০	৫,০০,০০০
২.	আঞ্চলিক গান	ক্যাসেট	২,০০,০০০	৩০	৬০,০০,০০০
		সিডি/ভিসিডি	১,০০,০০০	৫০	৫০,০০,০০০
		প্রকাশনা	২,০০০	১০০	২,০০,০০০
৩.	কবিগান	ক্যাসেট	১০,০০০	৩০	৩,০০,০০০
		প্রকাশনা	১,০০০	১০০	১,০০,০০০
৪.	হঁ-অ-লা	ক্যাসেট	২০,০০০	৩০	৬,০০,০০০
৫.	পালা/বারমাইস্যা	প্রকাশনা	২,০০০	১০০	২,০০,০০০
৬.	উপজাতি-আদিবাসী	ক্যাসেট	১,০০,০০০	৩০	৩০,০০,০০০
		সিডি/ভিসিডি	১০,০০০	৫০	৫,০০,০০০
		প্রকাশনা	৫,০০০	১০০	৫,০০,০০০
৭.	বিবিধ	ক্যাসেট	১,০০,০০০	৩০	৩০,০০,০০০
		সিডি/ভিসিডি	২০,০০০	৫০	১০,০০,০০০
৮.	লোকবাদ্যযন্ত্র	ক্রেতা	২,০০০ জন	১০,০০০	২,০০,০০,০০০
৯.	সঙ্গীতানুষ্ঠান	১০০টি গড়ে	১০০০ দর্শক	১০	১,০০,০০,০০০
১০.	বিজ্ঞাপন: বেতার/টিভি/অন্যান্য অনুমানিক		---	---	১০,০০,০০০
	সর্বমোট (কথায়: ছয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা অনুমান)				**৬,২৯,০০,০০০**

www.pathagar.com

সহায়ক-গ্রন্থ

১. আলম, ওহীদুল: ১৯৮৫: *চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. আলম, ওহীদুল: ১৯৮৬: *বাঙলা জীবনীকোষ*: আলমবাগ প্রকাশনী, কাজিরদেউরি, চট্টগ্রাম।

৩. আলম, এস এম নূরুল: ২০০৫: *চট্টগ্রামের কবিগান ও কবিয়াল*: বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪. আহসান, সৈয়দ আলী: ১৯৬৮: *পদ্মাবতী* (সম্পাদিত), স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকআ।

৫. ইসলাম, মুহম্মদ নূরুল: ২০০৩: *বরকেতা গাইন*, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী।

৬. ইসলামাবাদী, বি.এ আজাদ ১৯৮৭: *চট্টগ্রাম স্মরণী*: সমাজপ্রেস, মোমিনরোড, চট্টগ্রাম।

৭. করিম, আবদুল: ১৯৮০: *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৮. করিম, আবদুল: ১৯৭৫: *শরীয়তনামা* (সম্পাদিত), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. গাজী, শামছুর রহমান: ১৯৮৩: বাংলাদেশের কপিরাইট আইন: বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০. গোস্বামী, করুণাময়: ১৯৮৫: *সঙ্গীতকোষ*: বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১. ঘোষ, কল্যাণী: ১৯৯৮: *চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান* (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার: ১৯৯৫: *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্না বুক ডিষ্টিব্বিউটর্স, কলকাতা।

১৩. চৌধুরী, আবদুল হক: ১৯৮৮: *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৪. চৌধুরী, আবদুল হক: ১৯৯৪: *বন্দর শহর চট্টগ্রাম, ঐ*।

১৫. জলদাস, হরিশংকর: ২০০৪: *লোকবাদক বিনয় বাঁশী*: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা), চট্টগ্রাম।

১৬. জাহাঙ্গীর, এস এ এম কে: ১৯৯৪: *পটিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সৈকত প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

১৭. ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল: ১৯৯৪: *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি।

১৮. নূরুল ইছলাম চৌধুরী: ১৯৬৫: *চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি*, রয়াল লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।

১৯. বড়ুয়া, অশোক: ২০০৩: *অশোক বড়ুয়া রচনা সংগ্রহ* (ইউসুফ মুহম্মদ সম্পাদিত), চট্টগ্রাম।

২০. বুলবুল, আজাদ: ২০০৪: *পার্বত্য চট্টগ্রামের মানস-সম্পদ*: মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা।

২১. বাংলা একাডেমী: ১৯৮৫: বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান: বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২২. বিশ্বাস, অমলেন্দু: ১৩৯৭: *লোককবি রমেশশীল*: অমৃত প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

২৩. মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত): ১৯৮৮: *আশুতোষ চৌধুরী রচনা ও সংগ্রহ সম্ভার (সম্পাদিত)*, বাংলা একাডেমী।

২৪. মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত): *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন*: ৫৪-৫৭, ৬০ (*চট্টগ্রাম গীতিকা* ১-৫ খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৫. মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত): ঐ, ৫৮ (*বারমাসী গান-২*), ঐ।

২৬. মনিরুজ্জামান: ২০০২: *লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির*, গতিধারা ঢাকা।

২৭. মনিরুজ্জামান: ১৯৯৪: *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৮. মংছেন চীং (মংছিন): ১৯৯৪: *রাখাইন ইতিবৃত্ত*: দি রাখাইন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, কক্সবাজার।

২৯. শরীফ, আহমদ: ১৯৮৪: *লাইলী মজনু* (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী।

৩০. শরীফ, আহমদ: ২০০১: *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী ঢাকা।

৩১. শরীফ, আহমদ: ২০০০: *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, সময় প্রকশন, ঢাকা।

৩২. শাওন ফরিদ: ২০০৬: *পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া ভাষা ও সাহিত্য*: হিলি সোস্যাল ডেভেলাপমেন্ট অর্গনাইজেশন, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।

৩৩. শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ: ১৯৯৩: *রমেশ শীল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী।

৩৪. শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ: ১৯৯৭: *কবিয়াল ফণীবড়ুয়া- জীবন ও রচনা, ঐ*।

৩৫. শাহজাদা, সফিউল গণি চৌধুরী: ২০০০: (সম্পাদিত) *মাইজভাণ্ডারী গীতিমঞ্জরি*: গাউছিয়া রহমানিয়া গণি মঞ্জিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৩৬. শ্যামল, নাজিমুদ্দীন: ২০০২: *উপজাতিদের শিক্ষা সংকট ও উত্তরণের প্রস্তাবনা: পরিপ্রেক্ষিত - পার্বত্য চট্টগ্রাম*: চট্টগ্রাম ফোরাম, চট্টগ্রাম।

৩৭. সাঈদ, শামসুল আলম: ১৯৯২: *চট্টগ্রামের মানস-সম্পদ*, মৈত্রী প্রকাশনী চট্টগ্রাম।

৩৮. সাহিত্যবিশারদ, আবদুল করিম: ১৯৯৭: *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী*, (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী।

৩৯. হক, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল: ১৯৯১: *ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, (১ম খণ্ড), ঐ।

৪০. Huda, Mohammad Nurul, 2007: Methodology: Valuation of Identified Traditional Cultural Expressions of Bangladesh, Lokbangla (Dhaka) in Collaboration with WIPO (Geneva)

www.pathagar.com

সহায়ক-প্রবন্ধ

১. কানুনগো, সুনীতিভূষণ: *হাজার বছরের চট্টগ্রাম:* 'সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ', *দৈনিক আজাদী*, ৩৫ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৫, চট্টগ্রাম।

২. কাসেম, ড. মো . আবুল: ২০০৬: 'চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত', *কালধারা*, সেপ্টেম্বর ২০০৬, কালধারা সাহিত্য পরিষদ, চট্টগ্রাম।

৩. গুপ্ত, অরুণ দাশ: *হাজার বছরের চট্টগ্রাম:* 'সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত', *দৈনিক আজাদী*, ৩৫ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৫, চট্টগ্রাম।

৪. ইছহাক চৌধুরী, মুহাম্মদ: 'দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোকসংসস্তৃতি, *তিমির হননের গান*, এপ্রিল ১৯৯৮, উদীচী, চট্টগ্রাম।

৫. ইছহাক চৌধুরী, মুহাম্মদ: 'মাইজভাণ্ডারী তরীকায় লোকসঙ্গীত', *দৈনিক আজাদী*, ২৩ জানুয়ারী ১৯৯০।

৬. ইছহাক চৌধুরী, মুহাম্মদ: 'কাজী আমিরুজ্জামান শাহর মরমীসঙ্গীত', *দৈনিক ঈশান*, ১৬ জানুয়ারী ১৯৯২।

৭. ইছহাক চৌধুরী, মুহাম্মদ: 'লোকসাহিত্যে গাজীরপালা', *সাপ্তাহিক চট্টলা*, ৬ আগস্ট ২০০০।

৮. জাহাঙ্গীর, ড. সেলিম: 'মাইভাণ্ডারশরীফ পরিচিতি', *চাটগা ডাইজেস্ট* (ফটিকছড়ি সংখ্যা), ১৯৯৬, চট্টগ্রাম ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট।

৯. মাষ্টার শাহ আলম: 'কক্সবাজার অঞ্চলের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি', *সমুদ্র সংলাপ*, আগস্ট ২০০২, ককসবাজার সাহিত্য একাডেমী।

১০. হুদা, মুহম্মদ নূরুল: ২০০৫: 'লোক-সংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারণ', *দৈনিক আমার দেশ*, ৯ অক্টোবর ২০০৫।

সাক্ষাৎকার

১. শেফালী ঘোষ, ১০.১২.২০০৫, চট্টগ্রামে তাঁর বাসভবনে এই সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। এ সময় আবদুল গফুর হালী ও সৈয়দ মহিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

২. মুহম্মদ নূরুল হুদা, ১৯.১২.২০০৭, তাঁর কক্সবাজারের গ্রামের বাড়িতে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

৩. সালমা খাতুন, বয়স ৭২ (এই প্রবন্ধকারের মা), প্রায় সময়ই লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা হয়।

www.pathagar.com

৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের লোকসঙ্গীত

সুগত চাকমা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে গিরি, নির্ঝরণী, হ্রদ এবং অরণ্যের মায়াবী লীলা নিকেতন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। বাংলাদেশের এক দশমাংশ স্থান জুড়ে এই অপরূপ নৈসর্গিক অঞ্চলটির অবস্থান। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসন আমলে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ডিস্ট্রিক্ট নাম দিয়ে তারা এ অঞ্চলটির নামকরণ প্রথম বারের মতো করেছিল। ইতিহাসের অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আয়তন হলো ৫,০৯৩ বর্গমাইল। এটি এখন তিনটি পার্বত্য জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলি হলো রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ভাগে অবস্থিত। এর উত্তরে খাগড়াছড়ি ও দক্ষিণে বান্দরবান পার্বত্য জেলা অবস্থিত।

স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে বৃহত্তর মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর নানা লোকজন। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি দেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অঙ্গনেরই একটি বর্ণাঢ্য অংশ যা দেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরো সুশোভিত ও সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল- (১) চাকমা- ২,৩৯,৪১৭ জন, (২) মারমা- ১,৪২,৩৩৪ জন, (৩) ত্রিপুরা- ৬১,১২৯ জন, (৪) ম্রো- ২২,১৬৭ জন, (৫) তঞ্চঙ্গ্যা- ১৯,২১১ জন, (৬) বম- ৬,৯৭৮ জন, (৭) পাংখোয়া- ৩,২২৭ জন, (৮) চাক- ২,০০০ জন, (৯) খিয়াং- ১,৯৫৪ জন (১০) খুমী- ১,২৪১ জন এবং (১১) লুসাই- ৬৬২ জন। উল্লেখ্য বর্তমানে নানা কারণে তাদের মধ্যে বিশেষত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী এ সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। এখানে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা একই ভাষাভাষী। তাদের ভাষা বৃহত্তর ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান বা ইন্দো- ঈরানীয়ান শাখার অন্তর্গত। এখানে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা ব্যতীত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ভাষা ও উপভাষাগুলি সিনো-টিবেটান ভাষা পরিবারের তিবেতো-বার্মেন শাখার অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মধ্যে ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক যা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। মারমাদের কথ্য ভাষাটি বর্মী ভাষার একটি উপভাষা। চাকমা ও মারমাদের লেখার জন্য স্ব স্ব বর্ণমালা রয়েছে। সেগুলি তাদের সঙ্গীত, কাব্য ও অন্যান্য বিষয়াদির লেখার কাজে পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫টি কুকি-চিন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে। তারা হলো লুসাই, বম, পাংখোয়া, খিয়াং এবং খুমী। উল্লেখ্য যে ম্রো এবং চাক জনগোষ্ঠীর লোকদেরও স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে। তাই ভাষা ও সঙ্গীতের বৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে সত্যিই বৈচিত্র্যময় অঞ্চল বলা যায়। এখানে ভাষা ও উপভাষা রয়েছে যেমন অনেক, তেমনি রয়েছে নানা ধরনের সঙ্গীত, সুর ও বাদ্যযন্ত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় বাদ্যযন্ত্র বা সঙ্গীতযন্ত্রগুলিকে তাদের মেটারিয়াল কালচারের অন্যতম চিত্তাকর্ষক উপাদান বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লুসাই এবং পাংখোয়ারা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে। সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপারেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের সাথে ঘনিষ্ট আরো একটি জনগোষ্ঠী হলো বম। লুসাই, বম এবং পাংখোয়াদের মধ্যে কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সঙ্গীতের কোনো কোনো ক্ষেত্রেও মিল দেখা যায়।

চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান জনগোষ্ঠী। রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি এ দুটি পার্বত্য জেলায় চাকমারা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তাই রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি এ দুটি পার্বত্য জেলায় চাকমাদের ভাষা

www.pathagar.com

চাকমারা ছাড়াও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অনেক লোক বুঝতে ও বলতে পারে। উল্লেখ্য যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলাতেও কিছু সংখ্যক চাকমা রয়েছে। তদুপরি, চাকমাদের সাথে একই ভাষাভাষী তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রয়েছে। বান্দরবানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলো মারমারা। মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে এবং পশ্চিমাংশে তিনটি পার্বত্য জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। উল্লেখ্য যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় অন্যান্য লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মারমাদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। ত্রিপুরাদের অধিকাংশ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস করে। তবে তাদের একাংশ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রয়েছে এবং স্বল্প সংখ্যক ত্রিপুরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরে এবং এ জেলার উত্তর পূর্বাংশে সীমান্তবর্তী এলাকায় রয়েছে। চাক জনগোষ্ঠীর লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণের উপজেলা নাইক্ষ্যংছড়িতে এবং তার আশেপাশের এলাকায় রয়েছে। এ রকম আরো একটি জনগোষ্ঠী হলো খিয়াং। তারা রয়েছে কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনায় এবং রাজস্থলী উপজেলা সহ তার আশেপাশের এলাকায়। ম্রো, বম, খুমী এ তিনটি জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলাতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাংশে বিশেষত উত্তরাংশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুসাই ও পাংখোয়া জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে। মোটামুটি এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জেলায় এবং এলাকাতে এখানকার অধিবাসীদের ভাষাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল ভাষাগুলির সাথে বিগত দুই শতাধিক বছর ধরে পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজার ও তৎসন্নিহিত কোনো কোনো স্থানে চট্টগ্রামী আঞ্চলিক বাংলা অর্থাৎ চাঁটগাইয়া বাংলা একমাত্র 'লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা' ভাষারূপে ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য পূর্বে এ সকল বাঙালিদের বিশেষত নেয়েদের মাঝে এক ধরনের চট্টগ্রামী লোকসঙ্গীতের প্রচলন ছিল যা বিগত শতকের শেষার্ধে হারিয়ে গেছে। অতীতে ঐ সকল নেয়েরা চাকমাদের কাছে ভাঝোন্যা/ভাসন্যা বাঙালি হিসাবে পরিচিতি ছিল। [illegible] তাদের নানা ধরনের লোকগীতি ছিল।

রাঙ্গামাটির আদিবাসী শিল্পী ও গবেষকবৃন্দ

www.pathagar.com

এ লেখাটিতে প্রথমে হিন্দ-আর্য ভাষাভাষী চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। চাকমাদের পল্লীতে কয়েক ধরনের লোকসঙ্গীত রয়েছে। এগুলি হলো 'ওলিদাগোনি গীত' (ঘুমপাড়ানী গান), বারমাস (বারমাসী গীত। বিশেষত কোনো গ্রাম্য সুন্দরীর প্রেম বিরহ নিয়ে রচিত বারমাসী গীত), ঐতিহ্যবাহী উভাগীত, লামাহ্ (অষ্টাদশ শতকের চাকমা কবি শিবচরণ রচিত গোঝেন লামাহ্- এর গীতগুলি) এবং নানা ধরনের পালাগান। চাকমাদের পালাগানগুলির মধ্যে রাধামন-ধনপুদি পালা এবং চাদিগাঙ-ছারা পালা বিখ্যাত পালাগান। রাধামন-ধনপুদি পালাগানে রাধামন এবং ধনপুদি নামক দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার অনবদ্য প্রেমের কাহিনী রয়েছে। 'গেংগুলি' বা 'গেংখুলী' নামক চারণকবিরা বেহালা বাজিয়ে কখনও বা বাঁশি বাজিয়ে পালাগানগুলি গায়। জনশ্রুতি মতে সাত দিন সাত রাত একনাগাড়ে গেয়েও রাধামন-ধনপুদি পালাগান শেষ করা যায় না। উল্লেখ্য যে রাধামন ধনপুদি পালাগানে বেশ কয়েকটি পর্ব আছে। যেমন- জুম-বেড়া, রান্যা-বেড়া, ঘিলা-পাড়া, ফুল-পাড়া ইত্যাদি। 'চাদিগাঙ-ছারা' পালাগানে চাকমাদের আদি নিবাস চম্পক নগর, সেখান থেকে রাজা বিজয় গিরির নেতৃত্বে তাদের আরাকান, অক্সাদেশ (নিম্ন ব্রহ্ম), কালঞ্জর খিয়াংদেশ ইত্যাদি দেশ জয় এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়ার বেদনাবিধুর কাহিনী রয়েছে। চাকমা সমাজে গ্রামের অভ্যন্তরে চাদিগাঙ-ছারা পালাগান গাওয়া হয় না। গ্রাম থেকে দূরবর্তী নির্জন স্থানে অথবা কখনও কখনও গ্রামের প্রান্তদেশের সংলগ্ন কোনো স্থানে চাদিগাঙ-ছারা পালাগান গাওয়া হয়। চাকমাদের অন্যান্য পালাগানগুলির মধ্যে লোকখিপালা অন্যতম। স্বর্গ থেকে ঐশ্বর্য ও ফসলের দেবী মালোকখিমা-এর মর্ত্যে আগমন কাহিনী এতে আছে। সিরিত্তি পত্তন- এ সৃষ্টি বিষয়ক বর্ণনা ও কুকিকাবা পালাগানে কুকি-চিন ভাষী লুসাইদের হামলার কাহিনী আছে। উল্লেখ্য যে চাকমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে বাঁশি, বেলা (বেহালা), ধুদুক, শিঙা, খেংগ্রং ইত্যাদি।

চাকমাদের মত তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর লোকদেরও নানা ধরনের ঘুমপাড়ানি গান, বারমাসী গীতি, উভাগীত ও নানা ধরনের পালাগান রয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যা চারণকবি গেংগুলিরাও রাধামন-ধনপু[illegible] ।দিগাঙ ছারা পালা

বান্দরবানের আদিবাসী শিল্পীগণ

www.pathagar.com

গান গেয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দু' পাশেই দক্ষিণ- পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমাংশে ৪৫° কৌণিক এলাকা জুড়ে তঞ্চঙ্গ্যাদের অধিকাংশ লোকজনের বসবাস রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মারমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বর্মীদের অনুরূপ। ভাষাগত শ্রেণীকরণের দিক থেকে তাদের কথ্য ভাষাটি সিনো-টিবেটান পরিবারের বর্মী দলভুক্ত। বর্মী এবং এতদঞ্চলের কক্সবাজার জেলার রাখাইনদের ভাষার সাথে মারমাদের ভাষার ঐতিহাসিক যোগসূত্র ও মিল রয়েছে। তাদের ভাষায় প্রাচীনকাল থেকেই নানা ধরনের লোকগীতি, গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের প্রচলন রয়েছে। মারমা লেখক জনাব শৈ চিং প্রু তাঁর লিখিত "মারমা সঙ্গীত ও নৃত্য" শীর্ষক একটি লেখাতে এতদ্অঞ্চলের মারমাদের সঙ্গীত সম্পর্কে বলেছেন,- "মারমা সঙ্গীতকে মোটমুটি ৯ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- সাগ্রাং, কাপ্যা, আরোওয়ে, রদ্ধ, রাগাইং, আইং, ত্রঃ, পাংখুং ও তেঃখ্যাং," (গিরি নির্ঝর ১৯৮৩: ৪২-৪৪)। এ সকল সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুরে ও আঙ্গিকে গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে দ্রুত তাললয় বিশিষ্ট সঙ্গীত হলো আরোওয়ে এবং ধীমাতাল লয়ের সঙ্গীত হলো কাপ্যা। মারমা সমাজে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী অন্যতম সঙ্গীত হলো পাংখুং। এই গীতের সুর বিভিন্ন ধরনের গানে ও নৃত্যে ব্যবহৃত হয়। এমনকি মারমা সমাজে যে দুই ধরনের গীতিনাট্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে সেগুলির একটি শ্রেণীর নাম হলো পাঙখুং গীতিনাট্যসমূহ। এগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা লেখকেরা রচনা করেছেন। তাদের জনপ্রিয় পাঙখুং গীতিনাট্যে এই দেশীয় বাদ্য যন্ত্রাদির কোনো কোনোটির ব্যবহার রয়েছে। আবার লীলা চঞ্চল মারমা গীতিনাট্য 'জাইত' (কখনও কখনও উচ্চারণে জ্যা) শ্রেণীর গীতিনাট্যগুলি হলো বর্মীদের অনুরূপ। এগুলিতে বার্মার মান্দালয়ী বৈশিষ্ট্যের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মারমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ক্রেমং, পেটালা, মেন্ডালীন ঢোল, মঙ/গঙ(পিতলের তৈরি ঘন্টা জাতীয় বাদ্য), চেঃ, ঢোল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ত্রিপুরাদের মধ্যে নানা ধরনের গান রয়েছে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ত্রিপুরা লেখক জনাব সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা(সাবেক পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি) তাঁর লিখিত 'উপজাতীয় নৃত্য-গীত' শীর্ষক একটি লেখায় লিখেছেন- "ত্রিপুরাদের অসংখ্য লোকগীতি, প্রেমের গান, দেশাত্মবোধক গান, ছড়াগান ও ধর্মীয় গান রয়েছে।" (বাংলাদেশ পরিষদ পত্রিকা,১৯৮১:৩৪) তাদের ভাষায় এতদঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ত্রিপুরা সাধক রত্নমনি ও তৎশিষ্য সাধু বলংরায় রচিত আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ গান রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা গানগুলির মধ্যে ১. কুচুক হা-সিকাম কামানি (সুউচ্চ লুসাই পর্বত বিজয়), ২. লাঙ্গুঠ রাজান বুমনি (লাংগী বা কুকী রাজকে শাস্তি দান), ৩. পুনদা তানমানি(অজবধ), ৪. খুমকামনি (পুষ্পচয়ন), ৫. গঙ্গতলীয় থামানি (ভাটি অঞ্চলে গমন) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এজাতীয় পালাগানকে "ত্রিপুরাগণ রাচামুং বলে থাকেন।" (পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নৃত্যগীত। উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা। ১ম সংখ্যা, ১৯৮২) ত্রিপুরাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সুমুর (বাঁশী), দোতারা, ঢোল, তুত্তুমা এবং দাংদুং উল্লেখযোগ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বিচারে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে ম্রোদের স্থান চতুর্থ। তাদের অধিকাংশ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাস করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ভার্জ্যাতলীতেও ম্রোদের গ্রাম ছিল। যাদের অনেকে বিগত শতকের আটের দশকের দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় চলে গেছে। তৎ সমসাময়িক সময়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মেনলে ম্রো তাঁর সমাজে 'ক্রামা' নামে একটি নতুন ধর্ম এবং লিখার কাজে এক নতুন ধরনের অক্ষরেরও প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রভাব খুমী লোকদের কিছুসংখ্যকের উপরও পড়েছিল। উল্লেখ্য যে ম্রোদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশী 'প্লুং' খুমীদের মাঝেও এখন পাওয়া যায়। ম্রো এবং খুমী উভয় জনগোষ্ঠীরই বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব লোকগীতি রয়েছে।

লুসাই, বম এবং পাংখোয়া এ তিনটি মধ্য কুকি-চিন ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ভাষা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও যোগসূত্র রয়েছে। লুসাইরা মুলত পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর পূর্বাংশে এবং বমরা দক্ষিণাংশে ও

www.pathagar.com

বান্দরবানের আদিবাসী শিল্পীগোষ্ঠি

পাংখোয়ারা মধ্যবর্তী অংশের পূর্বাংশে ও উত্তর পূর্বাংশে রয়েছে। তাদের ভাষাগুলিতে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে খ্রিস্টান মিশনারিরা লুসাই পাহাড়ে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য রোমান বর্ণে লুসাই ভাষা লিখার কাজ শুরু করেছিল। এর প্রভাব বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বমদের উপরও পড়ে। এখন লুসাই এবং বম জনগোষ্ঠীর লোকেরা রোমান বর্ণে তাদের সঙ্গীতগুলির লিপি বদ্ধ করণের কাজ করছে। ইদানীং তাদের গানে গীটার ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে বমদের একটি নৃত্যে এখনও 'শিয়ালকী' (গয়ালের শিং) নৃত্যে তাল রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। আর পাংখোয়ারা এখনও পিতলের তৈরি ঘন্টা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র মং ব্যবহার করে থাকে। কাপ্তাই উপজেলায় খিয়াংদের মধ্যেও ইদানীং আধুনিক সঙ্গীত রচিত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বদক্ষিণে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় চাক জনগোষ্ঠীর মহিলাদেরকে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে কনের হয়ে দুঃখের গীত গাইতে দেখা যায়। সবশেষে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা লুসাই প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষায় আধুনিক গান রচিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

সুগত চাকমা, রাঙ্গামাটি- ১৯৮৩ খ্রিঃ: চাকমা পরিচিতি, রাঙ্গামাটি।

সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ঢাকা-১৯৮১ খ্রিঃ: "উপজাতীয় নৃত্য গীত", বাংলাদেশ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

নন্দলাল শর্মা, চট্টগ্রাম-১৯৮১ খ্রিঃ.: " সাহিত্য জগতে ত্রিপুরাদের ভুমিকা" বরেণ ত্রিপুরা সম্পাদিত-পুর-ই-রুবাইনি সাল গ্রন্থে প্রকাশিত।

শৈ চিং প্রু, রাঙ্গামাটি-১৯৮৬খ্রিঃ: "মারমা সঙ্গীত ও নৃত্য"। গিরিনির্ঝর, রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

সুগত চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), রাঙ্গামাটি-২০০৭খ্রিঃ.: "পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় উৎসব ও বিবাহ" রাঙ্গামাটি, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

www.pathagar.com

৩.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের লোকসঙ্গীত

শেখ গোলাম সরওয়ার জহির উদ্দিন

ভূমিকা: প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের মধ্যে প্রাকৃতিক সাবলীল পার্বত্য সৌন্দর্যে শোভিত অঞ্চল প্রায় পাঁচ হাজার উননব্বই বর্গমাইল মতান্তরে প্রায় পাঁচ হাজার তিরানব্বই বর্গমাইল।

অনুমান করা যায়, মাত্র হাজার বছর আগেও এ অঞ্চল ছিল জনমানব শূন্য। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরবর্তীকালে নৃতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠী এ এলাকায় প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করে। জনমানবশূন্য পাহাড়ি এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপনের মানদণ্ডে সে উপজাতিরাই এ অঞ্চলের আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পরিচায়ক। অতীতে এ ভূখণ্ডের কোনো নাম ছিল না। বলা হতো চট্টগ্রাম সন্নিহিত অঞ্চল। কার্পাস বা তুলা সংগ্রহের জন্য অঞ্চলটি প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের দখলে আসার পর চট্টগ্রামের পূর্বদিকস্থ বর্তমান সীমারেখা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে পরিচিত হয়। বর্তমানে আগের প্রতিটি মহকুমা তথা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি আলাদা তিনটি জেলা করা হয়েছে। চালু হয়েছে প্রত্যেক জেলার পাশে পার্বত্য জেলা লিখার প্রথা। তথাপি তিন জেলা মিলিয়ে এখনও বলা হয় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম।

এই অঞ্চলে ১১টি ক্ষুদ্র জাতি সত্তার বসবাস সনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে বান্দরবান জেলাতেই সব কটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা আদিবাসীর বসবাস রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ০১। চাকমা, ০২। মারমা, ০৩। ত্রিপুরা, ০৪। তঞ্চঙ্গ্যা, ০৫। ম্রো, ০৬। লুসাই, ০৭। খিয়াং, ০৮। বম, ০৯। চাক, ১০। পাংখোয়া, ১১। খুমি। তাছাড়া মূলতঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাতে গূর্খা, অহমিকা, আসামি, নেপালি এই চারটি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর অন্তত প্রায় ১১শ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিরাজমান। অথচ এদের কোন স্বীকৃতি নেই। বিষয়টি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় সংরক্ষণ এর ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের ক্রটি নিঃসন্দেহে। কিছু গ্রন্থে উসুই নামক জাতি গোষ্ঠীর উল্লেখও ক্রটিপূর্ণ। কারণ উসুই মূলত ত্রিপুরাদের উপ-গোষ্ঠী। বনযোগী বলতেও কোনো জাতি গোষ্ঠী নেই। এদেশে পাংখোয়া, বম, লুসাইদের কুকি বলা হয়। কুকি নামে আলাদা জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ভারতের মণিপুর ও নাগল্যান্ডেই বিরাজমান বলে জানা যায়।

বিভিন্ন অনুসন্ধানী জরিপ, অধ্যয়ন ও দৃশ্যমান বাস্তবতায় লক্ষণীয় যে, একবিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড গতিময় সময়ে অনেকাংশ আদিম পর্যায়ের জীবন ধারায় অভ্যস্ত হলেও এতদঞ্চলের আদিবাসীসমূহের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গৌরবমণ্ডিত। তারা মূলত উৎসবমুখর। নাচ-গান এদের জীবন যাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিতে কেন্দ্র করে তারা প্রায় সব আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ পর্যায়ে তাদের প্রকৃতিবাদী মনোবীক্ষণই প্রধান হয়ে ওঠে। প্রাচীন ইতিহাস, লোককাহিনী, কিংবদন্তি ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে তাদের এ প্রকৃতি মনস্কতার গভীর ঐকান্তিকতা সম্প্রসারিত হয়। বিশেষ করে সাংগ্রাই, চমলাং পূজা, ভূতপূজা, পূন্যাহ উৎসব ইত্যাদি সহ কৃষি-সংক্রান্ত পূজা কেন্দ্রিক তাদের লোকগীতি ও লোকনৃত্য এবং নানা রকম ক্রীড়ানুষ্ঠান পাহাড়ি সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

বর্তমানে সারা পৃথিবীজুড়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতিকে নতুন আঙ্গিকে নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জাতিসত্তার শিল্পকলা, ভাস্কর্য ও সংস্কৃতিতে নন্দিত শিল্প সুষমার সন্ধান লাভ করেছেন সচেতন নৃবিজ্ঞানীরা। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারা ও সংস্কৃতি এখনও সীমাবদ্ধ আঙিকেই বিরাজমান। অন্যদিকে সে

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের মজবুত অর্থনৈতিক ভিতও তৈরি হয়নি। তাই ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে তাদের স্বকীয়তা। বিশেষত লোকজ সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা আদিবাসীদের মনের আনন্দ ও আবেগের লাগাম টেনে ধরে লোকজ সঙ্গীত নৃত্যকে যথার্থ রূপ বিকাশ করে নি, ক্ষেত্রবিশেষে অস্তিত্ব সংকটের পর্যায়েও উপনীত করেছে দুর্ভাগ্যক্রমে। আবহমান বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের যথার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশ প্রশ্নে এ অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক।

সনাক্তকৃত লোক সঙ্গীতের তালিকা:

ত্রিপুরা লোকসঙ্গীত

ত্রিপুরা সারং: প্রাণহীনে প্রাণ দেবার নিমিত্তে মাতাল অবস্থায় ভরদুপুরে এই গীতি পরিবেশিত হয়।

ত্রিপুরা ভৈরব: দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি ও অভীষ্ট আশা পূরণের লক্ষ্যে এ গীত পরিবেশন করা হয়।

রাগ-গোমতী: ত্রিপুরা জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি গোমতী নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। গোমতী নদী দুগ্ধ স্রোতরূপী মাতৃনদী অর্থাৎ তোয়মা হিসেবে ত্রিপুরা জাতির কাছে সম্মানিতা। তাই গোমতী নদীকে নিবেদন করেই রাগ-গোমতী।

চার স্তরবিশিষ্ট ত্রিপুরা সঙ্গীত ধারা: ত্রিপুরা সঙ্গীতের নিজস্ব সাতটি রাগ রাগিনী ছাড়াও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সঙ্গীত ধারা চার ভাগে বিভক্ত:

(১) **লোক সঙ্গীত** - এ সঙ্গীত সচরাচর গ্রামে প্রচলিত। প্রেম, বিরহ, বিয়ে, কাব্য কাহিনী, সঙ্গীতের প্রধান উপাদ্য। বাঁশি এ সারিন্দা সঙ্গীতের একমাত্র সংগতকারী যন্ত্র। ফসল ফলানো গানও এ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) **বাউল** - বাউল সঙ্গীত এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যেমন নন্দিত সঙ্গীত, তেমনি ত্রিপুরা জনজীবনেও এ সঙ্গীত নন্দিত। ত্রিপুরা জাতির একটি অংশ হচ্ছে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা বৈরাগী নামে সমধিক পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকে পথে ঘাটে বাউল সুর আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ত্রিপুরা সঙ্গীতকে বৃহত্তর জনজীবনেও সুপরিচিত করে তুলেছে। এই সঙ্গীত বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে।

(৩) **কাব্য সঙ্গীত বা দুবাপদ:** অপরাপর ইতিহাসসমৃদ্ধ জাতির ন্যায় ত্রিপুরা সঙ্গীত পরিমণ্ডলে কাব্য সঙ্গীত বিশেষ স্থান দখল করে আছে। অতীতে ত্রিপুরা সঙ্গীত বা গান বলতে ছিল কাব্য সঙ্গীত, যার কাহিনী অবিচ্ছিন্ন। গাওয়ার সময় গানের প্রতিটি পয়ার বা তুকে রাগ এবং তালের পরিবর্তন হয়। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাব্য সঙ্গীতকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

১ম বৈশিষ্ট্য: গানের প্রতি কলিতে বা পয়ারে রাগ ও তাল দুটোই বদলায়।

২য় বৈশিষ্ট্য: রাগ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। তবে গানের প্রতিটি পয়ারে তাল বদলায়।

৩য় বৈশিষ্ট্য: তাল সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। তবে গানের পয়ারে রাগ পরিবর্তন হয়।

কাব্যগান কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন নামের যেমন:

জিজোঁক পুন্দা তান্নায়
কুচুক হা সিকাম বুনাই
গঙ্গা তলীঅ শানাই
জাদু কলিজা - ইত্যাদি।

কাব্য সঙ্গীতের প্রাণ সঞ্চারিণী কলি'ই হচ্ছে দুবাপদ বা দ্রম্মপদ, ত্রিপুরা কাব্য সঙ্গীতে বাঁশী, সারিন্দা, চেস্প্রেং, খমক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

(৪) **কীর্তন পদবাচ্য সঙ্গীত** - এটি সম্পূর্ণ আবাহন সঙ্গীত এবং সর্বজনীন সঙ্গীত। এই আবাহন সঙ্গীত ত্রিপুরা জন-জাতিতে বিশেষ আসন দখল করে আছে। বলাবাহুল্য এ কারণেই গীত, নৃত্য ও বাদনের অনুশীলন, শৈল্পিক বিকাশসাধন, এ জাতির জীবনপ্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ত্রিপুরা সঙ্গীতের

www.pathagar.com

উৎকর্ষ বৃদ্ধির ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। মন, সাধন, ভজন, নাম কীর্তন ইত্যাদি গান কীর্তন পদবাচ্য অন্তর্ভুক্ত।

প্রচলিত ত্রিপুরা লোকগীতি: কৃষ্ণলীলা রাসলীলা

ত্রিপুরা জনজীবনে গান বলতে নাচকে এবং নাচ বলতে গানকে বুঝায়। তাই তাদের লোকনৃত্যগীতও লোকগীতির অন্তরর্ভুক্ত বলা যথার্থ। তেমন লোকনৃত্যসমূহ:

গরায় নৃত্যগীত বিজু বা বিষু বা বৈসু উৎসব কেন্দ্রীক ও গরয়া নৃত্যগীত সমাগত দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

ঢোলকের সাহায্যে পরিবেশিত এ নৃত্যগীতের একটি নিম্নরূপ ঃ

চাং চাং আচাং
চাং চাং চাং চাং
আচাং

এ ছাড়া ত্রিপুরেশ্বরী, সকাল, হাচুকমা, সিবরাই, খাচী, নাইরাং, কের, চুমলাই, কাথারক, সাকচরাই, সিমতুং, হাবা, খুমকামীং, কামী মাইখুলুম ইত্যাদি পূজায় ব্যবহৃত নৃত্যগীতও আদি বৈশিষ্ট্যে লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য লোকগীতিসমূহ:

বাউনী বাউনী
কোচুক হে সিকাম তান্নায়
লাংগী রাজা নঅবুন্নায়
জুয়াংফা
লেবাং
মামিতা
হজাগিরি
অনজালী - ইত্যাদি।

ত্রিপুরা গান:

ও আনি লখিমা
মাইদং পাড়ানি সি:খ্ লামান আং
নহিয়ায়ে সাফ তংমাইয়া
মথিদে খাই নাং মুংসা সিমাইয়া
আংক ম্খেয়ে অংমি

অনুবাদ:

ওগো মোর প্রিয়তমা
কেমন যেন লাগছে মনে
কি যেন হল পারিনি বলতে
যাদু করেছ - বুঝি তুমি মোরে।

মারমা লোকসঙ্গীত

কাপ্যা: সমাজের আনন্দ বেদনার উপর ভিত্তি করে রচিত। কাপ্যাতে মারমাদের অতীত বর্তমান জীবন ধারা ফুটে উঠে। এই লোকগীতি কাহিনীভিত্তিকও হয়ে থাকে। যেমন - মহাপুরুষের জীবন কাহিনীভিত্তিক কাপ্যার মধ্যে পাইং দাইং মাংসা, সাইংদয়ে:সু উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের লোকগীতি সাধারণত গ্রাম অঞ্চলেই প্রচলিত রয়েছে। যুবক-যুবতীরা পরস্পরের সৌন্দর্য বর্ণনা করেও কাপ্যা গেয়ে থাকে।

চাগায়াং: জুম চাষের সময় উচ্চস্বরে এ গান গাওয়া হয়। তাছাড়া আনন্দ, প্রশংসা ও সৌন্দর্যের বর্ণনাভিত্তিক। ছোট-বড়,বুড়ো-বুড়ি বিভিন্ন সময় এই গান গেয়ে মনের আনন্দ মেটায়। এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের দিকে পরস্পরের প্রশংসা করে কিংবা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে প্রতিযোগিতামূলকভাবে

www.pathagar.com

চাগায়াং গাওয়া হয়। চাগায়াং শেষ হওয়ার পরপর ও ও বাইংলং বা আসাকলং এবং এ - হু- হু- হু করে উচ্চস্বরে উল্লাস প্রকাশ করা হয়। চাগায়াং কাহিনীভিত্তিকও রয়েছে।

রদু: উদিংনা রদু: জইং মাউইজিয়া রদু: বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনা। কাহিনীভিত্তিক লোকগীতি। এতে একটি নির্দিষ্ট কোমল সুর ও ছন্দ বিদ্যমান। এখনো গ্রামে গঞ্জে এ সঙ্গীত প্রচলিত। অতীতের মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী সম্পর্কে রদু সঙ্গীতে জানা যায়। সন্ধ্যার অবসর কিংবা কাজের সময় মনের আনন্দের জন্যও এটি গাওয়া হয়। বর্তমানে এই রদু: প্রায় বিলুপ্তির পথে।

ঙ চোয়ে আকাহ: গীতিনাট্য একক শিল্পী সমাজের ভবিষ্যৎ বাণীগুলোকে গানের সুরে সুরে তালে তালে পরিবেশন করে। চলমান কিছু ঘটনা প্রবাহের সাথে ঙ চোয়ে আকাহ-এর ভবিষ্যৎ বাণীগুলোর অনেক মিল দেখা যায়। যেমন - আংগি লাকমংদো ল্ব্যো কি:জা ম্যা:লিমে অর্থাৎ সমাজের ছোট জনেরা নেতা হয়ে সমাজ শাসন করবে।

আগেকার দিনে শিল্পীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঙ চোয়ে আকাহ আসর করতো। এটি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

হাইংছোয়া - গৃহত্যাগে ও গৌতমবুদ্ধের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত লোকগীতি।

সাইংবক - ক্যাঙ বা বিহারে শীল প্রার্থনার সময় নির্দিষ্ট সুরে ও ছন্দে পরিবেশিত ধর্মীয় লোকসঙ্গীত।

পাংখুং - কাহিনীভিত্তিক গীতিনাট্য বাংলায় নাটক বা যাত্রার মতো ভাবও বিষয়ভিত্তিক এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। সমাগম সমাবেশ সমারোহে পরিবেশিত বিষয়ভিত্তিক লোকগীতি:

বুং,পাইত,হ্নেহ,আতিহ,আহমুহ,ইহুহু ইহুহু

বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত লোকগীতি:

মে ওয়াইক মং
ওয়াইক খ্যিক্যুহ দাইং
ওয়াহ তাহ দাইং
চা ছোওয়ে দাইং
ওয়োক্ক্যাহ দাইং
লাঙা/লাঙ্গা:

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মহাপুরুষদের জীবন কাহিনীভিত্তিক লোকগীতি।

সাইংগ্র্যাই: দলীয় সঙ্গীত। এক দল অন্য দলকে উদ্দেশ্য করে উৎসবে পরিবেশন করে। ঐতিহ্যবাহী সাংগ্রাইতে আনন্দমুখর পানি খেলার অনুষ্ঠানে এই সাইংগ্যাই গাইতে দেখা যায়। এই গানের সাথে বুং ও পাইট (একপ্রকার ছোট ও বড় ঢোল), ছেহ (ঝাঁজ), হ্নেহ (এক প্রকার বাঁশি) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বাংলা জারিগানের মতো প্রথমে একজন গান সুরে করে। তারপর তালে তালে অন্যরাও গানটি গায়।

লুংদি: দলীয় লোকগীতি। কোনো প্রতিযোগিতায় জয়ী দল গ্রামের ঘরে ঘরে পুরস্কারস্বরূপ চাঁদা তুলতে এ গান গায়। সিদ্ধার্থের শৈশব ও যৌবনের কাহিনী নিয়ে মূলত এই লুংদি লোকগীতি রচিত।

আফয়ে: রাজা বাদশাদের সামনে আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রশংসা প্রকাশে বেহালা বাজিয়ে পরিবেশিত লোকগীতি। পরবর্তীকালে প্রজাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে এ গানের আসরের প্রচলন দেখা দেয়। এটি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

খ্রাং: পুরোহিতদের মৃতদেহকে নিয়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে দলগতভাবে কয়েক ঘন্টা পরিবেশন করা হয়। এই জাতীয় গান তথা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গানের অন্যগুলো নাখ্রাং, চেতিহখ্রাং, পাইন হ্রোক্খ্রাং, সইং আকাহ, ডুং কাহ খ্রাং ইত্যাদি।

নবাইংলা: গৌতম বৌদ্ধের নির্বাণ সম্পর্কিত কথার লোকগীতি। এটিও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার লোকগীতি বলা যায়।

www.pathagar.com

জাইট: গীতিনাট্য। বিভিন্ন উৎসবে এই জাইট নাটক দেখানো হয়। ২০-৪০জন নিয়ে এ জাইট দল গঠিত। এই লোকগীতি পরিবেশনের সময় মারমারা নিজস্ব পোষাক পড়ে।

বম লোকসঙ্গীত

কাইলেক - আবেগনির্ভর ধারাবাহিক প্রেমগীত। তবে এই গানে পাশ্চাত্যের সুর ও কথা লক্ষণীয়। জানা যায় এই মিল কাকতালীয়। কাইলেক ছাড়াও বমদের বিভিন্ন লোকগীতি রয়েছে।

বম গান

Meldi leng dawh kab khuatlang ahe,
Rualiang te hen Zarva bang lung lawn hen;
Tual a leng a sumtual zawl ah,
Leng thiam se ka ti meldi tawn ah.

অনুবাদ:

মোদের গাঁয়ে তুমি মোর প্রেয়সী
তুমি সুন্দর তোমার সখীদের চেয়ে
ঘুরে বেড়াও সবুজ গাঁয়ে
যৌবন আসুক মোর প্রিয়তমার।

খুমি লোকসঙ্গীত

গো হত্যা (রেনা) অনুষ্ঠানে নবীন প্রবীণ ছেলে-মেয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বাঁশি,ঢোল ও বিভিন্ন বাজনা বাজিয়ে নাচে গানে মেতে ওঠে। নাচের সাথে এই লোকগীতি বিশেষত কুয়াশা ও ঝাপসা জ্যোৎস্নার বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠান খুমিদের মাঝে আনন্দমুখর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

খুমীদের আছে নিজস্ব লোকগীতি।

তঞ্চঙ্গ্যা লোকসঙ্গীত

উবাগীত - মহিষ কেটে সিবলী পোই করার অনুষ্ঠানে দ্বৈত কিম্বা এককভাবে এই লোকগীতি পরিবেশন করা হয়। বিষয় ও কাহিনী ভিত্তিক এই পরিবেশনা তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সমাদৃত।

প্রেমগীত - রাধামন -ধনপুরী

লাঙ্যা - লাঙ্যানী

প্রেমের কাহিনীভিত্তিক এই সব লোকগীতির আবেদন যুবক-যুবতীসহ স্পর্শ কাতর তঞ্চঙ্গ্যা জনজাতিতে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়।

পালাগান - বিষু, ওয়াংগামা বা বহুচক্র এবং হালপালনী সামাজিক অুনষ্ঠানে গিংখুলী নামক গায়কেরা রাতদিন গেয়ে থাকে। তাছাড়া বিচগ্রী রাজা রোয়াং অভিযান তথা অক্যদেশ জয়ের গৌরবগীতি পালাও গাওয়া হয়। এসব গান যথার্থ অর্থে উবাগীতের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

তঞ্চঙ্গ্যা গান:

উ দুঅত জুম ঘত
সিবা কুন্‌না বাঁশী বাত
বাঁশী রবা শুনিলান
প আনান বানা ছপ্‌পরাত

অনুবাদ:

ওই দূর জুম ঘরে
কে বাঁশি বাজায়
বাঁশির সুর শুনে
ছটপট করে প্রাণ।

www.pathagar.com

চাক লোকসঙ্গীত

চাকদের অধিকাংশ লোকজগান বিবাহ ও শোকক্রিয়া অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। তাদের নৃত্য ও গান আলাদা। আশ্চর্যের বিষয়,চাকরা নাটক, নৃত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বর্মী ভাষায় গান গেয়ে থাকে। চাকদের লোকজ কোনো নৃত্যগীতের সন্ধান পাওয়া যায় না। আছে আধুনিক নৃত্যগীত।

চাকগান:

ফুফাই জিংগো ঙাং
মেদে দাংঙে প্যোগা
হে হে নিলে নাং।।

অনুবাদ:

আমাকে দু:খ দিয়ে
শান্তি পাও
সুখ পাও তুমি?

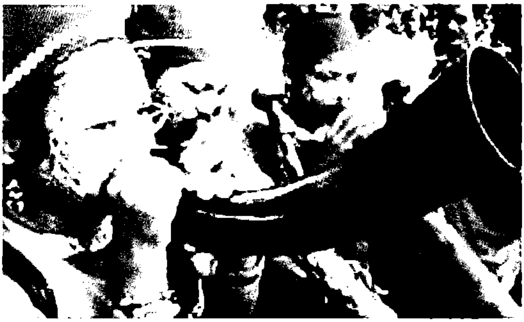

আদিবাসী শিঙা

অন্যান্য লোকজ গীতি:
ছিকহাং
উবাগীত
লাঙ্যা - লাঙ্যানী প্রেমিক - প্রেমিকার গীত
বারমাসী গীত।

ম্রো বা মুরং লোকসঙ্গীত

ম্রোদের গানে যেমন আছে প্রেম ভালবাসা, তেমনি বিরহগাঁথা ও দেশাত্মবোধে সমৃদ্ধ চেতনা। ম্রো উপজাতির মুখে মুখেই গানসমূহ রচিত ও প্রবহমান বংশপরম্পরায়। মনের ভাব প্রকাশের জন্য ম্রো যুবক-যুবতীরা মূলত গানকেই বেছে নেয়। তেমন লোকজ গানের অংশবিশেষ–

দম্রক ক্লিংলেউ ক্লিংকম প্রপ্রাই
জি চাংলং প্রাইচিল লিপা আইলে
উ: প্রাইনি পম্লং বাউ-অ:

অর্থ: ঝাঁক হারানো পাখি যেমন পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে কাঁদে, তেমনি আমিও তোমাকে হারিয়ে কাঁদি; হে হারানো প্রিয়া।

ম্রোদের লোকগীতি প্রায় সর্বাংশেই নাচভিত্তিক। এদের লোকগানে কোনো কোরাস নেই। একক বা দ্বৈতভাবেই গান পরিবেশন করা হয়।

রাম পম্লাং পম্লাই / সাচিয়া কাম পম্লাই

১২জন পুরুষ ও ১২জন অবিবাহিত মেয়ে এক সাথে এই নৃত্যগীত গেয়ে থাকে। তবে এই নৃত্যগীতের প্রচলন রাঙ্গামাটির তান গোত্রীয় ম্রোদের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ।

ক্লু বং প্লাই - বর্ষবরণ ও বর্ষ বিদায় উৎসবে প্লু বাঁশি বাজিয়ে উৎসব।

চাকলু প্লাই - শিকারী পশুর মুণ্ড নিয়ে নৃত্যগীত।
শাকং প্লাই - মৃতের আত্মার সন্তুষ্টির জন্য নৃত্যগীত।
ওয়াং ফাউ ফ্লাই - বৃষ্টি আহবানের লক্ষ্যে নৃত্যগীত। যেমন-
সং চাপো কাতুই দই
দাম চাপো কাতুই দই
ওয়াংচাক চারু চাক ক্রম ক্রম

www.pathagar.com

অনুবাদঃ

ছোট চিংড়ি ছোট মাছ
নাহি পায় জল
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়
ভরে যায় খাল।

উয়া প্লাই/ চাম প্লাই - জুমের অপদেবতার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নৃত্যগীত।

গো হত্যা নৃত্যঃ এই নৃত্যগীত সুপ্রাচীন ও জনপ্রিয়। ম্রোদের ধর্মগ্রন্থ খেয়ে ফেলার কথিত অপরাধের জন্য ফসল তোলার পর নৃত্যগীতের তালে তালে তলোয়ারের আঘাতে সম্মিলিতভাবে তারা একটি গরুকে হত্যা করে। এটিই গো হত্যা নৃত্য।

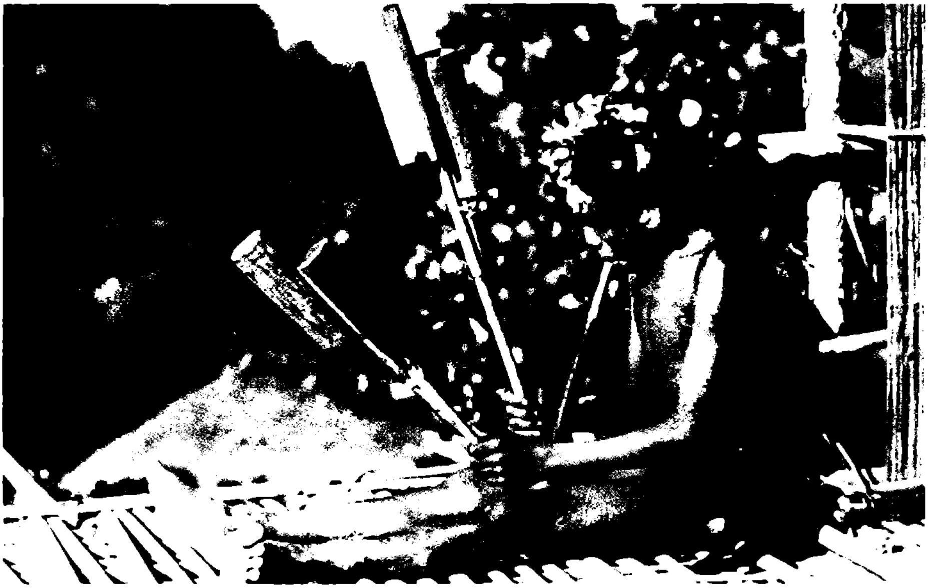

ম্রো বাঁশি

ম্রো সংস্কৃতিতে নৃত্যগীত সামাজিক অনুষ্ঠানভিত্তিক। তাদের নৃত্যগীত ৪ভাগে বিভক্তঃ

০১। প্লীচ,০২। প্লীচিং চাতচেতপ্লী,০৩। দেংগরামতকপ্লী,০৪। রাওলাতাতিংপ্লী।

চাকমা লোকসঙ্গীত

উবাগীতঃ চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি। এর সাথে কোনো গানের তুলনা চলে না। ব্যতিক্রম সুরের এই গান মূলত প্রেমের। গেংগুলি গায়কেরা বেহালা বাজিয়ে এই গান করে।

চাকমা বারমাসীসমূহ

চান্দবীর বারমাচ
তান্যবীর বারমাচ
রত্তনবীর বারমাচ
যুদ্ধপুদির বারমাচ
কির্বাবীর বারমাচ
মেয়াবীর বারমাচ

www.pathagar.com

তান্যবীর বারমাচের নমুনা: তান্যাবী রান্যাত যায় শুগরি দাদি টানের লই
পুরান কথা ঈদত তুলি গুজুরি কানের লই।

অনুবাদ: তান্যাবী রান্যায় যায় কুমড়ো লতার টানে
পুরান কথা পড়লে মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

পালাগান সমূহ: রাধামন -ধনপুদি
সনামন -পানপুদি
নরধন-নরপুদি
চাদিগাঙছাড়া
লক্ষ্মী
চরামিত্তু

উবাগীতের সুরে পালাগানসমূহ গাওয়া হয়। পালাগান মূলত কাহিনী ভিত্তিক। প্রেমিক-প্রেমিকার সুখ-দু:খ ভিত্তিক পালাগান বেশি প্রচলিত।

ভাওয়াইয়া গান: সংখ্যায় বেশি না হলেও চাকমাদের ভাওয়াইয়া গানের সাথে বাংলা ভাওয়াইয়া সুরের মিল লক্ষণীয়।

একটি ভাওয়াইয়া গান: হাত ধরং ওরে কালা পাও বা ধরং তোরে
ওরে গাছের কাপড় পাড়িয়া দে তুই যাং এল ঘরে।

জুম নৃত্যগীত: ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রে জুম নৃত্যগীত চাকমা সমাজে খুব জনপ্রিয়।

অধিক প্রচলিত লোকগীতি: খরত গেলে মগে পায়
ঝারত গেলে বাঘে খায়
মগে ন পেলে বাঘে খায়
বাঘে ন পেলে মগে খায়।

অন্যান্য লোকগীতি: এঁওতার গীত
নিমাই চান্দের গীত
শিবচরন চাকমার গীত
খোলামনি উৎসবের গীত।

লুসাই লোকসঙ্গীত: পার্বত্য চট্টগ্রামে লুসাই জাতিগোষ্ঠী অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মানুসারী। তাই তাদের একান্ত লোকজ গীতি বা সংস্কৃতির অনেকাংশই হুমকির মুখে।

লোকজগান: দোলবোল, নউহ, সিম, আত্রে লইলাম ইত্যাদি।

লুসাইরা মনের আবেগ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লালন করতে অভ্যস্ত নয়।

নৃত্যগীত - বাঁশ নৃত্যগীত
পুষ্প নৃত্যগীত
নরমুন্ড শিকার নৃত্যগীত

নৃত্যের সাথে এসব লোকগীতির লক্ষ্য জীবনে সফলকাম ও দেবতাদের তুষ্টি।

পাংখোয়া লোকসঙ্গীত: পাংখোয়া সমাজে জিইয়ে চলা সংস্কৃতির লোকগীতিসমূহ নানারূপ পুরাকাহিনী, উপকথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ও রম্য কল্পকথা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ।

লোকগীতি - ব্যালেক
লোকগীত সমন্বিত নৃত্য - ইপ্রা আকা
জুম নৃত্যগীত
মাইলুকমা
ছিয়াছত
সালুমালাম।

www.pathagar.com

লোক সঙ্গীতের অন্যান্য তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

লোক সঙ্গীতের নাম	উৎপত্তি স্থল	বিস্তৃতি স্থল	চলমান	বিলুপ্তপ্রায়	বিলুপ্ত	বাণিজ্যিক মূল্যমান
ত্রিপুরা						
ত্রিপুরা সারং	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
ত্রিপুরা ভৈরব	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
রাগ-গোমতী	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
কৃষ্ণলীলা	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
রাসলীলা	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
কেরপূজা	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
সাকাল	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
কাথারক	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
চুমলাই	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
হাচুকমা	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
বাউনি বাউনি	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	নাই
নাই রাং	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	নাই
লেবাং	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	নাই
জুয়াংফা	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	---	---	---	নাই
মামিত	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	---	---	---	নাই
অনজালা	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	---	---	---	নাই
হজাগিরি	ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	---	---	---	নাই
চাকমা						
উবাগীত	মায়ানমার (বার্মা)	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
চাকমা বারমাসী	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
চাকমা পালাগান	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
জুম নৃত্যগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
এঁওতারগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	---
শিবচরণ চাকমার গীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	---
খোলামনি উৎসবের গীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	---
ম্রো						
জ্যা তে খ্রাং রাম প্লাং প্লাই	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
সাচিয়া কাম প্লাই ভানতালা	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
ক্লুবং প্লাই চাইঃ অং	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
নৃত্যগীতসমূহ	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
চাগয়াং মাকং প্লাই	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
উয়া প্লাই চাম প্লাই	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
গো হত্যা নৃত্যগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	---
ওয়াং ফাউ প্লাই	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	---
চাকলু প্লাই	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত	---	---	---

www.pathagar.com

লোক সঙ্গীতের নাম	উৎপত্তি স্থল	বিস্তৃতি স্থল	চলমান	বিলুপ্ত প্রায়	বিলুপ্ত	বাণিজ্যিকভাবে মূল্যমান
তঞ্চঙ্গ্যা						
উবাগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
প্রেমের কাহিনী	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
পালাগান	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
বম						
কাইলেক	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
বিভিন্ন লোকগীতি	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
মারমা						
কাপ্যা	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
চাগায়াং	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
লুংদি	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
সাইংগ্যাই	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
বিবাহ অনুষ্ঠানের গীত সমূহ	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
সমাগম,সমারোহ ও সমাবেশের গীত সমূহ	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
স্বাখাং	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
নবাইংলা	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
পাংখুং	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	নাই
হাইংছোয়া	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	নাই
সাইং বক	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	নাই
রদু: জাইট	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	আছে (আংশিক)
ঙচোয়ে আকাহ	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত প্রায়	---	---	নাই
চাক						
উবাগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
বারমাসী গীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
প্রেমিক-প্রেমিকার গীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
চাকগান	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	আংশিক	---	---	আছে (আংশিক)
খুমি						
গোহত্যা নৃত্যগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
নিজস্ব লোকগীতি	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	আংশিক	---	---	আছে
পাংখোয়া						
নৃত্যগীতসমূহ	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
লোকগীতিসমূহ	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে (আংশিক)
খিয়াং						
নিজস্ব লোকগীতি	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম		---	---	আছে (আংশিক)
লুসাই						
বাঁশ নৃত্যগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
পুষ্প নৃত্যগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
নরমুণ্ড শিকারকরণ	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিলুপ্ত	---	---	নাই
নৃত্যগীত	মায়ানমার	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চলমান	---	---	আছে
লোকজ গানসমূহ						

www.pathagar.com

খিয়াং লোকসঙ্গীত: নিজস্ব লোকগীতি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর / শিল্পীর নাম

মারমা শিল্পগোষ্ঠী
ত্রিপুরা শিল্পগোষ্ঠী
খিয়াং শিল্পগোষ্ঠী
তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পগোষ্ঠী
পাংখোয়া শিল্পগোষ্ঠী
খুমি শিল্পগোষ্ঠী
চাক শিল্পগোষ্ঠী
ম্রো শিল্পগোষ্ঠী
চাকমা শিল্পগোষ্ঠী
বম কালচারাল গ্রুপ শিল্পগোষ্ঠী

বিশেষ দ্রষ্টব্য: খিয়াং,পাংখোয়া,খুমি-এদের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গ্রামীণ পর্যায়েই সীমাবদ্ধ।

কয়েকজন একক / দলীয় শিল্পী

মি: বেল নেই বম
মি: চম লি বম
মি: লং ঙান ম্রো
মি: মেন ইয়াম ম্রো
মি: দাওহার বম
মিসেস শোয়েনু প্রু মার্মা
মি: মং চ প্রু মারমা
মি: ক্রাই খ্যাং ওয়া জ্যা ও তাঁর দল।

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের

লোক বাদ্যযন্ত্রের তালিকা

সম্প্রদায়	বাদ্যযন্ত্র
মারমা	বুং,পাইট (ঢোল), রেয়াজ, গ্রহ (বেহলা), ক্রি-চয়, দুমমং, ক্লাইওনেট, খা-অম, বুষ, চেহ (ঝাঁজ), হ্রেহ (বাঁশি, পেহ, দার খোয়াং,খেংখ্রং,পাইতালম্না, রাংখুওয়াক, ক্রিনাং, সাইংজি, মং, খারা
ত্রিপুরা	বাঁশি, সারিন্দা, চেম্প্রংখমক, শিমুর, খা অম (বেহল), খোয়াং (ঢোল), বাং পুং
ম্রো	পম্লুং (বাঁশি),রিনাপম্লুং,তিং তং পম্লু,খোয়াং,গং পুং
চাকমা	হেনী, চামপ্রাং, ছেন্দা,হেংরংদুধুক, সিঙ্গার, বেলা, মগিউংচং, ড্রাগনাকৃতির (সতার), বাজি, শিঙ্গা, খেংখ্রং, ধুন্দুক, জান্দুরা
তঞ্চঙ্গ্যা	ঢুঢুক, খেংখ্যাং, (মেয়েদের ঠোঁট বাঁশি),বেলাপাক, বাঁশি, ঢোল
চাক	গিটার, চংপেস্নই, সেদা (গিটার), খাঁই, কুসুম (জনপ্রিয় বাঁশি)
পাংখোয়া	গিটার, চংপেস্নই, সেদা (গিটার), খাঁই, কুসুম (জনপ্রিয় বাঁশি)
বম	গিটার, খুয়াং (ঢোল), বিরট, ডারখোয়াং, জলফাল, মিং মিং (ছোট বাঁশি)

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে সম্ভবত গিটারের প্রবর্তন বমদের হাতেই।

www.pathagar.com

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সংগীতের বার্ষিক মূল্যায়ন

জাতি গোষ্ঠীর নাম	বাণিজ্যিকভাবে মূল্যমান আছে এমন সঙ্গীতসমূহ	মূল্যমানের উপকরণ ভিত্তি	মূল্যমান (প্রায়)
ত্রিপুরা	ত্রিপুরা সারং, কৃষ্ণলীলা, ত্রিপুরা ভৈরব, রাসলীলা, রাগগোমতী কেরপূজা, সকাল, কাথারক, চুমলাই, হাচুকমা	উপগোষ্ঠীগত অনুষ্ঠান, পাহাড়ি-বাঙালি সম্মিলিত অনুষ্ঠান, সিডি, ক্যাসেট, জাতীয় প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান, বাদ্য-বাজনা বিক্রয়	দৈনিক তিন লক্ষ টাকা আয় হিসেবে ১০,৯৫,০০০০০/-
চাকমা	উবাগীত, চাকমা বারমাসী, চাকমা পালাগান, জুম নৃত্যগীত		দৈনিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয় হিসেবে ১৭,২৫,০০০০০/-
ম্রো	জ্যা তে খাং, ক্লুবং পম্লাই, রাম পম্লাং পম্লাই, সাচিয়া কাম পম্লাই, ভানতালা, চাইং তাং, নৃত্যগীত সমূহ, চাগয়াং, মাকং পম্লাই, উয়া পম্লাই, চাম পম্লাই		দৈনিক এক লক্ষ টাকা আয় হিসেবে ৩,৬৫,০০০০০/-
মারমা	কাপ্যা, চাগায়াং, লুংদি, সাইংগ্যাইং, বিবাহগীত, সমাগমগীত, স্বাগ্রাং, নবাইংলা, রদু, জাইট		দৈনিক সাত লক্ষ টাকা আয় হিসেবে ২৫,৫৫,০০০০০/-
তঞ্চঙ্গ্যা	উবাগীত, প্রেমের কাহিনী, পালা গান		দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হিসেবে ২,০০,০০,০০০/-
চাক	উবাগীত, বারমাসী গীত, প্রেমিক-প্রেমিকার গীত, চাক গান		দৈনিক পঁচিশ হাজার টাকা আয় হিসেবে ১,০০,০০০০০/-
বম	কাইলেক, বিভিন্ন লোকগীতি		দৈনিক দশ হাজার টাকা আয় হিসেবে ৩৬,৫০,০০০/-
খুমি	গোহত্যানৃত্যগীত, নিজস্ব লোকগীতি		দৈনিক পাঁচ হাজার টাকা আয় হিসেবে ১৮,২৫,০০০/-
পাংখোয়া	নৃত্যগীতসমূহ, লোক গীতিসমূহ		দৈনিক দুইহাজার পাঁচশত টাকা হিসেবে ৯,১৩,০০০/-
খিয়াং	নিজস্ব লোকগীতি		দৈনিক দুইহাজার পাঁচশত টাকা হিসেবে ৯,১৩,০০০/-
লুসাই	বাঁশ নৃত্যগীত, পুষ্পনৃত্যগীত, লোকজ গানসমূহ		দৈনিক পাঁচ হাজার টাকা হিসেবে ১৮,২৫,০০০/-
			সর্বমোট ৬১,৩১,২৬,০০০/-

বি. দ্র. ২০০৬ সালে WIPO-এর অধীন ও বাংলা একাডেমির অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার ব্যবস্থাপনায় "পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠীসমূহের সাংস্কৃতিক পরিচয়, মূল্যমান নির্ধারণ ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ" বিষয়ে আমার কর্মের অভিজ্ঞতা ও ডকুমেন্ট এবং বর্তমান জরিপের ধারণাগতভাবে (conceptual) ভিত্তিতে উক্ত মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যমান সৃষ্টির প্রক্রিয়াগত কৌশল মূল্যামানকে বেগবান করতে পারে নিঃসন্দেহে। লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক ব্যক্তি নয়, সমাজ এই বোধে আদি জাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে আশাব্যঞ্জক প্রেরণা সৃষ্টিও মূল্যমানের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

সুপারিশমালা

সংগ্রহ সম্পর্কিত: প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীকে নিঁখুতভাবে সংগ্রহ করতে হলে পর্যাপ্ত সময় ও আর্থিক সহায়তা অপরিহার্য। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় তথা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে এশিয়াটিক সোসাইটির বিশেষ চুক্তি বা নীতিমালার আলোকে, প্রাসঙ্গিক গবেষণায় এম.ফিল/পি.এইচ-ডি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে গবেষক উচ্চতরভাবে মূল্যায়িত হবার তাড়নায় তাড়িত হবেন। গবেষণায় মৌলিকত্ব আসবে বেশি এবং লোকজসংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ ত্বরান্বিত হবে।

www.pathagar.com

সংরক্ষণ সম্পর্কিত: এ সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণাসমূহ লোকজ সংস্কৃতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। উক্ত রূপ সংগ্রহের প্রচেষ্ঠা, কৃতিত্ব ও ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে পুরস্কার কিংবা পরামর্শদানের ব্যবস্থা থাকলে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা হবে উৎসাহিত ও মূল্যায়িত।

উপস্থাপন: আদি গোষ্ঠীদের উপর গবেষণা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁদের গোষ্ঠীগত গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিকর্মীসহ জ্ঞানবান ব্যক্তিত্বের সমাবেশকে নিশ্চিত করতে হবে।

মেধাস্বত্ব প্রদান: মেধা যার স্বত্ব তার রাষ্ট্রীয়ভাবে এই শর্তের প্রতিষ্ঠাই পারে আদিজাতি গোষ্ঠীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে,তাদের সংস্কৃতি চেতনাকে উৎসাহিত করতে। মেধাস্বত্ব প্রদান করে আদি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির অন্যতম স্তর লোক সঙ্গীতের অন্বেষণ, লালন, সংরক্ষণ ও বাণিজ্যায়নকে প্রাগ্রসর করতে হবে।

উপসংহার: পার্বত্য চট্টগ্রামের উল্লেখিত আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির অন্যতম লোকসঙ্গীত প্রশ্নে স্মর্তব্য যে, সব জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত নিখুঁত পরিচয় এখনও উন্মোচিত হয় নি। অভিন্ন কারণে লোক সঙ্গীতসমূহের অনেকটাও আজানা। আদিবাসীদের নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতির বাহক এই লোকগীতিসমূহের যথার্থরূপ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটাতে হবে। তবেই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত অগ্রগতি জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতিময় অগ্রযাত্রা ও মূল্যমানকে বেগমান করবে।

তথ্যসূত্র

সাংগু, উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা বর্ষ ১০ সংখ্যা ০১।
সাংগু, উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা বর্ষ ০৫ সংখ্যা ০১।
সাংগু, উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা বর্ষ ১ম থেকে ৩য় খন্ড একত্রে।
উপজাতীয় সঙ্গীত পুস্তিকা ৩য় খন্ড, ৫ম খন্ড, ২য় খন্ড।
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান।
ওয়াগ্যোয়াই, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান।
পইংজ্রা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান।
সম্মানিত পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান।
কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান।
তঞ্চঙ্গ্যা জাতি, রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা।
চাকমা পরিচিতি, সুগত চাকমা।
Chakma, Murung, Marma, Tripura।
Colurful People of Bangladesh- BITA।
গবেষণা কর্ম: পার্বত্য চট্টগ্রাম, আতিকুর রহমান।
বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, রামকান্ত সিংহ।
বাংলাদেশের ম্রো উপজাতির জীবন ধারা, মুহাম্মদ আবদুল বাতেন।
ত্রিপুরা জাতি ও সংস্কৃতি, প্রভাংশু ত্রিপুরা।
মারমা জাতিসত্তা, মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত।
বাংলাদেশের উপজাতি, সুগত চাকমা।
লোকসংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারণ, মুহম্মদ নূরুল হুদা,
দৈনিক আমার দেশ, ০৯অক্টোবর'২০০৫সংখ্যা।
উপজাতীয়দের ইতিহাস ও জীবনধারা, মু: আইনাল হক।
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি।
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি।

www.pathagar.com

৪

ঢাকা অঞ্চল

৪.১ ঢাকা বিভাগের লোকসঙ্গীত

বিমান চন্দ্র বিশ্বাস

ভূমিকা: গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সঙ্গীত। এদিক থেকে লোকগীতি, লোকবাদ্য, লোকনৃত্য এই তিনের সমন্বিত রূপকেই লোকসঙ্গীত বলা যায়। বাংলা লোকসঙ্গীত শুধু সমষ্টিরই সৃষ্টি নয়, ব্যষ্টিরও রচনা। প্রাচীন নাথ গীতিকা থেকে শুরু করে বর্তমান কালের বাউল, মরমিয়া ও দেহতত্ত্ব গানের রচয়িতাদের নাম-ভনিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যেসকল গান নাম না জানা কোনো স্বভাবকবি অথবা কর্মজীবী মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে লোকের কণ্ঠের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করেছে এবং বাণী ও সুরে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি বর্ণিত রয়েছে তাকে লোকসঙ্গীত বলা হয়। লোকসঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সঙ্গীতে আছে গণমনের অকপট অভিব্যক্তি। বাংলা লোকসঙ্গীত বৈচিত্র্যময়। শ্রমজীবী জনমানসের সংস্কারগত চিন্তাভাবনা, বারোমাসে তের পার্বণ, জগৎ জীবন সম্পর্কে ঔৎসুক্য, নদী নৌকার রূপকাশ্রয়ী চিন্তা-চেতনা, দারিদ্র, অন্যায় অবিচার প্রভৃতি বিষয়গত বোধ ও অলৌকিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গ্রাম বাংলার মানুষ এ গান বেঁধেছে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এর প্রাথমিক কালের ইতিহাস সুস্পষ্ট নয় ফলে এ নগরীর পত্তন কবে ঘটে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুসকিল। গুপ্ত, পাল, বর্মণ, সেনযুগীয় শাসন আমলে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাভার, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। মুসলিম যুগেও বিশেষত বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনামলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে) রাজধানী সোনারগাঁও এর নিকটবর্তী স্থান হিসেবে ঢাকার অপরিসীম গুরুত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। প্রাচীন নথিপত্রে এখনও প্রমাণ আছে যে, একাদশ শতকের শেষের দিকে এ অঞ্চলে এক সুবৃহৎ জনপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তখন ঢাকা বিশ্বের প্রধান জনবহুল শহরগুলোর অন্যতম ছিল। দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকার আত্মপ্রকাশ।

জেলা পরিচিতি: রাজধানী শহর ঢাকা বিভাগ। বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক প্রাচীন জনপদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদসহ শিক্ষা সংস্কৃতিতে এই বিভাগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিভাগের অধীনে সতেরটি জেলা: ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ। ঢাকা বিভাগের আয়তন ৩১,১৭৮ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩,৩৫,৯৩,০০০ জন। এই বিভাগের উত্তরে মেঘালয়, দক্ষিণে বরিশাল বিভাগ, পূর্বে সিলেট বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং পশ্চিমে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ অবস্থিত।

www.pathagar.com

মহররমের মিছিল, ঢাকা

ঢাকা: ১৬০৮ সালে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান চিশতী রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। তখন ঢাকার নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর। ঢাকা নামের উৎপত্তি নিয়ে জনশ্রুতি রয়েছে। কারো কারো ধারণা ঢাকা নামক বৃক্ষ থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। কেউ কেউ বলেছেন বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে বর্তমান রাজধানী ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে। আয়তন ১৪৬৪ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ৬১,৬৩,০৪৫ জন। শিক্ষিতের হার প্রায় ৩৫%। জনগোষ্ঠীর পেশাসমূহ- কৃষি ৭.৬২%, কৃষি শ্রমিক ৪.৪১%, শিল্প ১.৮৭%, ব্যবসা ২৩.০৮%, চাকুরী ৩১.৪৯%, বাড়ি ভাড়া ২.২৩%, পরিবহন ৮.৫৩%, নির্মাণ শ্রমিক ২.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৭১%, অন্যান্য ১৫.৩০%। এ অঞ্চলের প্রধান গান হলো বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারেফতি, দেহতত্ত্ব, অপ্রধান গানগুলোর মধ্যে ধুয়া, বারাশে।

গাজীপুর জেলা: দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে পালোয়ান গাজী নামক জনৈক মুসলমান বীর ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তখন এ অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। পালোয়ান গাজী এ অঞ্চলের অনেক জঙ্গল পরিস্কার করে বসবাসের উপযোগী করে তোলেন। পরবর্তীতে পালোয়ান গাজীর বংশধররা অনেক দিন এ এলাকা শাসন করেন। ধারণা করা হয় এই পালোয়ান গাজীর নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় গাজীপুর। আয়তন ১,৭৪১ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ১৬,৮৭,৯৯০ জন, ৭টি থানা, ৪৩টি ইউনিয়ন এবং মৌজা ১,৩১৩টি। শিক্ষিতের হার প্রায় ৩৫%। এ জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ জেলা, পূর্বে নরসিংদী জেলা, পশ্চিমে ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলা অবস্থিত। এ অঞ্চলে বাউল ও ভাটিয়ালি গান প্রধান।

নরসিংদী: ধারণা করা হয় রাজা নরসিংহের নাম থেকে নরসিংদী জেলার নামকরণ করা হয়। এই জেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, পূর্বে মেঘনা নদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং পশ্চিমে গাজীপুর জেলা অবস্থিত। আয়তন ১১৪৯ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ১৭,০৯,৯৯২ জন। ৬টি থানা, ৭০টি ইউনিয়ন এবং ৫৮৭টি মৌজা রয়েছে। শিক্ষিতের হার প্রায় ২৮%। ভাটিয়ালি, বাউল, মুর্শিদি, মারেফতি ও পালা গান এ অঞ্চলের।

www.pathagar.com

মাণিকগঞ্জ: আয়তন ১,৩৭৯ বর্গকিলোমিটার, ৭টি থানা, ৬৫টি ইউনিয়ন এবং ১,০৩৮টি মৌজা রয়েছে। এ জেলার জনসংখ্যা প্রায় ১২,১৬,৭৬৩ জন। শিক্ষিতের হার প্রায় ২৮%। এই জেলার উত্তরে টাঙ্গাইল জেলা ও যমুনা নদী। দক্ষিণে ঢাকা জেলা পদ্মা নদী, পূর্বে ঢাকা জেলা, পশ্চিমে রাজবাড়ী এবং পাবনা জেলা ও পদ্মানদী প্রবাহিত। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী, ভাষাসৈনিক শহীদ রফিক, সাধক ভবাপাগলা, কালুশাহ্ ফকিরের জন্ম এই জেলায়। ভবাপাগলা এবং কালুশাহ্ ফকিরের অসংখ্য গান রয়েছে যা আমাদের লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এ অঞ্চলের প্রধান গান হলো ভাটিয়ালি।

মুন্সিগঞ্জ: মুন্সিগঞ্জ জেলার উত্তরে ঢাকা, দক্ষিণে ফরিদপুর জেলা, পূর্বে কুমিল্লা জেলা এবং পশ্চিমে পদ্মানদী ও ফরিদপুর জেলা অবস্থিত। আয়তন ৯৫৫ বর্গকিলোমিটার, ৬টি থানা, ১৭টি ইউনিয়ন এবং ৬৯৫টি মৌজা রয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় ১২,২৯,৩৮৯ জন। শিক্ষিতের হার প্রায় ৩৮.৮%। ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারেফতি ও পালাগান এ অঞ্চলের।

নারায়ণগঞ্জ: এ জনপদ প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। ধারণা করা হয় হিন্দু ধর্মীয় দেবতা নারায়ণ ঠাকুরের নামানুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয় নারায়ণগঞ্জ। এই জেলার উত্তরে নরসিংদী ও গাজীপুর জেলা, দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জ জেলা, পূর্বে মেঘনা নদী ও কুমিল্লা জেলা এবং পশ্চিমে ঢাকা জেলা অবস্থিত। আয়তন ৭৫৯ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ১৮,১৮,৯৪৪ জন। ৫টি থানা, ৪৯টি ইউনিয়ন ও ৯৩০টি মৌজা রয়েছে। শিক্ষিতের হার প্রায় ২৭%। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর আছে এখানে। এ অঞ্চলের প্রধান গান হলো ভাটিয়ালি। তাছাড়া বাউল, মুর্শিদি, মারেফতি গানও এ অঞ্চলের।

ময়মনসিংহ: ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে গাজীপুর জেলা, পূর্বে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা অবস্থিত। আয়তন: ৪,৩৬৩ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪০,৯৬,৪৮৬ জন। শিক্ষিতের হার শতকরা ২৮.৫%। এই জেলায় ১২টি থানা ও ১৪৬টি ইউনিয়ন রয়েছে। ময়মনসিংহের লোক সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাটিয়ালি, বাউলগান, পালাগান, মৈমনসিংহ গীতিকা, ঘাটু গান উল্লেখযোগ্য। লোক শিল্পের মধ্যে রয়েছে বাঁশ ও বেত, তাঁত, মৃৎ শিল্প ইত্যাদি। ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন আদিবাসীর বসবাস রয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী হলো গারো। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে।

শেরপুর: শেরপুর জেলার আয়তন ১,৩৬৪ বর্গকিলোমিটার, ৫টি থানা, ৫১টি ইউনিয়ন এবং মৌজার সংখ্যা ৬২২টি। শিক্ষিতের হার শতকরা ১৮% এবং মোট জনসংখ্যা প্রায় ১১,৭৮,৯২১ জন। শেরপুর জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও দক্ষিণে জামালপুর জেলা, পূর্বে ময়মনসিংহ জেলা এবং পশ্চিমে জামালপুর জেলা ও যমুনা নদী প্রবহমান রয়েছে। এ অঞ্চলে পালা, জারী ও ঘাটু গান প্রধান।

জামালপুর: জামালপুর জেলার নামকরণ নিয়ে জনশ্রুতি রয়েছে যে, হযরত শাহ জামাল (রঃ) নামে একজন ধর্ম প্রচারক এই অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। কালক্রমে হযরত শাহ্ জামাল (রঃ)-এর নামানুসারে এই শহরের নামকরণ করা হয় জামালপুর। এ জেলার উত্তরে শেরপুর জেলা, দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলা, পূর্বে ময়মনসিংহ জেলা এবং পশ্চিমে বগুড়া জেলা অবস্থিত ও যমুনা নদী প্রবহমান। জনসংখ্যা প্রায় ১৯,৪২,৭৫২ জন এবং আয়তন ২০৩২ বর্গকিলোমিটার। শিক্ষিতের হার প্রায় ২২%, ৭টি থানা, ৬৭টি ইউনিয়ন এবং মৌজার সংখ্যা রয়েছে ৭২৭টি। প্রধান গানগুলোর মধ্যে পালা ও বাউল এবং জারী। ঘাটু, ধুয়া এবং বারাশে অপ্রধান গান।

নেত্রকোনা: নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও হাজং, হদি ইত্যাদি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বাসস্থান। নেত্রকোনা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। আয়তন ২৮১০ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ১৭,৯০,৭৮৫ জন এবং শিক্ষিতের হার প্রায় ২৬%। এই জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা অবস্থিত। এ জেলার প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলোর মধ্যে রয়েছে ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদী, পালাগান, জারী, ঘাটু, মারেফতি ও বাউল গান।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জঃ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত কিশোরগঞ্জ জেলা। ধারণা করা হয় নন্দ কিশোরের নামানুযায়ী এ জায়গার নামকরণ করা হয় নন্দ-কিশোরগঞ্জ। নন্দ-কিশোরগঞ্জ থেকে কালক্রমে কিশোরগঞ্জ জেলা নামকরণ হয়। এই জেলার উত্তরে নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ জেলা, দক্ষিণে নরসিংদী, পূর্বে হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলা অবস্থিত। আয়তন ২,৬৮৯ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৩,৮৮,৩৪৮ জন। ১৩টি থানা, ১৯৬টি ইউনিয়ন এবং ১,৭১১টি মৌজা রয়েছে। শিক্ষিতের হার প্রায় ২২%। এ অঞ্চলের প্রধান গান হলো পালা ও ভাটিয়ালি। তাছাড়া বাউল, মুর্শিদি, মারেফতি, জারী ও ঘাটুগান এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

টাঙ্গাইলঃ এই জেলার আয়তন ৩,৪১৪ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ৩১,০৮,০৮৫ জন এবং শিক্ষিতের হার পুরুষ ৩৬.১% ও মহিলা ২২.৪% প্রায়। ১১টি থানা, ১৮৩টি ইউনিয়ন ও ২,০১৯টি মৌজা রয়েছে। এই জেলার উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলা, পূর্বে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলা এবং পশ্চিমে পাবনা, সিরাজগঞ্জ জেলা অবস্থিত ও যমুনা নদী প্রবহমান। প্রধান গানের মধ্যে বাউল গান এবং ধুয়া, বারাশে অপ্রধান।

ফরিদপুরঃ ফরিদপুর জেলার উত্তরে পদ্মানদী, দক্ষিণে গোপালগঞ্জ জেলা, পূর্বে মাদারীপুর জেলা এবং পশ্চিমে নড়াইল, মাগুরা ও রাজবাড়ী জেলা অবস্থিত। এর আয়তন ২,০৭৩ বর্গকিলোমিটার। ৮টি থানা, ৭৯টি ইউনিয়ন ও ৯১১টি মৌজা রয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় ১৫,৫৮,২১১ জন এবং শিক্ষিতের হার প্রায় ২৭%। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের জন্ম এ জেলায়। তাঁর লেখা এবং সংগ্রহ করা গান আমাদের লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বাউল, ধুয়া, বারাশে এ অঞ্চলের গান।

মাদারীপুরঃ মাদারীপুর জেলার উত্তরে ফরিদপুর ও পদ্মানদী, দক্ষিণে বরিশাল জেলা, পূর্বে শরীয়তপুর জেলা ও মেঘনা নদী এবং পশ্চিমে গোপালগঞ্জ জেলা ও পদ্মানদী প্রবহমান। আয়তন: ১,১৪৫ বর্গকিলোমিটার, ৪টি থানা, ৫৮টি ইউনিয়ন এবং ৬৮৬টি মৌজা। জনসংখ্যা প্রায় ১১,০৬,৫৫১ জন এবং শিক্ষিতের হার প্রায় ২২%। এ অঞ্চলের প্রধান গান হলো রয়ানী তাছাড়া পালাগানও এ অঞ্চলের।

ঢাকা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত (নব পর্যায়)

www.pathagar.com

সাইদুর রহমান বয়াতি ও তাঁর দল

শরিয়তপুর: ঐতিহাসিক ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হাজী মোঃ শরীয়তুল্লাহর নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় শরীয়তপুর। এ জেলার উত্তরে মুন্সিগঞ্জ ও পদ্মানদী, দক্ষিণে বরিশাল জেলা, পূর্বে চাঁদপুর জেলা, পদ্মা ও মেঘনা নদী এবং পশ্চিমে মাদারীপুর জেলা অবস্থিত। আয়তন ১,১৮৯ বর্গকিলোমিটার। ৬টি থানা, ৬১টি ইউনিয়ন এবং মৌজার সংখ্যা ৫২০টি। জনসংখ্যা প্রায় ৯,৮৬,০২৭ জন এবং শিক্ষিতের হার প্রায় ২২%। এ অঞ্চলের প্রধান গান রয়ানী ও পালা।

রাজবাড়ী: রাজবাড়ী জেলার নামকরণের প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বাদশা আকবরের আমলে এই জনপদে রাজবাড়ী ছিল। ধারণা করা হয় এই রাজার বাড়ী থেকেই এ জেলার নামকরণ করা হয় রাজবাড়ী। এই জেলার উত্তরে পাবনা জেলা ও পদ্মানদী, দক্ষিণে ফরিদপুর জেলা, পূর্বে মানিকগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে কুমিল্লা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলা অবস্থিত। এই জেলার আয়তন ১,১১৯ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ৮,৬৫,৫৫৬ জন। শিক্ষিতের হার প্রায় ২৬.৩%। এ অঞ্চলের গান হলো বাউল গান।

গোপালগঞ্জ: দক্ষিণেশ্বরের রাণী রামমণির নাতি ছিল গোপাল। ধারণা করা হয় গোপালের নামানুসারে মধুমতি নদীর তীর সংলগ্ন ছোট এই গঞ্জটির নাম রাখা হয় গোপালগঞ্জ। এই জেলার উত্তরে ফরিদপুর জেলা, দক্ষিণে বরিশাল ও পিরোজপুর জেলা, পূর্বে মাদারীপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে বাগেরহাট ও নড়াইল জেলা অবস্থিত। আয়তয় ১৪৯০ বর্গকিলোমিটার, ৫টি থানা, ৬৯টি ইউনিয়ন এবং মোট জনসংখ্যা প্রায় ১০৯৭০০৩ জন। শিক্ষিতের হার প্রায় ৩৮.২০%। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক উজ্জল নক্ষত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শিক্ষাবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম গোপালগঞ্জে। এ অঞ্চলের প্রধান গান বাউল এবং অপ্রধান গান হলো রয়ানী।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি)

ক. ভাটিয়ালি: ভাটিয়ালি গানের আদি উৎপত্তিস্থল সিলেট, ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চল। সুরমা ও মেঘনা নদী উপত্যকায় এ গানগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে এগুলোর প্রসারণ ঘটে

www.pathagar.com

পূর্ববঙ্গের নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। পূর্ববাংলার মানুষের কণ্ঠে নিঃসৃত সঙ্গীত হলো ভাটিয়ালি। ভাটিয়ালি এদেশের একটি প্রাচীন সুরও বটে।

উৎপত্তিস্থান: নওয়াবগঞ্জ, দোহার ও কেরানীগঞ্জ থানা, সমগ্র মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা, কুমিল্লা জেলার পশ্চিমাঞ্চলের চাঁদপুর, মতলব বামর, দাউদকান্দি, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নাসিরনগর থানা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার কালিয়াজুড়ি থানা এবং সিলেট জেলার লাখাই, হবিগঞ্জ, বানিয়াচং, আজমিরিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, সল্লা, দেরাই ও সুনামগঞ্জ থানা।

ভাটিয়ালি ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক কণ্ঠের সুর-প্রধান গান। গানের বিষয় অনুসারে ভাটিয়ালির সুর প্রধানত করুণ। গায়ক কয়েকটি শব্দ পরপর উচ্চরণ করে স্বরটি ধরে দীর্ঘ টান দেন। সুরের এই লহর বা টান উচ্চগ্রামে শুরু হয়, শেষে খাদে নেমে আসে। প্রলম্বিত এই টানের স্থিতি গায়কের দম ও মর্জির উপর নির্ভর করে। বিষয়ের দিক থেকে ভাটিয়ালির তিনটি প্রধান ভাগ আছে- ক. লৌকিক প্রেম, খ. রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা, গ. আধ্যাত্মিকতা। এই তিনটি ধারার মধ্যে লৌকিক প্রেম-বিরহের ভাটিয়ালি গানই আদি স্তরের। ভাটিয়ালি অবসর মুহূর্তের গান। এ গানে সাধারণত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই।

খ. বাউল: বাউল অধ্যাত্মবাদী একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গীত। এ সম্প্রদায়ের বাউল নামে পরিচিত। সাধারণত এদের কণ্ঠে গীত সঙ্গীতই বাউল সঙ্গীত। এরা একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধন-ভজন সম্প্রদায়। উনিশ শতকের আগে বাউল সঙ্গীতের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এর আগেও যে বাউল মত ও বাউল গানের প্রচলন ছিল, এমন অনুমান করা গেলেও কোনো লেখ্যরূপ মেলে না। তাছাড়া এদের সাধনপ্রণালী গুরুশিষ্য পরম্পরায় স্মৃতি ও শ্রুতি অবলম্বন করেই বহমান। মোটামুটি ভাবে বলা যায় সতের শতকের দ্বিতীয় পাদ (১৬৫০ খ্রিঃ) থেকেই বাউল মতের উন্মেষ। মাধব বিবি ও আউল চাঁদই এই মতের প্রবর্তক বলে সুধীজনের ধারণা। মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রই বাউলমত জনপ্রিয় করেন। আর উনিশ শতকের লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

সমগ্র কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ জেলা নিয়ে বাউল সঙ্গীতাঞ্চল রূপায়িত হয়েছে।

গ. জারিগান: জারি ফার্সি শব্দ, এর অর্থ ক্রন্দন বা বিলাপ। জারির কাহিনী বিদেশী হলেও ধর্মীয় অনুভূতির কারণে দেশীয় শ্রোতারা কাহিনীর সাথে একাত্মবোধ করে নয়নজলে বুক ভাসিয়ে দেয়। জারি গানের মূল সুর করুণ রসাত্মক। বিষয়বস্তু বিষাদাত্মক।

ঘ. মুর্শিদি: মুর্শিদি শব্দটি আরবি ইরশাদ শব্দটির অর্থ নির্দেশ করে। যিনি ইরশাদ বা নির্দেশ দেন তাকে মুর্শিদ বলে। সে অর্থে মুর্শিদকে গুরু বলা যেতে পারে। এই মুর্শিদ বা গুরুর প্রতি ভক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতকেই মুর্শিদি গান বলে। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য মুর্শিদ নির্দেশিত যে পন্থা সে পন্থাই মারেফত।

ঙ. বিচারগান: বিচার অর্থ বিবেচনা বা তত্ত্ব নির্ণয় করা। বিচার গান মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। এ গানের মধ্যে একজন বয়াতি প্রথম প্রশ্ন করেন গানের মাধ্যমে। আর একজন বয়াতি সেই প্রশ্নের উত্তর গানের মাধ্যমে দেন। শরিয়ত-মারেফত, মেয়ে-পুরুষ, জীব-পরম, আদম-শয়তান, কেয়ামত-হাসর, শহর-পল্লী, ছনেঘর-দালান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এ গান গাওয়া হয়।

চ. তর্জা গান: যে গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়া হয় তাকে তর্জা গান বলে। তর্জা গানও একধরনের পালাগান। যেমন প্রশ্ন: বল মন মানব দেহে কিবা বস্তু কোন জাগাতে রয় তার একটি বস্তু হারাইলে দিন দুপুরে সন্ধ্যা হয়। উত্তর: দেহতত্ত্বের কথা জিজ্ঞাস করলা শুন তাহার পরিচয় আইদ্যি চন্দ্র ডুইবা গেলে মানব দেহে সন্ধ্যা হয়।

ছ. ঘাটুগান: পল্লী গানের মূলধারা প্রেম সঙ্গীত। ঘাটু গান সে প্রেম সঙ্গীতের একটি ধারা। এ গান নৃত্যসঙ্গীতের অন্তর্গত। ঘাটু গানকে অঞ্চল বিশেষে বৈঠকী গানও বলা চলে। সৌখিন শিল্পীরা এক আসরে

www.pathagar.com

বসে পালাক্রমে সমবেত কণ্ঠে এ গান গেয়ে থাকে। এ সময় "ঘাটু ছোকরা" নীরব অঙ্গভঙ্গি সহকারে নেচে তার অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে।

জ. ধুয়াগান: এ গানের বিষয়বস্তু সাধারণত জীবনযাপনের অবস্থা থেকে সমাজনীতি, ধর্মনীতি, আধ্যাত্মকথা, হাস্যরসিকতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এক বা একাধিক লোক কোনো একটি বিষয় নিয়ে প্রথমে গায় এবং পরে দলের অন্যরা তার পুনরাবৃত্তি করে।

ঝ. মারেফতি গান: মারেফতি অর্থ আল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্বের পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান। আল্লাহর ক্ষমতা কীর্তি মহিমা ইত্যাদির কথা স্মরণ করে মুগ্ধচিত্তে তার পায়ে আপন সত্তাকে সমর্পণ করা এবং তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, এরূপ ভক্তি ও করুণ রসের গীত-রীতিকেই মারেফতি গান বলা হয়।

ঞ. পালা গান: বিচিত্র বিষয় ও ভাবনাকে কেন্দ্র করে গাওয়া পালাগান এক ধরনের দলীয় সঙ্গীত। সারা দেশে এই গান আঞ্চলিকভিত্তিতে তরজা গান, বিচার গান ও কড়চা গান নামে পরিচিত। সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি এই গানের প্রধান বিষয়।

ট. কবি গান: এ ধরনের গানের কথা পরিষ্কার, সহজে বুঝা যায়। শুদ্ধ ভাষায় গান গাওয়া হয়। আসরে দাঁড়িয়ে তৎক্ষনাৎ, উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে মূল গায়ক গান রচনা করেন এবং প্রতিপক্ষের কাছে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করেন। বিপক্ষের কবি সরকারও উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে গানের মাধ্যমে তার জবাব দেন।

ঠ. দেহতত্ত্ব গান: বাউল সাধনায় দেহের গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের মধ্যে চলে বাউলদের অধরা মানুষ ধরার কৌশল। বাউলদের দেহের মধ্যে অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়। সে সময় দেহে জোয়ার আসে। জোয়ারে অধর মানুষ ভেসে বেড়ায়। সাধন বলে তাকে ধরতে হয়। তাই বাউল গানে বারবার দেহের কথা এসেছে। অনিত্য দেহ ও পরমাত্মার রূপক নিয়ে এ গান।

ঢাকার নওহা ও কাসিদা (নিজামউদ্দিনের দল)

www.pathagar.com

কাওয়ালি পরিবেশনরত আরিফ দেওয়ান ছবি: জুলফিকার আলী ভুট্টো

ড. ডাকগান: বাংলা সাহিত্যে "ডাক ও খনার বচন" নামে যে প্রবাদ প্রবচন প্রচলিত আছে, আমাদের "ডাক গান" সে অর্থ বহন করে না। সাধারণত উরস উপলক্ষে বা ভূত ছাড়ানোর বৈঠকে এ গান গাওয়া হয়। ডাক অর্থ আহ্বান অর্থাৎ গানের মাধ্যমে কাউকে আহ্বান করা। এই গানে পরম গুরুকেই ডাকা বা আহবান করা হয়।

ঢ. জাগগান: রাত জেগে এ গান গাওয়া হয় বলে এ গানের নাম জাগ গান। পৌষ মাসে বাড়ী বাড়ী জাগ গান গেয়ে গায়ক দলের সংগৃহীত ধান চাল বিক্রি করে যে টাকা হয় তা দিয়ে পৌষ-সংক্রান্তির দিন বিপুল সমারোহে মাঠের মধ্যে শিরনির আয়োজন হয়।

ণ. সারিগান: আমাদের লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি শাখা হলো সারি গান। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রসিদ্ধ এই গান সাধারণত মাঝি-মাল্লারা সারিবদ্ধভাবে গেয়ে থাকে। বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকায় গোড়ার উপর মাঝিরা সারিবদ্ধভাবে বসে এবং নৌকার মাঝখানে রাম-করতাল ক্ষেত্রবিশেষে ঢোল নিয়ে দুই তিন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গান শুরু করে, নৌকাতে বসে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীরা বৈঠা দিয়ে নৌকার বাতায় আঘাত করে সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নেন। যে কোনো বিষয় নিয়ে সারিগান রচিত হয়ে থাকে। এই গানের সুরে একঘেঁয়েমি থাকলেও তাল লয়ের তারতম্যে তা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কতগুলি উচ্ছ্বাসবাচক শব্দ যথা: হাঃ হিঃ হোঃ তাইরিয়া নাইরিয়া, আহা বেশ ইত্যাদি গানের বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে। যেমন-

নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া দে
ছল ছলাইয়া চলুকরে নাও মাঝ দইরা দিয়া হোঃ।

ত. কাসিদা: কাসিদা ঢাকা অঞ্চলের বিখ্যাত গান। এ গান সাধারণত রমজান মাসে গীত হয়।

থ. কাওয়ালি: আরবি কাউল শব্দ থেকে কাওয়ালি শব্দের উৎপত্তি। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মুসলমান সূফি-সাধু ব্যক্তিগণের এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেম ধর্ম বিষয়ক ভক্তিমূলক গান। খোদা, রসূল বা কোনো ওলি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেও এই গান গীত হয়।

দ. মর্সিয়া: মহরম মাসে শোক পালনের সময় এই গান গীত হয়। কারবালায় সংগঠিত ঘটনায় কাহিনী নিয়ে এ গান রচিত। শিল্পীরা তাদের বুকে থাবা দিতে দিতে এ গান পরিবেশন করেন।

www.pathagar.com

অন্যান্য অঞ্চলের গান: যা ঢাকায় বহুপ্রচলিত নয়

মনসা পুজার গান
দূর্গা পূজার গান
জন্মাষ্টমির গান
রামলীলার গান
বনদূর্গার গান
কালীপুজার গান
ভাইফোঁটার গান
কার্তিক ব্রতের গান
বাস্তু পূজার গান
পৌষ পার্বণের গান
মাঘমণ্ডলের গান
উত্তম ঠাকুরের গান
নীল পুজার গান
বোলান
ভাজো গান
জারিগান:
- ক. মরমিয়া জারী
- খ. মাতম জারী
- গ. নাড়া জারী
- ঘ. ঢালি জারী
- ঙ. জল জারী
- চ. ব্যাঙ জারী
- ছ. জারী যাত্রা প্রভৃতি

মাহেলার গান
লীলা গান
ঘেটু পূজার গান
শীতলা নৃত্যের গান
গাজনের গান
হোলীর গান
বেহুলার গান
ব্যাঙের বিয়ের গান
গোরক্ষনাথের গান
কটুয়াদের গান
ভাওয়া গান
দাঁড় শালিয়া
ছোট নাচের গান
খেমটা গান
পাতা নাচের ঝুমুর
ভাদুরিয়া গান
করম নাচের ঝুমুর
বাধনা গান
তুলসী ও দড়ি গাছার গান
কাঠি নাচের গান
চড়বোর গান
জিতা পূজার গান
গরু নাচের গান
ঘাটু গান
ধুয়া গান
বারাষী গান
হ্যাচোরের গান
রাখালী
সোহেলীয়া
পুথির গান
আরসীর গান
মালসী
হাবু
ছোকরা গান
তরজা গান
গোয়ালার গান
লুটো গান
পাঠ গান
করচা গান
কুষান গান
পাঁচালী
রঙ পাঁচালী
বালাছি
পুতুল নাচের গান
ঝাপান
হোল বোল গান
বারমাসী
নব জাতকের গান
মানতের গীত
ভেরা ভাসানের গীত

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা

ক. আলাউদ্দীন বয়াতী
খ. পরান ফকির
গ. খালেক দেওয়ান
ঘ. মালেক দেওয়ান
ঙ. রজ্জব আলী দেওয়ান
চ. হালিম বয়াতী
ছ. আব্দুর রহমান বয়াতী
জ. কুদ্দুস বয়াতী
ঞ. নবীন চন্দ্র রাজবংশী
ট. ইন্দ্রমোহন রাজবংশী
ড. হামিদুল ইসলাম
ঢ. লোকমান হোসেন ফকির
ণ. মমতাজ আলী খান
ত. বেদার উদ্দীন
থ. কানাই লাল শীল
দ. সিরাজুল ইসলাম
ধ. আলাউদ্দীন বয়াতী
ন. মারফত আলী বয়াতী
প. সোহরাব হোসেন
ফ. মীর আলী বয়াতী
ব. আবুল সরকার
ভ. মোঃ দেলোয়ার হোসেন
ম. মমতাজ বেগম
য. উকিল মুন্সী
র. ইসলাম উদ্দীন পালাকার
ল. সাইদুর রহমান বয়াতি
শ. সুনীল কর্মকার

সনাক্তকৃত লোক সঙ্গীত দলের তালিকা

ক. বাংলাদেশ লোক সঙ্গীত পরিষদ
খ. কাঙ্গালিনী সুফিয়া ও তার দল
গ. মমতাজ আলী খান সঙ্গীত পরিষদ
ঘ. বাউল জাহাঙ্গীর ও তার দল
ঙ. ছানাউদ্দীন বয়াতী ও তার দল
চ. আলেয়া ইসলাম আলো ও তার দল
ছ. লতিফ সরকার ও তার দল
জ. শেফালী সরকার ও তার দল
ঝ. মায়া রাণী ও তার দল
ঞ. বাশুরীয়া
ঝ. আব্বাস উদ্দিন সঙ্গীত একাডেমী
ঞ. আব্দুল আলীম সঙ্গীত একাডেমী
ট. নলিনী সঙ্গীত একাডেমী

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা

বাউল গান, ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি, মুর্শিদি, মারেফতি।

৮. একক গানের তালিকা

বাউল গান, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী, মারেফতি, পালাগান এবং বিভিন্ন গীতিকার কর্তৃক রচিত সঙ্গীত ছাড়া একক কোনো সঙ্গীত-এ অঞ্চলের প্রচলিত নেই।

বিপন্ন গানের তালিকা: কাসিদা, মর্সিয়া, ঘাটু, ডাকগান।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা: বাউল গান, পালাগান, ভাটিয়ালি, মুশির্দি, মারেফতি।

লুপ্ত গানের তালিকা: ঘাটু, কাসিদা।

একক গানের তালিকা: ভাটিয়ালি, বাউল।

সামষ্টিক গানের তালিকা: সারিগান, কাওয়ালি, পালাগান, জারিগান।

সনাক্তকৃত লোক বাদ্য যন্ত্রের তালিকা

সারিন্দা, খমক, মন্দিরা, করতাল, জুড়ি, বাঁশি, ঢোল, খোল, নাল, বাঁশি, হারমোনিয়াম, প্রেমজুড়ি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের মেধা স্বত্বের মালিক:

স্থানীয় শিল্পী এবং গীতিকারই এ সব লোক সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক। শিল্পীদের অবর্তমানে তাদের বংশধর অথবা তাদের নামে যদি কোনো সংগঠন থাকে তাহলে সেই সংগঠনও পেতে পারে।

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ: বিভিন্ন লোক শিল্পীর কাছ থেকে লোক সঙ্গীতগুলো সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। এই গানগুলো পুস্তক আকারে, স্বরলিপিসহ প্রকাশ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে অনেক গান বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

খ. সংরক্ষণ: লোকসঙ্গীতগুলো অডিও এবং সিডি করে বিভিন্ন জেলায় শিল্পকলা বা লোকসঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। খ্যাতিমান লোকসঙ্গীত শিল্পী এবং লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের নামে লোক সঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের জীবনী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

গ. প্রচার: ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে লোকসঙ্গীতগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। লোকসঙ্গীত উৎসব, এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান মালায় লোকসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে এর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

ঘ. মেধাস্বত্ব: যারা লোকসঙ্গীত স্রষ্টা তাদের সাধনায় ফসল হল সঙ্গীত। তাই-এর মেধাস্বত্ব যেন তারা ভোগ করতে পারে তার দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। অনেকে তাদেরকে ব্যবহার করে নামমাত্র সম্মানী দিয়ে থাকেন, আবার কখনো দেন না। শিল্পীদের সাধনার মূল্য যেন পান সে দিকে সরকার ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নজর রাখতে হবে।

উপসংহার: ঢাকা বিভাগের জেলাগুলো লোকসঙ্গীতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশিষ্ট লোক মানসের পরিচয়ে লোক সঙ্গীতগুলো ফুটে উঠেছে। বিষয়বস্তুগত পরিচর্যা এবং উপস্থাপন কৌশলের মধ্যেও রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। লোক-সংস্কৃতি একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর মানস প্রকর্ষ। তাই এসব লোকসঙ্গীতের মূল্য অপরিসীম। আমাদের এই লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতি রক্ষণের স্বার্থে গানগুলো চর্চা, সংরক্ষণ ও প্রচার করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র

পূর্ববাংলার লোকসঙ্গীত: সম্পাদনা, শ্রী দিনেন্দ্র চৌধুরী, অর্পনা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৭
বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত: সম্পাদনা, শফিকুর রহমান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২
বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাটিয়ালী গান, ড. ওয়াকিন আহম্মদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭
প্রবেশিকা সঙ্গীত শিক্ষা, ওস্তাদ মুনশী রইস উদ্দীন, সারগাম পাবলিকেশন্‌স, ১৯৬০
স্মরণিকা: সঙ্গীত সম্মেলন ৯৬-৯৭, সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ১৯৯৭
টিটন'স মানচিত্রে বিশ্ব পরিচিতি ও বাংলাদেশ পরিক্রমা, সম্পাদনা, এম, এস, এ, ভুইঁয়া টিটন, ২০০০
লোকসঙ্গীত, ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী
বাংলাদেশী লোকসঙ্গীত, মোঃ সেলিম রেজা।

সাক্ষাৎকার:

কিরণ চন্দ্র রায়, বাউল শিল্পী, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন।
চন্দনা মজুমদার, কণ্ঠ শিল্পী, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন।
মোঃ দেলোয়ার হোসেন, দোতরা বাদক, বাংলাদেশ বেতার।
মিঠুন, শিক্ষার্থী, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিপুল ভট্টাচার্য্য, কণ্ঠশিল্পী, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন।
আরিফ দেওয়ান, কণ্ঠশিল্পী, বাংলাদেশ বেতার।
মোঃ ফরিদ, কণ্ঠশিল্পী, বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত পরিষদ।

www.pathagar.com

৪.২ ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীত

শাহিদা খাতুন

ভূমিকা: বাংলাদেশ আবহমানকালের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এদেশের মানুষ ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিকে হাজার বছর ধরে ধারণ ও লালন করে চলেছে। এই ঐতিহ্যিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য লোকসঙ্গীত। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র বিচিত্র এবং এর আবেদন গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। এখনও বাংলাদেশের হাটে-মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জারি, সারি, মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি প্রভৃতি বহু ধরনের সঙ্গীত। এসব সঙ্গীত আমাদের অমূল্য সম্পদ। লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে হলেও ঢাকা একদিকে রাজধানী শহরও এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ঢাকা একদিকে রাজধানী শহর অন্যদিকে এর অবস্থান দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে। যে কারণে সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে নানা প্রয়োজনে ঢাকাতে আসতে হয়। শুধু তা-ই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নিম্নবর্গের লোকসঙ্গীত-প্রেমী পেশাজীবী মানুষকে এখানে আসতে হয় জীবিকার প্রয়োজনে। মূলত এদের আগমনে ঢাকার লোকসঙ্গীত দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের চেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বৈচিত্র্যময় সুর, বাণী, বাদ্য ও কণ্ঠের সম্মিলনে ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীত এমন একটি শঙ্করজাত চারিত্র অর্জন করেছে, যা লোকসঙ্গীতের প্রান্তিক সুর ও চিন্তাধারার মধ্যে নাগরিক-চিন্তার মিশেলে চমৎকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে, যাকে 'আরবান লোকসঙ্গীত' বললে মনে হয় ভুল হবে না। ঢাকার লোকসঙ্গীতের চারিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায়, এর একদিকে আছে ধর্মীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য এই ধর্মীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে সুফি-সাধকদের বিচিত্র সঙ্গীত, বৈষ্ণব ও বাউলদের কীর্তন, ভাবগান ইত্যাদি; অন্যদিকে আছে পেশাজীবী সঙ্গীত এই সঙ্গীতধারার মধ্যে বেদেদের সাপখেলানোর গান থেকে শুরু করে হাল-আমলের পক্ষাঘাতগ্রস্ত কিংবা অন্ধ-ভিক্ষুকদের ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীত পর্যন্ত পড়ে। আবার ঢাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার সাফল্য-গাথা নিয়ে আধুনিক-মনস্ক নাগরিক গীতিকার ও সুরকারগণকে দেখা যায় লোকসঙ্গীতের সুর ও বাণীর কাঠামো নিয়ে সঙ্গীত রচনা করতে। যাকে আমরা দেশের গান, ভাষার গান প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকলেও এ সকল গানকে ঢাকার লোকসঙ্গীত বলেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

জেলা পরিচিতি (ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক, জনসংখ্যাগত, গোষ্ঠীগত, পেশাগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কাহিনী-কিংবদন্তি, লোকশ্রুতি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য)

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকা জেলার উত্তরে গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে মুন্সীগঞ্জ, পূর্বে নারায়ণগঞ্জ এবং পশ্চিমে মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা। ঢাকার আয়তন প্রায় ১,৪৭১ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৬১,৪৬,০০০ জন। ঢাকায় বসবাসকারী পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫.১৪% ও ৪৪.৮৬%। এর মধ্যে মুসলমান প্রায় ৯২ ভাগ, হিন্দু প্রায় ৬ ও অন্যান্য ৪.৭৮ ভাগ। ঢাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, চাকরি, বাড়িভাড়া, পরিবহণ, নির্মাণ-শ্রমিক, অকৃষি-শ্রমিক ও অন্যান্য।

ঢাকা জেলা ২০টি থানা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ১৫টি থানা নিয়ে মেট্রোপলিটন শহর। বাকি ৫টি থানা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে। মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে কোতোয়ালী, সূত্রাপুর, মতিঝিল, ডেমরা, রমনা, লালবাগ, ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, তেজগাঁও, ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, পল্লবী, সবুজবাগ ও উত্তরা থানা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সাভার, ধামরাই, দোহার, নবাবগঞ্জ ও কোরানীগঞ্জ থানা। 'ঢাকা' নামের উৎপত্তি নিয়ে আছে নানা কিংবদন্তি, জনশ্রুতি ও কাহিনী; আছে মুগল সুবাদার ইসলাম খানের

www.pathagar.com

ঢাকা আগমন, ঢাকাতে সুবা বাঙলার রাজধানী স্থাপন এবং 'ঢাকে'র শব্দ থেকে 'ঢাকা' নামের উৎপত্তি এসবের কথা। কেউ বলেছেন, 'ঢাক' নামক বৃক্ষ থেকে 'ঢাকা'র জন্ম। কেউ বলেছেন, বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত 'ঢাকেশ্বরী' মন্দির থেকে 'ঢাকা' নামের উৎপত্তি হয়েছে। কেউ বলেছেন, ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খাঁ বুড়িগঙ্গার কাছে ঢাক বাজিয়ে যতদূর পর্যন্ত শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত সীমানা নির্ধারণ করে যে এলাকায় রাজধানী বানান সেই এলাকাই 'ঢাকা' নামে পরিচিত। আরবি লিপিতে 'ঢাকা'র প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে উৎকীর্ণ *উলুক আযলকা খান* নির্মিত মসজিদে। ঢাকার প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে পরীবিবির মাজার, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, আহসান মঞ্জিল, হুসেনী দালান, চামেলী হাউস, লালবাগ মসজিদ, শায়েস্তা খান মসজিদ, বাহাদুর শাহ পার্ক, কার্জন হল ইত্যাদি। ঢাকা একসময় 'বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির শহর' নামে খ্যাত ছিল। বাংলায় মুসলমান আগমনের পূর্বে বর্তমান ঢাকা (প্রাক্তন বৃহত্তর ঢাকা জেলা) 'বঙ্গ' নামে পরিচিত প্রশাসনিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর কিছু অংশ কখনো কখনো 'হরিকেল' নামেও পরিচয় পেত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত মাহেন্দ্রাদিত্য এবং গুপ্ত রাজাগণ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকার উপর তাঁদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন বলে জানা যায়। একসময় ঢাকা জেলা হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। পাল ও সেন বংশ বহু বছর ঢাকা জেলা শাসন করে। ১৬০৬ সালে 'ঢাকা'কে বাংলার রাজধানী করা হয়। ইসলাম খাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকাকে 'জাহাঙ্গীরনগর' নামকরণ করেন। আঠারো শতকের শুরুতে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যান। ঐ সময় ঢাকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলকেন্দ্র। একসময় ঢাকার মসলিন শিল্প সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতকে মোগল আমলে এই শিল্প বিকশিত হয়। ঢাকার মসলিন রপ্তানি হতো ভারতবর্ষসহ ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। ঢাকার দোহার উপজেলার জয়পাড়াকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে নীল চাষের প্রচলন ছিল। দোহারে গড়ে ওঠে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে 'অভয় আশ্রম'। ১৯৪০ সালে দোহারের মালিকান্দা গ্রামে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে মহাত্মা গান্ধীর আগমন ঘটে। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। যা 'ঢাকা দাঙ্গা ১৯৪১' নামে আজো স্মরণীয়। ঢাকা জেলায় অসংখ্য মসজিদ, মন্দির প্যাগোডা, গির্জা ও মাজার রয়েছে। এখানে

গুরুমা যমুনা হিজরা ঢোল বাজিয়ে হিজরা গান পরিবেশন করছেন (পাশে নৃত্যরত হিজরা) ছবি: স্বপন কুমার দাস

www.pathagar.com

কাওয়াল পরিবেশনরত সমু কাওয়ালদাস

চকমসজিদ, লালবাগ মসজিদ, বিবি মেহের মসজিদ, খাজা আম্বার মসিজদ, তারা মসজিদসহ বহু মসজিদ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে জয়কালী মন্দির, ঢাকেশ্বরী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, বাগমারা মঠ, আমপূতি, আর্মেনিয়াম গির্জা, হলিক্রোস ইত্যাদি প্রার্থনালয়। এছাড়া রয়েছে গোলাপ শাহ'র মাজার, পীর ইয়ামেনি (রঃ) মাজার, বিবি মরিয়মের সমাধি, পীর জঙ্গি মাজারসহ বহু মাজার ও সমাধি। ঢাকায় গার্মেন্টস শিল্প, সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, প্রিন্টিং এন্ড ডাইং ফ্যাক্টরি, ফার্মাসিটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ, বরফকল, স্টীল ওয়ার্কস, ছাপাখানা, লঞ্চ তৈরির কারখানা এসবের পাশাপাশি রয়েছে নানা ধরনের কুটিরশিল্প যেমন তাঁত, কাঁসা ও পিতল, বাঁশ ও বেতের কাজ, স্বর্ণকার, হস্তশিল্প ইত্যাদি। ঢাকায় চারু ও কারুশিল্প মেলা, ধামরাইয়ের রথযাত্রা মেলা, পৌষ-সংক্রান্তি মেলা, নবাবগঞ্জের বৈরাগী পৌষ মেলা, সাভারের বাহাত্তর প্রহরের মেলা, ঘোড়া পিরের মেলাসহ বর্তমানে বৈশাখী মেলা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একুশে বইমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৭০০ সালে ঢাকা নগরী ছিল বিশ্বের দ্বাদশ বৃহত্তম নগরী। বাংলায় তিন মুগল রাজধানীর মধ্যে ঢাকা প্রাচীনতম। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছে ঢাকা নগরী।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত পরিপিতি

ঢাকা জেলায় একসময় বহু ধরনের লোকসঙ্গীত প্রচলিত ছিল, যার অধিকাংশই আজ বিপন্ন ও বিলুপ্তির পথে। অষ্টম ও উনিশ শতকে এতদ্অঞ্চলে যেসব লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হতো এবং যেসব সঙ্গীত এখনও টিকে আছে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও কিছু পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হলো, যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীতের আংশিক পরিচয়। তবে বর্তমান সময়ে এসব সঙ্গীতের সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য।

১. **পাল্লাগান**: পাল্লাগান তর্ক-বিতর্কের গান। তর্কের খাতিরে প্রতিপক্ষের গায়ককে জব্দ করা হয় এ গানে। বিষয়ভিত্তিক পাল্লাগানের সুনির্দিষ্ট ধরন আছে এবং অঞ্চলভেদে তা বিভিন্ন নামে পরিচিত। একসময় ঢাকা-কুমিল্লা অঞ্চলে এ গান *মালজোড়া* বা *দোতরার* গান, ফরিদপুর অঞ্চলে *কড়চা* গান, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে *শব্দগান* নামে পরিচিত ছিল। আগে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের মধ্যে পাল্লাগান সীমাবদ্ধ থাকতো না একজন গায়ক দেহতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করলে বিপক্ষের গায়ক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিষয় পরিবর্তন করে নবীতত্ত্ব, মেরাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারতো। জানা যায়, ঢাকার আবদুল হালিম ও বাসুদেব মণ্ডল বিষয়ভিত্তিক পাল্লাগানের ধারা প্রচলন করেন। যেমন একজন গায়ক মেয়ের গুণ গাইলে অন্যজন পুরুষের গুণ গাইবে। এভাবে পাল্লাগানের জগতে নতুন ধারা চালু হয়। একসময় বৃহত্তর ঢাকার গায়কেরা পাল্লাগানের পরিবর্তে গানের পৃষ্ঠে গান গাইতেন। যেমন একজন গায়ক কোনো আসরে মানবদেহকে নৌকারূপে এবং অন্য গায়ক দেহকে পাখিরূপে কল্পনা করে গান পরিবেশন করতেন। ঢাকার বিখ্যাত পাল্লাগায়ক আবদুল হালিম বয়াতী বিষয়ভিত্তিক প্রথম যে পাল্লাগানটি করেন তা হলো নারী-পুরুষ। ঢাকা অঞ্চলে আগে পাল্লাগানকে ঠ্যাশ গান বা মালজোড়া গানও বলা হতো। দোতারা সহযোগে দুই পক্ষের মধ্যে ঠ্যাশ গান হতো। এটি নারী-পুরু, শরিয়ত-মারেফত-এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক গান ছিল। ঢাকাতে যখন বিচার গানের

www.pathagar.com

বিচারগানের শিল্পী মমতাজ বেগম প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রতিপক্ষের জবাব দিচ্ছেন

প্রচলন ছিল না, তখন ঠ্যাশ গান চলতো। এছাড়া দোতরারা বাজিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হালকা চটুল বিষয়ে যে ঠ্যাশ গান গাওয়া হতো তাকে চাপান গানও বলতো। 'ঠ্যাশ' হচ্ছে চাপান গান অর্থাৎ একে অপরকে কথায় চাপানো। এ গানের শিল্পীদের মধ্যে মারফত আলী, ফেদু বয়াতি এদের নাম শোনা যায়।

২. বিচার গান: বিচার গান লোকসঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বিচার গান দুই দলে পাল্লা করে গাওয়া হয়। এতে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। বিচার গান প্রধানত দেহতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, আদিতত্ত্ব, নামাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গাওয়া হয়। এ গানে বাউল গানের প্রভাব রয়েছে। বিচার গানের আসরে দুই দলের গায়নের মধ্যে শরিয়ত-মারেফত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। মূল গায়েন আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গান করেন। তাঁর হাতে থাকে একতারা, দোতারা, বেহালা বা সারিন্দা। গায়নের গলায় ডুগীও ঝুলানো থাকে। সাধারণত জুড়ি, করতাল, ডুগী, তবলা, বাঁশি এসব যন্ত্র বিচার গানে ব্যবহার হয়। বর্তমান সময়ে 'বিচার গান' হিসেবে পরিচিত গানকে আগে বাইলান্তি/ভাববিচ্ছেদ/বিচ্ছেদ ইত্যাদি বলা হতো। এক সময় নতুন হাট বসানোর জন্য বিচারগান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিচারগানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ঢাকার হালিম-হাজেরা জনপ্রিয় জুটি। ঢাকা অঞ্চলে বিচারগানের তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যেমরফত আলী বয়াতি (বিক্রমপুর), ফেদু বয়াতি (বাসুদিয়া, বিক্রমপুর), মালেক দেওয়ান ও খালেক দেওয়ান (বামনশুর), আলেফ দেওয়ান (নবীগঞ্জ), জালাল বয়াতি (গজারিয়া), আলাউদ্দিন বয়াতি (বিক্রমপুর), ওসমান গণি বয়াতি (মুন্সিগঞ্জ), জব্বার বয়াতি (মুন্সিগঞ্জ) প্রমুখের নাম করা যায়। এছাড়া ইরন ফকির, নোয়াই ফকির, ফেলু মোল্লা, আলাউদ্দিন বয়াতি, হজরত আলী বয়াতি, মহর বয়াতি, কালা মিয়া বয়াতি, শমসের আলী বয়াতি, লাল মিয়া বয়াতি, আবদুল বারেক বয়াতি, বজ্জব দেওয়ান, দলিলউদ্দিন বয়াতি এঁরা ঢাকার বিচার গানের নামকরা শিল্পী।

৩ কবিগান: কবিগান প্রশ্ন ও উত্তরের গান। দুই দলে প্রতিযোগিতার মধ্যে এ গান গাওয়া হয়। প্রত্যেক দলে একজন সরকার বা কবিয়াল থাকে। আরো থাকে গায়ক, ঢোলী, কর্তাল বাদক ও বেহালাদার। দুই দলের বিরোধে কবিগান রসালো হয়ে ওঠে। কবিগানের নির্দিষ্ট তাল-মান, লয়-ছন্দ আছে। কবিগানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কবিয়ালরা দলে 'খেমটাওয়ালি' ও 'ঝুমুরওয়ালির' দল সঙ্গে রাখে। বাংলাদেশের কবিগানের জগতে ঢাকার হরিচরণ আচার্যের নাম করা যায়। ঢাকা জেলার পাগলা গ্রামে নিমচাঁদ ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত কবিয়াল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন কবিয়াল তিনি। ঢাকার ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় কবিগানের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁর কবিগানের দলও ছিল। তাঁর দলে গান রচনা করতেন কবিয়াল রামকুমার সরকার। রামকুমারের মতোই প্রতিভাবান কবিয়াল ছিলেন ঢাকার হরিশচন্দ্র মাস্টার। এছাড়া ঢাকায় আরও অনেক কবিয়াল ছিলেন। যেমন পঞ্চানন আচার্য, কানাই আচার্য, গঙ্গাচরণ আচার্য, নীলমণি চক্রবর্তী, মহিম চন্দ্র নন্দী, মনোরঞ্জন ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

www.pathagar.com

মঞ্চে যাত্রাভিনয় ও গান

৪. জারিগান: বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের জগতে জারিগান স্বমহিমায় স্থান করে নিয়েছে। হযরত ইমাম হাসান ও হোসেনের শাহাদৎ বরণের মর্মস্পর্শী কাহিনী প্রধানত এখানকার জারিগানের মূল উপজীব্য। জারিগানের বিষয়বস্তুতে বিশেষভাবে থাকে করুণ রস। এ গানে একদিকে ব্যথার সুর গভীরভাবে ধ্বনিত হয়, অন্যদিকে ফুটে উঠে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র আবেদন। ঢাকায় এক সময় জারিগান মহররম মাসেই বেশি গাওয়া হতো। এছাড়া হিন্দু-মুসলমানদের বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে বা গ্রামীণ মেলায় বিভিন্ন প্রদর্শনীতে জারিগান গাওয়ার প্রচলন ছিল। ঢাকায় আগে মহররম মাসে 'সখিনার চৌতিশা', 'সখিনার বিলাপ', জয়নবের বিলাপ' প্রভৃতি পাঁচালীর ঢঙে আসরে গাওয়া হতো। জারিগানে একজন মূল গায়ক থাকে, তাঁকে বলা হয় বয়াতী। তাঁর সঙ্গে থাকে আট থেকে দশ জন দোহার। জারিগান বিভিন্নভাবে গাওয়া হয়। কখনো কখনো জারিয়াল দল নেচে নেচে ঘুরতে থাকে। আবার মর্সিয়া পরিবেশনের সময় দলের সবাই এক জায়গায় বসে জারি গায়। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আগে যেসব জারিগান পরিবেশন করা হতো সেগুলোর কয়েকটি নাম এখানে তুলে ধরা হলো: ১. খাতনামার পালাজারি, ২. আদমের জারি, ৩. চাচা-ভাতিজার জংগ, ৪. বড় এমামের জারি, ৫. মাদার মণির জারি, ৬. মুনছুরের জারি, ৭. লক্ষমতির জারি, ৮. শাহজালালের জারি, ৯. শেখ ফরিদের জারি, ১০. সাদ্দামের জারি, ১১. সোলায়মান নবীর জারি ইত্যাদি।

৫. মাজার সঙ্গীত: মাজারকে কেন্দ্র করেই এই সঙ্গীতের জন্ম। তবে এই সঙ্গীতের বাণীর প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে অধ্যাত্ম সাধনা, গুরু সাধনা এবং ভক্তিমূলক নানা ছন্দোবদ্ধ গীতিকথা। সপ্তাহের বিশেষ একটি দিনে বিভিন্ন মাজারে গুরু, ভক্ত মিলে নিয়মিতভাবে এই সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। নারী ও পুরুষ কণ্ঠে গতি

www.pathagar.com

বিয়ের গীত

এই গানে গভীর রাত পর্যন্ত মাজার প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে থাকে। লোকসঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে যাঁরা সমর্পণ করেছেন সেসব শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন মাজারে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। ঢাকার হাইকোর্ট মাজারে প্রতি বৃহস্পতিবার এর আসর বসে। পীরজঙ্গী মাজার, মিরপুর শাহ আলী মাজার, গোলাপ শাহ মাজার, তেলশাহ মাজার, সাভারের ঘোড়া পীরের মাজারসহ অন্যান্য মাজারে সঙ্গীতের আসর বসে। একসময়ের অন্যতম লোকসঙ্গীত শিল্পী কাঙ্গালিনী সুফিয়া, সুরুজ দেওয়ান, জামাল দেওয়ান, আলাম দেওয়ান, হারিছ দেওয়ানসহ আরও অনেক শিল্পী বর্তমানে হাইকোর্ট মাজারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

৬. মেয়েলি গীত: আমাদের লোকসঙ্গীত অঙ্গনে মেয়েলি গীতের আবেদন বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। নারীমনের উৎস থেকে স্বাভাবিকভাবেই এর জন্ম। পারিবারিক জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনে এসব গীত গাওয়া হয়। মেয়েলি গীতে নারী-জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। মেয়েলি গীত গাওয়ার সময় বিশেষ কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় না। বাংলাদেশের লোকজীবনে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে গায়ে হলুদ, কনে সাজানো, নাইওর, বর আগমন, শাশুড়ি-জামাইয়ের রসিকতা, শ্বশুর বাড়ির জ্বালা-যন্ত্রণা এসব নিয়ে সুখ-দুঃখের নানা ধরনের গীত গাওয়া হয়। মেয়েলী গীতের মধ্যে বিয়ের গীত গ্রাম-বাংলায় খুবই জনপ্রিয়। কোনো কোনো অঞ্চলে এসব গীত এখনও প্রচলিত। একসময় ঢাকা জেলার বিভিন্ন মহল্লায় লৌকিক আচার, বিয়ে-শাদী উপলক্ষে গীত গাওয়ার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে গৃহস্থ পরিবারে এর চর্চা ছিল বেশি এবং হিন্দুদের চেয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে এ গীতের প্রাধান্য বেশি লক্ষ করা যায়।

৭. মুর্শিদি গান: মরমী সঙ্গীতের প্রধান বিষয় মুর্শিদি গান। এর অর্থ আধ্যাত্মিক গুরু। এই আধ্যাত্মিক গুরুকে উদ্দেশ্য করে যেসব প্রশস্তি ও মাহাত্ম্যসূচক গান গাওয়া হয়, সেসব গান হলো মুর্শিদি। কেবল গুরুর প্রশস্তি নয়, কোনো কোনো গানে স্রষ্টার কাছে ভক্তবৃন্দের আত্মনিবেদনও থাকে। সৃষ্টি-রহস্যের কিনারা করতে হলে গুরু বা মুর্শিদের সহায়তা দরকার। তাই এ গানে দয়াল-মুর্শিদকে পাবার চেষ্টা করা হয়। মুর্শিদি গানের আসর সাধারণত রাতে বসে। আসরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতারা থাকে। এ গানে একতারা, দোতারা, বায়া, তবলা, সারিন্দা, মন্দিরা, খমক, ঢোল, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মারেফতি ও মুর্শিদি গানকে ফকিরালি গানও বলে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে যা মুর্শিদি গান, উত্তরাঞ্চলে তাকে দেহতত্ত্ব গান বলে। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার শানাল' ফকিরের বাড়িতে একসময় মুর্শিদি গান

www.pathagar.com

ব্যাপকভাবে পরিবেশন করা হতো। শানাল' ফকির বহু মুর্শিদি গান লিখেছেন। আগে মুর্শিদি গান পরিবেশনের সময় খমক, খঞ্জনী, চটা এসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো।

৮. মারেফতি: মারেফতি গানে অলৌকিক জগতের কথা বলা হয়। স্রষ্টার অস্তিত্ব ও স্বরূপ, সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মারফতি গানের মূলবিষয়। মরমী সাধকগণ বহু মারেফতি গান রচনা করেছেন। মানুষের অতীত-ভবিষ্যৎ, জীবন-জগৎ, স্রষ্টা-সৃষ্টি এসবের প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হয় মারফতি গানের কথায়। মারফতি গানের শ্রেণী বিভাজনে স্রষ্টার গুণকীর্তন, রসুল প্রশস্তি, মুরশিদতত্ত্ব, নবুয়ত, বেলায়েত, সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরকাল চিন্তা ইত্যাদিসহ অঞ্চলভেদে সাম্প্রতিককালে দেহতত্ত্ব, পরোপার, প্রেমতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা গানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৯. ধুয়াগান: এদেশের ধুয়াগানের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। ধুয়াগান এক ধরনের প্রশ্ন-উত্তরমূলক গান। ধুয়াগানের বহু বিষয় রয়েছে যেমন দেহতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা, সমসাময়িক ঘটনা, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি। একসময় ঢাকা জেলার একটি বড় অংশ জুড়ে ধুয়াগানের ব্যাপ্তি ছিল। ঐসময় দক্ষিণা ধুয়া, কৃষ্ণের ধুয়া, বর্ণমূলক ধুয়া, রঙের ধুয়া এসব বেশি গাওয়া হতো। ঢাকার ধুয়াগানের মধ্যে কবিত্ব যেমন ছিল, তেমনি ছিল হাস্য ও করুণ রসের সমাবেশ। অনেক ধুয়া গাওয়া হতো সাধারণ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে। এক বা একাধিক গায়ক দাঁড়িয়ে যে কোনো বিষয়ে গানের আদ্যচরণ এবং দলের অন্য শিল্পীরা এর পুনরাবৃত্তি করতো। ধুয়াগান পরিবেশনের সময় বিশেষ ধরনের কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো না।

১০. সারিগান: এটি কর্ম উদ্দীপনামূলক ছন্দবহুল গান। শ্রমমুলক কোনো কাজ করার সময় শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করে বিনোদন ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য কর্মীরা যেসব সঙ্গীত গেয়ে থাকে সেগুলিই কর্ম বা

জাতীয় লোকসঙ্গীত উৎসবে ঢাকার কেরাণীগঞ্জের বিখ্যাত পাল্লাগায়ক আব্দুল হালিম বয়াতি ও তাঁর সঙ্গীরা

www.pathagar.com

রঞ্জিৎ দাস বাউল ও মমতা রাণী দাসী

শ্রমসঙ্গীত অর্থাৎ সারিগান। এ গান নানা ধরনের। যেমনছাদ পেটানো গান, পাল্কি বাওয়া গান, বাইচের গান, ধান-পাট নিড়ানো গান ইত্যাদি। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে শহর ও নগরকে কেন্দ্র করে যেসব শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছে সেখানেও শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সময় সারি গান পরিবেশন করে থাকে। আগে ঢাকা শহরে ভবন তৈরির কাজে ছাদ পেটানোর সময় শ্রমিকেরা সারিবদ্ধভাবে সুরকি পেটার তালে তালে সারিগান গাইতো। এ গানের সাথে কাঁশি, টিকারা, কাড়া-নাকাড়াএসব লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হতো। নৌকা বাইচের প্রধান আকর্ষণই হলো সারিগান। বাইচের নৌকা যখন ছুটতে থাকে, তখন দলগতভাবে সারিগান গাওয়া হয়।

১১. অষ্টকগান: অষ্টকগান পালাবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। তবে পালাগুলো বেশি দীর্ঘ হয় না। ছোট ছোট সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এ গানের কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এর বিষয়বস্তুতে ধর্মীয়, পৌরাণিক ও সমাজজীবনের নানা কাহিনী যুক্ত। এ গানের এক একটি দলে ৫/৬ জন গায়িকা থাকে; আরও থাকে ঢোল বাদক, সুরকার, আঁড়বাঁশি বাদক, জুড়ি বাদক ও দোহার। অষ্টক গানে নাচ, গান, অভিনয় ও বাদ্যযন্ত্রের সুসম সংযোগ ঘটানো হয়। এর সুরের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আছে। যেমন কখনো একটানা, কখনো ভাটিয়ালি, কখনো কীর্তন সুরের প্রভাবে এ গান গাওয়া হয়।

শিল্পী মোহাম্মদ আলম দেওয়ান, মোঃ তারাব আলী দেওয়ান, ও অন্যদের কণ্ঠে বাউল গান

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমীর মঞ্চে দেশের বিখ্যাত লোকশিল্পীবৃন্দ

১২. বাউল গান: বাউল আধ্যাত্মিক গান। এ গান সাধকদের গান। এই সাধকেরা বাউল নামে পরিচিত। এ গানের উৎপত্তির মূলে আছে বিভিন্ন যুগ-চৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রভাব। তাই বাউল গানে ধর্মের সমন্বয় দেখা যায়। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও সিলেট জেলার মতো একসময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বাউল গানের ব্যাপক পরিবেশনা ছিল। এর মধ্যে বিশেষ করে বাউল সম্রাট লালন শাহের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ায় এ গানের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

১৩. ভাটিয়ালি: ভাটিয়ালি বাংলাদেশের প্রাচীন সুরসমৃদ্ধ একটি গান। ছোট ছোট আল দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড নিম্নাঞ্চলের গান ভাটিয়ালি। ভাটিয়ালি সঙ্গীতাঞ্চল এককভাবে কোনো আলাদা সীমানার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নয়। হবিগঞ্জ, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা প্রভৃতি জেলার ন্যায় ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ, দোহার, কেরানীগঞ্জ এসব এলাকায় একসময় ভাটিয়ালি গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ গানের আদি উৎপত্তিস্থল সিলেট ও ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চল। আঞ্চলিক বিশেষত্ব ভাটিয়ালি আবার নদীর গানও। তবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলই মূলত ভাটিয়ালি গানের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ।

১৪. ভজন গান: এ গানের মাধ্যমে স্রষ্টার ভজনা করা হয়। ভজন গান এক ধরনের ভক্তিগীতি। সব ধরনের ভক্তিগীতি আবার ভজন গান নয়। ঢাকা জেলায় একসময় ভজন গানের মধ্য দিয়ে যে আরাধনা করা হতো তা ছিল অত্যন্ত আবেগময়। বর্তমানে এ গান বিলুপ্ত।

১৫. ভিক্ষুক সঙ্গীত: পঙ্গু, অসহায়, ভিক্ষুকেরা দলবদ্ধভাবে ঢাকা জেলার বিভিন্ন আবাসিক এলাকায়, রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কের ধারে ও মোড়ে মোড়ে এ সঙ্গীত পরিবেশন করে পথচারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায়। এ সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য হলো দলবদ্ধ সকল ভিক্ষুক সমস্বরে জোর আওয়াজে গান গেয়ে সুরের মূর্ছনায় পথচারীর মনকে দয়াশীল ও দানশীল করে তোলে। এ গানে বিশেষত মর্সিয়ার সুর ধ্বনিত হয়। এ গানের কথা নবী, রসুল এবং পরকালের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল

পাল্লাগান: বিভিন্ন আঙ্গিকের পাল্লাগানের উৎপত্তি বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। ঢাকা জেলা কেন্দ্রিক যেসব পাল্লাগান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার উৎপত্তি কেরানীগঞ্জে।

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী পালকির গান পরিবেশনরত বেহারাবৃন্দ

মুর্শিদি (শানাল' ফকিরের গান), ভেলা ভাসান/ভেওড়া: ঢাকার নবাবগঞ্জের শানাল' ফকিরের বাড়ি।
যাত্রাগান, দেহজরিপ: ধামরাইয়ে।
বাইচের গান: বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়। ঢাকা কেন্দ্রিক বাইচের গানের উৎপত্তি কেরানীগঞ্জে।
বৈঠকী গান: দোহার থানার পির-সাহেবের বাড়িতে।
সারিগান (তাঁত বুনন): ডেমরা, দোহার, নবাবগঞ্জ।
সারিগান (ছাদ পেটানো): বাড্ডা, গুলশান, সাঁতারকুল, সোয়ারীঘাট।
কিচ্ছাগান: কেরানীগঞ্জে।
জারিগান (দেওয়ান গীতি): কেরানীগঞ্জে।
রূপবান যাত্রা: খালপাড়, কেরানীগঞ্জে।
কাসিদা/মহররমের গান/কাহিনী কারবালা/রমজানের সেহ্‌রী/ আলবেদা: পুরনো ঢাকার আজিমপুর, হোসনীদালান, মোহাম্মদপুর, লালবাগ।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতিস্থল

পাল্লাগান: ময়মনসিংহ, ফরিদপুরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়।
মুর্শিদি (শানাল' ফকিরের গান), ভেলা ভাসান/ভেওড়া: ঢাকা বিভাগের সর্বত্র।
যাত্রাগান: সমগ্র বাংলাদেশে।
বাইচের গান: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়।
সারিগান (তাঁত বুনন): ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা।
সারিগান (ছাদ পেটানো): বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়।
কিচ্ছাগান: মিঠামঙ্গল, কেন্দুয়া, নেত্রকোনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়।
জারিগান (দেওয়ান গীতি): ঢাকা জেলার বিভিন্ন এলকায়।
রূপবান যাত্রা: বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়।
কাসিদা/মহররমের গান/কাহিনী কারবালা/রমজানের সেহ্‌রি/ আলবেদা: মানিকগঞ্জ/ অষ্টগ্রাম এবং ঢাকা জেলার বিভিন্ন এলাকায়।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা (যে ক্ষেত্রে একক স্রষ্টা আছে)

দেওয়ান গীতি: ঢাকার কেরানীগঞ্জের মৃত আবদুল খালেক দেওয়ান।

হালিম গীতি: ঢাকার মৃত আবদুল হালিম বয়াতী।

শানাল' ফকিরের গান/ভেলা ভাসান/ ভেওড়া: নবাবাগঞ্জের মৃত শানাল'ফকির।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত শিল্পী/লোকসঙ্গীত দল

পাল্লাগান: আবদুল খারেক দেওয়ানের দল, কানন দেওয়ান ও তাঁর দল, কাজল দেওয়ান ও তাঁর দল, আলেফ চাঁদ ও তাঁর দল।

বৈঠকী গান: পরশ বয়াতী ও তাঁর দল।

দেহতত্ত্ব/ ভাববিচ্ছেদ: দারোগ আলী বয়াতীর দল, খৈমদ্দীন ও তাঁর দল।

কাওয়ালি: ছমির কাওয়াল, রানা কাওয়াল, নওশের কাওয়াল।

রূপবান যাত্রা: খালপাড় দল।

দেওয়াল গীতি (জারিগান): আবদুল খালেক দেওয়ানের দল, আবদুল মালেক দেওয়ানের দল।

সনাক্তকৃত দলীয় সঙ্গীতের তালিকা

পাল্লাগান (আপন-দুলালের পালা, আলম শা'র পালা, তায়জন মুল্লুকের পালা, শ্যামপরির পালা); মেয়েলী গীত/ বিয়ের গান, বৈঠকী গান, জারিগান, কবিগান, যাত্রাগান, সারিগান, দেওয়ান গীতি।

সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা

বাইলান্তি/বিচ্ছেদ গান, বাউল গান, বিলাপ গান, ধুয়াগান, ওন্নিগান, পাঁচালী, অষ্টগান, বিচার াগন, বৈঠকী গান, মুর্শিদী গান, কীর্তন, মেয়েলী গীত/ বিয়ের গান।

সনাক্তকৃত লোকবাদ্যযন্ত্রে তালিকা

খমক, খঞ্জনী, চটা, ঢোল, করতাল, পাতিল, চারা, একতারা, দোতারা, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, খোল, বাঁশি ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

বাউলগান, পাল্লাগান, কীর্তন, কবিগান/বিচারগান, পালকির গান, হিজরাদের গান ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

বৈঠকী গান, কিচ্ছাগান, কাওয়ালি, রূপবান যাত্রা, হিজরাদের গান।

সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা

মূল পাল্লাগান, পালকির গান (সদরঘাট অঞ্চলের), সারিগান (তাঁত বুনন ও ছাদ পেটানো), কর্মসঙ্গীত (ভবন তৈরির কাজে পাইলিং করার সময় যে গান গাওয়া হয়)।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান

পাল্লাগান: বিভিন্ন উৎসব/লোকউৎসব উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দলের সম্মানী আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। এই হারে বছরে গড়ে প্রতিমাসে দুইটি করে ৮ মাস x ২টি অনুষ্ঠান= ১৬টি অনুষ্ঠান x ১০,০০০.০০ টাকা = ১,৬০,০০০.০০ টাকা।

উৎসবকালীন মাসগুলিতে গড়ে প্রতিমাসে তিনটি হিসেবে ৪ মাস x ৩টি অনুষ্ঠান = ১২টি অনুষ্ঠান x ১০,০০০.০০ টাকা = ১,২০,০০০.০০ টাকা, সর্বমোট বছরে পাল্লাগানের দলীয় শিল্পীরা ২,৮০,০০০.০০ টাকা সম্মানী পেয়ে থাকেন।

অন্যান্য লোকসঙ্গীতের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রিত এককভাবে প্রতিটি শিল্পীর সম্মানী গড়ে ৫০০.০০ থেকে ১০০০.০০ টাকা। সে হিসেবে বাউল, বিচার, জারি, মুর্শিদি, মারফতি প্রভৃতি গানের একজন শিল্পী গড়ে বছরে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা সম্মানী পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক

দেশের বিশিষ্ট রচয়িতা ও শিল্পী যাঁরা একক স্রষ্টা হিসেবে গান রচনা করেছেন এ ধরনের স্রষ্টা-শিল্পীরাই তাঁদের গানের মেধাস্বত্বের মালিক। এক্ষেত্রে আরিফ দেওয়ান (পাল্লাগানের জন্য), হালিম বয়াতী (হালিম গীতির জন্য), শানাল' ফকির (মুর্শিদি গানের জন্য) প্রমুখের নাম করা যায়। পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে যেসব লোকসঙ্গীত শিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে এদেশের অসংখ্য নাম না জানা লোককবির গান কণ্ঠে ধারণ ও লালন করে চলেছে ঐসব লোক-কবিদের যদি কোনো সংগঠন না থাকে তবে শিল্পীরাই তাঁদের ত্যাগ ও সাধনার জন্য মেধাস্বত্বের মালিক হতে পারে।

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ: আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংগ্রহ কাজে নামতে হবে। সেক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয়; সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

খ. সংরক্ষণ: ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রেও সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

গ. উপস্থাপন: প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতগুলোকে সনাক্ত করে গুরুত্ব অনুসারে পর্যাক্রমে জাতীয় পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। এখানে টিভি মিডিয়া বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। পরবর্তী ধাপে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য সরকারকে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিতে হবে।

ঘ. মেধাস্বত্ব প্রদান: মেধাস্বত্ব ন্যায্য-অধিকার সম্পর্কিত একটি বিষয়। এটি যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রয়োজন মেধাস্বত্ব আইন ও সুপারিশমালা। যাতে প্রকৃত মেধাস্বত্বভোগীরা অধিকার বঞ্চিত না হয়। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের ফল্গু ধারাকে অব্যাহত ও সজীব রাখার প্রয়াসে মেধাস্বত্ব প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে সকলের বিবেচনা করা উচিত।

উপসংহার: লোকসঙ্গীত আমাদের সুমহান ঐতিহ্যের ভিত্তি। আঞ্চলিকতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে নিহিত আছে লোকসঙ্গীতের প্রাণ। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে আমাদের জাতীয় পরিচয়ের উৎস-উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই চিন্তা-চেতনা সামনে রেখে লোকসঙ্গীত নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। আর এজন্য দরকার সমন্বিত প্রয়াস। তবে, শুধু পাঠ বা বর্ণনামূলক গবেষণা নয়; উদ্যোগ নিতে হবে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণার। এ কাজের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় নবীন উৎসাহী গবেষকদেরকে কালক্ষেপণ না করে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ করিঢাকা জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও চর্চা হচ্ছে। এই চর্চার প্রেক্ষাপটে ঢাকার অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নানাভাবে তথ্যানুসন্ধান করা হচ্ছে। একইভাবে ঢাকা জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতসমূহ, যেসব সঙ্গীত একসময় সুরের বৈচিত্র্যে, ছন্দের গতিতে, ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্যের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ছিল সেসব সঙ্গীতের বেশিরভাগই এখান লুপ্ত ও বিলুপ্ত হওয়ার পথে। তাই হাজার বছরের ঐতিহ্য-ধারণকারী ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীতকে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা, এনিয়ে তাদেরকে আগ্রহ সৃষ্টি করানো এবং এসব সঙ্গীত টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলকেই নিতে হবে। পরিশেষে প্রস্তাব রেখে বলতে পারি ঢাকার লোকসঙ্গীতের বর্তমান চালচিত্র অর্থাৎ এর ধরন-ধারণ, বৈশিষ্ট্য ও চলমান-ঐতিহ্য নিয়ে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণে এখনই বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা অত্যন্ত জরুরি। এই গবেষণার ভেতর দিয়ে একইসঙ্গে সারাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি সাধারণ চিত্র যেমন লক্ষ করা যাবে তেমনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকসঙ্গীত মহানগরের মানুষের চর্চায় কিরূপ প্রকৃতি লাভ করেছে বা করছে তাও নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

৪.৩ নরসিংদী জেলার লোকসঙ্গীত

রীতা ভৌমিক

ভূমিকা

লোকসঙ্গীত লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত একটি শাখা। নরসিংদী অঞ্চলের লোকসঙ্গীত লোকসাহিত্য সম্পদের মধ্যে একটি অমূল্য রত্ন। এই জেলার মহাজনী, মুর্শিদি, মারেফতি, প্রেম-বিরহ, নবীতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, ব্যবহারিক গান ইত্যাদি সঙ্গীতে বিচিত্র বিষয়বস্তু উঠে এসেছে। এর রচয়িতা এখানকার মানুষ-চাষী, মাঝি-মাল্লা, জেলে, ফকির, দরবেশ, বৈরাগী থেকে গৃহিণী পর্যন্ত।

নরসিংদী জেলার বিবরণ

বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব সীমান্তের ছোট্ট একটি জেলা নরসিংদী। এই জেলাটি চতুর্দিকে নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। নরসিংদী জেলার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদী ও কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানা, পূর্বে মেঘনা নদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা ও গাজীপুর জেলা অবস্থিত।

নরসিংদী জেলাকে সমতল, উচ্চ সমতল, নিম্ন সমতল, গৈরিক উচ্চভূমি বলা যায়। এর ভূ-ভাগের কোথাও সমতল, কোথাও-বা উচ্চভূমি বা নিম্নভূমি পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো এলাকার ভূমি লাল মাটি, পলি মাটি, বেলে মাটি ও অপেক্ষাকৃত নবীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এর উত্তরাংশে লাল মাটির উঁচু পাহাড়ি ভূমি, দক্ষিণাংশ সমতল, পশ্চিমাংশ উঁচু সমতল আর সমগ্র সীমান্ত নিম্ন সমতল। নরসিংদী শব্দটির আসল রূপ হল নরসিংহদী। প্রথম দিকে কারো কারো ধারণা ছিল যে, এখানকার অধিবাসীরা সিংহের মত পরাক্রমশালী বলে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে নরসিংহদী।

আবার কেউ বলেন, সেন রাজারা শহরের কোনো এক মন্দিরে বিষ্ণুর নরসিংহ অবতার রূপ একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন থেকে এ জায়গার নাম হয়েছে নরসিংহদী। দেওয়ান শরীফ খাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি মামলায় দলিল পত্রের সঙ্গে দেয়া একটি বংশ তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় একটি নাম নরসিংহ। এই নরসিংহ নাম দেখে প্রমাণ করা যায় যে, সম্ভবতঃ রাজা নরসিংহের নাম থেকেই নরসিংহদী নামের উৎপত্তি। নরসিংহ ছিলেন ঈশা খাঁর একাদশ উর্ধ্বতন পুরুষ। তাঁর সময়কাল ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। সে হিসেবে নরসিংহদী নামের উৎপত্তি হয়েছে কম করে হলেও ছয়শত বৎসর পূর্বে। শেষোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য হলে নরসিংহের সঙ্গে 'দি' শব্দটি কিভাবে যুক্ত হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আসলে প্রাচীনকালে শব্দটি ছিল 'ডিহি'। সংস্কৃত ভাষার এই শব্দটির অর্থ হল 'ডাঙ্গা'। নরসিংদী একটি উচ্চ স্থলভূমি। এজন্য প্রাথমিক যুগে এর নামকরণ হয়ে থাকবে, 'নরসিংহ ডিহি'। পরবর্তীকালে সাধারণের মুখে বিকৃত হয়ে এর নামকরণ হয় 'নরসিংহ দীহি'। এই শব্দটি উচ্চারণে 'হ' ও 'হি' অক্ষর দু'টির আলাদা কোনো গুরুত্ব না থাকায় ক্রমান্বয়ে তা বাদ পড়ে যায়।

কাজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নরসিংহের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করা হয় নরসিংহ ডিহি। বর্তমানে যা হয়েছে নরসিংদী। যা দেওয়ান শরীফ খাঁ ও নরসিংহের পরিচিতি এখানে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

নরসিংহের পিতা রাজা ধনপদ সিংহ হাবসী শাসনের শেষ পর্যায়ে সোনারগাঁ ভূ-খণ্ডের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শীতলক্ষ্যার তীরের জমিদার ছিলেন। রাজা নরসিংহ শীতলক্ষ্যা নদীর তিন মাইল পূর্বে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে নগর নরসিংহপুর নামে একটি ছোট শহর প্রতিষ্ঠা করে নিজের আবাস্থান তৈরি করেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে এই গ্রামটি পলাশ থানায় অবস্থিত এবং পারুলিয়া নামে পরিচিত। নগর নরসিংহপুর ছিল ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে।

এই নদীর পূর্ব তীরে 'নরসিংহের চর' নামে একটি গ্রাম এখনও বর্তমান। এই বংশের অধস্তন একাদশ পুরুষ কালিদাস সিংহ হোসেনশাহী বংশের শাসনের শেষের দিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সোলেমান খাঁ নাম নিয়ে সোনারগাঁ অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠান করেন। এই সোলেমান খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ঈশা খাঁ ও দ্বিতীয় পুত্র ইসমাইল খাঁ। আর দেওয়ান শরীফ খাঁ হলেন দেওয়ান ঈশা খাঁর পঞ্চম অধস্তন পুরুষ।

নরসিংদী একটি নবগঠিত জেলা। সাবেক নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি থানা এবং ঢাকা সদর উত্তর মহকুমার কিয়দংশের সমন্বয়ে ১৯৮৪ সালে জেলাটি গঠিত হয়।

শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে এই জেলাটি অবস্থিত। জেলার মধ্য দিয়ে সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদী। জেলার কণ্ঠে সাতনড়ি হার হয়ে দুলছে শাখা নদী আঁড়িয়াল খাঁ, হাঁড়িধোয়া, পাহাড়িয়া, কাওর, কলাগাছিয়া, গঙ্গাজলী ও বালু।

নব্য-প্রস্তর যুগের প্রত্ন নিদর্শন

এ জেলার উত্তরাঞ্চলে বেলাব থানার উয়ারী, বটেশ্বর, রাজাবাড়ি, বেলাব, কামারটেক ইত্যাদি গ্রামে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্ন ও নব্য-প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত প্রস্তুরীভূত ও অশ্মীভূত কাঠের তৈরি হাত কুড়াল, বাটালি (Chisel)। এগুলো থেকে ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার বছর আগেও এখানে মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিক্রমপুরের ইতিহাসে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বেলাব লিপির ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন এভাবে:

"ঢাকা জেলার (ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের ও শীতলক্ষ্যার মধ্যবর্তী) মহেশ্বরদি পরগণায় অন্তঃপাতী বেলাব নামক গ্রামের জনৈক মুসলমান গৃহস্থ নিজ কুটীরের নিকট গর্ত খনন করিবার সময় [এপ্রিল ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ] এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্ত হয়। সে এই শাসনখানিকে আকাশ হইতে পতিত সুবর্ণপাত্র মনে করিয়া ইহাকে গোপনে পরীক্ষা করিবার জন্য তাম্রফলকে শীর্ষ-দেশস্থ রাজ মুদ্রাটি চাঁছিয়া ফেলিয়াছিল। সেটেলমেন্ট কার্যোপলক্ষে সাব ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি.এ. মহাশয় এই তাম্রশাসনের সন্ধানপ্রাপ্ত হইয়া (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) ইহা ২ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া ঢাকা নগরীতে আনয়ন করিলে, এই তাম্র শাসনের কথা প্রকাশিত হয়। সে সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দত্ত মহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্য এই তাম্র শাসনখানি বসাক মহাশয়ের পূর্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত শ্যামলা সুন্দর করের ও শ্রীমান নিকুঞ্জ বিহারী সেনের দ্বারা তাঁহার নিকট (২৪ শে জুন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই তাম্র শাসনখানির পাঠোদ্ধার ডাক্তার বসাক মহাশয় কর্তৃকই প্রথম সম্পাদিত হয়। এই তাম্র পট্টখানির আয়তন দশ ভাগের চারের এক গুণ নয় ভাগের দুয়ের এক ইঞ্চি। ইহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ৩৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা নিবদ্ধ দানলিপি উৎকীর্ণ আছে।' ...

এ ছাড়াও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন স্থানে উয়ারী, মরজাল, কান্দুয়া, ভাবলা, পাটুলি, ব্রাহ্মণের-গাঁও প্রভৃতি গ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের ছাপাংকিত রৌপ্য মুদ্রা (Punch marked silver coin) ও নকশী পাথরের (stone) নিদর্শনগুলো খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে প্রথম শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ছাপাংকিত মুদ্রা-প্রাপ্তিস্থান থেকে ধারণা হয় এ অঞ্চলটি সম্রাট অশোকের শাসনাধীন ছিল।

নরসিংদীর উয়ারী গ্রামের প্রাপ্তিস্থানে প্রচুর ছাপাংকিত রৌপ্য মুদ্রা, নকশী পাথরের গুটিকা এবং অতি সূক্ষ্ম ও অনুপম কারুশিল্পের নিদর্শনরূপে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি বিষ্ণুপট্ট দ্বারা এ অঞ্চলে মৌর্য শাসনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ের খড়গ বর্মণ বংশীয় রাজাদের তাম্রলিপি, মধ্যযুগীয় মুসলিম সুলতানদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, শিলালিপি স্থাপত্য ও বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

নরসিংদী জেলার সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি)

১. মহাজনী গান, ২. মারেফতি/ মুর্শিদি গান, ৩.নবীতত্ত্ব গান, ৪. দেহতত্ত্ব গান, ৫. খাজা বাবা সান, ৬. প্রেম সঙ্গীত, ৭. বিরহ বিচ্ছেদ, ৮. মেয়েলি গীত: বিয়ের গান – ক. মুসলিম সমাজের বিয়ের গান, খ. হিন্দু সমাজের বিয়ের গান, ৯. ঘুমপাড়ানি গান।

মহাজনী গান

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার বাউল ফজলুর নরসিংদীর শিবপুর, বেলাব থানার গ্রামগুলোতে প্রায়ই গানের আসর করেন। তার মাধ্যমে এই এলাকায়ও মহাজনী গানের বিকাশ ঘটে। মহাজনের রূপক হচ্ছে মহাজনী। যিনি মহাজন তিনিই ভাণ্ডারী জ্ঞানী। এ গানের ভেতরে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করে এবং স্রষ্টা বা পরমসত্তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করার শক্তি লাভ করে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানুষ, পশুপাখি সর্বময় ঈশ্বরের ইশারা দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবজগৎ ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরের ইঙ্গিতে এরা পৃথিবীতে আসে। আবার নিজ নিজ কর্ম করে একদিন সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে এই পৃথিবী ছেড়ে চলেও যায়। জীবজগতের এই যে আসা-যাওয়ার এক চমৎকার দর্শন মেলে মহাজনী গানে।

ছাড় তরী দেশের পানে
ছায়া ও ভাই নায়া
অনুরাগে ডাঙ্গা (দড়ি) কাচি
বইস্যা এই ভক্তির রশি
বিশ্বাসেতে লাগাইও মাস্তুল (নৌকার মাঝখানে পাল তোলার বাঁশ)
ছয়জন তোমার সহচরী
হাইল ধইরাছে মন ব্যাপারী
এইসকির হাওয়া দক্ষিণে চলিল
বেলা ডুবিল,
সুবাতাসে ধরলে পাড়ি
তালে তালে চলবে তরী
এসমেজাজে (আল্লাহর নামে) বান্দিল (বাধা) সম্বল (পুঁজি) ও
বেলা ডুবিল,
নায়ারে করিতেছে নয়টি ছিদ্র
আগে তুমি কর বন্ধ
নামের গন্ধ কড়িতে লাগাইয়া
তিনশত চব্বিশ হাজার
দিবারাত্র যায় অনিবার
ছাড়ছ তরী পঞ্চ ডরি দিয়া
মুর্শিদি যদি হয় কান্ডারী
দিয়া যাবে অনাজ বাড়ি
প্রেমের বাদাম লিলুয়ায় বাতাস বাইয়া
ও ভাই নাইয়া (মাঝি)
নাইয়ারে মহাজনের পুঁজি দিয়া
দিয়াছে ভবে পাঠাইয়া
আইস তুমি ব্যাপারী সাজিয়া
ব্যাপারে না পাইলে দিশা
স্বর্ণের দরে কিনলে সীসা

www.pathagar.com

লাভের মূলে সকলি হারাইয়া
সুজন নাইয়ারে
ছাড় তরী দেশের পানে চাইয়া।

মারেফতি/মুর্শিদি গান

এ অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত হলো মারফতী/মুর্শিদী গান। এলাকার জনসংখ্যার বেশির ভাগ অধিবাসী মুসলমান। কাজেই মানুষের জীবনের নানা বিষয় ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। মূলত মরমিয়া বাউল গানের কাঠামোর উপরে মারেফতি/মুর্শিদি গানের ভিত গড়ে উঠলেও এই গানে ইসলামের একটি ধর্মীয় বলিষ্ঠ সুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্ম সাধনে শরীয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মারেফাত শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা পথ প্রদর্শক।

ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতে, মরমিয়া সাধনার ব্যাপারে জ্ঞান পরম লক্ষ। খোদাকে পেতে হলে ব্যক্তিগতভাবে বস্তু জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। অর্থাৎ বস্তু জগতের স্বরূপ কি এবং নিজের স্বরূপ কি জানতে হবে সেই জ্ঞানের মূলধন নিয়ে খোদার জ্ঞান লাভ করতে হবে।

এই এলাকায় মুর্শিদকে কেউ কেউ গুরু বলেও আখ্যায়িত করেছেন। যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যস্থতাকারী। তাই মুর্শিদী গান গুরুবাদী ধর্মীয় সঙ্গীত। গুরুর প্রতি অসীম ভক্তি এই গানের মূল বিষয়বস্তু। এই গানের মধ্যে মুসলিম ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফকির দরবেশের কণ্ঠে এ গান অপূর্ব আধ্যাত্মিক রসের অনুরণন তোলে। মুর্শিদি গান নরসিংদী অঞ্চলের বহুল প্রচলিত গান।

নরসিংদী অঞ্চলের মুর্শিদি গানেও গুরুর প্রতি ভক্তি, আল্লাহকে ভালভাবে জানার আকাঙক্ষা প্রকাশ পায়। রামদাস বাউল নরসিংদী জেলায় প্রথম বাউল সঙ্গীতের সূচনা করেন।

একতারা, দোতারা, বাঁশি, সারিন্দা, মন্দিরা, করতাল, ঢোলক, খঞ্জনী ও তবলা বাজিয়ে এ গান পরিবেশন করা হয়।

নরসিংদীর মুর্শিদি গানের তৃণমূলীয় লোকশিল্পী

www.pathagar.com

থাপিতে (অস্থির) হৃদয় যারে দেখলে শীতল হয়
তার কাছে বস্তু রয় জানিও নিশ্চয়,
ওগো মায়েরও মূর্তি
আদ্যেরও শক্তি
জগৎ জননী তারে কয়।

হারিয়া বরচনে
চুম্বকেতে টানে
লীলা খেতে মিলন বান্দা (বাধা)
খেয়ে শান্ত হয়
থাপিতে হৃদয় যারে দেখলে শীতল হয়
তার কাছে বস্তু রয় জানিও নিশ্চয়,
এসে ভূমণ্ডলে যারে গাইয়া বাঁচিলে
সকলে কিছু দিতে হয়
জালালউদ্দিন কয়।
সাধনের ধন পরশ মনি
তিন রঙের পানি
তিন দিনে ঘাটে এসে দেহ মিলন হয়
থাপিতে হৃদয় যারে দেখলে শীতল হয়
তার কাছে বস্তু রয় জানিও নিশ্চয়।

হিন্দু কিবা মুসলমান
বৌদ্ধ কিবা খ্রিস্টান
ভাইয়ে ভাইয়ে বর্তমান
পঞ্চ প্রেম ঘর,
পুরান কোরান পড়।
এসব কথা যাও শুনে
দুটি কোমল কলি তার
দুধের ভাণ্ড রয়।
থাপিতে হৃদয় যারে দেখলে শীতল হয়
তার কাছে বস্তু রয় জানিও নিশ্চয়

মুর্শিদ গুরুর কাছে
জানা যাবে পিছে
প্রেমের ভাণ্ড (বাক্স) কোথায় আছে
কই বাঁচাবি রয়
থাপিতে হৃদয় যারে দেখলে শীতল হয়
তার কাছে বস্তু রয় জানিও নিশ্চয়।

নবীতত্ত্ব গান

নরসিংদী জেলায় নবীতত্ত্ব গানের প্রচলন রয়েছে। নবীতত্ত্ব মূলত জাগতিক সত্তা অর্থাৎ নবীর উপর নির্ভরশীলতাই এ গানের মূল লক্ষ্য। সকলকেই জগৎ সংসারের মায়া ত্যাগ করে একলা চলে যেতে হবে। এই ভব সংসারে কোনো কিছুই স্থায়ী নহে। সকলই পরিবর্তনশীল। জন্মও যেমন মরণও তেমন। এ সঙ্গীতে তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিন্যাসই গায়কের উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্মে নবীতত্ত্বের গান গাওয়া হয়। নবীর প্রশংসা এই গানের মূল মহত্ত্ব। হযরত মুহম্মদ ও অন্যান্য নবীর গুণ কীর্তন এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কারণ নবীরা হলো পরকালের কাণ্ডারী, পথ দিশারী। মানুষ পৃথিবী থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এ গান গেয়ে থাকে।

আসিবে তুফান ভেঙ্গে নিবে ঘরখান
নবীজীর নামে এবার
পালা লাগাও না
চিরদিন ভবে আর কেউ রবে না
ভাইগো ভাই যেদিন টান দিবে ডুরি
ছাড়িবে ঘরবাড়ি
পুত্রকন্যা নারীকেও রাখতে পারবে না
ভাইগো ভাই যেদিন টান দিবে ডুরি
ছাড়িবে ঘরবাড়ি।
এক দুই দিন করিয়া
দিন যাইতেছে চলিয়া
কি ধন যাবে লইয়া
চিন্তা বাঁচিনা।
একদিন কোমরেরও বাটিয়া
রাইখা দিকে কাটিয়া
ভাবে ইসমাইল মিয়া কয়
কিছুই বুঝি নারে।

চিরদিন ভবে আর কেউ রবে না
আসিবে তুফান
নবীজীর নামে এবার পালা লাগাও না
চিরদিন ভবে আর কেউ রবে না।

দেহতত্ত্ব গান

নরসিংদী অঞ্চলের এক সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত দেহতত্ত্ব গান অনিত্য দেহ ও পরমাত্মার রূপক নিয়ে রচিত। এ গান কোথাও সুরের। কোথাও বাউলের অনুকরণ এবং কোথাও কীর্তন প্রভাবিত। ধর্মতত্ত্ব নিয়েই এ গানের উৎপত্তি। বাউল তত্ত্বের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে অন্যদিকে সহজিয়া ও তাত্ত্বিক ভাবধারার একটা সংমিশ্রণ হয়েছে।

সাধনার মাধ্যমে উদ্বোধিত হয়ে অলৌকিক আনন্দের মায়ালোকে পৌঁছে দেয়াই এ গানের কাজ। মানুষের দেহের মধ্যেই সকল তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। যেখানে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে।

বাঙালি সাধনায় আরেকটি চির বৈশিষ্ট্য মানব মাহাত্ম্যের উপলব্ধি। শুদ্ধ জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম ও ভক্তির পথ অবলম্বন করায় এ গানে এটিই উপলব্ধি হয় যে, বিশ্বের সকল তত্ত্ব আছে মানুষের দেহভাণ্ডে। এই দেহতত্ত্বই জন্ম দিয়েছে মানবতত্ত্ব। নরসিংদী অঞ্চলের প্রচলিত দেহতত্ত্ব গানের মধ্যেও এই পরম সত্যটি লুকিয়ে রয়েছে।

রায়পুরা থানার শিবপুর গ্রামের কুদ্দুস মাস্টার দেহতত্ত্ব গানের রচয়িতা ও গীতিকার। বেলাব থানার হোসেননগর গ্রামের আক্কেল আলী প্রচুর দেহতত্ত্ব গানের রচয়িতা ও সুরকার। আক্কেল আলী একতারা বাজিয়ে গাইতেন:

এদেশে তো বন্ধু কে রে
ভাব কইর্যা দেখ তোর দেহের মধ্যে

www.pathagar.com

বা

পরদেশী মাঝি ভাই
তুমি ছাড়ছ রঙের তরী
আমারে নিবাগো নায়শ্বর (নতুন বৌয়ের নায়র)
যাইতাম বাপের বাড়ি।
যেদিন হইতে দিলা গো বিয়া
না লইলা খবর
খাইতে গেলে ভাত মিলে না
পিন্দনে নাই কাপড়
ভিজা মাটি বাঁশের ছানি গো
দয়াল উপরে নাই মশারি।
আমারে নিবাগো নায়শ্বর
যাইতাম বাপের বাড়ি
কত মানুষ নায়শ্বর গো গেলো রঙিন শাড়ি পিন্দা
আমারে নিবাগো নায়শ্বর মার্কিন কাপড় দিয়া
ভিজা মাটি বাঁশের ছানি
দয়াল উপরে নাই মশারি।
কত মানুষ নায়শ্বর গো গেলো পালকি ঘোড়া চইড়া
আমারে নিবাগো নায়শ্বর বাঁশের মাচা দিয়া
ভিজা মাটি বাঁশের ছানি
দয়াল উপরে নাই মশারি।

খাজা বাবা সান

এ গানের মাধ্যমে অধ্যাত্ম্য সাধনা চলে। খাজা বাবাকে কেন্দ্র করেই এ গানের উৎপত্তি। খাজা বাবার মাহাত্ম্য এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একসময় নরসিংদী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে খাজা বাবার গানের আসর বসতো।

তোমার প্রেমে জগৎ বাধা
ডাকিতেছি সব জনে
দয়াল গো তোমার কারণে
যে দুঃখ গিয়াছ পায়া
খাজা গো আজমেরি গিয়া
চিশতিয়ারে দাও পাঠাইয়া
পুড়তে তোমায় আগুনে
দয়াল গো তোমার কারণে
যে গেছে তোমারে পায়া
সে জন গেল চন্দন হইয়া
এই অধমে কয় ভাবিয়া
আর থাকব না নিরজনে
দয়াল গো তোমার কারণে

www.pathagar.com

তোমার নামে এতো মধু
যত দুঃখের যায় গো দুঃখ
লাগাইয়া প্রেমের ডুরি
টানিতেছে নির্জনে
দয়াল গো তোমার কারণে।

প্রেম সঙ্গীত

লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান শাখা হলো প্রেমসঙ্গীত। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই এ গীতের প্রচলন রয়েছে। এ অঞ্চলের প্রেমসঙ্গীত বেশ সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রেমের মধ্য দিয়ে মানব হৃদয়ের সুকোমল চিত্তবৃত্তির সুন্দরতম প্রকাশ ঘটে। নর-নারীর প্রেমেই শুধু নয়, প্রকৃতি জগতেও দেখা যায় পুরুষ পাখি স্ত্রী পাখিকে আকর্ষণ করার জন্য গান গায়। প্রেম একজন নর-নারীর হৃদয়ে রস মাধুর্যের কি ঝংকার তোলে তা প্রকাশ পায় এই গানে। এই গানের মাধ্যমে অনুভব করা যায় প্রেম নর-নারীর জীবনে চিরন্তন সত্য। মূলত প্রেমের উন্মেষ ঘটে ভালোলাগা থেকে। এই ভালালাগা থেকে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এরপর অভিসারের পালা। পরবর্তীকালে মিলনের আকাঙ্খা দেখা যায় গানগুলোতে।

ডিপো (প্রেমিক) ডিপো ডিপো মৈষালদী (মহিষের গাড়ি চালক)
ও মৈষাল ডিপো তোমার হিয়া
কোন বাগানে যাইতেরে মৈষাল
আমাকে ছাড়িয়া (২)
ডিপো ডিপো ডিপো মৈষালদী
ও মৈষাল ডিপো তোমার হিয়া
কোন বা দেশে গেলেরে মৈষাল
আমাকে ছাড়িয়া
ও মৈষালরে
তুমি যাইবা আমপুরে মৈষালরে
ও মৈষাল মোর ধইরাছে হিয়া
আর কতদিন রাখব যৌবন
অঞ্চলে বাঁধিয়া, মৈষালরে।
হাটবাজারে যাইতেরে মৈষাল
কিনা আনছ কি?
চিংড়া, বিদুরিয়া তাহাতে মিহিরে সব ধরি
ডিপো ডিপো ডিপো মৈষালদী
ও মৈষাল ডিপো তোমার হিয়া
কোন বাগানে যাইতেরে মৈষাল
আমাকে ছাড়িয়া। (২)

বিরহ বিচ্ছেদ

নরসিংদী অঞ্চলে এ গান বহুল প্রচলিত। এ অঞ্চলের বিরহ সঙ্গীত বিরহ বেদনা করুণায় সিক্ত। তাই এই গানগুলোর করুণ সুর প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে আমাদের ভাব-বিহ্বল করে তোলে। গায়ক-গায়িকা উদাস করা করুণ সুরে এই গান পরিবেশন করে শ্রোতাকে গানের মর্মমূলে প্রবেশ করায়।

এ গানে বিরহী প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের গোপন ব্যথা, দুঃখ, কষ্ট গানের মাধ্যমে অবলীলায় প্রকাশ পায়। কখনও রাধার বিরহকে কেন্দ্র করে এ গানের ভাব ব্যক্ত হতে দেখা যায়। মূলত এ সঙ্গীত বিরহ হৃদয়ের অশ্রুধারা নিয়েই রচিত।

www.pathagar.com

পীড়িতি করল দেশান্তরী
হইলাম বিহারী
মান কলেমান ত্যাজ্য করে
ঘুরি কত দ্বারে দ্বারে
কলঙ্ক রহিল জগৎ জুড়ে
দুঃখে মরি পীরিতি করল দেশান্তরী
হইলাম বিহারী
দুঃখে মরি পীরিতি করল দেশান্তরী
শোন বলিগো প্রাণ ললিতি
আমার লেখা নিয়ে হাতে
চইল্যা যাইও ঐ মথুরা পুরী
দুঃখে মরি পীরিতি করল দেশান্তরী

আমার লেখা হাতে দিয়া
কইও তারে বুঝাইয়া
ঐ দুরবীণ শা যাবে নিজ বাড়ি
দুঃখে মরি পীরিতি করল দেশান্তরী
হইলাম বিহারী
দুঃখে মরি পীরিতি করল দেশান্তরী।

মেয়েলি গীত

বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই গানের প্রচলন আছে। নরসিংদী অঞ্চলের শিবপুর থানায় এই গানের প্রচলন বেশি হলেও অন্যান্য জায়গায় এই গান প্রায় বিলুপ্তির পথে।

বিয়ের গান

বিয়ের উৎসবে যেসব গান গাওয়া হয় তাকে বিয়ের গান বলা হয়। এ গানকে সাধারণত ব্যবহারিক বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় গীতও বলা হয়। নরসিংদী অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলিম সমাজে বিয়ের গানগুলোর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিয়ের গানে রাম সীতার উল্লেখ করে অন্যদিকে মুসলমান সমাজে বিয়ের গানে মানবিকতাবোধের স্বাধীন বিকাশ অনুভূত হয়।

মুসলমান বিয়ের গান

নরসিংদীর কিছু কিছু এলাকায় এখনো মুসলিম বিয়েতে গান গাওয়া হয়। এই গানে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। নারীরা নেচে নেচে এই গান পরিবেশন করে বিয়ের সময়। নাপিত ডাকা, মেহেদী তোলা, বর কনের গোসল, বরের আগমন, বিয়ের দিন বর কনের সাজসজ্জা, বিয়ের মজলিশে বরপক্ষের আনীত অলংকারাদি নিয়ে কন্যা পক্ষের রসিকতা, কনে বিদায়ে, বউ বরণে, বধূর পরিচয় ইত্যাকার নানা পর্বে এই গান গীত গেয়ে হয়।

মেহেদী তোলা ও বরকনের হাতে মেহেদী পড়ানোর গীত

মুসলিম বিয়েতে মেহেদী বরকনের হাতে পড়াতে হয়। এজন্য বিয়ের দিন সকালে বা পূর্ব দিন নতুন কুলা হাতে সমস্বরে মেয়েলি গীত সহকারে কিশোরী, যুবতী, বিবাহিতা রমণীরা বিয়ের পূর্ব দিন বা দুদিন আগে মেহেদী তুলতে পারে। নিঃসন্তান, বিধবা, দোজবরে, মৃতবৎসা, নারী মেহেদী তুলতে পারে না। পঞ্চ এয়ো নতুন কুলায় ধান দুর্বা, তেল, হলুদ, সিঁদুর, পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি, বাতাসা প্রভৃতি নিয়ে মেহেদী তুলতে যায়। গাছের গোড়ায় তেল ঢেলে পাঁচ কিংবা সাতটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। তারপর পাঁচবার কুলা দিয়ে গাছ

www.pathagar.com

আঙিনায় মেয়েলি গীত

বরণ করে। পান, বাতাসা, সুপারি গাছের গোড়ায় রেখে মেহেদী গাছকে বিয়ের নিমন্ত্রণ করে। এর ফলে প্রথমে পাঁচ মুষ্ঠি মেহেদী পাতা তোলার নিয়ম রয়েছে এবং মেহেদী তোলার সময় পঞ্চ এয়ো গান গায়।

এতদিন ছিলরে কুলা ডুয়ায়ের দোকানে
আজ ক্যানে আইলরে কুলা (কন্যার নাম ধার) ঘরেতে
এতদিন ছিলরে মেন্দি গাছের ঐ ডালে
আজ ক্যানে আইলরে মেন্দি (কন্যার নাম ধরে) হাতে
এতদিন ছিলরে হলুদ গৃহস্থের বাগানে
আজ ক্যানে আইলরে হলুদ (কন্যার নাম ধরে) গায়েতে
এতদিন ছিলরে জিনিস বানিয়ার দোকানে
আজ ক্যানে আইলরে জিনিস (কন্যার নাম ধরে) গলাতে
এতদিন ছিলরে সাবান নরসিংদীর দোকানে
আজ ক্যানে আইলরে সাবান (কন্যার নাম ধার) ঘরেতে
এতদিন ছিলরে শাড়ি তাঁতীরও কলেতে
আজ ক্যানে আইলরে শাড়ি (কন্যার নাম ধার) বরনে।

বর সাজানোর গীত

বরকে গোসল করানোর পর নওশা সাজানোর সময় গীত গাওয়া হয়।

আরে অ নশা (বর) লাল
তুই কেমনে বিয়ার সাজে যাছ গোটা মেন্দি হাতেরে
জামাই বিয়ার সাজে যাছ-বিয়ার সাজে যাইতাছে
পালকিত চড়নারে-পালকিত চড়নারে, গোটা মেন্দি হাতেরে।

www.pathagar.com

জামাই বিয়ার সাজে যাছ - বিয়ার সাজে যাইতাছে
জুতা মোজা লাগেরে - জুতা মোজা পরনারে।
গোটা মেন্দি হাতেরে।

বর বরণের গীত

বর কন্যার বাপের বাড়িতে পৌঁছানোর পর কন্যাপক্ষ কিছু মেয়েলি আচারের মাধ্যমে বরকে বরণ করে। এ সময় পাড়াপড়শী, আত্মীয় স্বজনরা মেয়ের মায়ের কাছে গানের মধ্য দিয়ে জানতে চায় তারা বরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসবে। সব ঠিকঠাক মতো রয়েছে কিনা।

কি করগো কৈন্যার মায়া নিড়ালে (একাকি) বসিয়া
তোমার ঝিয়ের জামাই গো আইয়ে পীতি নিশান লইয়া
আয়ুক আয়ুক ঝিয়ের জামাই পীতি নিশান লইয়া
বা'র বাড়িত বিছায়া রাখছি ফুলের বিছানা,
কি করগো কৈন্যার ভাই-বউ নিরালে বসিয়া?
তোমার ননদের জামাই গো আইয়ে, পীতি নিশান লইয়া
আয়ুক আয়ুক ননদের জামাই পীতি নিশান লইয়া
বার বাড়ি ইসাহ রাইখ্যা দিছি বাঁকা পানের খিলি।

কনে সাজানোর গীত

বরপক্ষ কনে সাজানোর সামগ্রী বাজার থেকে কিনে আনে। নরসিংদী অঞ্চলে বরপক্ষ বিয়ের বাজার করতে প্রথমে কুলা ও হলুদ একদামে কেনে। পরে অন্যান্য সামগ্রী কেনে। কনের জন্য আনা কনে সাজানোর 'বরণ ডালা' বরপক্ষ বিয়ের মজলিশে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে। এতে কন্যার কাপড় চোপড়, প্রসাধনী ও অলংকারাদি থাকে। বরপক্ষের আনা জিনিস দিয়েই কনে সাজানো হয়। কনে সাজানোর সময় সখীরা বরপক্ষের আনীত জিনিস দিয়ে ঠাট্টা-মশ্‌করা করে গীত গায়।

শানের বান্দাইল (বাধা) ঘাটে
জামান মতি সাইরা রে সাইরারে
কি লইয়া যাইবারে জামান
জামান নবীন শ্বশুর দেশে।
হলদির দোকানে গিয়া
হলদি কিনা নিবাম গো কৈন্যা
জুলুসের (উজ্জ্বলতা) লাইগ্যা
থাক থাক মাইয়াগো হলদি দোকানে শুইয়া
বিয়া কইরা যাইবার গো সময়
নিবাম ছুটি কইর‍্যা।

কনে বিদায়ের গীত

কনে বিদায়ের সময় নরসিংদী এলাকায় এই গানগুলোর প্রচলন ছিল।

চল চল শরুফা কৈন্যা গো
চল আপন দেশে
তোমার দেশে যাইতেরে সাধু (বর)
প্রাণের দুঃখ পাইয়াম।
পন্থে (পথে) পন্থের গো শরুফা
পানের দোকান বসাইয়াম।
চল চল শরুফা কৈন্যা গো
চল আপন দেশে

www.pathagar.com

তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
প্রাণের দুঃখ পাইয়াম
পন্থে পন্থের গো শরুফা
সুপারির দোকান বসাইয়াম।

তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
মা বলিবাম (বলব) কারে
তোমার মায়ের মতোন গো শরুফা
আমার মায়ে আছে
আমার মারে তুমি গো শরুফা মা বলিবা।

তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
আব্বা বলিবাম কারে
তোমার আব্বার মতোন গো-শরুফা
আমার আব্বা আছে
আমার আব্বারে তুমি গো শরুফা আব্বা বলিবা।

তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
ভাই বলিবাম কারে
তোমার ভায়ের মতোন গো শরুফা
আমার ভায়ে আছে
আমার ভায়েরে তুমি গো শরুফা ভাই বলিবা।
তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
বোন বলিবাম কারে
তোমার বোনের মতোন গো শরুফা
আমার বোন আছে
আমার বোনেরে তুমি গো শরুফা বোন বলিবা।

তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
নানী বলিবাম কারে
তোমার নানীর মতোন গো শরুফা
আমার নানী আছে
আমার নানীরে তুমি গো শরুফা নানী বলিবা।

তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
দাদী বলিবাম কারে
তোমার দাদীর মতোন গো শরুফা
আমার দাদী আছে
আমার দাদীরে তুমি গো শরুফা দাদী বলিবা।
তোমার দেশে যাইতেরে সাধু
ফুপু বলিবাম কারে
তোমার ফুপুর মতোন গো শরুফা
আমার ফুপু আছে
আমার ফুপুরে তুমি গো শরুফা ফুপু বলিবা।

www.pathagar.com

বধূ বরণের গীত

শাশুড়ি/ বয়োজ্যেষ্ঠরা নতুন বধূকে কুলা দিয়ে বরণ করার জন্য উঠানে অপেক্ষা করে। বরণ কুলায় ধান দুর্বা, তেল, সিঁদুর, সরিষা, পান সুপারি ইত্যাদি উপাচার থাকে। বর বধূসহ নিজ বাড়িতে আগমন করার সঙ্গে সঙ্গেই নব দম্পতিকে উঠানে একটি নতুন পিঁড়ির উপর পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়। মা প্রথমে তিন মুষ্ঠি ধান দুর্বা পুত্র ও পরে পুত্রবধূর মাথায় নিয়ে আশীর্বাদ করে বরণ করে। পরে একইভাবে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা বরবধূকে বরণ করে ঘরে তোলে।

মূলী বাঁশের তলে গো কজলী সুন্দরীরে থুইয়া
মাথার বেশর পরাও নারে দামান (বর) চর্তুবানে চাইয়া।
কেমুন ঐ না আভাগ্যা বাবায় বিয়া দিছিনরে তরে?
কি করবো মোর আভ্যাগ্যা বাবায় কি করবো মোর চাচায়
হাইট্যারার (ছয় ষষ্ঠীর) দিন লেখনে লিখছে গো যাইতাম পরের ঘরে।

বধূর পরিচয় পর্বের গীত

বধূ শ্বশুর বাড়িতে এসে এক অচেনা পরিবেশে নিজেকে সামলাতে হিমশিম খায়। শাশুড়ি বা বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ বধূর সঙ্গে বাড়ির লোকজনদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বধূর জড়তা কাটাতে সাহায্য করে। অনেক সময় গানের ভাষায় তা প্রকাশিত হয়।

বউ গো চিক্কন সুর বাণী
চিন্যা লওছেন গো তোমার হরী কোন লাগো?
পচ্চিমের ভিটার ঘরে গো- সোনার খাড়ী আতে গো
পান সুপারী বাঁড়ে গো
হেইলা যেমুন হরীর মতন লাগে গো।
বউ গো চিক্কন সুর বাণী।
চিন্যা লওছেন গো তোমার হউর কোনলা গো?
পচ্চিমের ঘরের পিঁড়ার গো, সোনার উক্কা আতে গো
জলচকিত বইয়া গো গুড়ুর গুড়ুর টানে গো।
হেইলা যেমুন হউরের মতন লাগে গো।
বউগো চিক্কন সুর বাণী!
চিন্যা লওছেন গো- তোমার জাল কোনলা গো?
পাকের ঘরঅ বওয়া গো সোনার ছিপি আতে গো।
মেমানদারী করে গো
হেইলা যেমন জালের মতন লাগে গো।
বউ গো চিক্কন সুর বাণী।
চিন্যা লওছেন গো তোমার ভাউর (ভাসুর) কোনলা গো?
পূর্বের ভিটার ঘরে গো- সোনার খড়ম পায়ে গো
চট্টর চট্টর আঁড়ে গো
হেইলা যেমুন ভাউরের মতন লাগে গো।
বউগো ... তোমার দেওর কোনলা গো?
পাড়ায় পাড়ায় আঁড়ে গো-ভাইজ বইলা ডাকে গো
হেইলা যেমুন দেওরের মতন লাগে গো?
বউগো... তোমার ননদ কোনলা গো?

www.pathagar.com

উডান বাড়ী হুরে গো ভাবী ভাবী ডাকে গো
কাইজ্যা ফসাদ করে গো-মুচকাইয়া কতা কয় গো
হেইল্যা যেমুন নন্দের মতন লাগে গো।
বউগো... তোমার জামাই কোনলা গো?
তেছরা হিতা করে গো চিক্কুন ধূতি পিন্দে গো
পাড়ায় পাড়ায় আঁড়ে গো বাজার পান খায় গো
হেইলা যেমুন জামাইর মতন লাগে গো।

হিন্দু সমাজের বিয়ের গান

নরসিংদী অঞ্চলে এই গান এখন বিলুপ্ত। আগে হিন্দু বিয়েতে পান চিনি, সোহাগ মাগা, গায়ে হলুদ, অধিবাস, জলভরন, বরকনে বরণে, বর-কনে সাজানো, বর যাত্রার গান, বর কনে বরণের, বরপক্ষের প্রতি রসিকতা সূচক গান, কন্যা সম্প্রদানের গান, ফুল ছিটানো গান, কনে বিদায়ের গান, বধূ বরণ, পাশা খেলা ইত্যাদি গীতের প্রচলন ছিল। হিন্দু ধর্মে বিয়ের আচার দু'রকমের হয়। বৈদিক আচার ও লৌকিক আচার। বৈদিক আচার পুরোহিত দ্বারা পরিচালিত হয়। পুরোহিত মন্ত্রেও মাধ্যমে বৈদিক আচার সম্পাদন করেন। মেয়েরা লোক গীতি গেয়ে লৌকিক আচার পরিচালিত করে। বিয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মহিলারা লৌকিক আচারে নিজেদের আঞ্চলিক গানগুলো গাইত।

সোহাগ মাগার গীত

সোহাগ মাগা একটি স্ত্রী আচার বিশেষ। 'সোহাগ' সৌভাগ্য শব্দের প্রতিশব্দ। হিন্দু বিয়ের পূর্ব দিন বর বা কনের মা মাথায় নতুন কুলা নিয়ে বর বা কনের সোহাগ কামনায় প্রতিবেশীদের বাড়ি যায়। কুলার উপর পাঁচটি মাটির প্রদীপ জ্বালানো থাকে। মা একে একে পাঁচ বাড়ির দরজার সামনে আতপ চালের গুড়া দিয়ে আল্পনা এঁকে তাতে বসে। গৃহকর্ত্রী কুলাধারিণী মায়ের মুখে দুধের সর ও মিষ্টি তুলে দেয় এবং আলাদা কৌটায় সরিষার তেল দেয়। সোহাগ মাগার সময় মা কোনো কথা বলতে পারবে না। পাঁচ বাড়ির সরিষার তেল একত্রে জ্বাল দিয়ে বরকনের মুখে মাখানো হয়। এটি বরকনের প্রতি সমাজের শুভ আশীর্বাদ সূচক। সোহাগ মাগার সময় পাড়া প্রতিবেশীরা গান গেয়ে মাকে আমন্ত্রণ জানায়

মাথায় এ সোহাগের ডালি
এগো মাগো সোহাগ দি ফুল
মায়ে গো সুন্দরী, কপালে সিঁন্দুরের ফোটা
হাতেতে শঙ্খটি দিয়ে
এগো মাগো সোহাগদি ফুল আর মায়ে গো সুন্দরী
পইরনে বিটি শাড়ি
এগো-মাগো সোহাগদি ফুল আর মায়ে গো সুন্দরী।

জল ভরণ ও বর কনের স্নানের গীত

হিন্দু বিয়েতে গঙ্গাপূজা করে নদী খাল বিল বা পুকুর থেকে জল সংগ্রহ করে আনে। অধিবাসের দিন নদী, পুকুর, কুয়া বা ইঁদারায় বৌদি, দিদি, কাকীমা, মামীমা, মা, মাসীমা, কলসি কাঁখে করে জল ভরতে যায়। গঙ্গাকে পান, বাতাস, সুপারি এবং ধান দুর্বাসহ উলুধ্বনি দিয়ে নিমন্ত্রণ করে। এগুলো একটি রিকাবে নেওয়া হয়। বিধবা, নিঃসন্তান, দোজবরে মহিলাদের জলভরণে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। কলসি কাঁখে জলভরণের সময় ও বর-কনেকে স্নান করানোর সময় সমস্বরে গীত গাওয়া হয়।

কোন বনে বাজায় গো বাঁশি শ্যাম রায়
সখি জামাইর মায়ে জলের ঘাটে যায়।
সখি ধান দুর্বা থালি হায়

www.pathagar.com

কোন বনে ...
সখি কাহার পিন্দন লাল নীল, কাহার পিন্দন সাদা হায়
কোন বনে ...
সখি জামাইর মা সুন্দরীর পৈরন (শাড়ি) গো
সখি কৃষ্ণ নামটি লেখা হায়
কোন বনে ...
সখি কেহ হাঁটে ধীরে ধীরে কেহ হাঁটে রইয়া হায়
কোন বনে ...
সখি জামাইর সুন্দরী হাঁটে ত্রিভঙ্গ হইয়া হায়
কোন বনে ....
সখি কেহর হাতে লোটা ঘটি- কেহর হাতে কলসি হায়
কোন বনে ...
সখি জামাইর সুন্দরীর কাঁখে সুবর্ণের কলসি হায়
কোন বনে ...
সখি কলসি বুরাইয়া তারা থুইল তরু তলে হায়
কোন বনে ...
সখি তারা ফুল ঝরিয়া পড়ে গো কলসির মাঝে হায়
কোন বনে ...
সখি আগে যদি জানতাম ফুল পড়বেরে ঝরিয়া হায়
শাড়ির আঞ্চল (আঁচল) দিয়া গো ঢাকিয়া রাখিতাম হায়।

কনে সাজানোর গীত

বিয়ের কনেকে সাজানোর জন্য বরের বাড়ি থেকে কাপড় চোপড়, সিঁদুর, মাছ, দই, মিষ্টি, পান-সুপারি, প্রসাধনী ও অলংকারাদি সহ বরণ ডালা নিয়ে বিয়ের অন্তত দু'দিন বা বিয়ের পূর্বে বরের বাড়ি হতে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, বাবা, কাকা, মামা, ভাই, বোনের জামাই, কনের বাড়িতে উপস্থিত হলে বাড়ির মহিলারা তাদের কনের কাছে নিয়ে যান। বরপক্ষের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কনেকে অলংকার ও বস্ত্র শরীরে পরিয়ে আশীর্বাদ করেন। নরসিংদী অঞ্চলে একে 'সোনা কাপড়' করাও বলে।

কনে সাজানোর সময় নরসিংদী অঞ্চলের হিন্দু সমাজে এ সব গীত পূর্বে খুবই প্রচলিত ছিল।

সাজাও সাজাও ধনী ও কমলিনী
সাজিতে বিলম্ব কেন গো ধনী
শাড়ি ও আইনাছে ছায়াত টাংগে গো ধনী।
সাজাও সাজাও ... কেন গো ধনী
ছায়াত আইনাছে ব্লাউজ টাংগে গো ধনী
সাজাও সাজাও ... কেন গো ধনী।

বর যাত্রার গান

বিয়ের দিন বর বরযাত্রীসহ শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে মায়ের আশীর্বাদ কামনা করে। মা ছেলের মাথায় স্বহস্তে শোলার টোপর পড়িয়ে দিয়ে বরণ কুলা থেকে ধান দুর্বা নিয়ে আশীর্বাদ করে। বরের পরনে থাকে ধুতি, পাঞ্জাবি, উত্তরীয়, গলায় পুষ্পমাল্য। এ সময় উলুধ্বনি দিয়ে বর যাত্রার গান গাওয়া হয়।

সুটকেশ আন যাত্রা করি
এগো যাইবো সুটকেস কইন্যার বাবার

www.pathagar.com

বাড়িতে গো সুন্দরী।
সুটকেশ আন যাত্রা করি
এগো যাইবো সুটকেশ কইন্যার জেঠার বাড়িতে গো সুন্দরী।

বর পক্ষের প্রতি রসিকতাসূচক গান

বিয়ের আসরে বরপক্ষের প্রতি কন্যাপক্ষ রসিকতা করে গান গাওয়ার রেওয়াজ এ অঞ্চলেও রয়েছে। কখনও হবু বধূর নামে বরের বোন জামাইরা নেচে নেচে নানা রকম গান গেয়ে শ্যালকের সঙ্গে রসিকতা করে।

শালা বাড়ি যারে তোর মাগীরে দেইখ্যা আইছি
নশন্দির বাজারে।
বহু পুরুষ আসর কইরা খেমটা নাচাইল।

কন্যা সম্প্রদানের গান

বর ছাদনাতলায় এসে আসন গ্রহণ করলে বিয়ের রীতি অনুযায়ী কনেকে পিঁড়ির মধ্যে বসিয়ে ছাঁদনাতলায় এনে বরের বিপরীত পাশে বসানো হয়। কনের বাবা সকলের উপস্থিতিতে চাঁদ, সূর্য, সহস্র কোটি দেবতাকে সাক্ষী রেখে মেয়েকে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ করে জামাতার হাতে সম্প্রদান করে। অর্থাৎ কনেকে 'গোত্রান্তর' করা হয়।

চন্দ্র সূর্য দেবগণ চিন্তা যুগে হল মন
শিবে বলে বর্মা- নাপিত জন্মা।
কুল শীলে নাম থুইল ভুবংকর মাটি দিয়া
গৌরীরে লইয়া শিব দেশে যায়
'ললন চান্দের মা' নাহ কান্দ-মন কর স্থির।
হর গৌরীর বিয়া আইল।
'বন্ধন কটি ছুটি আইল।'
ডাইনে শংকর বামে গৌরী
সর্বলোকে বল হরি।

ফুল ছিটানো গান

এটি একটি স্ত্রী আচার মাত্র। কনে সম্প্রদানের পর বর কনেকে ফুলের তৈরি কুঞ্জে আনা হয়। বরকে একটি চেয়ারে বসানো হয়। কনে বরের চারদিকে ঘুরে এসে দু'হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ফুল সাজিয়ে নাচের ভঙ্গিতে বরের মাথায় পুষ্পবর্ষণ করে। এভাবে সাতবার বরের মাথায় পুষ্পবর্ষণ করতে সাহায্য করে এয়োস্ত্রীগণ। এ সময় এয়োস্ত্রীগণ গান গায়।

'চার গাছে রাম গো কলা দুয়ারে কুঁপিল'
'সাত নাল সূতা গো দিয়া কলারে যে দিল'
'সাত গাছি আমের ফলক সূতারে বেড়িল'
মুষ্টি মুষ্টি ছিড গো পুষ্প রামের বদন চাইয়া।
রাম যায় বড়শি বাইতো-সীতা যায় গো জলে
রামের হাতের বড়শি দুইডা সীতার কলস ভাঙছে।
এগো ভাঙছে মাইট্যা গো কলসী
আইন্যা দিব হীরার কলসী।

কনে বিদায়ের গান

কন্যা বিয়ের পর প্রথম পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করার পূর্বে কিছু আচার পালন করে। এয়োরা তার সামনে ধান-দুর্বার ডালা তুলে ধরে। বর কনের ডান হাত ধরে রাখে। কন্যা ডালা থেকে ধান-দুর্বা নিয়ে

www.pathagar.com

মাথার উপর দিয়ে পেছনে ফেলে দেয়। এভাবে সে তিনবার করে। মা পেছন থেকে সেই ধান গ্রহণ করে। নরসিংদী অঞ্চলে কন্যার বিদায় দৃশ্য গানের ভাষায় প্রকাশ পায় এভাবে

দুঃখিনী যে কালো মায় কি মতে সহিব গায়।
ঝি গো একতিল না দেখিলাম তরে
তুমি ঝি জন্মিলা যথে
ঝি গো বিশ্বে ছিলাম নানান মতে।
ঝি গো লোহার তন্ডুল করেছে রন্ধন
ঝি গো শ্বশুরে করিও ভক্তি
ঝি গো শাশুড়িকে চাইও বাক্যি
ঝি গো পতি সেবা করিও যতনে।
সোনার চৌদলে উঠে -দেখিয়া মায়ের প্রাণ ফাটে
নিশাকারে আইছঅ ঝি গো খাইবা কি আর নিবা কি?
অ গো মিষ্টান্ন রইল মায়ের ঘরে।

ঘুমপাড়ানি গান

মৃদু স্বরে গুণ গুণ করে ঘুমপাড়ানির গান গেয়ে শোনায়। শিশুরা গান শুনতে শুনতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। নরসিংদী অঞ্চলেও এই গানের প্রচলন রয়েছে।

ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী
ঘুম দিয়া যাইঅ
পাকনা কাঁডল ভাইঙ্গা দিলে
দৌরঅ বইয়া খাইঅ।
দোর গেছে গা ভাইঙ্গা
খোলঅ বইয়া খাইঅ
খাল গেছে গা হুকাইয়া
মাছঅ বইয়া খাইঅ।
মাছ নিছে চিলঅ
চিল বইছ ডালঅ
ডাল ভাইঙ্গা পড়ছে।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল

১. মহাজনী : গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার নয়নবাজার থেকে নরসিংদী অঞ্চল মহাজনী গানের উৎপত্তি।
২. দেহতত্ত্ব : বেলাব উপজেলার হোসেননগর ও বারৈচা গ্রাম।
৩. প্রেম সঙ্গীত : নরসিংদী জেলার সর্বত্র।
৪. মেয়েলি গীত : শিবপুর উপজেলা।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা

বাউল গান: মৃত রামদাস বাউল নরসিংদী জেলায় প্রথম বাউল সঙ্গীতের স্রষ্টা।

দেহতত্ত্ব গানঃ মৃত কুদ্দুস মাস্টার নরসিংদী এলাকায় দেহতত্ত্ব গানের স্রষ্টা। মৃত মোহাম্মদ আক্কেল আলী দেহতত্ত্বের গান গাইত। ত্রিশ বছর তিনি নিয়মিত গান গেয়েছেন। অন্যান্য গানের স্রষ্টার নাম জানা যায়নি।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের তালিকা

কিস্‌সার গান: বেলাব উপজেলার পুঁটিমারা গ্রামে মৃত আমজাদ আলী মেম্বারের দল, দড়িকান্দির মৃত শাহাবুদ্দীনের দল পাকিস্তান আমল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

পুঁথি গান: বেলাব উপজেলার দড়িকান্দি গ্রামের মৃত শমসের আলী প্রধানের দল।

সামষ্টিক গানের তালিকা

মেয়েলি গীত

একক গানের তালিকা

মহাজনী গান, মারেফতি, মুর্শিদি, দেহতত্ত্বগান, প্রেম-সঙ্গীত, বিরহ বিচ্ছেদ, ঘুমপাড়ানি গান।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা

দেহতত্ত্ব গান, মারেফতি, মুর্শিদি গান।

বিপন্ন গানের তালিকা

মহাজনী, প্রেম-সঙ্গীত, বিরহ বিচ্ছেদ।

দেহতত্ত্বের গান

লুপ্তগানের তালিকা

ফকিরি গান, মেয়েলী গীত, ঘুমপাড়ানি গীত, কিস্‌সার গীত, পুঁথি গান, বাউল গান।

সনাক্তকৃত লোকবাদ্যের তালিকা

একতারা, মন্দিরা, বাঁশি, বেহালা, ঢোল, হারমোনিয়াম, তবলা। স্থানীয় লোকশিল্পীদের দিয়ে দেশীয় উপকরণে বাদ্যযন্ত্রগুলো তৈরি করা হয়।

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা

গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীরাই এসব লোকসঙ্গীতের মালিক।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যমান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান

বেলাব উপজেলার দড়িকান্দি গ্রামের মো. মইদর গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে ১০০ থেকে ২০০ টাকা সম্মানী পেয়েছেন। সাত বছর ধরে তিনি গান করেন না। হোসেনেনগরের মোসাম্মৎ জোহরা তাঁর বাবা মৃত আক্কেল আলীর ও কুদ্দুস মাস্টারের গান গেয়ে একেকটা আসরে এক থেকে দুই হাজার টাকা আয় করতেন। তিনি কুদ্দুস মাস্টারের রচিত ৪৭০টা গান গেয়েছেন এ পর্যন্ত। স্বামীর নিষেধাজ্ঞার কারণে এগার বছর যাবৎ কোন আসরে গান পরিবেশন করেন না। তবে সামগ্রিকভাবে মূল্যমান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

সুপারিশমালা

১. **সংগ্রহ সম্পর্কিত:** নরসিংদী এলাকার লোকসঙ্গীতগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেগুলো বিদ্যমান রয়েছে তা অডিও ও ভিডিওতে ধারণ করে সংগ্রহ করা দরকার। দরিদ্রতার কারণে অনেক লোকশিল্পী লোক বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে পারছেন না। লোকবাদ্যযন্ত্র সংগ্রহে তাদের আর্থিক সহযোগিতা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. **সংরক্ষণ সংক্রান্ত:** স্থানীয়ভাবে লোকসঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে সেই একাডেমীর তত্ত্বাবধানে ভিডিও ও অডিওর মাধ্যমে লোকশিল্পীদের সঙ্গীত, আলোকচিত্র ও জীবনী সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ নেওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

৩. **উপস্থাপন:** পহেলা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস, গ্রামীণ উৎসব ও আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা দিবসে লোকসঙ্গীতগুলো পরিবেশন করা যেতে পারে। এতে নতুন প্রজন্ম তার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৪. **মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত:** লোকশিল্পীদের সাধনার ফসল এই লোকসঙ্গীত। এই লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্ব যাতে সব লোকসঙ্গীত শিল্পী ভোগ করতে পারেন এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

উপসংহার

নরসিংদী জেলার লোকসঙ্গীতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেগুলো বিপন্ন ও লুপ্ত হয়েছে সেগুলো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. East Pakistan District Gazetteers, Dacca 1969, p. 476.
২. নরসিংদী গাজীপুরের লোক ঐতিহ্য বিবাহ ও মেয়েলি ছড়া গীত, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, পৃ. ৯।
৩. বিক্রমপুরের ইতিহাস, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃ. ২০৪-২০৫।
৪. নরসিংদী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (অপ্রকাশিত), মুহম্মদ ইমামউদ্দিন।
৫. লোকসাহিত্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহর ভূমিকা সম্বলিত আশরাফ সিদ্দিকী প্রণীত, প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ৪৭৭।
৬. বাংলাদেশের লোকসাহিত্য, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, রচনা মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দীন, পৃ. ৪৮০।
৭. বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত, রচনা মোবারক হোসেন খান, পৃ. ১০৯।
৮. বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, রচনা মুহম্মদ মুনসুরউদ্দীন, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫।
৯. বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত, রচনা মোবারক হোসেন, পৃ. ১১৫।
১০. বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৪৫।

সাক্ষাৎকার

১. মো. মইদর, লোকসঙ্গীত শিল্পী, বেলাব উপজেলা
২. আব্দুল হক, লোকসঙ্গীত শিল্পী, বেলাব উপজেলা
৩. খোরশেদ মিয়া, লোকসঙ্গীত শিল্পী, বেলাব উপজেলা
৪. আইনুদ্দীন, লোকসঙ্গীত শিল্পী, বেলাব উপজেলা
৫. মরিয়ম, মেয়েলী গীতের শিল্পী, পলাশ উপজেলা
৬. নূরজাহান বেগম, মেয়েলী গীত, বেলাব উপজেলা
৭. ফরিদা ইয়াসমিন, রায়পুরা উপজেলা
৮. রুসেনা, লোকসঙ্গীত শিল্পী, বেলাব উপজেলা
৯. হানিফ পাঠান, লোক সাহিত্য গবেষক, বেলাব উপজেলা
১০. মোসাম্মৎ জোহরা, লোকশিল্পী, বেলাব উপজেলা
১১. শাহিদা বেগম, মেয়েলী গীতের শিল্পী, বেলাব উপজেলা
১২. হেনা বেগম, মেয়েলী গীতের শিল্পী, বেলাব উপজেলা
১৩. রাবিয়া খাতুন, মেয়েলী গীতের শিল্পী, বেলাব উপজেলা
১৪. তমিজা, মেয়েলী গীতের শিল্পী, বেলাব উপজেলা

www.pathagar.com

৪.৪ ফরিদপুর অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

তপন বাগচী

ভূমিকা: দেশের অন্যান্য জেলার মতো ফরিদপুর অঞ্চলেও রয়েছে লোকসঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন। কোনো কোনো লোকসঙ্গীতের উৎস ও উৎপত্তিস্থল হিসেবে, কিংবা লোকসংগীতের প্রচলন-অঞ্চল হিসেবে এবং খ্যাতিমান লোকসঙ্গীত শিল্পীর জন্মস্থান হিসেবে এই অঞ্চলের তাৎপর্য রয়েছে। বাংলাদেশে যত রকমের লোকসঙ্গীত প্রচলন রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল আঙ্গিকের উপস্থিতি এই অঞ্চলে দেখা যায়। ভৌগোলিক কারণে এটি দেশের ঠিক মধ্যখানে হওয়ায় সকল অঞ্চলের সঙ্গে অধিকতর নৈকট্যলাভের সুযোগ পেয়েছে। ফলে গ্রহণ ও আত্তীকরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে এই অঞ্চলের নিজস্ব লোকসঙ্গীতের ধারা।

জেলা (বৃহত্তর) পরিচিতি: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দক্ষিণে রয়েছে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা। এই জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৬ ফুট উঁচুতে অবস্থান করছে। ফরিদপুর জেলার আয়তন ৭,০৮৪ বর্গ কিলোমিটার বা ২,৬৯৪ বর্গমাইল। এর মধ্যে ১৫৬ বর্গকিলোমিটার বা ৬০ বর্গমাইল নদী এলাকা। আয়তনের বিচারে এটি বৃহত্তর জেলার মধ্যে ৯ম জেলা।

ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশ গঠিত হয়েছে পদ্মাবাহিত পলল ভূমি দ্বারা। আর দক্ষিণাংশ গঠিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ হিসেবে। ফরিদপুরের দক্ষিণাংশ একসময় চন্দ্রদ্বীপের আওতায় ছিল। তাই বালুমাটি ও পলিমাটির সংমিশ্রণ রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল এখনো বিল বা জলাভূমি হিসেবে রয়ে গেছে। এসময় যে এই এলাকা জঙ্গল ছিল, মাটির গভীরে কালো মাটি দেখে তা অনুমান করা যায়।

ফতেহ আলীর নামে এক ব্যক্তি জলাজঙ্গলের এলাকাকে বাসযোগ্য করে তোলেন বলে এর নাম হয় ফতেহাবাদ। ত্রয়োদশ শতকে শাহফরিদ উদ্দিন বা শেখ ফরিদউদ্দিন বর্তমান কালেক্টরেট ভবনের পার্শ্বে তার চিল্লাখানা স্থাপন করেন। তার নামেই শহরের নামে ফরিদপুর হয়। আকবরের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্য যে ১৯টি সরবকারে বিভক্ত করা হয়, তার একটি হচ্ছে ফতেহাবাদ। নবাব মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। এর মধ্যে ভূষণা চাকলার বড় অংশই হচ্ছে ফরিদপুর। ১৭৬৫ সালে ফরিদপুরকে শাসক কোম্পানির রাজস্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ১৭৮৬ সালে বিভিন্ন কালেক্টরের এলাকা অনুসারে জেলা সৃষ্টি হওয়ার সময়ে বর্তমান ঢাকা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ স্থান ঢাকা জালালপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার বৃহদংশ ছিল ঢাকা কালেক্টরেটের অংশ। ১৭৯৩ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা (বর্তমান রাজবাড়ী) ও গোপালগঞ্জ মহকুমার অংশ যশোরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফরিদপুরের বাকি অংশ থাকে ঢাকা জালালপুর জেলার অন্তর্গত হয়। ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ নিয়ে গঠিত এ জেলার সদর অবস্থিত ছিল ঢাকায়। ফরিদপুরে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা স্থাপিত হয় ১৮১১ সালে। ১৮৩৩ সালের পরে এক সময় 'ঢাকা জালালপুর' 'ফরিদপুর' জেলা নামে পরিবর্তিত হয়। ১৮৫৬ সালে ফরিদপুর থেকে মানিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানা ঢাকা জেলার মধ্যে দেয়া হয়। ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা (বর্তমান রাজবাড়ী জেলা) গঠিত হয় ও ১৮৭৩ সালে মাদারীপুর মহকুমা ফরিদপুর জেলায় হস্তান্তরিত হয়। গোয়ালন্দ মহকুমা গঠনের সময় পাবনা জেলা থেকে পাংশা ও বালিয়াকান্দিকে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একসময় ফরিদপুর সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয় মধুমতির পূর্বতীরের যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার আলফাডাঙ্গা থানা এবং মাগুরা মহকুমার মুহাম্মদপুর থানার বানা, পঞ্চরিয়া, গুনবাহা ও ময়না ইউনিয়ন। ১৯৮৪ সালে ফরিদপুর জেলা ভেঙে ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী ও শরীয়তপুর নামে পাঁচটি জেলা পুনর্গঠিত হয়।

www.pathagar.com

আদিবাসী নৃগোষ্ঠী বাদে বাংলাদেশের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে ভিন্নতা খুঁজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী 'বাঙ' থেকে চণ্ডাল ও নিষাদ বা পুণ্ড্র নামে এক অনার্যজাতি আর্যাধিকারের পূর্ববঙ্গের চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী ছিল। এদের অধঃস্তন পুরুষ হচ্ছে বর্তমানকালের নমঃশূদ্র সমাজ। পুণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও নমশূদ্রকে আদিম জাতির অন্তর্ভুক্ত বলেও মনে করা হয়। ফরিদপুরের মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় এদের বসবাস বেশি লক্ষ করা যায়। কৃষিজীবী এই জনগোষ্ঠীর অবদানে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধ হয়েছে। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীই এ জেলায় জঙ্গল কেটে প্রথমে বাসযোগ্য করে তোলে। ধীরে ধীরে তারা কৃষিসভ্যতার পত্তন করে। বিলাঞ্চল হওয়া এরা জেলে না হয়ে মাছ ধরাকেও জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। এই নিবন্ধকার সম্পাদিত আনন্দনাথ রায়ের 'ফরিদপুরের ইতিহাস' (গতিধারা, ঢাকা, ২০০৭) গ্রন্থে দেখা যায় যে ফরিদপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ে ৭২টি শ্রেণীবিভাগ ছিল। এরা হলো-'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, ছত্রী, গন্ধবণিক, কামার, কুমার, আগরওয়ালা, আগুরি, তাম্বুলী, সদগোপ, শূদ্র, কুরমী, তিলি, মালী, কাঁশারি, শাঁখারী, নাপিত, বৈষ্ণব, বারই, কৈবর্ত, গাররী, মাদক, গোপ বা গয়লা, সুবর্ণ বণিক, সেকরা, সূত্রধর, সাহা, পাইটাটী, কলু, তাঁতি, জুগী, চুনারী, পাইটাল, জেরে, কাড়াল, কারশী, মাল, মাজি, পোদ, টীয়র, পূবর, বাইয়তী, বেহারা, ধনুক, বাগদী, পাটনী, কোয়রী, চাষা, ধোপা, কাচুরী, নমঃশূদ্র, কাপালী, বাউতি, কাহার, মুচি, পালী, বিন্দু, চেল, ডোম, দোসাদ, কারাঙ্গী, আদারিয়ার, রাজবংশী, মাল, মালো, হাড়ী, কাওলী, ভূঁইমালী, মিহাটার, বুনা ও নর বা নট্ট।'

ড. মাসুদ রেজার গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যেও মিয়া, মোল্লা, মুন্সি, শেখ, পোদ্দার, জোদ্দার, খাঁ, খান, হাওলাদার, পাঠাদার, কাজি, জোলা, কুলু, কারিকর, মণ্ডল, খলিফা, মাঝি, বয়াতি, মীর, মৌলভী, ফকির, বিশ্বাস, সৈয়দ, চৌধুরী, খন্দকার, গাজি, লস্কর, মল্লিক, সরকার, খালাশি, মজুমদার, দেওয়ান, মির্জা, তালুকদার, আকন, ভূঁইয়া, সিরাজী, চাকলাদার, শিকদার, মৃধা, সরদার, পরামানিক, দারিয়া, ধাপুর, আকন্দ, বেপারি, চোকদার, খয়রাতি, জমাদার, মোড়ল, মাতুব্বর, কোতয়াল, মালত, পাশা, ঢালী, বাগদী, কাহার মিস্ত্রি, ফরাজি ও কাদিয়া প্রভৃতি পদবির প্রচলিত রয়েছে।

বিয়ের গান

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা

১. **কবিগান:** কবিগান হলো ছন্দ ও সুরে সুরে যুক্তি ও জ্ঞানের লড়াই। কবিগানকে 'কবির লড়াই' নামেও পরিচয় দেয়া হয়। মূলত দুইজন কবি ও তাঁদের একাধিক সহযোগী এই লড়াইয়ে অংশ নেয়। কবিগানের মূল শিল্পীকে সরকার বা কবিয়াল বলা হয়। তাৎক্ষণিক গান বেঁধে রচনার মাধ্যমে কবিয়ালের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়।

২. **জারিগান:** কারবালার বিয়োগান্ত কাহিনীর বিবরণধর্মী গানই জারিগান। ফরিদপুরের পশ্চিমে যশোর অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ফরিদপুর অঞ্চলে এখনো জারিগানের আসর বসে। মূলত ইসলামি বীরত্বগাথা এবং শোকের মর্মবেদনা প্রকাশ করা হয়। কারবালার ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য জারিপালা। জারিগানের শিল্পীদের জারিয়াল কিংবা বয়াতী বলা হয়। বয়াতীদের সঙ্গে চারপাঁচজন দোহার ও যন্ত্রী থাকে। জারিগানে পূর্বরচিত পালা পরিবেশিত হয়। কখনো কখনো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ বয়াতীদের মধ্যে পাল্লা দেয়া হয়।

৩. **ধুয়াগান:** কবিগান ও জারি গানে ব্যবহৃত বিশেষ আঙ্গিকের গান। টানা সুরে গাওয়া হয় এবং সঞ্চারির মতো একটি চরণ বারবার গীত হয়। মূলত দোহাররাই একই অংশ সমবেতসুরে গেয়ে থাকে।

৪. **হালোই গান:** হালোই গান মূলত বাস্তপূজার গান। পৌষ-সংস্কৃতিতে হালোই গান গীতি হয়। গায়কেরা বড়ো বড়ো লাঠির আঘাতে তাল ঠুকে ঠুকে কিংবা বাদ্যযন্ত্রসহকারেও এই সমবেত গান পরিবেশন করে থাকে। মূল গায়েন একটি দীর্ঘ গান গাইতে থাকে, তার একটি পর্ব পরে পরে অনুগামী শিল্পীরা 'হালুই', 'হালুই' শব্দ সুর করে গায়।

৫. **পটের গান:** কাপড়ে বা কাগজের পটে বিভিন্ন ছবি এঁকে একটি শক্ত লাঠিতে পেঁচিয়ে রাখা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির কয়েকদিন আগের থেকে কিশোর কিশোরীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পটে যেসব ছবি আঁকা থাকে

নববর্ষের লোকগান

www.pathagar.com

আবদুল হালিম বয়াতি

তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে মাগুন তোলে। মাগুন হিসেবে পাওয়া চাল-ডাল-তরকারি-টাকা দিয়ে পরে বনভাত (বনভোজন) খাওয়া হয়।

৬. **সারিগান:** সারিগান একধরনের কর্মসঙ্গীত। সাধারণত বাইচের নৌকায়, ধানকাটার সময় এবং ছাদ পেটানোর সময় এই গান গাওয়া হয়। সারিবদ্ধভাবে বসে গাওয়া হয় বলে একে সারিগান বলা হয়।

৭. **গাজির গান:** গাজি-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী নিয়ে আবর্তিত হয় গাজীর গান বা গাজীর পালা। এটি একধরনের নাট্যসঙ্গীত। গাজির গানের উৎপত্তি ফরিদপুর অঞ্চলে।

৮. **মানিক পীরের গান:** মানিক পীরের কাহিনী নিয়ে রচিত গীতিনাট্য মানিক পীরের গান নামে পরিচিত। এটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল খুলনা থেকে বাহিত হয়ে এই অঞ্চলে এসেছে বলে ধারণা করা হয়।

৯. **জাগরণের গান:** কালীদেবীর উদ্দেশ্যে সধবা নারীদের মনোবাসনা পূরণের জন্য সারা রাত জেগে যে গান পরিবেশন করে সেটাই জাগরণ গান। এটি জাগের গান নামেও পরিচিত।

১০. **মুর্শিদি গান:** হিন্দুরা যেমন গুরু মানে, মুসলিমরা তেমনি পীর বা মুর্শিদ মানে। এই মুর্শিদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান হলো মুর্শিদি গান।

১১. **বিচারগান:** মারেফাত-শরিয়ত, সৃষ্টিতত্ত্ব, কামপ্রেম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গানে-গানে আলোচনা ও যুক্তির পাল্লা দেয়ার মাধ্যমে বিচারগানের জন্ম। এই গানের সুর বাউল গানের মতো। বিচার গানে তত্ত্বকথা বেশি থাকে।

১২. **ভাবগান:** ভাবগান হচ্ছে ভাবের গান। বিচার গানের মতো প্রতিযোগিতা এতে থাকে না। তবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর আত্মনিবেদনই এই গানের মূল উদ্দেশ্য।

১৩. **নামকীর্তন গান:** 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ; কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম; রাম রাম হরে হরে' কেবল এই অংশটুকুই বিভিন্ন সুরে তালে রাগে বিরতিহীনভাবে গাওয়া হয়। একজন মূল কীর্তনিয়া থাকলেও এটি সমবেত সঙ্গীত। তিন থেকে পাঁচটি দল বা সম্প্রদায় পালাকারে অষ্টপ্রহর (১ দিনরাত), ষোল প্রহর, চব্বিশ প্রহর এমনকি বাহাত্তর প্রহরও নামকীর্তন পরিবেশন করে।

১৪. **পদাবলী কীর্তন পালা:** মধ্যযুগে সৃষ্ট কীর্তনগান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে নতুন রূপ পায়। এটি হয়ে তাঁর ধর্মান্দোলনের মাধ্যম। গৌড় অঞ্চলে প্রচলন বলে একে গৌড়ীয়কীর্তনও বলা হয়। এতে ছোট ছোট কাহিনীকে 'পালা' থাকে বলে 'পালাকীর্তন'ও বলা হয়।

১৫. **যাত্রাগান:** শুরুতে তীর্থ কিংবা উৎসবে গমনপথে গীতবাদ্যাদি পরিবেশিত হতো। পরে এটি একাধিক পাত্রপাত্রীর ধারাবাহিক গীত পরিবেশনায় রূপ লাভ করে। আস্তে আস্তে এতে গানের বদলে সংলাপ ও কাহিনী যুক্ত হয়। একসময় অভিনয় মাধ্যম হিসেবে বাড়ির আঙিনা থেকে এটি বাঁধা মঞ্চে উঠে আসে। যাত্রা এক ধরনের দলীয় পরিবেশনা।

www.pathagar.com

লালন সঙ্গীত পরিবেশনরত শিশু শিল্পী

১৬. **বারোমাসি গান:** বছরের বারোটি মাসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এই গান গাওয়া হয়। এটি মূলত স্বামী বিরহে কাতর রমণীর মনের কথা ব্যক্ত হয়। তবে নারীর বেদনা প্রকাশিত হলেও পুরুষের কণ্ঠে এই গান গীত হয়।

১৭. **ফকিরি গান:** এই গানে ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বাউল গানের সঙ্গে এর সাযুজ্য রয়েছে।

১৮. **গার্শির গান:** 'আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়/ যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়'। এই ব্রত নিয়ে আশ্বিন-সংক্রান্তি রাতে গানবাজনার মাধ্যমে কাটানো হয়। এই রাতকে বলা হয় গার্শির রাত। এই রাতে পরিবেশিত গানকে গার্শির গান বলে।

১৯. **হ্যাঁচড়া পূজারগান:** ফাল্গুন মাসের শেষ ৩ দিন হ্যাঁচড়া পূজার নির্দিষ্ট বেদীস্থলে হিন্দু কুমারীদের কণ্ঠে হ্যাঁচড়া গান শোনা যায়। গানের বিষয় হলো, হিন্দু কুমারীর শিবের মতো বর বা স্বামী প্রার্থনা।

২০. **ত্রিনাথের গান:** ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রশস্তিমূলক কাহিনী বর্ণনা শেষে যে সকল গান পরিবেশন করা হয় তাকে ত্রিনাথের গান নামে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত গোয়ালের গোরু প্রথম বাচ্চার জন্ম দেয়ার পরে তাঁর শাল দুধ কয়েকদিন জমিয়ে দই বানানো হয় এবং পাড়াপ্রতিবেশীকে ডেকে দই খাইয়ে তারপর গৃহস্থ নিজেরা খায়। এই উপলক্ষে যে মিলনমেলা হয়, তাকে ত্রিনাথের মেলা বলা হয়। উঠোনে গাছের ডাল পুতে সামনে বসে একজন ত্রিনাথের গল্প বলে। তারপর সবই মিলে গান গায়। এই অনুষ্ঠানে সিদ্ধি খাওয়ারও প্রচলন রয়েছে।

২১. **মতুয়া সঙ্গীত:** ভাবে মাতোয়ারা হয়ে হরিনাম কীর্তন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের স্তুতিমূলক সঙ্গীতকে হরিসঙ্গীত বলা হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারীদের মতুয়া বলা হয়। এই মতুয়াদের সাধনসঙ্গীতই মতুয়া সঙ্গীত নামে প্রচলিত। মূলত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরাই মতুয়াসঙ্গীত পরিবেশন ও উপভোগ করে।

www.pathagar.com

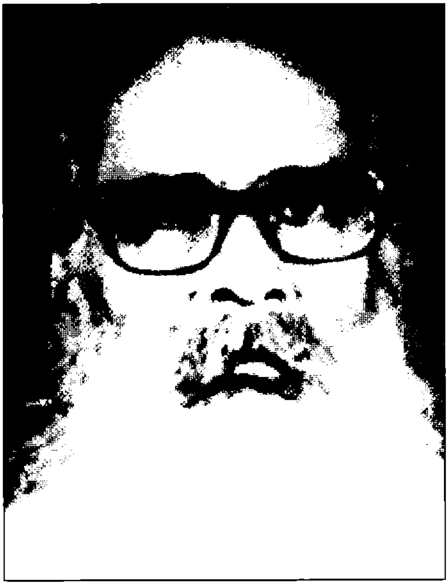

আবদুর রহমান

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল

১. কবিগান: যশোর অঞ্চলে
২. জারিগান: যশোর অঞ্চলে
৩. ধুয়াগান: ফরিদপুর অঞ্চলে
৪. হালোই গান: গোপালগঞ্জ অঞ্চলে
৫. পটের গান: ফরিদপুর অঞ্চলে
৬. সারিগান: ফরিদপুর অঞ্চলে
৭. গাজির গান: ফরিদপুর অঞ্চলে
৮. মানিক পীরের গান: ফরিদপুর অঞ্চলে
৯. জাগরণের গান: শরিয়তপুর অঞ্চলে
১০. মুর্শিদি গান: ফরিদপুর অঞ্চলে
১১. বিচারগান: মাদারীপুর অঞ্চলে
১২. ভাবগান: ফরিদপুর অঞ্চলে
১৩. নামকীর্তন গান: মাদারীপুর অঞ্চলে
১৪. পদাবলী কীর্তন পালা: ফরিদপুর অঞ্চলে
১৫. যাত্রাগান: শরিয়তপুর অঞ্চলে
১৬. বারোমাসি গান: ফরিদপুর অঞ্চলে
১৭. ফকিরি গান: ফরিদপুর অঞ্চলে
১৮. গার্শির গান: মাদারীপুর অঞ্চলে
১৯. হ্যাঁচড়া পূজারগান: শরিয়তপুর অঞ্চলে
২০. ত্রিনাথের গান: শরিয়তপুর অঞ্চলে
২১. মতুয়া সঙ্গীত: গোপালগঞ্জ অঞ্চলে

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতিস্থল বা ব্যবহার এলাকা

১. জারিগান: ফরিদপুর, যশোর ও বরিশাল অঞ্চলে
২. কবিগান: ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে
৩. ধুয়াগান: ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে
৪. হালোই গান: গোপালগঞ্জ ও যশোর অঞ্চলে
৫. পটের গান: ফরিদপুর, বাগের হাট, সাতক্ষীরা, মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে
৬. সারিগান: ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে
৭. গাজির গান: ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা অঞ্চলে
৮. মানিক পীরের গান: ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলে
৯. জাগরণের গান: শরিয়তপুর, নড়াইল ও যশোর অঞ্চলে
১০. মুর্শিদি গান: ফরিদপুর-সহ সমগ্র বাংলাদেশ অঞ্চলে
১১. বিচারগান: মাদারীপুর, ফরিদপুর-সহ সমগ্র বাংলাদেশ অঞ্চলে
১২. ভাবগান: মাদারীপুর, ফরিদপুর-সহ সমগ্র বাংলাদেশ অঞ্চলে
১৩. নামকীর্তন গান: মাদারীপুর, ফরিদপুর-সহ সমগ্র বাংলাদেশ অঞ্চলে
১৪. পদাবলী কীর্তন পালা: মাদারীপুর, ফরিদপুর-সহ সমগ্র বাংলাদেশ অঞ্চলে

www.pathagar.com

১৫. যাত্রাগান: বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল
১৬. বারোমাসি গান: ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ-সহ সকল ভাটি অঞ্চলে
১৭. ফকিরি গান: ফরিদপুর, কুষ্টিয়া অঞ্চলে
১৮. গার্শির গান: ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে
১৯. হ্যাঁচড়া পূজারগান: ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে
২০. ত্রিনাথের গান: ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে
২১. মতুয়া সঙ্গীত: ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, খুলনা, চব্বিশপরগনা অঞ্চলে

আয়নাল মিয়া

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা

১. জারিগান: মঙ্গল বয়াতি, গনি বয়াতি, মেঘু বয়াতি, কফিলউদ্দিন বয়াতি, সাকিম আলী বয়াতি, জালালউদ্দিন বয়াতি
২. কবিগান: নিশিকান্ত সরকার, কালিপদ সরকার, অসীম সরকার, চিত্ত সরকার, মনোহর সরকার, নিখিল সরকার, বিনয় সরকার প্রমুখ
৩. ধুয়াগান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
৪. হালোই গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
৫. পটের গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
৬. সারিগান: জয়নাল তালুকদার (মাদারীপুর) প্রমুখ
৭. গাজির গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
৮. মানিক পীরের গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
৯. জাগরণের গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
১০. মুর্শিদি গান: জসীম উদদীন, ওয়াজেদ আলী, মহিন শাহ, মেছের শাহ প্রমুখ
১১. বিচারগান: আবদুল হালিম বয়াতি, কাইমুদ্দিন বয়াতি, হান্নান বয়াতি
১২. ভাবগান: আকম বয়াতি, জৈনুদ্দিন বয়াতি
১৩. নামকীর্তন গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
১৪. পদাবলী কীর্তন পালা: একক কোনো স্রষ্টা নেই
১৫. যাত্রাগান: পালাকার মনোরঞ্জন বিশ্বাস, চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ
১৬. বারোমাসি গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
১৭. ফকিরি গান: সানাল চাঁদ, গহের শাহ প্রমুখ
১৮. গার্শির গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
১৯. হ্যাঁচড়া পূজারগান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
২০. ত্রিনাথের গান: একক কোনো স্রষ্টা নেই
২১. মতুয়া সঙ্গীত: তারক সরকার, বিজয় সরকার, প্রফুল্ল গোঁসাই, অশ্বিনী গোঁসাই প্রমুখ

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকা

ফরিদপুর

মেছের শাহ
গনি বয়াতী
ব্রজানন্দ গোস্বামী
ওয়াজেদ আলী
মেহের চাঁন্দ
সাধু শিকদার
মঙ্গল সাধু
মঙ্গল বয়াতী
মহিন সাঁই
কুটি সিকদার
করিম বয়াতী
আবদুর রহমান চিশতী
পাপিয়া পারভীন
রিজিয়া পারভীন
সোনিয়া গাজী
পাগলা বাবুল
তিনু শাহ
খোসালচাঁদ
পাঁচু ফকির
নৈমদ্দিন ফকির
গহের শাহ
কিতাব্দী শাহ
কমিরুদ্দিন
ছৈজদ্দিন ফকির
মুন্সি বাছের
যোগেশ সরকার
সানাল চাঁদ
সাগর শাহ
সমীর চাঁদ
নবাব চাঁদ
কালা চাঁদ
কুণ্ডু দাস
পাইলন ফকির
ফটিক গোঁসাই
আহম্মদ ফকির
ডাক্তার হানিফা
আনেচ ফকির
সতীশ গুহ
কমলা বিবি
জসীমউদ্দিন
ফেলা শাহ
হাসমত চাঁদ
মোস্তাক ফকির
আজিম শাহ
আমিনুদ্দিন মোড়ল

রাজবাড়ী

কাঙালিনী সুফিয়া
শেখম আলী
ইসমাইল সরকার
মাতাম শাহ
মেঘু বয়াতী
আবদুর রহিম বয়াতী
রহমত আলী বয়াতী
রবীন্দ্রনাথ সরকার
মীর আসমত আলী
দেবেন ক্ষ্যাপা

মাদারীপুর

সৈয়দ আলাওল
নিত্যানন্দ বাড়ৈ
নবকুমার বৈদ্য
অঞ্জু বিশ্বাস
ঝর্না সরকার
শেফালী সরকার
অনিল বিশ্বাস
অনিলবরণ কীর্ত্তনীয়া
কফিলউদ্দিন বয়াতী
কাইমুদ্দিন বয়াতী
সাকিমালী বয়াতী
আবদুল হালিম বয়াতী
জৈনুদ্দিন বয়াতী
শামসুল হক বয়াতী
ওমর আলী বয়াতী
হেমায়েত হোসেন
মোতাহার বয়াতী
আবদুল খালেক বয়াতী
ইদ্রিস আলী বয়াতী
তোতামিয়া বয়াতী
ধীরেন্দ্রনাথ বয়াতী
দলিলউদ্দিন
মঙ্গল সরকার
শরৎ তালুকদার
মৃত্যুঞ্জয় বাড়ৈ
রাধিকারঞ্জন তালুকদার
জগদীশ তালুকদার
নকুল সরকার
আনন্দ তারুকদার
ঝড়ু বয়াতী
মতিলাল সরকার
শিরীষ মণ্ডল
বেলায়েত হোসেন বয়াতী
লাকী সরকার
দেলোয়ার হোসেন বয়াতী
মোহাম্মদ হালিম
বাবুল সরকার
লিয়াকত আলী সরকার
আবদুর রশিদ বয়াতী
হারুনর রশীদ বয়াতী
বৃষ্টি আক্তার
জয়নাল তালুকদার
মনোহর ঠাকুর
রঘুনাথ সরকার
প্রশান্ত সরকার

গোপালগঞ্জ

চণ্ডী গোঁসাই
শের আলী ফকির
অনিল দে
নিখিল সরকার
স্বপন সরকার
সুরেন সরকার
সুরেশ সরকার
সঞ্জয় সরকার
শশী সরকার
চিত্ত সরকার
সুকণ্ঠ গাইন
বিনয় সরকার
ছোট রাজেন সরকার
নিশিকান্ত সরকার
মনোহর সরকার
কালিপদ সরকার
নকুল দত্ত
অসীম সরকার
গৌতম সরকার
অম্বিকাচরণ সরকার
মনোরঞ্জন সরকার
নারায়ণ বালা সরকার
কে.এম. চান মিয়া
বীরেন্দ্রনাথ বালা
মনোজ মধু
সুনীল রাজবংশী
শেফালী বিশ্বাস
যুগল ঠাকুর
অসিত বিশ্বাস
মনোতোষ বিশ্বাস
নিতাই বৈদ্য
রামপ্রসাদ রায়
মাখনলাল অধিকারী
মহেন্দ্রনাথ সরকার
সন্ধ্যারানী বিশ্বাস
কার্তিক গোঁসাই
ফটিক গোঁসাই
ক্ষিতীশ গোঁসাই
মাতামচাঁদ গোঁসাই
শুকচাঁদ সরকার

শরীয়তপুর

কাসেম মোলা
মমিন আলী সরকার
জামাল দেওয়ান
আবদুল হাই বয়াতী
মমিন আলী সরকার
কলোম মোলা
হাফিজ বয়াতী
সাদেক বয়াতী
বাসুদেব ভক্ত
মিসির আলী
কোব্বাদ বয়াতী
লিয়াকত আলী সরকার

www.pathagar.com

খোরশেদ
ইয়াছিন ফকির
শেখ দবিরউদ্দিন
দেওয়ান মোহন
নাসির মাহ
ফোরকান খাঁ
জলুর মাহ
মান্দার ফকির
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (সরকার)
হরষিত ভট্টাচার্য (সরকার)
কুটি মুনসুর

লোকসঙ্গীতের দলের তালিকা

১.	জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান (যাত্রা)	ফরিদপুর
২.	নিউ বাসন্তী অপেরা	ফরিদপুর
৩.	রাজনীলা নাট্যসংস্থা	ফরিদপুর
৪.	আদি বলাকা অপেরা	ফরিদপুর
৫.	মধুছন্দা যাত্রা ইউনিট	ফরিদপুর
৬.	আদি বঙ্গশ্রী অপেরা	ফরিদপুর
৭.	রাজমণি অপেরা	ফরিদপুর
৮.	নিত্যানন্দ বাড়ের রামায়ণ দল	বাহাদুরপুর, মাদারীপুর
৯.	মঞ্জুশ্রী সম্প্রদায়	বাহাদুরপুর, মাদারীপুর
১০.	আনন্দ তালুকদারের ত্রিনাথের দল	বাহাদুরপুর, মাদারীপুর
১১.	পতিতপাবন সম্প্রদায়	বাহাদুরপুর, মাদারীপুর
১২.	আদি ঝর্না অপেরা	মাদারীপুর
১৩.	রত্নশ্রী অপেরা	মাদারীপুর
১৪.	নিউ সবুজ অপেরা	মাদারীপুর
১৫.	ভাইবোন সম্প্রদায়	রঘুনাথপুর, গোপালগঞ্জ
১৬.	দিপুশ্রী সম্প্রদায়	সাতপাড়, গোপালগঞ্জ
১৭.	দীপ্তি সম্প্রদায়	কাফুলাবাড়ি, গোপালগঞ্জ
১৮.	আনন্দময়ী সম্প্রদায়	রঘুনাথপুর, গোপালগঞ্জ
১৯.	যোগমায়া সম্প্রদায়	জহরেরকান্দি, গোপালগঞ্জ
২০.	সীমা সম্প্রদায়	সাতপাড়, গোপালগঞ্জ
২১.	নিত্যানন্দ সম্প্রদায়	ডোমরাশুর, গোপালগঞ্জ
২২.	শেফালী সম্প্রদায়	টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
২৩.	কল্পনা সম্প্রদায়	শেওড়াবাড়ি, গোপালগঞ্জ
২৪.	বিশ্ববন্ধু সম্প্রদায়	রঘুনাথপুর, গোপালগঞ্জ
২৫.	আদি ঠাকুর সম্প্রদায়	পাঁচুড়িয়া, গোপালগঞ্জ

www.pathagar.com

২৬. অনিল সম্প্রদায়	ঘোষেরচর, গোপালগঞ্জ
২৭. দুলালী সম্প্রদায়	কলাবাড়ি, গোপালগঞ্জ
২৮. সন্ধ্যারানী সম্প্রদায়	সিংগা, গোপালগঞ্জ
২৯. মায়া সম্প্রদায়	কলাবাড়ি, গোপালগঞ্জ
৩০. মহেন্দ্র সম্প্রদায়	কলাবাড়ি, গোপালগঞ্জ
৩১. সুকণ্ঠ গাইনের রামায়ণ দল	কলিগ্রাম, গোপালগঞ্জ
৩২. রায়কোম্পানি যাত্রাপার্টি	গোপালগঞ্জ
৩৩. দীপালি অপেরা	গোপালগঞ্জ
৩৪. নরনারায়ণ অপেরা	গোপালগঞ্জ
৩৫. বঙ্গবাণী অপেরা	গোপালগঞ্জ
৩৬. স্বর্ণকলি অপেরা	গোপালগঞ্জ
৩৭. অঞ্জলি অপেরা	গোপালগঞ্জ
৩৮. নিউ ফাল্গুনী নাট্যসংস্থা	গোপালগঞ্জ
৩৯. চন্দ্রা অপেরা	গোপালগঞ্জ
৪০. শঙ্কর অপেরা পার্টি	শরীয়তপুর
৪১. নবদ্বীপচন্দ্র সাহা যাত্রাপার্টি	শরীয়তপুর
৪২. অগ্রগামী নাট্যসংস্থা	রাজবাড়ী

সামষ্টিক সঙ্গীতের তালিকা

১. পালা গান, ২. জারিগান, ৩. কবিগান, ৪. যাত্রাগান, ৫. কীর্তনগান, ৬. সারিগান, ৭. হালোই গান, ৮. পটের গান, ৯. গাজির গান, ১০. মানিক পীরের গান, ১১. জাগরণ গান, ১২. ভাবগান, ১৩. বিচারগান, ১৪. ত্রিনাথের গান, ১৫. দোলপূজার গান, ১৬. অষ্টকগান, ১৭. বিয়ের গান, ১৮. মতুয়া সঙ্গীত ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা

১. রূপের খাঁচায় সোনার পাখি আসে আর যায়/ চোখ বুঁজিলে সকল মিথ্যা দিনদুনিয়া আঁধার হয়। (মহিন শাহ)
২. ও যার জ্ঞান হলো না মনে/ অজ্ঞান দেহ পশুর তুল্য ভজন করবে কেনে (মেছের শাহ)
৩. তুই তারে ধরবি কেমন করে/ বেদবিধির উপর বসে আছে সে/ সপ্ততালার পরে (চণ্ডী গোঁসাই)
৪. ও যেজন ভবনদীর ভাব জেনেছে/ তার কীসের ভয় আছে (ফটিক গোঁসাই)
৫. শোন বলি ও মন ভোলা, কেল তিনতাসের খেলা এসে ভবের হাটে (কফিলউদ্দিন বয়াতী)

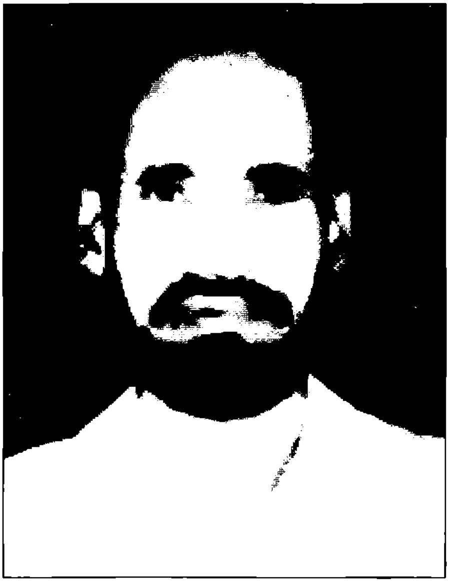

জলিল বয়াতি

www.pathagar.com

৬. আম তোমার ভাঙ্গা তরী/ তুমি আমার কর্ণধার/ যেদিকে ঘোরাও সেদিক ঘুরি/ মিছে নে দোষ আমার (আবদুল হালিম বয়াতী)
৭. তারে ধরতে হলে চোখের জলে একতারাতে বাঁধ ঘর (শের আলী ফকির)
৮. ঘুমাইয়া ছিলাম ছিলাম ভালো, জাইগা দেখি বেলা নাই/ কোন বা পথে চেতনগঞ্জে যাই। (কাঙালিনী সুফিয়া)
৯. তুমি আসিবে বলিয়া গিয়াছ চলিয়া/ ফিরিয়া বন্দু আমার আর তো এলো না (কুটি মনসুর)
১০. জীবননদীর জোয়ারেতে কুলকিনারা নাই/ অচিন দেশে নৌকাখানি কোন ঘাটে ভিড়াই (কে.এম. চান মিয়া)

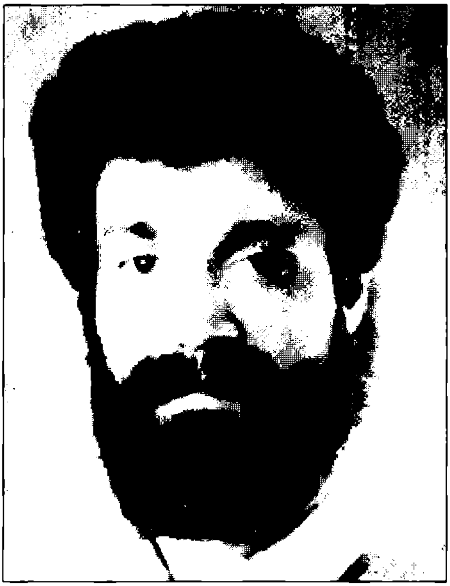

বাউল পাগলা বাবলু

লোকবাদ্য যন্ত্রের তালিকা

১. ঢোল, ২. ঢাক, ৩. জয়ডঙ্কা, ৪. খোল (মৃদঙ্গ), ৫. বাঁশি, ৬. ঘণ্টা, ৭. জুড়ি, ৮. প্রেমজুড়ি, ৯. চটা, ১০. দোতারা, ১১. একতারা, ১২. সারিন্দা, ১৩. শানাই, ১৪. বেহালা, ১৫. খোমক, ১৬. কাশি, ১৭. ডুগডুগি

মূল্যবান লোকসঙ্গীতের তালিকা

লোকসঙ্গীতের বেশ কিছু ধারা লুপ্ত হয়েছে এবং আরো কিছু বিলুপ্তির পথে। বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান কিছু লোকসঙ্গীত হলো: ১. কবিগান ২. কীর্তনগান ৩. জারিগান ৪. ভাব বা বিচার গান ৫. রামায়ণ গান ও ৬. যাত্রাগান ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান

প্রতিরাতে	সম্মানী	বছরে গড় কর্মদিন	মোট আয় (টাকা)
কবিগানের দল	৫০০০/০০	১০০	৫০০০০০/০০
যাত্রাদল	২০০০০/০০	১৮০	৩৬০০০০০/০০
কীর্তনদল	৫০০০/০০	১৮০	৯০০০০০/০০
রামায়ণ গানের দল	৩০০০/০০	২০০	৬০০০০০/০০

বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

১. বেদেনির গান, ২. শীতলাপূজার গান, ৩. ধুয়াগান, ৪. ঝুমুরগান, ৫. মনসার পাঁচালী, ৬. লক্ষ্মীর পাঁচালী, ৭. শনির পাঁচালী, ৮. সত্যনারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদি।

লুপ্তসঙ্গীতের তালিকা

১. হঁওলা গান, ২. হাবৈইড় গান, ৩. বারোমাসি গান প্রভৃতি

সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক

মেধাস্বত্বের মালিক রচয়িতা বা স্রষ্টা। কিন্তু লোকসঙ্গীতের প্রকৃত রচয়িতার হদিশ অনেক সময় পাওয়া যায় না। লোকসঙ্গীত লোকসমাজের সম্মিলিত সৃজনকর্ম। তাই উপস্থাপনকারী কিংবা পরিবেশনকারীকেই স্বত্বভোগের অধিকারী দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ সম্পর্কিত: সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশপ্রেমী, ঐতিহ্যচেতন ও পরিশ্রমী গবেষকদের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায় থেকে লোকসঙ্গীত করতে হবে লেখ্য ও ভিডিওগ্রাফি রূপে।

খ. সংরক্ষণ সম্পর্কিত: এর লেখ্য রূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যায়। সুর ধরে রাখার জন্য অডিও টেপ, ভিডিও টেপ এবং ডকুমেন্টারি তৈরি করে রাখা যায়।

গ. উপস্থাপন সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীতকে জাতীয় গণমাধ্যমে সম্প্রচার এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানে পরিবেশনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

ঘ. মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য সংসদীয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার: লোকমানসে জন্ম লোকসঙ্গীতের। তাই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এটি টিকে থাকে। তবে সময় ও পরিস্থিতির বদল হলে এর সুর বদলায়, ভাষা বদলায়, উপস্থাপনের ধরনও বদলায়। কিন্তু সেটিও কালের সাক্ষী। লোকসঙ্গীতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বাঙালি প্রাণের স্পর্শ। লোকসঙ্গীতের যে বিশাল রত্ন রয়েছে এই দেশে, তাকে যথাযথ উপস্থাপন করতে পারলে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

ব্যক্তিঋণ

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, সভাপতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, ঢাকা;
ড. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া;
কবি পরিতোষ হালদার, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মুকসুদপুর ডিগ্রি কলেজ, গোপালগঞ্জ;
কবি রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, দৈনিক সংবাদের জেলা বার্তা পরিবেশক, গোপালগঞ্জ;
এমএ আজিজ মিয়া, প্রাক্তন প্রফেসর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, শরিয়তপুর সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর;
বাবু মল্লিক, সম্পাদক, দৈনিক অনুসন্ধান, রাজবাড়ী;
তুষ্টচরণ বাগচী, বাহাদুরপুর, দত্তকেন্দুয়া, মাদারীপুর;
ইয়াকুব খান শিশির, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ, কালকিনি, মাদারীপুর;
সুবল বিশ্বাস, দৈনিক জনকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি, মাদারীপুর;
আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুশল, সাধারণ সম্পাদক, ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা, ফরিদপুর;
নির্মলেন্দু চক্রবর্তী শংকর, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক, ফরিদপুর;
ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ;
মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

গ্রন্থঋণ

আ.ন.ম আবদুস সোবহান, বৃহত্তর ফরিদপুর লেখক অভিধান, মুক্তবাংলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭
ড. আবুল আহসান চৌধুরী, মহিন শাহের পদাবলি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬
ড. মাসুদ রেজা, মেছের শাহের গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬
ড. তপন বাগচী, মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭
ড. তপন বাগচী (সম্পা.), আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭
ড. তপন বাগচী, বাংলাদেশের যাত্রাগান: জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭
বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার ফরিদপুর, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৭৭

www.pathagar.com

৫

বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীত

দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী

ভূমিকা: প্রাচীন *বঙ্গ* জনপদের অন্তর্গত *চন্দ্রদ্বীপ* মুসলিম শাসনামলের *বাকলা* পরবর্তী সময়ের *বাখরগঞ্জই* বর্তমান সময়ের বরিশাল বিভাগ। নাম ও সময়ভেদে এই অঞ্চলের বিস্তৃতি, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতির খুব একটা পরিবর্তন সাধিত হয়নি পূর্বের তুলনায়। নদীভাঙ্গন জলোচ্ছ্বাস-ঘূর্ণিঝড় হিংস্রজীবজন্তুর মোকাবেলা করেই এ অঞ্চলের মানুষ টিকে আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। রুদ্রপ্রকৃতিকে বসে আনার অনন্ত প্রচেষ্টা এই অঞ্চলের মানুষকে করেছে অসীম সাহসী, কর্মঠ। এরপরও এই সব মানুষের চওড়া বুকে রয়েছে অফুরান গান।

রামায়ণের জনকঋষির ধনুর্যজ্ঞে *বঙ্গ* রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। মহাভারতে জরাসন্ধবধ পর্বাধ্যায়ে তাঁর রাজত্ব বর্ণন সময়ে *বঙ্গ*র উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজেন্দ্র চোড়দেবের গিরিগাত্রে খোদিত এক আদেশে 'বঙ্গাল' দেশের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। *বঙ্গ* বা *বঙ্গাল* বা *বাঙ্গালার* অন্ত র্গত চন্দ্রদ্বীপ সমূদ্রোপকূলীয় এক বিস্তীর্ণ জনপদ যা আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বগলা* বা *বাকলা সরকার* নামে বর্ণিত হয়েছে।

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত। *ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড* নামক সংস্কৃত গন্থে লিখিত মতে এখানকার সমান্তভূমি পূর্বে জলমগ্ন ছিল, মহাদেবের প্রসাদে ও তার ললাটস্থ অগ্ন্যুত্তাপে সে জল শুকিয়ে যায়। চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্থ চন্দ্রকলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হয়েছিল।

চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো দু'টি কিংবদন্তি রয়েছে। প্রথমটি বিক্রমপুর পরগনার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক ব্রাহ্মণ তাঁর আরাধ্য দেবীর বরে এ ভূখণ্ড লাভ করেন। দ্বিতীয়ত, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক সন্ন্যাসী তার প্রিয়শিষ্য দনুজমর্দন দেকে স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে এ ভূখণ্ড দান করেছিলেন। চন্দ্রশেখরের আদেশ ও নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ লেখকের মতে বিক্রমপুর হতে আসা দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা। ইনিই মুসলমান ইতিহাসে দনুজরায় বা নৌজা ও প্রাচীন কুলাচার্যকারিকায় দনৌজমাধব নামে বিখ্যাত। অনেকের মতে ইনিই লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র। ফিরোজশাহী নামক পারস্যগ্রন্থ হতে জানা যায় – দনুজ রায় সুবর্ণগ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যখন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তুঘ্রিল খাঁকে দমন করতে এ অঞ্চলে আসেন তখন (১২৮০) দনুজ রায় বলবনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ইনিই অবশেষে সুবর্ণগ্রাম ছেড়ে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন।

দিগ্বিজয়প্রকাশবিবৃতি নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে:

> পূর্বে মধুমতি সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী।
> বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোওরে,
> সমন্তাৎ মাস মার্গস্য শাসকোহম্ মহীপতি:।

www.pathagar.com

এখানে পূর্বসীমা মধুমতী, পশ্চিমে ইছামতী, দক্ষিণে বাদাভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপ। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হতে এ অঞ্চলের নাম চন্দ্রদ্বীপের বদলে বাকলায় পরিণত হয়। বাদশা আকবরের সময়ে বাকলা একটি স্বতন্ত্র সরকার ছিল যা- ইসমাইলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর ও আলিপুর (ইদিলপুর) এই ৪টি মহালে বিভক্ত ছিল।

১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে আগাবাখর এই অঞ্চলের সর্বময়কর্তা ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর বাখরগঞ্জ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে বিস্তারিত ও পূর্ণাকারে বাকরগঞ্জের সীমা লিখিত হয়। সেখানে বাকেরগঞ্জের উত্তর সীমা ফরিদপুর ও ঢাকা; পশ্চিম সীমা ফরিদপুর, খুলনা ও বলেশ্বরনদী; দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বসীমা মেঘনানদী, সাহাবাজপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর। যা উত্তর –দক্ষিণে ৮৭ ও পূর্ব-পশ্চিম ৬০ মাইল এবং বিস্তৃতি ৩,৬৪৯ বর্গমাইল।

১৮০৩ সালে বাখরগঞ্জ জেলা স্থাপতি হয়। ১৮১১ সালে এই জেলা বরিশালে স্থানান্তরিত হয়। বরিশালের নামকরণ নিয়ে রয়েছে অসংখ্য কাহিনী কিংবদন্তি। তবে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নি। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলকে নিয়ে বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা হল- বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর এবং ভোলা। যার আয়তন ১৩২৯৫.৫৫ বর্গ কি:মি:। বরিশালের উত্তরে ঢাকা বিভাগ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে খুলনা বিভাগ।

বিভাগের মোট জনসংখ্যা ৮১,১২,৪৩৫ জন। বিভাগের সমগ্র অঞ্চল নদীবিধৌত পলিসৃষ্ট সমভূমি। ছোট–বড় অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে বিভাগ জুড়ে।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত: এ অঞ্চলের জনজীবনে বিভিন্ন যুগ পর্যায়ে বিচিত্রতর জনগোষ্ঠী ও ধর্মের প্রভাবে লোকসঙ্গীতে এসেছে বৈচিত্র্য। সময়ের বিবর্তনে রূপান্তর, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঘটেছে প্রচুর। যার ফলে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতগুলো একটি জটিলাবর্তের সৃষ্টি করেছে। ফলে বিভিন্ন সঙ্গীতের মধ্যে সুস্পষ্ট শ্রেণীবিন্যাস অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, ধর্ম এদেশের লোকসঙ্গীতকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সঙ্গীতগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তাই বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে ধর্মীয় প্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে গীত হওয়ার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়:

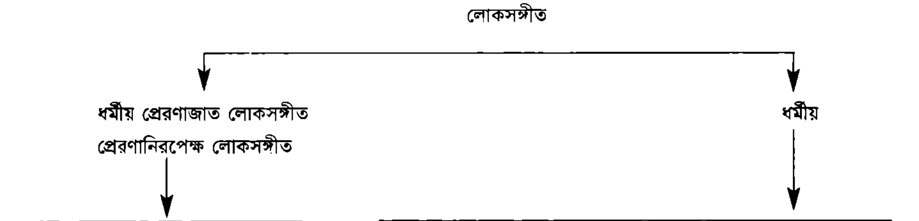

বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের উপর এই স্থানের জলবায়ু, ভূ–অবয়ব, নদ–নদী, উদ্ভিদ, জীব-জন্তুর প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিবেশেরভিত্তিতে সৃষ্ট লোকসঙ্গীতকে নিম্নোক্ত ধারায় শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে–

ক. অপার্থিব পরিবেশে সৃষ্ট লোকসঙ্গীত

১. ভাবমূলক লোকসঙ্গীত

২. জাগরণমূলক লোকসঙ্গীত

www.pathagar.com

খ. পার্থিব পরিবেশে সৃষ্ট লোকসঙ্গীত

১. বস্তুগত লোকসঙ্গীত

২. স্থানগত লোকসঙ্গীত

অপার্থিব পরিবেশের ভাবমূলক লোকসঙ্গীতগুলোকে আবার দেব-দেবী ও পীর–পীরানিভিত্তিক, উৎসব–অনুষ্ঠানভিত্তিক, সাধনাভিত্তিক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এছাড়া জাগরণমূলক লোকসঙ্গীতকে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসনির্ভর এবং দেশপ্রেমমূলক ভাগে ভাগ করা যায়। একইভাবে পার্থিব পরিবেশের বস্তুগত লোকসঙ্গীতগুলোকে মানবসৃষ্ট উপাদানভিত্তিক যা আবার দেশীয় এবং বৈদেশিক বস্তুভিত্তিক ভাগে ভাগকরা যায়। আর স্থানগত পরিবেশের লোকসঙ্গীতগুলো গ্রাম- ও নগরকেন্দ্রিক।

১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ* গ্রন্থে হাবিবুর রহমান পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নোত্তর জরিপ এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ১০টি লোকসঙ্গীতাঞ্চলে রূপায়িত করেছেন। তাঁর মতে, বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা এবং শরিয়তপুর ও মাদারীপুর অঞ্চল হল রয়ানী অঞ্চল। তিনি বলেন, সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এবং ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর শরিয়তপুর মহকুমা নিয়ে রয়ানী সঙ্গীতাঞ্চল গড়ে উঠেছে।

রয়ানী বা ভাসান গান মূলত চাঁদসওদাগর, লক্ষীন্দর ও বেহুলার প্রচলিত লোককাহিনীভিত্তিক মনসাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক সঙ্গীত। সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রকাশক ভক্তিসঙ্গীত বলে এই গানকে মনসার গান নামেও অভিহিত করা হয়।

রয়ানীর আভিধানিক অর্থ নেই। তবে বরিশাল– পটুয়াখালী এলাকায় *স্মৃতিকথা* বা *মাহাত্ম্যগাঁথা*, বিশেষ করে সর্পদেবী মনসার জন্ম থেকে লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে তার দেবত্ব প্রচেষ্টার গীতি–কাহিনীই *রয়ানী* নামে পরিচিত। এদের রচয়িতাক রয়ানীকার বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে *রয়ন* (অর্থাৎ স্মৃতিকথা) শব্দ হতে *রয়ানীর* উদ্ভব ঘটেছে বলা যায়।

অন্যদিকে সারারাত্রি এ গান পরিবেশিত হয়ে থাকে বলে *রজনী* শব্দ হতে রয়ানী গানের উৎপত্তি হতে পারে। তবে অধিকাংশের অভিমত, *রয়ানী* যাত্রা (যাত্রার অর্থ যখন একস্থান হতে অন্যস্থানে রওয়ানা হওয়া) শ্রেণীর গান। ফলে *যাত্রার* পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষা প্রকাশক *রওয়ানা* শব্দ হতে *রয়ানী* শব্দটির উৎপত্তি। এ ছাড়া *রয়ানী গান* চাঁদসওদাগরের ব্যবসা-সংক্রান্ত ও বেহুলার স্বামী লক্ষীন্দরের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির অভিযাত্রামূলক সঙ্গীত বলে (অভিযাত্রা–যাত্রা–রওয়ানা–রয়ানী) রয়ানী নামকরণ হয়েছে।

বরিশাল–পটুয়াখালী অঞ্চল খাল–বিলে পরিপূর্ণ। এখানকার আবহাওয়া আর্দ্র এবং মাটি খুবই স্যাঁতসেঁতে। এমনিতর পরিবেশ সাপ বসবাসের জন্য খুবই উপযোগী। এ অঞ্চলে সাপের প্রকোপও খুব বেশি। অধিকন্তু এই বিস্তৃত নিম্নাঞ্চল একসময় সুন্দরবনেরই অংশ ছিল। দক্ষিণ বাংলার এই ভৌগোলিক পরিবেশ যেখানে যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে সর্পাঘাতের আশঙ্কা বর্তমান। সেখানে এই বিশেষ নিসর্গ পূজাভিত্তিক সঙ্গীতের প্রসার একান্তই স্বাভাবিক।

দক্ষিণ বাংলার ঘরে ঘরে এ সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এ গানের শ্রোতা। প্রতিবছর বিশেষত বর্ষার (আষাঢ় ও শ্রাবণ) আগমনে যখন সাপের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় তখন এ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি পরিবারে মনসা পূজা কিংবা মনসার মাহাত্ম্য পরিবেশিত হয়। শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত শ্রদ্ধা, ভয় ও শুভকামনায় মনসার গুণ ও কাহিনী কীর্তিত হয়। রয়ানীকাররা তখন দিবারাত্র সঙ্গীতাকারে রয়ানী পরিবেশন করে। যে বর্ষণমুখর দিনের অবিশ্রান্ত ধারার সাথে এ গানের সুর একই সূত্রে গাঁথা। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের তালে তালে মানুষের অশ্রুপাতের মতই এ গান করুণরসের সঞ্চার করে। তাই এ গান একান্তভাবেই আঞ্চলিক। এ ছাড়াও স্থানীয় কথোপকথনের অভিন্নতাও রয়ানী সঙ্গীতের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

www.pathagar.com

রয়ানী সঙ্গীতের বিষয়বস্তু, স্থান, ঘটনাপ্রবাহ ও বিশ্লেষণে এবং চরিত্র চিত্রণে দেখা যায় সব কিছুই একান্ত ভাবেই একটি বিশেষ অঞ্চলকে, অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, লোকমানস, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জনপদকেই উপস্থাপিত করেছে।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত

১. নাথসঙ্গীত
২. রয়ানী
৩. ছড়াগান
৪. দেব-দেবীভিত্তিক সঙ্গীত – কালীপূজার গান, নীলের গান, কীর্তন, কৃষ্ণলীলা, গাজন, গোষ্ঠগান, গৌরীর গান, বাস্তুপূজার গান, ভাসান গান, ব্রতের গান, পাঁচালী প্রভৃতি।
৫. ধর্মীয় আচারভিত্তিক সঙ্গীত – আচার সঙ্গীত, দধিমঙ্গল উৎসবগীত, পার্বণ সঙ্গীত প্রভৃতি।
৬. পারিবারিক উৎসবভিত্তিকগান – নবজাতকের গান, গায়ে হলুদের গান, বিয়ের গান, কন্যাবিদায়ের গান, সাধভক্ষণের গান, পানখিলির গান, হঁ-অলা প্রভৃতি।
৭. পীর–পিরানীর গান – খোয়াজ খিজিরের গান, বনপীরের গান, বনবিবি/ বনদুর্গার গান, গাজীর গান প্রভৃতি।
৮. কৃষিসঙ্গীত – পানবোনার গান, ফসলতোলার গান, ধানভানার গান প্রভৃতি।
৯. ওঝানাচের সঙ্গীত এবং ফকিরালীর গান।
১০. কর্ম সঙ্গীত/লোকপেশাসঙ্গীত – বাইদানী গান, বাইচের গান, জেলেদের গান, পটুয়াদের গান প্রভৃতি।
১১. রাখাইন লোকসঙ্গীত।
১২. জাগরণমূলক লোকসঙ্গীত – মুকুন্দ দাসের গান, আবদুল লাতিফের গান, গণসঙ্গীত প্রভৃতি।
১৩. পালাগান/কেচ্ছাগান – আসমান সিং, কমলা, আমিনা বিবি নছর মালুম, গুনাইবিবি, নুরুন্নিছার পালা, তোমেরদ্দি লালমতির পালা প্রভৃতি।
১৪. ব্যক্তিগত সঙ্গীত রচনায় যারা কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে নিজস্বধারার সৃষ্টি করে নিজ নামে সঙ্গীত প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন – অধরমণি বৈষ্ণবীর গান, অনাথ বন্ধুর গান, আবদুল লতিফের গান, গণি বয়াতির গান, উমেশ চন্দ্রের গান, কালু রায়ের গান, কালোযামিনীর গান, কেশব দত্তের গান, চন্দন বিবির গান, চন্দ্রকান্তের গান, কালীসাধকের গান, দক্ষবালার গান, দক্ষিণারায়ের গান, নকুল সরকারের গান, নাগর মোল্লার গান, প্রিয়বালার গান, মনমোহিনী বৈষ্ণবীর গান, মনোহরা বৈষ্ণবীর গান, যামিনী বৈষ্ণবীর গান, রশিদ ফকিরের গান, রাখাল আচার্যের গান, লক্ষ্মী বৈষ্ণবীর গান, শরৎবালার গান, হরিচরণ সরকারের গান, হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান, হিরণবালার গান, ক্ষিরোদা খেমটাওয়ালীর গান প্রভৃতি।

এছাড়াও বরিশাল অঞ্চলে জারি, খেউর, খেমটা, ঘুমপাড়ানির গান, টপ্পা, তরজা গান, তত্ত্বসঙ্গীত, ধূয়াগান, ভাটিয়ালী গান, হেঁচড়া গান, সখী সংবাদ গান, স্মরণ গান ইত্যাদি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

সনাক্তকৃত লোক সঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল, বিস্তৃতি এবং স্রষ্টা ও শিল্পীদের তালিকা

কাহিনীনির্ভর ব্যালাড বা গীতিকা পৃথিবীর সর্বত্র গীত হয়ে থাকে। গীতিকার কাহিনী ও সুর সমানভাবে প্রাচীন। তবু এতে গল্প-রসই মুখ্য, সুরের ভূমিকা গৌণ। কাহিনীর বিশেষ নাটকীয় তুঙ্গ মুহূর্তের আবেদন ফুটিয়ে তোলার জন্য কখনো কখনো গীতিকায় বিশেষ সুরের ব্যবহার হয়ে থাকে। এমন বিবেচনায় পণ্ডিতেরা বাংলাদেশের গীতিকাকে ভাগ করেছেন নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকায়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথের সময়কাল সপ্তম শতক বলেছেন। যদিও এর সঙ্গে পণ্ডিতদের মতদ্বৈততা রয়েছে। অধিকাংশের মতে দশম/একাদশ শতকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাথাচার্যের আবির্ভাব। নাথ মতাদর্শে বিশ্বাসীদের মতে আদি নাথ শিব, তাঁর শিষ্য মীননাথ, মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। শিবের আরেক শিষ্য হাঁড়ি পা বা জালন্ধরী পা, তাঁর শিষ্য কাহ্নপাদ। এই চার শিষ্যের কাহিনীই নাথগীতিকার

www.pathagar.com

উপজীব্য বিষয়। গ্রীয়ারসন ১৮৭৮ সালে নাথ গীতিকা (মানিক রাজার গান নামে) প্রকাশ করলেও এর উৎসমুখ প্রায় হাজার বছর পূর্বে নিহিত। নাথ গীতিগায় দু'টি বিভাগ লক্ষ করা যায়। এক বিভাগে গোরক্ষনাথ, মীননাথের কাহিনী, যেমন- গোর্খ বিজয়, মীন চেতন ইত্যাদি। উল্লিখিত মীন নাথের জন্ম বরিশাল অঞ্চলে। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রথম খণ্ড, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদক অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপর্ষদ, কলিকাতা, নবম সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃঃ৬৬) বলেন-কাহারো কাহারো মতে মীন নাথের বাড়ি বাকেরগঞ্জ ছিল। এ বিষয়ে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে না আসা গেলেও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ অনেক পণ্ডিত এবং আঞ্চলিক ঐতিহাসিক মীননাথকে বরিশাল অঞ্চলের মানুষ বলে স্বীকার করেছেন। সে সূত্র ধরে বাংলা গীতিকার শুরু হয়েছিল মীননাথকে দিয়ে। অর্থাৎ বরিশাল বা বাকেরগঞ্জকে কেন্দ্র করে। নাথ গীতিকার অন্য বিভাগে আছে গোপীচন্দ্র ময়নামতির কাহিনী। এ কাহিনী মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের সন্যাস নামে পরিচিত। পণ্ডিতেরা এই কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে বঙ্গাল দেশের রাজা বলেছেন। বঙ্গাল বরিশাল বা বাকেরগঞ্জ সম্পৃক্ত নাম। সে সূত্রে এ কাহিনীর উৎস ভূমিও বাকেরগঞ্জ বা বরিশাল বা দক্ষিণ বঙ্গ। গ্রিয়ারসন বরিশাল অঞ্চলের *তোসেরদ্দি লাল মতি*র গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন।

রয়ানী মূলত মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ-এর গান। মনসামঙ্গলের রচয়িতা বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতব্দীর শুরুতে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সনাতন গুপ্ত এবং মা রুক্মিনী দেবী। বিজয়গুপ্ত প্রসিদ্ধ ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের ভাগিনেয়। মনসামাঙ্গল হতে কবির সহধর্মিণী জানকী দেবীর নাম জানা যায়। সে সময়ে প্রচলিত মনসাগীতে দেবী পরিতৃপ্ত না হওয়ায় মনসা স্বয়ং ভক্ত বিজয়কে গ্রন্থ রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ করেন-

গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও।।
মনে ভয় না করিও দেখে নাগ জাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী।
মোর পায়ে ভক্ত তুমি সেবক প্রধান।
স্বপ্ন উপদেশ বলি না করিও আন।।
আজ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন।।

বিজয়গুপ্ত আদিষ্ট হয়ে প্রকাণ্ড ছাতিম গাছের নিচে বসে পাঁচালী রচনা করনে। ১৪০৬ সাকে বিজয় মনসামঙ্গল রচনা সম্পন্ন করেন। সেই থেকে এই কাব্য পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই ভক্তির সাথে রক্ষিত এবং পঠিত হতো। শ্রাবণ মাসে ঘরে ঘরে বিষহরির উপাসনা হতো। একই সাথে বিজয়গুপ্তর কাব্য সর্বত্রগীত হতো। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাসের *ভাসান* যেমনি প্রচলিত, পূর্ববঙ্গে একইভাবে বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গল প্রচলিত। প্রকৃতি-পরিবেশ- ধর্ম-ভক্তি-সুর সবকিছুরই ব্যঞ্জনায় মনসামঙ্গল দক্ষিণ বাংলায় টিকে আছে। বিজয়গুপ্তের রচনা অবিকৃতভাবে আজও বরিশাল অঞ্চলে গীত হয় সগৌরবে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডী পেরিয়ে মনসামঙ্গলের কাহিনী এবং সুর বরিশালকে রয়ানী অঞ্চল বলে খ্যাতি এনে দিয়েছে।

মনসামঙ্গল চাঁদসওদাগরের পুরস্কার, বেহুলার অপূর্ব সতীত্ব, লক্ষিন্দরের জীবনলাভের মতো কাহিনী বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। একই সাথে কবি বিজয়গুপ্তের প্রাঞ্জল বর্ণনা ও সুর বরিশাল অঞ্চলবাসীর আদরের ধন।

২৮চৈত্র, ১২৬১-তে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত কবি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের বরিশালের বিবরণ হতে জানা যায়, এদেশের বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণরূপেই বিপরীত। অর্থাৎ বরকে প্রায় কন্যার বাটিতে যাইতে হয় না, কন্যাই স্বয়ং সাজ-সজ্জা করিয়া সমারোহপূর্বক বরের আবাসে গমন করেন। এই রূপ নিয়ম ইহার দিগের পক্ষে অতিশয়

www.pathagar.com

মুকুন্দ দাস

সম্ভ্রমজনক, এতদ্রূপ শুভকর্মের কিঞ্চিত পূর্বে গৃহের অঙ্গনারা অঙ্গনের মধ্যে চক্রাকার হইয়া গানারাম্ভ করেন, এই গানের নাম" গাহিন লওন", তাহার বাদ্যের নাম "খাড়ানাগরা"। পুরুষেরা বাহিরে আসিয়া অত্যুত্তম গায়িকাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এতদ্রূপ গায়িকাগণ অন্য পল্লীতে কুটুম্বের ভবনে সংগীত করনার্থে নিমন্ত্রিতা হইয়া থাকেন। ...
১৭৮৪ সালে আরাকানের মেঘবতী হতে ১৫০টি রাখাইন পরিবার বর্মী শাসকের নাগপাশ হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ৫০টি নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি জমায়। অবশেষে ঐ পরিবারগুলোর একটি অংশ বর্তমান বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার রাঙাবালী দ্বীপে উপনীত হয়। পরবর্তীতে তারা রাঙাবালী ছেড়ে মৌডুবিতে স্থায়ী বসতি গড়ে। ক্রমান্বয়ে তাদের বসতি আরো বিস্তার লাভ করে এবং কলাপাড়া উপজেলার মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের বালিয়াতলী, টিয়াখালী ও লতাচাপলী ইউনিয়নের কুয়াকাটা ও ধুলাসার এলাকায় তারা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে পটুয়াখালী জেলায় রাখাইনদের সংখ্যা প্রায় দু'হাজারের মতো। সমপরিমাণ রাখাইন রয়েছে পার্শ্ববর্তী বরগুনা জেলাতেও। আত্মনির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং কঠোর পরিশ্রমী রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। রাখাইন-সংস্কৃতি উৎসবাদিতে কেন্দ্রীভূত। এদের রীতিনীতি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ। ওয়াছো বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা, রাখাইন রাঠাপোয়ে রথোৎসব, সাইংক্রাইং পোয়ে বা পানিখেলা বা জলোৎসব রাখাইন নববর্ষ অনুষ্ঠান রাখাইনরা আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপন করে থাকে। উৎসব উদ্‌যাপনে রাখাইন সঙ্গীতের ভূমিকা ব্যাপক। তাদের সঙ্গীত মধুর এবং বৈচিত্র্যময়। রাখাইনদের পল্লীগীতি রোডোক, লোকগীতি ক্যাপ্যাতেহ সুরব্যঞ্জনায় অনন্য। রাখাইন সঙ্গীতকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো তেখ্রাংগ্রী বা ক্লাসিক্যাল কিংবা পৌরাণিক গান, অপরটি তেখ্রাংশে বা লঘু সঙ্গীত। এগুলো ছাড়া রাখাইনদের অসংখ্য লোকগীত, প্রেম-বিরহের গান, দেশাত্মবোধক গান, ছড়াগান এবং ধর্মীয় সঙ্গীত রয়েছে যা দক্ষিণাঞ্চলের এ সম্প্রদায়ের মুখে মুখে গীত হয়। রক্ষণশীল রাখাইনরা তাদের গানগুলোর সাথে *ছেইনওয়েন* বা গোলাকার ঢোল (যা পূর্বে মালয়েশিয়া থেকে আনা হতো), *ওজে* (লম্বাকৃতির একদিক মুখওয়ালা ঢোল), *পেটমাহ* (বৃহদাকৃতির ঢোল), *চাকওয়েন* (মধ্যম আকৃতির ঢোল), *লাঙখ* (মন্দিরা), *চে* (করতাল), *পেটতলা* (জলতরংগ) *প্রী* বা *পুলী* (বাঁশী), *মং* (ঘন্টা), *হে* (সানাই) বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

আরাকান সংস্কৃতির ধারক বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায় ক্রমে বর্মি সংস্কৃতির আগ্রাসনে বিপণ্নপ্রায়। বৌদ্ধ ধর্মযাজকদের মাধ্যমে আরাকানি সংস্কৃতির উপর বর্মি সংস্কৃতির প্রভাব দিন দিন বাড়ছে বলে রাখাইন এলাকা ঘুরে জানা গেছে। যাই হোক, বাঙালি সংস্কৃতি ধারার মধ্যে বহমান ক্ষুদ্রধারা হিসেবে চিহ্নিত রাখাইন সংস্কৃতি বরিশাল অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে।

সনাক্তকৃত ব্যক্তিস্রষ্টাদের তালিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বরিশাল অঞ্চলের স্বনামধন্য কবিয়াল ছিলেন ষষ্ঠীচরণ খরাতী, কুঞ্জলাল দত্ত ও শরৎচন্দ্র সরকার। ষষ্ঠীচরণ খরাতী চরিত্রবান ও কৃতিত্ব শক্তিসম্পন্ন স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁর উপস্থিত

www.pathagar.com

বিয়ের গান (জলিল বয়াতি ও তার দল)

অনুপ্রাসে তৎকালীন ঢাকার কবিয়াল সম্রাট হরিচরণ আচার্য–পর্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল বরিশাল জিলার বানারীপাড়ার কাছে আলতা গ্রামে। তিনি ঝালকাঠি কবিগানের দলপতি যামিনীকান্ত নট্টের দলে বেতনভোগী সরকার ছিলেন।

কবিয়াল কুঞ্জলাল দত্তের বাড়ি ছিল বর্তমান পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে। কেশবলাল দত্ত নামে তাঁর এক ভাই স্বনামধন্য কবিগায়ক ছিলেন। কুঞ্জলাল দত্ত ঝালকাঠির অধরমনি বৈষ্ণবীসহ অন্যান্য কবিওয়ালিদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন। কুঞ্জলাল দত্তের দলে যে সব বৈষ্ণবীরা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন তাঁরা বেশ্যার চেয়ে সম্মানিতা ছিলেন। কারণ গান-বাজনাই ছিল তাদের ব্যবসা। ওইসব বৈষ্ণবী একজনের সঙ্গে স্বামী–স্ত্রী ভাবে কালযাপন করতেন। কুঞ্জলাল দত্ত খুব বড় মাপের কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু আসরে তিনি দ্রুত বক্তৃতা করতে পারতেন। তাছাড়া ভদ্র সন্তান বিধায় তিনি খুব সম্মান পেতেন।

কবিয়াল শরৎচন্দ্র সরকারের জন্মস্থান ঝালকাঠিতে। বেশ্যার গর্ভে তার জন্ম। শরৎ সরকার যামিনী বৈষ্ণবীকে নিয়ে দল করতেন। যামিনীর ডাক নাম ধলা যামিনী। যামিনীর ভগনী ছিল কামিনী। কামিনীর মেয়ে ছিল বেঁচা বা সুরধ্বনি। এরা মাঝারী ধরনের গায়িকা ছিলেন। কামিনীর ছেলে জ্ঞানেন্দ্র তবলার ওস্তাদ ছিলেন। শরৎ সরকার কোনো স্থায়ী গান রচনা করেন নি। কিন্তু উপস্থিত বক্তৃতা শক্তিতে বলীয়ান শরৎ সরকার দর্শক শ্রোতার হৃদয়ে স্থান পায়। তাঁর মিষ্টি গলায় স্বর এবং বক্তৃতায় ত্রিপদী ছন্দের এমন মিল ছিল যা সমসাময়িক কোনো সরকারের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

শরৎ সরকারের শিষ্য ছিলেন চন্দ্রকান্ত দাস বা দিগবিজয় চন্দ্র সরকার। তিনি লক্ষ্মী বৈষ্ণবীকে নিয়ে দল গঠন করে ছিলেন। দিগবিজয় চন্দ্র সরকারের কবি গানের পাল্লায় একমাত্র ঢাকা জেলায় কবিয়াল সম্রাট হরি আচার্য ছাড়া আর সকলেই পরাজিত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে। চন্দ্র সরকারের রচনা মনোমুগ্ধকর। তিনি ডাকগান,মালসী গান, সখী সংবাদ গান, ভোর গান, গোষ্ঠ গান জুতার কবি প্রভৃতি রচনা করে ছিলেন। চন্দ্র সরকার এবং লক্ষ্মীর অল্প বয়সে মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

www.pathagar.com

বাংলা ১৩৩০ সনে কবিয়াল রাখাল চন্দ্র আচার্য গান শুরু করেন। চন্দ্র সরকার, হরিচরণ দাস, নকুলেশ্বর দাস, বৈষ্ণব সরকার প্রমুখ শিল্পীরা রাখল চন্দ্র আচার্যের তুলনায় বয়সে ৭/৮ বছরের বড়। জানা যায়, উল্লিখিত সময়ে তারা যুবক ছিলেন। তবে উমেশচন্দ্র শীল ছিলেন ওই সময়ে পৌঢ়। উমেশ চন্দ্র শীল কালো যামিনীকে নিয়ে দল গঠন করেছিলেন। কালো যামিনীকে ওই সময়ে শ্রোতাগণ কোকিলকণ্ঠী বলে সম্বোধন করতেন। উমেশ চন্দ্র শীল এবং কালো যামিনী স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে থাকতেন। সমসাময়িককালে ঝালকাঠি অঞ্চলের অন্যমত গায়িকা ছিলেন ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালি তার নাচে ও গানে শ্রোতাকূল ছিল মুগ্ধ। একই সময়ে ঝালকাঠিতে সরলা নাম্মী মুসলিম গায়িকা যশ অর্জন করেছিলেন। এছাড়া বরিশালের বাকেরগঞ্জের সাহেবগঞ্জে ক্ষীরোদা নাম্মী আরো একজন সুগায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর তিনের দশকে ঝালকাঠির স্বনামখ্যাত লোকগায়িকা ছিলেন কবিয়াল মনোমোহিনী বৈষ্ণবী। তিনি বেতনভোগী সরকার রেখে নিজেই দল গঠন করেন। তাঁর শিষ্য ছিলেন রাধালক্ষ্মী বৈষ্ণবী। মনোমোহিনীর মতো তারও মধুর কণ্ঠস্বর এবং গানের ছন্দ ছিল। এই রাধালক্ষ্মী মনোমোহিনীর দলে গান গেয়ে মাসিক ১শ টাকা বেতন পেতেন। মনোমোহিনীর কন্যা হরিদাসীও সুকণ্ঠী গায়িকা ছিলেন। তিনি নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। ওই সময়ে ঝালকাঠিতে দক্ষবালা নাম্নী আরো একজন গায়িকা ছিলেন। তিনি অনাথবন্ধু নাগকে নিয়ে গান করতেন। হরিচরণ দাস বেতনভোগী হয়ে ঝালকাঠির বিভিন্ন দলে সরকারি করতেন। তিনি ছড়াকাটায় ওস্তাদ ছিলেন। রাখাল চন্দ্র আচার্যের সাথে বহুবার তার গানের পাল্লা হয়েছিল। ওই সময়ে রাখাল চন্দ্র, নকুল সরকারসহ স্থানীয় সরকাররা সকলেই পাঁচালীতে হরিচরণকে সমীহ করতেন। রুক্ষভাষী হরিচারণ পালায় অশ্লীলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

বরিশাল জেলার শুয়াকাটিতে নকুল সরকারের বাড়ি। তিনি প্রথমে কৃষ্ণ সরকার এবং পরে কবিয়াল সম্রাট হরিচরণ আচার্যের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। নকুল সরকার বেদ-পুরান-কোরআন- বাইবেল ইত্যাদি শাস্ত্র

মেয়েলি গীত

www.pathagar.com

হঁ-অলা (জলির বয়াতি ও তার দল)

সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। তার ভাষাবোধ, রুচিসম্মত শব্দচয়নসহ তাল-মান-রাগ-রাগিণীতে যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি তাল, রস ও অলংকারযুক্ত বহু মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। যা তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর কবিগান ও টপ্পা পাঁচালীতে সন্তুষ্ট হয়ে করিমগঞ্জ মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে একটি স্বর্ণপদক এবং একটি দোনালা বন্দুক উপহার দিয়েছিলেন। দেশভাগের কিছুকাল আগে তিনি কোলকাতা চলে যান এবং সেখানেও তিনি খ্যাতির সঙ্গে তার সঙ্গীতে শ্রোতামণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। মনোহরা বৈষ্ণবী নাম্মী আর একজন সুগায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নিশ্চিত করে জানা যায় নি। একই সময়ে শরৎবালা (শরতী) বলে আরও একজন সুগায়িকা ঝালকাঠিতে ছিলেন। নৃত্য–গীতি পটিয়সী ওই গায়িকার জুড়ি ছিল না। শরৎবালা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক দলে বেতনভোগী শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। একই সময়ে প্রিয়বালা (ডাক নাম চেড়া বোচা) নাম্মী অপর এক সুগায়িকার অস্তিত্ব জানা যায়। তিনি অধিকাংশ সময়ে ঢাকার কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের দলে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে গান করতেন। ঝালকাঠিতে তাঁর বাড়িঘর থাকলেও পরবর্তীতে তিনি পশ্চিম বাংলায় থেকে রাজেন্দ্র সরকারের দলে গান করতেন। ঝালকাঠির অপর এক নৃত্য-গীতি পটিয়সী সুগায়িকার নাম হিরণবালা। তিনি যামিনী নট্টের পালিতা কন্যা। তিনিও দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায় চলে যান এবং বিভিন্ন দলে গান করেন। দেখা যায়,দেশভাগের পূর্বে অর্থাৎ গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঝালকাঠিতে প্রায় ১০/১৫ টি দল সুনামের সাথে পালা পরিবেশন করেছেন।

দেশবিভাগের পর ঝালকাঠি অঞ্চলে দু'টি ভাল জারীর দল গড়ে ওঠে। একটি এ অঞ্চলের জারি সম্রাট বলে খ্যাত গণি বয়াতীর। অপরটি পোনাবালিয়ার নাগর মোল্লার। ওই সময়ে ঝলকাঠির অন্যতম গায়িকা ছিলেন গৌরী। তিনি গণি বয়াতীর সাথে গান করতেন। এছাড়া ঝালকাঠির মারাসাতা নিবাসী আলম শরীফ ও তারপুত্র কলম শরীফ, সঞ্জয়পুরের আকুব্বার ও তার পুত্র মোনসেক, কল্যাণ কাজী, নাদের আলী, উত্তমনগরের রাজাউল্লাহ বয়াতী, ভৈরবপাশার হিঙ্গলদ্দিন বিখ্যাত জারী গায়ক ছিলেন।

www.pathagar.com

রয়ানী (নিমাই দেউড়ী ও তার দল)

পঞ্চাশের দশকে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে আধ্যাত্মিক গান, তত্ত্বসঙ্গীত, দেহতত্ত্বগান, ভাবগানসহ বন্দনাগানের অন্যতম শিল্পী ছিলেন বরগুণার মাতানচাঁদ গোসাঁই। সমসাময়িক সময়ে বরগুণার পুরাঘাট এলাকার হেউলিবুনিয়া গ্রামের রাধাবল্লভ গোসাঁই, বরিশালের উজিরপুর উপজেলার প্রিয়নাথ বৈরাগী এবং বামরাইলের মাধব গোসাঁই আধ্যাত্মিক গানে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

গত শতাব্দীর শুরুর দিকে বরিশালে বৈষ্ণব সাধনরীতি জনপ্রিয়তা পেলে নগরীতে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি আখড়া। এসব আখড়ায় মধ্যে ভাটিখানায় রাধা গোবিন্দ আশ্রম, বাজার রোডের রাধা গোবিন্দ জিউর আখড়া, চকবাজার মদনমোহন আখড়া, সদর রোডের জগন্নাথ আখড়া অন্যতম। এসব আখড়ায় নামকীর্তন, কৃষ্ণলীলা, ভোরকীর্তন, বৈষ্ণব সঙ্গীতসহ স্মরণসঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক গানের চর্চা চলতো ব্যাপক ভাবে। এরই ধারাবাহিকতায় চল্লিশের দশকে বরিশাল শহরকেন্দ্রিক বৈষ্ণবগানে রাধারমন বৈষ্ণব, মাখম গোসাঁই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তাদের শিষ্য মহামায়া বৈষ্ণবী, রাইধ্বনী বৈষ্ণবী, কালি বৈষ্ণবী গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহামায়া– রাইধ্বনীর লোটকীর্তন একসময়ে নগরীতে সাড়া তুলেছিল।

সমসাময়িককালে ঝালকাঠি অঞ্চলে লক্ষ্মীকান্ত ঢেপ'র পালাকীর্তন, টপ্পা, রঙ্গরসের গান এবং পুতুলনাচের গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। লক্ষ্মীকান্ত ঢেপ'র পুতুলনাচের দল ছিল বলে জানিয়েছেন প্রবীণ যাত্রাশিল্পী জ্যোতিপ্রকাশ রায় হিটলার। তিনি বলেন, ৪০-এর দশকের মেলা লক্ষ্মীকান্ত ঢেপ'র পুতুলনাচ ছাড়া জমতো না। ওই সময়ে দূরদূরান্ত থেকে মেলায় আগত সাধারণ মানুষ তার পুতুলনাচ এবং এর সঙ্গে গীত কাহিনী নির্ভর সঙ্গীত উপভোগ করতো প্রাণ ভরে।

সমসাময়িককালে বরিশালের বাকেরগঞ্জের শিয়ালঘুনি এলাকায় বসন্তশীল নামে পালাকীর্তনীয়ার নৌকা বিলাস, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ এবং টপ্পা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

রয়ানী

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে বরিশালের বাকেরগঞ্জের দাঁড়িয়াল এলাকায় মনোরঞ্জন শীল ও নিরঞ্জন শীলের কীর্তনের দল এলাকা চষে বেড়াত। জানা যায়, ওই সময়ে বাকেরগঞ্জের কলসকাঠিতে জগদ্ধাত্রী ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে পালাগানের আসর বসত যা মনোরঞ্জন শীল ও নিরঞ্জন শীল ছাড়া জমতো না। শিল্পীদ্বয় ওই আসরে গীতকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র সেজে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন।

পঞ্চাশের দশকে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার খোরশেদ বয়াতির তরজা গান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া এর কিছুকাল পরে একই এলাকার মনু শীল, প্রেমানন্দ, ত্রৈলোক্য গায়েনের কবিগান, বৈঠকী গান দুই দশক আগ পর্যন্ত এলাকায় প্রচলিত ছিল। তাদের মৃত্যুর পর থেকে এ অঞ্চলে কবিগান ও বৈঠকীগানে ভাটা নামে। তবে তাদের পরবর্তী বংশধরেরা কর্মজীবনের পাশাপাশি কবিগান–বৈঠকীগানের ধারা অব্যাহত রাখছে। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাও বিপন্ন হবার পথে। তিনি জানান,বর্তমানে বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় রবি সরকারের কবিগানের দল রয়েছে। যারা এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাঝে মাঝে কবিগান করে থাকেন।

সামাজিক চিন্তার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ লোকসঙ্গীতের রূপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তর যেমন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে, তেমনি উপস্থাপনার কৌশলের ক্ষেত্রেও। অধ্যাত্মচেতনা থেকে মোহমুক্তি ঘটিয়ে লোকসঙ্গীতে ক্রমশ সমাজ এসেছে, স্বদেশ এসেছে, এসেছে রাজনীতি। লোকসংস্কৃতির এই বিবর্তনের সাথে মুকুন্দদাসের নাম ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। মুকুন্দদাসই প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনা কিংবা দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের পরিবর্তে ইতিহাস চেতনা ও সমাজ চেতনার সংযুক্তি ঘটান। তিনি যাত্রায় রাসলীলা আর কৃষ্ণলীলার পরিবর্তে আনলেন মানবলীলা। সামন্তবাদী প্রভুদের মনোরঞ্জনের চেতনা দূর করে যথা ধর্ম তথা জয় এ উপদেশবাণীকে উপেক্ষা করে মুকুন্দদাস নিয়ে এসেছেন মানুষের কীর্তিকথা, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণমানুষের মুক্তির অন্বেষা, আনলেন স্বদেশ চেতনা তথা দেশমাতৃকার মুক্তির বাণী। শুধু বিষয়বস্তুই নয় মুকুন্দদাসই ছিলেন লোকসংস্কৃতির সর্বপ্রথম রচয়িতা, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা

www.pathagar.com

ও গায়ক। ফলে তিনি নিজেই সংস্কৃতির প্রচলিত কর্মকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেন স্থান-কাল-অবস্থা আর অবস্থানের সাথে তাল মিলিয়ে। মুকুন্দদাসের জন্ম ১৮৭৮ বলে স্বীকৃত। তাঁর জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে হলেও তার কর্মক্ষেত্র বরিশালেই বিস্তৃত। তাঁর নিজেরই কথায়-*শৈশবাতিক্রমের সহিত বরিশাল ভূমিকে চিনিয়াছি, ভালবাসিয়াছি। আমার জন্মস্থান বিক্রমপুর একটা শোনা কথার স্মৃতি ব্যতীত আর কিছু নয়, যে আবেষ্টনকে মানুষ জন্মভূমি নামে আরাধ্য – বরিশালের প্রত্যেক ধূলিকণা আমার প্রিয় শিরোভূষণ।* (ড. জয়গুরু গোস্বামী: চারণ কবি মুকুন্দ দাস)

সমসাময়িক রাজনীতি, বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি মুকুন্দকে কীর্তনীয়ার আবেশ থেকে মুক্ত করে এনে দাঁড় করিয়েছে জনতার সামনে- চারণের বেশে। মুকুন্দদাসের এই স্থান পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত।

মুকুন্দদাস শুরু করলেন সমাজ সচেতন যাত্রাপালা ও গান রচনা। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। ক্রমশ মুকুন্দদাস পরিচিত হলেন চারণ কবি হিসেবে। তিনি নিজেই গড়ে তুললেন দল। তার পালায় যেমন ছিল দেশপ্রেম, ছিল সমাজ আর সমাজের সংস্কার আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তেমনি ছিল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রুপাত্মক আক্রমণ। আর ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। গানের এ ধারা স্বদেশীযাত্রা হিসেবে লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। মুকুন্দদাস আবিষ্কারক, লোকসংস্কৃতির নতুন অধ্যায়ের প্রবর্তক, প্রচারক, অভিনেতা ও শিল্পী প্রবক্তা।

"বাবু বুঝবে কি আর ম'লে-
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা।
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখনা বাবু খুলে।"
"আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম,
তবে ফিরিংগী বণিকের গৌরব রবি-
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।"

রয়ানী

www.pathagar.com

গান দুটির জন্য মুকুন্দ দাসের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় এবং বিচারে প্রথমটির জন্য তিন ও দ্বিতীয়টির জন্য আড়াই বছর জেল হয়েছিল। বৃটিশ সরকার *মাতৃপূজা, কর্মক্ষেত্র* ও *পথ* এই পালা তিনটি বাজেয়াপ্ত করে।

মুকুন্দদাসের নবযাত্রা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি একে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেও পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি স্বদেশী পালা প্রচারের জন্য সিরাজগঞ্জ ও মেদিনীপুরে একটি করে দল গঠন করিয়েছিলেন। তিনি বরিশালের কালীকৃষ্ণ নট্টকেও (১৩০১-১৩৬১) একটি দল গঠন করে দিয়েছিলেন।

মুকুন্দদাস গান লিখেছেন প্রচুর। তার রচিত গানকে বিষয়ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক. শাক্ত সঙ্গীত, দুই দেশগান। দেশপ্রেমই মুকুন্দদাসের মূলমন্ত্র। মুকুন্দদাস দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তির সাধনার পথের শক্তির উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছেন শাক্ত বন্দনা। তার এই শাক্ত বন্দনার আর এক কারণ হতে পারে, সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থা। সামাজিকভাবে মানুষ অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের প্রতি যতটা আকৃষ্ট হয়, দেশগানে ততটা হবে না ভেবেই তিনি হয়তো এর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মুকুন্দদাস ছিলেন দেশপ্রেমিক সচেতন রচয়িতা। এর জন্য তাকে মূল্যও দিতে হয়েছে অনেক। তার বহু লেখা বৃটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মামলায় জড়ানো হয়েছে চারণ কবিকে দেয়া হয়েছে সাজা। ১৯৩৪ সালের ১৮ মে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গীত ৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির অনুপ্রেরণার উৎস ছিল।

জারি সম্রাট আবদুল গণি বয়াতি ১৯০৯ সালে তৎকালীন বরিশাল জেলার নুরুল্লাপুরে (মেহেদীপুর) – জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি গানের চর্চা শুরু করেন। লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ থাকলেও তিনি জারী গানে সর্বাধিক পরিচিত লাভ করেন। শুধু জারী শিল্পী হিসেবেই নন, তিনি জারি গানের রচয়িতা হিসেবেও সুখ্যাত। তিনি অসংখ্য পল্লীগীতির রচয়িতা। আবদুল গণি বয়াতির পিতাও ছিলেন একজন নামকরা জারি গায়ক। পিতার কাছে জারীর হাতে খড়ি হলেও তাঁর অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন হরিচরণ সরকার। মাত্র ১৩ বছর বয়সে জমিদার হীরালাল চৌধুরীর বাড়িতে গান গেয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি। ১৯২১ সালে তিনি একটি ক্ষুদে গায়ক দল গঠন করেন। বাংলা ১৩৫০ সনের আকালকে নিয়ে তিনি একটি মর্মস্পর্শী গান রচনা করলে সে গান মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন বরিশালের ডি.এম তাকে ১০ একর জমি দান করেন। খ্যাতিমান এ জারি গায়ক পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেঃ আজম খানের নিকট থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৬৯ বছর বয়সে নিজ গ্রামে ১৯ আগাস্ট ১৯৭৮-এ জারি-সম্রাটের দেহাবসান ঘটে। আবদুল গণি বয়াতির গানগুলোর মধ্যে তাঁর জারী, পল্লীগীতি, ধূয়াগান এবং বিচ্ছেদগান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সাম্প্রতিককালের অপর এক জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পী আবদুল লতিফ-এর জন্মও বরিশালে। আধুনিক মানসিকতায় পরিশীলিত এ শিল্পীর সৃষ্টি মূলত লোকজীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ১৯৩০ সালে আব্দুল লতিফ বরিশালের রায়ের পাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম আজীবুন্নেছা, পিতা আমিন উদ্দিন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে আবদুল লতিফ ছিলেন চতুর্থ। কোলকাতার ভূজঙ্গভূষণ বসুই তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু। আবদুল লতিফের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে সঙ্গীতমুখী করে তোলে। কোলকাতায় দীনেশ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় তিনি ওস্তাদ সুরেন্দ্র নাথ দাসের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বরিশালে ফিরে আসেন। সঙ্গীত পরিচালক আবদুল হালিম চৌধুরীর সহায়তায় তিনি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকায় গান গাওয়া শুরু করেন। অচিরেই তিনি সঙ্গীতজগতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আবদুল লতিফ বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে রেডিও প্রোগ্রাম বর্জন করেন। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা *আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কী ভুলিতে পারি . . .* এই গানটিতে প্রথম সুরারোপ করেন। এছাড়া তিনি ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে গানও রচনা করেন। আবদুল লতিফের দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনের অবসান ঘটে ২০০৫ সালে। তাঁর পুঁথি পাঠরীতি, লোকসঙ্গীত বর্তমান সময়েও সমধিক জনপ্রিয়। আবদুল লতিফ একাধারে শিল্পী, রচয়িতা এবং লোকবাংলার অন্যতম লোককবি।

www.pathagar.com

গত শতাব্দীর শেষার্ধে যে কয়েকজন লোকশিল্পী বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীতাঙ্গন সরব রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজাউল্লাহ বয়াতী, মফিজুদ্দিন, কলম ওরফে গোলাম আলী শরীফ, আবদুল কাদের বয়াতী, মোনাসেফ বয়াতী, খোরশেদ আলম, নগরমোল্লা, আজিমুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব লোকশিল্পী পূর্বসূরিদের রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের পাশাপাশি নিজস্ব সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন।

রাজাউল্লাহ: ঝালকাঠি জেলার উত্তর মগর গ্রামের রাজাউল্লা বয়াতী আলম বয়াতীয় শিষ্য। পরে তিনি নিজস্ব জারী ও আধ্যাত্মিক গানের দল গঠন করেছিলেন।

মফিজ উদ্দিন: ঝালকাঠি জেলার বালিঘোনার মফিজউদ্দিনও আলম বয়াতীর শিষ্য। পরে তিনি নিজস্ব দল গঠন করে ওস্তাদের সাথে বহু প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সফলতা লাভ করেন। *চাপান* জাতীয় কুশলতায় তার নাম স্মরণীয়।

কলম ওরকে গোলাম আলী শরীফ: তিনি আলম বয়াতীর পুত্র। অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের অধিকারী। গত শতাব্দীর ৩য় দশকে তিনি তাঁর সুরে বরিশাল অঞ্চল তথা আশপাশ এলাকার মানুষকে মোহিত করে রেখেছিলেন। এই গুণী শিল্পীর জন্মও ঝালকাঠি জেলায়।

আবদুল কাদের বয়াতী: ১৯৪৯ সালে তিনি জারীগান শুরু করেন। ৫১–তে নিজস্ব দল গঠন করেছিলেন। বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার বরাকোঠা গ্রামে সদাহাস্যময়, মৃদুভাষী বিনয়ী–বিনম্র এই জারী শিল্পী প্রথমজীবনে গৌরনদীর জারী শিল্পী খোরশেদ আলমের কাছে জারী, আধ্যাত্মিক, তত্ত্বসঙ্গীতে তালিম নেন। গুরুসঙ্গীত গাওয়ার পাশাপাশি তার নিজস্ব সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি এই সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি বরিশাল অঞ্চলসহ আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের জারি অঙ্গনে নিজস্ব পালা বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।

মোনাসেফ বয়াতী: আবুবকর বয়াতীর পুত্র মোনাসেফ অগাধ পণ্ডিত্য, অপার সুরমাধুরী এবং বেহালার সুর মুর্ছনায় এককালে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন দক্ষিণ লোকসঙ্গীতাঞ্চলকে। তাঁর স্থায়ী নিবাস ছিল ঝালকাঠি অঞ্চলে।

খোরশেদ আলম: বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বড়পাইকা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিরক্ষর খোরশেদ বয়াতীর জারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শালীনতা। অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

নাগর মোল্লা: ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা গ্রামে তার জন্ম। নাগরমোল্লা ছিলেন মোনাসেফ বয়াতীয় শিষ্য। শাস্ত্রীয় কূটতর্কে তিনি ছিলেন কুশলী। প্রতিপক্ষকে সুন্দরভাবে ঘায়েল করতে তিনি তার ওই অস্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর জারিতে এমন ধাঁধাঁ সৃষ্টি করতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক বিস্ময়ে ভাবতো এর বুঝি আর উত্তর নেই।

আজিমুদ্দিন: বরিশাল সদর উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রথমে তিনি কবিদলের হয়ে গান গাইতেন। পরে জারির দল গঠন করেন। শাস্ত্রজ্ঞানী আজিমুদ্দিনের বিকাশ জারির অস্তাচলের যুগে। তবুও তিনি পুরান বয়াতীদের মোকাবেলায় অনন্য নৈপুন্য দেখাতেন। আজিমুদ্দিনের সমসাময়িককালে বরিশালের উজিরপুর উপজেলার আবদুল কাদের বয়াতী ও মন্নান বয়াতী বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে বেড়াতেন।

পেয়ারা বেগম: পটুয়াখালী জেলার পাঙ্গাশিয়ায় ১৯৬৪ সালে পিয়ারা বেগমের জন্ম। মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই তিনি জারিশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে পটুয়াখালী এক্সজিবিশনে তিনি ছোট বয়সে গেয়ে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১১-জন সদস্য নিয়ে ওই অঞ্চলে একটি দল গঠন করেন।

১৯৭৭ সালের ২৪ থেকে ২৬ জুন এবং ১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে সরকারের জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত ছয়দিনব্যাপী লোকসঙ্গীত উৎসবে বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীত শিল্পীদের একটি বিরাট অংশ উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা হতে অংশগ্রহণ করেন জারিশিল্পী আবদুল মান্নান, আবদুল কাদের, জয়নাল আবেদীন, আজাহার বয়াতী, মতলেব, মোসলেম বয়াতী আলউদ্দিন বয়াতী, কিশোর জাকির

www.pathagar.com

হোসেন, মোশারফ হোসেন, রয়ানী গায়ক অনন্ত দেউরীর দল, কবিগায়ক রবীন্দ্রনাথ, মনিন্দ্র নাথ, পল্লীগীতি শিল্পী আনোয়ার হোসেন, নিত্যানন্দ, হাবিবুর রহমান, মোশারেফ হোসেন প্রমুখ।

জেলার গৌরনদী উপজেলার ইউসুফ বাউল, সুলতান বয়াতী, বেলায়েত বয়াতী, সৈয়দ আলী বয়াতী, মোসলেম বয়াতী, জয়নাল বয়াতী, কিশোর শিল্পী সাইফুল আলম প্রমুখ।

মুলাদী উপজেলার পল্লীগীতি শিল্পী ফরিদউদ্দিন, জারিশিল্পী হাচান বয়াতী, হাচেন বয়াতী, পল্লীগীতি শিল্পী এ ফারুক, আবদুল বাসেত, সিরাজল হক, সারি ও পুঁথি শিল্পী ফয়জুদ্দিন, রঙ্গরসশিল্পী কালাচাঁদ ও শ্যামসুন্দর প্রমুখ।

বরিশাল সদর থেকে অংশগ্রহণ করেন পল্লীগীতি শিল্পী আবদুল জব্বার (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী), রুনা লায়লা।

বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভাটিয়ালী শিল্পী আবুল হোসেন, বাবুগঞ্জের জারী শিল্পী মোশারেফ হোসেন, ধামশর গ্রামের জারী শিল্পী ভাসাই বয়াতী লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

লোকসঙ্গীত উৎসবে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা গ্রামের পল্লীগীতি শিল্পী ফোরকান আহমেদ, ঝালকাঠির জারী শিল্পী আবদুল বারেক এবং পটুয়াখালী জেলার পল্লীগীতি শিল্পী ইউনুস তালুকদার, জারীশিল্পী পিয়ারা বেগম অংশগ্রহণ করেন।

গুনাইবিবি'র গান: বরিশাল অঞ্চলের লোকসংগীতের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল গুনাই বিবি যাত্রাপালার গানগুলো। যা আজ অবধি লোকবাংলার ঘরে ঘরে গীত হয়। বরিশাল অঞ্চলের গণ্ডি পেরিয়ে গুণাই বিবি যাত্রাপালার মতো গুণাই'র গান গুলোও পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর, খুলনা এবং ময়মনসিংহের কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল।

গুণাইবিবি যাত্রাপালায় সংলাপ অপেক্ষা নৃত্য ও গীতেরই প্রাধান্য। সঙ্গীতই এই পালার প্রাণ। পালার গানগুলো পল্লী সুরে গীত হয়। কতগুলো গানের সাঙ্গে দোহারগণ সহযোগিতা করতেন। এ পালায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে দোতারা, বাঁশের বাঁশি, হারমোনিয়াম, খঞ্জনি, ঢোল ও করতাল ব্যবহৃত হতো।

প্রবাদ আছে-তোতামিয়া ও গুণাই বিবির কাহিনী কাল্পনিক নয়। বাস্তব ঘটনা। অনুসন্ধানে নিশ্চত হয়-ঘটনাটি বরিশাল জেলার ঝালকাঠিতে ঘটেছিল।

গুণাইবিবি'র গান:

তোতা: আমার ভুইলো না ভুইলো না
ওগো প্রাণেশ্বরী
আমার কথা মনে হলে যেও বরিশালের বাড়ি
আমার ভুইলো না প্রাণেশ্বরী
নয় লক্ষ টাকার জমিদারী বেঁচে মামলা কর জারী
তাতেও যদি না কুলায় বেচবো ঘর বাড়ী
আমায় ভুইলো না ভুইলো না ওগো প্রাণেশ্বরী।

গুণাই: আমি কাকে লইয়া যাইব থানায় গো বন্ধু নাহি মিলে
ও আমার অন্তর বিচ্ছেদ অনলে জ্বলে।
আমার নাইকো শ্বশুর ভাসুর
নাইকো শ্বাশুরী
বড় ভাই মরল দারুণ বিষে
ছোট ভাই নাই বাড়ী
ও প্রাণ গেলরে ...

www.pathagar.com

পুঁথি: কালের স্রোতে বরিশাল অঞ্চলে গীত অসংখ্য পুঁথি হারিয়ে গেলেও *আসমান সিং*-এর পুঁথি এ অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জানা যায়, বঙ্গদেশে বিদ্রোহ কিংবা জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধে দিল্লী থেকে সুজাউদ্দৌলাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুজার বিশ্বস্ত আফগান সেনা আসমান সিংহ যুদ্ধের রণদামামার বিরতিতে এক বাঙালি কন্যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। পরবর্তীকালে আসমান সিংহ স্ত্রী দুর্গার প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ায় এবং স্ত্রীকে হত্যা করতে গিয়ে নিজ সন্তানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল আসমান সিং-এর কাহিনী। যা পুঁথি, পালা বা যাত্রা আকারে বরিশাল অঞ্চলে গীত হত।

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার সুজাবাদের কেল্লায় এ ঘটনার সূত্রপাত। এ ট্রাজিক গীতগাঁথাই একদিন সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের মনে বেদনার সুর সৃষ্টি করেছিল। আসমান সিং পালায় ব্যবহৃত গানগুলো সে সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

গত শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত পটুয়াখালীর মীর্জাগঞ্জ উপজেলার মুন্সি আবদুর রহমান প্রণীত *ছহি হাসেম কাজীর পুঁথি*, মুহাম্মদ ইউসুফ রচিত *আবদুল আলী গারুলী* ও *নিবারণ সর্দারের পুঁথি* এ অঞ্চলের সৃষ্টি। বিষাদ সিন্ধুর কাহিনী অবলম্বনে *কারবালা ও ইমাম যাত্রা* বরিশাল অঞ্চলের মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা পেয়ে ছিল। এছাড়া সোনাভান, কালুগাজী, আমীর সাধু, কাছাসুল আম্বিয়া নামক পুঁথি এ অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছে। বরিশাল বিভাগের সর্বত্রই পুঁথি পাঠের প্রচলন ছিল। সন্ধ্যারপর মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে সুরে সুরে পুঁথি পাঠের দৃশ্য এক সময়ে দক্ষিণঞ্চলের লোক সংস্কৃতির অন্যতম আকর্ষণ ছিল। গয়নার নৌকায় যাত্রীদের চলতি পথে মনোরঞ্জনের জন্যও পুঁথি পাঠের প্রচলন ছিল। পটুয়াখালী অঞ্চলের জনপ্রিয় পুঁথির মধ্যে কালিকাপুর ইউনিয়নের ডিবুয়াপুর গ্রামের আবুল হোসেন মুন্সীর পাঁচটি পুঁথি অন্যতম। এগুলো হল- *হাকীকাতুল আম্বিয়া, ফয়সল আহকাম, জিকরনামা, আহকামুছ ছালাত, কুয়াতুল মুমিনীন*। এছাড়া ফৈজদ্দীনের *শবে মেরাজ*, শেখ কামরুদ্দিন রচিত *খায়রুল হাশার পুঁথি*, মুন্সি আশরাফ উদ্দিন রচিত *হাসেম কাজীর পুঁথি* পটুয়াখালী অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলে *ইউসুফ -জোলেখা, রহিম বাদশা-রূপবান*-এর মতো পুঁথি গীত হত।

এসকল পুঁথি কোনোরকম বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই গীত হত। দর্শক ও শ্রোতা পরিবৃত্ত হয়ে পাঠক পুঁথির শব্দমালায় সুর আর দোহারিকরা ধূয়া তুলতো। কাহিনীর বিশেষ বিশেষ ঘটনা সুরে সুরে বর্ণনার সময় দর্শক-শ্রোতারা বাহাবা দিতো। এ অঞ্চলের পুঁথি গুলো সাধারণত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যামক, তোটক ও চৌপদী ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আর লোক বাংলায় কোথাও দেখা যায় না প্রদীপ আলোয় পুঁথির আসর।

সনাক্তকৃত লোকবাদ্যযন্ত্রের তালিকা

একতারা, গোপীযন্ত্র, থুনথুনে, বেনা, দোতরা, সারিন্দা, খমক, ঢাক, ঢোল, খোল, ডুগডুগি, খঞ্জরি, ডফ, কাঁসি, জুড়ি, করতাল, খড়তা, চটি, পাইল্যা, বাঁশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাঁশি হিসেবে আড়বাঁশি, কদবাঁশি, হরিনাবাঁশি, পাতবাঁশি, মুখাবাঁশি, ভেপুঁ, তুবড়ি, শিঙ্গা, শঙ্খ ব্যবহৃত হয় বলে জানা যায়।

সুপারিশমালা

বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীতসমূহ রক্ষায় নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রন্থ করা যেতে পারে

১. সংগ্রহভিত্তিক: বই আকারে প্রকাশ, অডিও, ভিডিও, আলোকচিত্র, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২. সংরক্ষণভিত্তিক: জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে লোকসঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা, প্রকাশনা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. সামাজিক ধর্মীয় উৎসবে উপস্থাপন, সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগে উপস্থাপনের ব্যবস্থা, হাতীয়া লোকসঙ্গীত উৎসবের আয়োজন করা, বিভিন্ন মেলা ও জাতীয় দিবস উদযাপনে এবং সরকারি বেসরকারি গণমাধ্যমে উপস্থাপনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

৪. মেধাস্বত্ব প্রদান: শিল্পীদের মেধাস্বত্ব প্রদান করার মাধ্যমে লোকসঙ্গীত সংরক্ষণ, সংগ্রহ এবং প্রচার প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল, বিস্তৃতি এবং বর্তমান অবস্থা

ক্র. নং	গানের নাম	উৎপত্তিস্থল	বিস্তৃতি অঞ্চল	চলমান	বিলুপ্ত প্রায়	বিলুপ্তি
১	নাথ সঙ্গীত	প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ	...	...		বিলুপ্তি
২	রয়ানী	আগৈলঝাড়া উপজেলায় গৈলা গ্রাম	বরিশাল বিভাগ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, শরিয়তপুর	চলমান		
৩	ছড়াগান	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ	...	বিলুপ্ত প্রায়	
৪	দেবদেবীভিত্তিক সঙ্গীত	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ	চলমান		
৫	ধর্মাচারভিত্তিক সঙ্গীত	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ	চলমান	...	
৬	পারিবারিক উৎসবভিত্তিক সঙ্গীত	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ		বিলুপ্ত প্রায়	
৭	পীর পিরানীর গান	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ		বিলুপ্ত প্রায়	
৮	কৃষি সঙ্গীত	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ		বিলুপ্ত প্রায়	
৯	ওঝা নাচের গান	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ	...	বিলুপ্ত প্রায়	
১০	কর্ম সঙ্গীত	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	বরিশাল বিভাগ	চলমান		
১১	রাখাইন সঙ্গীত	পটুয়াখালী, বরগুনা	পটুয়াখালী, বরগুনা	চলমান		
১২	জাগরণমূলক গান	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	সমগ্র বাংলাদেশ	চলমান	...	
১৩	পালাগান	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	সমগ্র বাংলাদেশ	...	বিলুপ্ত প্রায়	
১৪	ব্যক্তিগত সঙ্গীত	বিভাগের বিভিন্ন স্থান	সমগ্র বাংলাদেশ	চলমান	...	

বরিশাল অঞ্চলের প্রাপ্ত তথ্যেরভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান:

ক্র.নং	গানের নাম	বই	ক্যাসেট	সিডি	ভিসিডি	প্রতিটির গড় মূল্য	মোটমূল্য
১	নাথ সঙ্গীত	১,০০০	---	---	---	১০০/-	১,০০,০০০/-
২	রয়ানী	১,০০০	২,০০০	২,০০০	২,০০০	১০০/-	৭,০০,০০০/-
৩	ছড়াগান	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	১০০/-	২,০০,০০০/-
৪	দেবদেবীভিত্তিক সঙ্গীত	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১০০/-	৪,০০,০০০/-
৫	ধর্মাচারভিত্তিক সঙ্গীত	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১০০/-	৪,০০,০০০/-
৬	পারিবারিক উৎসবভিত্তিক সঙ্গীত	১,০০০	১,০০০	১,০০০	৫০০	১০০/-	২,০০,০০০/-
৭	পীর পিরানীর গান	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	১০০/-	২,০০,০০০/-
৮	কৃষি সঙ্গীত	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	১০০/-	২,০০,০০০/-
৯	ওঝা নাচের গান	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	১০০/-	২,০০,০০০/-
১০	কর্ম সঙ্গীত	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	১০০/-	২,০০,০০০/-
১১	রাখাইন সঙ্গীত	৫০০	৫০০	৫০০	১,০০০	১০০/-	৫,০০,০০০/-
১২	জাগরণমূলক গান	২,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১০০/-	৫,০০,০০০/-
১৩	পালাগান	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	১০০/-	৯,০০,০০০/-
১৪	ব্যক্তিগত সঙ্গীত	৩,০০০	২,০০০	২,০০০	২,০০০	১০০/-	২,০০,০০০/-
১৫	আঞ্চলিক সঙ্গীত	২,০০০	২,০০০	২,০০০	২,০০০	১০০/-	৮,০০,০০০/-
১৬	লোকসঙ্গীত উৎসবভিত্তিক বার্ষিক আয় আঞ্চলিকভাবে বছরে ৫টি উৎসব					২০,০০০/-	১,০০,০০০/-
						মোট মূল্যমান টাকায়	৫৭,০০,০০০/-

উপসংহার

লোকসঙ্গীত বাঙালি জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। এসব সঙ্গীত আমাদের যথার্থ পরিচয়ের ঠিকুজি। লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, উপস্থাপনা, গবেষণাসহ সার্বিক আবিষ্কারের মাধ্যমেই আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ উন্মোচিত হবে। আর তাতেই ঘটবে বিভ্রান্ত বাঙালির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

www.pathagar.com

গ্রন্থপুঞ্জি

১. বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩
২. বাখেরগঞ্জের ইতিহাস, খোসাল চন্দ্র রায়
৩. বরিশালের বিবরণ, ঈশ্বরগুপ্ত
৪. বাকলা, রোহিনী কুমার সেনগুপ্ত
৫. বরিশাল জেলা লোকসাহিত্য, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও সৈকত আজগর
৬. বরিশালের ইতিহাস, সিরাজউদ্দিন আহম্মেদ
৭. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল, হীরালাল দাশগুপ্ত
৮. *History of Bakarganj*, H. Beveridge
৯. চারণ কবি মুকুন্দ দাস, ড. জয়গুরু গোস্বামী
১০. বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগলিক পরিবেশ, হাবিবুর রহমান
১১. পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি, মুস্তফা মজিদ
১২. পটুয়াখালীর লোকসাহিত্য, আ.জ.ম. সিকান্দার মোমতাজী
১৩. কর্ষণ, সম্পাদক: মিজান রহমান
১৪. সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ, বরিশাল
১৫. আনন্দ লিখন, সম্পাদক: সৈয়দ দুলাল এবং একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

৬

ময়মনসিংহ অঞ্চল

৬.১ কিশোরগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত

প্রিন্স রফিক খান

ভূমিকা: বৃহত্তর জেলা ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চল নিয়ে ভাগ হয়ে গেছে যে বর্ধিষ্ণু জনপদ তারই বর্তমান নাম জেলা কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ-বৃহত্তর ময়নসিংহের পূর্ব-ময়নসিংহ বলেও পরিচিত। এ জেলার বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির পলিমাটির মতোই একদিকে গভীর জলরাশি বেষ্টিত নিম্ন জলাভূমির বিশাল হাওর অঞ্চল অন্যদিকে উচ্চ টিলাযুক্ত বালুকাময় চরাঞ্চল ভূমির সমৃদ্ধ উজান এলাকার দৃশ্য কিশোরগঞ্জ জেলাবাসীকে দান করেছে হাজার বছরের লোকসঙ্গীতের নানান ধারার লোকগান যা গর্ব করার মতোই ঐতিহ্য। লোককথা, রূপকথা, উপকথা, ধাঁধাঁ, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, উপাখ্যান, কিংবদন্তি, নানান নৃত্য, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র, আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংস্কার বিভিন্ন বিশ্বাস, খেলাধুলা ইত্যাদি লোকঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

লোকসঙ্গীত লোক সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ সঙ্গীত বাংলাদেশের প্রাচীন এবং প্রধানতম সঙ্গীত। নিরক্ষর দরিদ্র ও শোষিত মানুষই লোকসঙ্গীতের জনক-ধারক-বাহক। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত লোক কবির সহজ সরল ভাব স্বর-সুর হলো লোকসঙ্গীতের প্রাণ।

মানুষের জাতিতাত্ত্বিক গোত্র ও গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মীয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গ্রন্থি উন্মোচন করছে লোকসাহিত্যের এই অন্যতম প্রাচীন শাখা লোক সঙ্গীত। এ সঙ্গীত মূলত বাউল, ভাটিয়ালি, বিরহ, বিচ্ছেদ, সাধন সঙ্গীত, নিগম সঙ্গীত, বৈষ্ণব সঙ্গীত ইত্যাদি হতদরিদ্র নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের কাছে এ সঙ্গীতের আবেদন চিরায়ত। বাংলার লোক সমাজ থেকে সৃষ্ট সঙ্গীতই লোকসঙ্গীত। এ সঙ্গীতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো জেলা কিশোরগঞ্জের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পালা কাব্যে উল্লেখ আছে, "বাঙ্গালীর গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গান" ছিল সেকালের প্রাচুর্যের পরিচয়। হাজার বছর ধরে কিশোরগঞ্জে গড়ে উঠেছে লোকসঙ্গীতের এক বিশাল ভাণ্ডার। ফলে এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের কথা কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে "মৈমনসিংহ গীতিকা"র– মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দস্যু কেনারামের মতো বিখ্যাত পালা কাব্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রাচীন নিদর্শন 'চর্যা বা চর্যাপদ'কে বলা হয় 'চর্যাগীতি'। এই চর্যাগীতিকে বাংলাদেশের প্রাচীনতম লোকসঙ্গীত শাস্ত্রীয় সাহিত্য বলে শনাক্ত করা হয়েছে। চর্যাপদের লোককবি ভূসুকুই প্রথম প্রাচীন "বাঙ্গাল রাগ" বাউল-ভাটিয়ালির সুর ও কথার সন্ধান করে এ তথ্য চর্যাপদে উল্লেখ করেছিলেন। তাই এ সঙ্গীত সাহিত্য 'বৌদ্ধ দোহা বা বৌদ্ধ গান' নামে বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। চর্যাগীতির ভিত্তি ভূমির উপরই বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতির সোপান নির্মিত হয়েছে। তেমনি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বৃহত্তর ময়মনসিংহের ভৌগোলিক অবস্থান পূর্ব-ময়মনসিংহ নামে খ্যাত ও পরিচিত আজকের জেলা কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার হাওর অঞ্চল বলে চিহ্নিত ভাটি কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকগান-গীত-কিস্‌সা-কাহিনীর অবলম্বনেই রচিত হয়েছে মৈমনসিংহ গীতিকা।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ একটি প্রাচীন জনপদ। এর একদিকে ঐতিহাসিক বীর কেশরী ঈশা খানের বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য, এবং মানসিক মহানুভবতা যেমন এখানকার ইতিহাসকে দিয়েছে অসাধারণ গৌরব, তেমনি এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে রচিত লোকসঙ্গীত মিশ্রিত মৈমনসিংহ গীতিকার গীতি কবি চন্দ্রাবতী, মনসুর বয়াতী ও নয়ন চাঁদ ঘোষের পালা গানের লোক সঙ্গীত চর্চায় জেলা কিশোরগঞ্জ অর্জন করেছে এক অনন্য সাধারণ মহিমা।

কিশোরগঞ্জ জেলা দু'টি অংশে বিভক্ত। একটি উজান অঞ্চল অন্যটি ভাটি বা হাওর অঞ্চল নামে পরিচিত। ভাটি কিশোরগঞ্জের মানুষের আদি এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র মাধ্যম হলো নদী ও নৌকা। প্রবাদ আছে "বর্ষায় নাও, হেমন্তে পাও"। এ অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার তাগিতে মানুষ নদীপথে সকাল-সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পরে কত নানা ধরনের নানান নামের নৌকা বেয়ে। যেমন: কোষা, ডেঙ্গি, উদলা, ছইয়াওয়ালা, পানসি, পাতাম, সরঙ্গা, গইছতা, রপ্তানি, দৌড়ের নাও, কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় কুন, কোষা, কোন্দা ইত্যাদি। ভাটি কিশোরগঞ্জের জনপ্রিয় সঙ্গীত ভাটিয়ালি। এ লোকসঙ্গীতের মর্মমূলে একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে নদী ও নৌকার চেতনা। সাগর সদৃশ 'বড় হাওর' পাড়ি দিতে বর্ষাকালে মাঝি-মাল্লাদের মাথার উপর থাকে উদাম আকাশ আর চোখের সামনে থাকে উদাস করা দীর্ঘ দরিয়া। এ দৃশ্য দেখে হাওর নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোট ৬টি জেলার প্রায় ৩৩টি হাওর উপজেলার মানুষজন ছাড়াও সুদীর্ঘ কাল ধরে হাওর নদীপথে পণ্যবাহিত নৌকার মাঝি-মাল্লারা ভিনদেশী ব্যবসায়ী অথবা স্থানীয় ধান-পাট ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যবসায়ী-বেপারি-মাঝি-মাল্লা-দাঁড়ি-সাড়ি গান গেয়ে তারা যখন ভাটির স্রোতে হাল ধরতো তখনি হয়তো কোন এক কালে তাদের অলসদেহের কাব্যিক মনের কণ্ঠ থেকে সৃষ্ট আকুল করা এই ভাটিয়ালি গান এদেরই অনন্য অবদান। এ ছাড়াও এ অঞ্চলের আউল, বাউল, মুর্শিদি, মারেফতি, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ঘাটু, নৌকা বাইচের গান, বদর পীরের গান, বৈষ্ণব গান, খিজির পীরের গান, পালা গান, শাহ্ কলন্দরের গান, মাদার বাঁশের গান, ভাসান গান, মনসা মঙ্গলের গান, পদ্মপুরানের গান, বেহুলা-লক্ষিন্দরের গান, পীর-ফকিরের গান, আখড়াই গান, কিস্‌সা কাহিনী, পুঁথি পাঠ তাদের নির্মোহ মনের স্বত:স্ফূর্ত পরিচয় রয়েছে। ভাটিয়ালি গানের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

> বাপের বাড়ি ছাড়িয়া কন্যা শশুর বাড়ি যায়
> নাও গলুইয়ের পিছন দিয়া ফিরে ফিরে চায়

অথবা

> বাপের বাড়ির পানসি রে কোথায় চল্যা যাও
> মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও।

অথবা

> ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া যাও
> ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা তামাক খাইয়া যাও
> পান খাইয়া যাওরে বন্ধু, তামাক খাইয়া যাও।

এতসব লোকসঙ্গীতের সুনির্দিষ্ট লেখক বা লোক গায়ক কবিদের পরিচয় অথবা গানের উৎস স্থল চিহ্নিত করা আজ আর সম্ভব নয়। এগুলো যুগ যুগ ধরে সমাজের সর্বজনীন সম্পদ রূপে বেঁচে আছে, তবে জেলা কিশোরগঞ্জে অনেক লোকায়ত লোকগায়ক কবিদের পরিচয় পাওয়া যায়, যারা লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি দান করেছে। এদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাশ, চন্দ্রাবতী, প্রাচীন মধ্যযুগীয় গায়ক কবি ছাড়াও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত গায়ক লোক কবি মামুদ জান ফকিরের নাম উল্লেখযোগ্য। মামুদ জান ফকিরের অসংখ্য গান ভাটি কিশোরগঞ্জের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ:

www.pathagar.com

জলে যাওয়া বর্শি বাওয়া
সন্ধান যদি পাইতাম গো
জলে বর্শি বাওয়া যাইয়াম।

অথবা

মন রইল মোহিনী রূপে
ধরতে পারি কি প্রকার
ভব নদীর না দেখি কিনার।

কটিয়াদী উপজেলার কুড়িখাই বা কুড়িগাই নামক এলাকায় রয়েছে মধ্যযুগীয় একটি প্রাচীন মাজার। এ মাজারকে কেন্দ্র করে এখানে শত শত পীর-ফকির-দরবেশগণ হযরত শামছ উদ্দিন বোখারি ও তার প্রধান শিষ্য শাহ কলন্দর, শাহ কবির, শাহ মাদার পীর প্রভৃতির উরস উপলক্ষে লোকসঙ্গীত গাওয়া হয়। এ উৎসবমুখর পরিবেশে দূর-দুরান্ত থেকে সুফিবাদী পীর ফকিরগণ উচ্চ স্বরে মুখে মুখে 'হেল কুড়িগাই-হেল কুড়িগাই' গানের ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে এক মহা উৎসবে মেতে ওঠেন। এসব অনুষ্ঠানে অন্য যেসব লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে:

হল ধরি মাস কলন্দর
মাস-মাস-মাস কলন্দর
বো-আলী-শাহ কলন্দর।

অথবা

খেঁচিয়া উঠিল মাদার ব্রহ্মতালু হইতে
দম মাদার বলিয়া নাম রহিল দুনিয়াতে
দমেতে খেঁচিয়া মাদার দম মাদার হইল
কালে কালে সেই নাম জাহের রহিল।

এ ছাড়াও নাম না জানা প্রাচীন লোক গায়ক কবিদের গানের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন:

ভাটি কিশোরগঞ্জের কত পানি রে
বাড়ি ঘর ভাঙ্গে ঢেউ বাতাসে
ঘায়েল দেইখ্যা চাইয়া থাকি
আমারে বাঁচাইতে নি কেউ আসে-রে।

অথবা

আরে ও ভাইট্যাল গাঙ্গের নাইয়া
তুমি কোনবা কইন্যার দেশে যাও রে
ঘোড়াউত্রা গাঙ বাইয়া।

অথবা

উজান দেশের মাঝি ভাইধন
ভাটির দেশে যাও
বাজানেরে কইও খবর
দেখা যদি পাও।

জেলা পরিচিতি

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা কিশোরগঞ্জ। এতে রয়েছে ১৩টি উপজেলা। এই ১৩টি উপজেলার ৩টি পুরোপুরি মেঘনা নদীর অববাহিকায় সমুদ্রসদৃশ বিশাল হাওর। ৬টি উপজেলার অংশ বিশেষ হাওর নিয়ে মোট ৯টি উপজেলাসহ এ বিশাল নিম্নাঞ্চল ভাটি বলে কথিত। ভাটি অঞ্চল বাদে বাকি ৪টি উপজেলা

www.pathagar.com

মোটামুটি উচ্চ ভূমি। কোথাও কোথাও ব্রহ্মপুত্র নদের বিশাল বালুকাময় চরাঞ্চল। পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর এলাকায় রয়েছে লাল মাটি ও ছোট ছোট টিলাযুক্ত উচ্চ ভূমি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের বাড়ি ঘর মাটির তৈরি। অন্যদিকে, হাওর বা ভাটি অঞ্চলের অষ্টগ্রাম উপজেলায় রয়েছে প্রাচীন বাঙ্গাল পাড়া নামে জনপদ ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির চিহ্নিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের অধিবাসীকে কিশোরগঞ্জের উজান অঞ্চলে 'ভাটি-ভাইট্যা-বাঙ্গাল' জনগোষ্ঠী নামে কথিত হয়। বাংলাদেশে 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জেলা কিশোরগঞ্জে এর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। বিলুপ্ত হাওর উন্নয়ন বোর্ডেরই অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম প্রধান অঞ্চল জেলা কিশোরগঞ্জ। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক লেখক ও গবেষক সৈয়দ আলী আহসান তার 'লোকসংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে লিখেছেন "বৃহত্তর ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে অর্থাৎ যারা জেলা কিশোরগঞ্জে এবং নেত্রাকোণা হাওর অঞ্চলে বাস করতো তাদের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ তেমন ছিল না বললেই চলে। তাদের জীবনে একটা ইনস্যুলারিটি নির্মিত হয়েছিল যাকে বাংলাতে বলা যায় একাত্মতা। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে ভাটির হাওর অঞ্চলে তারা নিজেদের জীবনে একটা বিশেষধরনের সংস্কৃতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধুতাই নয় সৈয়দ আলী আহসান প্রাচীন ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চল বলতে আজকের জেলা কিশোরগঞ্জকে প্রাচীন লোকসংস্কৃতির লালনভূমি হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। (দ্রষ্টব্য: শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত "বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি" ১৯৮৫ ঃ ৫২৬নং পৃষ্ঠা।) ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা কিশোরগঞ্জের উপজেলা সমূহের নাম যথাক্রমে: কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, নিকলী, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, ভৈরব, অষ্টগ্রাম, ইটনা ও মিঠামইন।

ভৌগোলিক অবস্থান: এ জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলা। দক্ষিণে নরসিংদী জেলা। পূর্বে হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। পশ্চিমে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার অংশবিশেষ সংযুক্ত। জেলা সৃষ্টির তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

ঐতিহাসিক: ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে বাংলার বার ভূঁইয়া প্রধান বীর ঈশা খাঁর নিকট জঙ্গলবাড়ির কোচ-রাজা লক্ষণ হাজরার পরাজয়, মোগলদের সঙ্গে ঈশা খাঁর দীর্ঘ দিনের সশস্ত্র সংগ্রাম, এগারসিন্দুর দুর্গে কোচ রাজা অহম এর পরাজয়, -- যশোদল পুর কালিকা মৌজার তান্ত্রিক রাজা গোবর্ধনের পরাজয়, কটিয়াদী অঞ্চলের চারিপাড়া রাজা নবরঙ্গ রায়ের পরাজয় -- এসব ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘনঘটার ধারাবাহিকতাই জেলা কিশোরগঞ্জের প্রাচীন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও বিবর্তন ধারার ইতিহাস। মধ্যযুগের ইতিহাসের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চলে এসে তাদের নীলকুঠি স্থাপন করে এ অঞ্চলে তাদের শাসনাধীন যুগের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে বৃহত্তম ময়মনসিংহের জেলা সৃষ্টি হলে এখানকার শাসন সংরক্ষণের জন্য তৎকালীন মুগল আমলের সৃষ্ট পরগনাসমূহে থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান জেলা কিশোরগঞ্জে সর্বপ্রথম দুটি থানা স্থাপিত হয় এর একটি নিকলী অন্যটি বাজিতপুর। তখনও কিশোরগঞ্জ নামে কোন 'গঞ্জ' বা 'থানা' অথবা 'মহকুমা' কোনো কিছুরই নামের সৃষ্টি হয় নি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ নামে মহকুমা সৃষ্ট হলে আমরা প্রথম জানতে পারি এ এলাকায় তিনটি থানার অস্তিত্ব রয়েছে এর একটি নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ। অর্থাৎ কিশোরগঞ্জ থানা ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে একই দিনে থানা ও মহকুমা সৃষ্টি হয়। ময়মনসিংহ জেলা সৃষ্টি হয় ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে। ভারতীয় উপমহাদেশের এক সময়ের বৃহত্তর জেলার নাম ময়মনসিংহ। এই ময়মনসিংহ জেলারই বর্তমান খণ্ডিত অংশের নাম জেলা কিশোরগঞ্জ।

সামাজিক: কিশোরগঞ্জে সমাজ কাঠামো, সমাজ বিন্যাস, সামাজিক শ্রেণী ও বৈশিষ্ট্যে কিশোরগঞ্জ শহরটি একসময় ছিল হিন্দু-মুসলিম-জমিদার-তালুকদার ও ব্যবসায়ী প্রধান। শিক্ষা-দীক্ষায় তারাই থাকতো অগ্রণী ভূমিকায়। সামাজিক কাঠামো বলতে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল: এক. জমিদার শ্রেণী; দুই. প্রজাকুল। এখানকার পুরুষরা প্রধানত লুঙ্গি, গেঞ্জি, শার্ট, পাঞ্জাবি পরিধান করে। শিক্ষিত শ্রেণী ধুতি, প্যান্ট,

www.pathagar.com

পায়জামা, কোট-শার্ট এবং বেশিরভাগ শার্ট-প্যান্ট ও পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি পরিধান করে। মহিলারা শাড়ি, ব্লাউজ ছাড়াও অল্প বয়সের মেয়েরা জামা, ফ্রগ, স্কার্ট ইত্যাদি পরে থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, সেলোয়ার, কামিজ ইত্যাদি পরিধান করেন বেশি। ধনী পরিবারের মহিলারা স্বর্ণের চুড়ি, গলার হার, চেইন, কানের দুল, ব্রেসলেট ইত্যাদি ব্যবহার করেন। গ্রামের গরিব লোকেরা সাধারণত রূপার তৈরি জিনিস-পত্র ছাড়াও কাঁচের চুড়ি ও প্লাস্টিকের চুড়ি ব্যবহার করেন। শহরের লোকেরা বর্তমানে জুতা, মোজা পায়ে ব্যবহার করলেও এককালে রাবারের স্যান্ডেল এবং কাঠের তৈরি বৌলাওয়ালা খড়ম ব্যবহার করতেন। গ্রামের গরিব লোকেরা সাধারণত খালি পায়েই চলাফেরা করে থাকেন। বর্তমানে রাবারের স্যান্ডেল বা স্পঞ্জ জুতা ব্যবহার করেন। পূর্বে কঠের স্যান্ডেল হিসেবে গ্রামের লোক জন খড়ম ব্যবহার করত, যা বর্তমানে আর দেখা যায় না। কিশোরগঞ্জ জেলা শহর এক কালের মহকুমা শহরের একটি মহল্লায় তৎকালীন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক ভ্রমণের সময় পায়ে বৌলাওয়ালা খড়ম ব্যবহার করতেন বলে এ এলাকাটির নামকরণ ক্রমে ক্রমে 'খড়মপট্টি' হিসেবে নামকরণের পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান যুগে এই খড়মপট্টি অঞ্চলটি একটি অভিজাত শ্রেণীর অঞ্চল হিসেবে খ্যাত ও পরিচিত। কিন্তু নামকরণ তার সেই খরমপট্টি নামেই পরিচিত।

নৃতাত্ত্বিক: কিশোরগঞ্জ জেলার সদর এলাকার একটি জনপদে এক কালে রাখক্ষাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস থেকেই বর্তমান জনপদের নামকরণ হয়েছে রাখক্ষাইন উচ্চারণ থেকে রাখুয়াইল এলাকা। বনয়ারী জনগোষ্ঠী থেকে উদ্বুদ্ধ নামকরণ থেকে নিকলী ও কটিয়াদী উপজেলার দু'টি অঞ্চলের নামকরণ রয়েছে বনয়ারী থেকে উচ্চারণ বিকৃতি বা বিবর্তনে বর্তমানে বুনা~ভুনা নামের এলাকা। নাগ জনগোষ্ঠী থেকে নামকরণ হয়েছে কটিয়াদী উপজেলার বর্তমান নাগের গাঁও এলাকা। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী থেকে উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে বর্তমান নামকরণ হয়েছে জেলা সদর কিশোরগঞ্জের একটি এলাকার নাম সাঁওতাল থেকে সঁতাল। মণিপুর জনগোষ্ঠী থেকে মণিপুর নামটি আজও জেলা সদর কিশোরগঞ্জ শহরস্থ একটি বিখ্যাত অঞ্চলের নামকরণ রয়েছে মণিপুর ঘাট। হদি জনগোষ্ঠীর বসতি থেকেই অনেক গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন বর্তমান কটিয়াদী নামকরণটিও হদি জনগোষ্ঠীরই একটি রূপান্তর। অনুরূপ নিকলী উপজেলায় একটি জনপদের নামকরণ রয়েছে সাঁওতালি ভিটা। এ থেকে অনুমান করা যায় যে আলোচ্য এ অঞ্চলে প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বংশধারারই একটি বিবর্তন ধারা বর্তমান জনগোষ্ঠীর হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান জাতিধারার একটি সমাজ নির্মিত হয়েছে।

জনসংখ্যাগত: কিশোরগঞ্জ জেলার জনসংখ্যা সর্বমোট ২৫,৫৮,২৪০ জন। পুরুষ ১৩,০৪,১৬০ জন এবং মহিলা ১২,৫৩,০৮০ জন। জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যানে আদি থেকে আধুনিককালেও এ অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে ধর্মভিত্তিক সঙ্গীত তথা সংস্কৃতিচর্চা ও সম্প্রীতির সুফল রয়েছে। এর প্রমাণ বা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ অঞ্চলে রচিত মনসা মঙ্গল গান, পদ্মপুরাণ গান, পুঁথি গান ও মৈমনসিংহ গীতিকার লোক সাহিত্য ও লোকসঙ্গীত। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান পাশাপাশি বসতি স্থাপন করছে। তারা পরস্পর প্রীতির মাধ্যমে প্রভাবিত করছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়শ্রেণী একে অন্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। একে অন্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কখনও বাধা সৃষ্টি করে না।

বংশগত: কিশোরগঞ্জ জেলায় হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী অনেক সম্প্রদায় গোত্র ও বর্ণে বিভক্ত। যেমন: কামার, কুঁড়ি, কসবি, কাঁহার, কুরমী, কাপালী, কারকুন, কালোয়ার, কায়স্থ, কৈবর্ত, কৈরী, বাজপেয়ী, বারুই, বসাক, বণিক, বর্মণ, ভৌমিক, চৌহান, বিন্দ, বৈষ্ণব, বৈরাগী, বিশ্বাস, বকশি, আচার্য, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, চামার, চাঁড়াল, ঋষী, হরিজন, নাগরচি, নাপিত, গোপ, গোয়ালা, ঘোষ, গোস্বামী, মুচি, মোহন্ত, মাঝি, ডোম, দেবনাথ, ধোপা, নমশুদ্র, দত্ত, দে, নন্দী, পণ্ডিত, পোদ্দার, পাটনী, পাল, শীল, সাহা, সুত্রধর, মাল, মালাকার, মালি, মল্লিক, মণ্ডল, যোগী, জেলে, সিকদার, মুন্সি, বারুই প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতি গোষ্ঠী হিসেবে উক্ত পদবীযুক্ত বর্ণ ও গোত্রসমূহের লোকজনের পরিচয় এ জেলায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ গোষ্ঠী বা বর্ণের পদবীযুক্ত লোকজনের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন: দেওয়ান, খান, দাদখান, খাঁ, ঠাকুর, কারার, কাঁহার, কুলু, কসবি, কারকুন, মিস্কি, মাইমল, মল্লিক, আকন্দ, খন্দকার, মাজি, মোল্লা, মগ, মলং, মুন্সি, মিয়া, মণ্ডল, ভূঁইয়া, বেপারি, বক্‌স, বিশ্বাস, বৈদ, তরফদার, তেলী, তাঁতী, জোলা, জাল, নাগারচি, বৈদ, শেখ, সৈয়দ প্রভৃতি জনগোষ্ঠী জেলা কিশোরগঞ্জে তাঁদের নামে জনপদ ও জনবসতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

পেশাগত: বর্তমান যুগে প্রাচীন পেশাগত মানুষের বংশ ও গোষ্ঠীগত পেশা এ যুগে এখন আর নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ সমাজ পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের বংশ ও গোষ্ঠীগত পেশাও পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে বংশপরম্পরায় যাদের যে বংশ বা গোষ্ঠীগত পেশা ছিল তা অনেকের মাঝে প্রচলিত আছে আবার অনেকের মাঝে নেই।

ধর্মীয়: ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জেলা কিশোরগঞ্জের উপজেলা কটিয়াদী অঞ্চলের বনগ্রাম ইউনিয়নের নাগের গাঁও নামক একটি বিখ্যাত গ্রামে 'কাদেয়ানি' সম্প্রদায়ের বসবাস ও বসতি রয়েছে। তাদের নামের শেষে ব্যতিক্রমী কোনো পদবি দেখা যায় না। তবে এরা মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য একটি প্রাচীন গির্জা রয়েছে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার গাইটাল নামের শিক্ষকপল্লী এলাকায়। এটি বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের অধীনে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, এ গির্জার পাশে তাদের নিজস্ব ভূমিতে একটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কবরস্থানও রয়েছে। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী পদবী বা উপাধি দেখা যায়, যেমন: এ এলাকার জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান ঈশা খাঁ কর্তৃক তৎকালীন কিশোরগঞ্জে শ্রীমন্ত বাবুকে 'শ্রীমন্ত খাঁ উপাধি' বা নামকরণ প্রদান করেছিলেন। হিন্দুদের জমিদারি প্রদান করে তৎকালীন সময়ের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা 'কারকুন' উপাধি প্রদান করেন। গাইটাল কিশোরগঞ্জের হিন্দুদের মাঝে 'বীর" উপাধি প্রদান করে মুসলিম জমিদারেরা বীর বাড়ি নামকরণ ও বাজিতপুর উপজেলার দিঘির পাড় এলাকার "ঘোষ" পরিবারকে "ঘোষ খাঁ" উপাধি প্রদান করেছিলেন। বর্তমানেও এ সম্প্রদায় ঘোষ খাঁ বাড়ি নামেই পরিচিত রয়েছে। এই ঘোষ পরিবারের একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম "ধনঞ্জয় ঘোষ খান"। তারই বংশধর বর্তমানে এড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র ঘোষ খান একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে আজও সেই খেতাবে বা পদবী যুক্ত পরিচয়ে সগৌরবে জেলা কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে বসবাস করছেন। আর এসব পদ ও পদবী প্রদান করেছিলেন বাংলার অন্যতম ভৌমিক বীর ঈশা খাঁ। বীর ঈশা খাঁ কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ি নামক এলাকায় ভাটি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করে। পরবর্তীকালে তার বংশধরগণ এখনও কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি, হয়বতনগর, বাজিতপুরের ভাগলপুর, অষ্টগ্রামের আদমপুর ও ইটনা দেওয়ান বাড়িতে বসবাস করছেন। কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। এটি বাজিতপুর উপজেলার হিলচিয়া নামক এলাকায় অবস্থিত। এই মন্দিরটি বর্তমানে হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীবলম্বিদের অধীনে মন্দির বা আখড়া হিসেবে পরিচালিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের কোনো লোক বা সদস্য এ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখা যায় না। তবে এককালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধদের স্থায়ী বসতি ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে এ মন্দিরটির অস্তিত্বে।

সাংস্কৃতিক: কিশোরগঞ্জ জেলায় এককালে আদিবাসীদের বসতি ছিল। কিন্তু এখন আর এই অঞ্চলের আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু তাদের ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল এই ঐতিহ্য। বিশেষ করে কিশোরগঞ্জ হচ্ছে মৈমনসিংহ গীতিকার এক বিশাল ভাণ্ডার। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাচীন বাংলা ভাষায় নাথ-ধর্মীয় বিভিন্ন নাথ গীতিকা বা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জনপদ থেকে বিগত উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিকলী উপজেলার ষাইটধার নামক এলাকার আখড়া থেকে চন্দ্রনাথ গোসাই-এর হস্তলিখিত নাথ-ধর্মীয় গীতিকা *হাড়মালা*-এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও অন্যান্য অঞ্চল

www.pathagar.com

থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নাথ গীতিকাগুলো হলো হাড়মালা, যোগধর্ম, যোগমালা ও যোগধর্মরহস্য। উল্লেখ্য যে, নিকলী উপজেলার ধারীশ্বর নামক গ্রাম এলাকার আখড়া থেকে এককালে জগন্নাথ গোসাই-এর হস্তলিখিত হাড়মালা নামক নাথ-ধর্মীয় গীতিকা পাওয়া গিয়েছিল। এসব গীতিকাগুলো বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। এ জেলার আঞ্চলিক মেয়েলি গীত লোককিস্‌সা, লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, লোক বিশ্বাস, লোক সংস্কার, লোক কুসংস্কার, লোক পালা গান, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, সিলুক, ছড়া ইত্যাদি লোকসাহিত্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে। বাংলা ভাষায় যাকে আমরা লোকসাহিত্য বলি তার অন্যতম শাখা লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতে কিশোরগঞ্জের ভাটিয়ালি, বাউল, মারেফতি, মুর্শিদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গান মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত এবং প্রচলিত আছে। লোক সাহিত্যের যেমন দুটি ধারা রয়েছে একটি মঙ্গল কাব্য, মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্যদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শিতলামঙ্গল, সতীমঙ্গল প্রভৃতি অন্যদিকে পীর-পাঁচালী, পুথি-পাঠ, লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, লোক ছড়া, লোক গান, লোক প্রবাদ, লোক প্রবচন, লোক ধাঁধাঁ, লোকতন্ত্র, লোকমন্ত্র এ জেলায় ব্যাপকভাবে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত এবং প্রচলিত আছে।

কাহিনী-কিংবদন্তি: মৈমনসিংহ গীতিকার লোক সাহিত্যের অধিকাংশ পালাগাল রচনা করেন কিশোরগঞ্জের কবিকন্যা চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতীর পিতা ছিলেন মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কবি দ্বিজ বংশীদাস। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাসমূহের মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও দস্যু কেনারাম-এর পালা কাব্যে বর্ণিত গ্রাম হাওর বিলসমূহ জেলা কিশোরগঞ্জের মধ্যে পড়েছে। তাছাড়া দেওয়ানা-মদিনার পালাকাব্যে কিশোরগঞ্জে জেলার ভাটি অঞ্চলের ইটনা উপজেলার ধনু নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে। কিশোরগঞ্জের কবি চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যে প্রথম অন্যতম রামায়ণ রচয়িতা। এই রামায়ণ গানই কিশোরগঞ্জের এই মহিয়সী কবিকন্যাকে চির অমর করে রেখেছে। কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বাংলাদেশের অন্যতম লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী কিশোরগঞ্জের লোককথা, লোককাহিনী, লোকগল্প, লোকবিশ্বাস, লোকশ্রুতি, লোকগাঁথা, লোকগান ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। এছাড়াও কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানদের রচিত মনসামঙ্গল, পদ্মপুরাণ, পুথিপাঠ ও রামায়ণ ইত্যাদি প্রাচীন লোকসঙ্গীত এ অঞ্চলের ঘরে ঘরে গীত হতে আজও শোনা যায়।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা

অ– অধিবাসের গীত, অন্নপ্রাসনের মঙ্গল গীত, অষ্টমাসী গান, অখিল ঠাকুরের গান, অমর শীলের গান।

আ– আখড়ার কীর্তন গান, আদুরীনাথের গান, আঞ্চলিক গান, আবেদ আলী বয়াতীর গান, আমির উদ্দিনের গান, আলোমতি গান।

ই– ইসলামী গান, ইসলাম উদ্দিন ফকিরের গান, ইন্তাজ ফকিরের গান।

উ– উদাস গান, উড়ি গান, উৎসবমূলক গান, উপস্থিত গান।

ঋ– ঋষি গান, ঋষি সম্প্রদায়ের গান, ঋতুভিত্তিক গান।

এ– একতারার গান, এক দিল শাহের গান, এক নাম কীর্ত্তন।

ও– ওঝার গান, ওমালীর গান।

ক– কবিগান, কবিরাজি মন্ত্রের গান, কালী পুজার গান, কনে-বর আসার গান, কনে-বর বাহিরকরার গান, কনে সাজানোর গান, কার্তিক ব্রতের গান, কার্তিক পুজার গান, কালী কীর্তন গান, কানা বাছিরের গান, কুমারী ব্রত গান।

খ– খৎনা গীত, খাজাবাবার গান, খেপু বয়াতির গান, খেলার গান, খেমটা নাচ গান, খোয়াজ খিজিরের গান, খইন্তা পাগলের গান, খেত নিড়ানীর গান, খনার বচন গান।

www.pathagar.com

গ- গম্ভীরা গান, গাজনের গান, গাজী পীরের গান, গাজী পটের গান, গাডু গান, গোঁসাই গান, গাড়োয়ালী গান, গোরমা গান, গায়ে হলুদের গান, গরু চিকিৎসার গান, গুনাই বিবির গান, গুরুবাদী গান, গোপীগান, গোপী চন্দ্রের গান, গফুর মিয়ার গান, গোরক্ষ নাথের গান, গিয়াস উদ্দিনের গান, গাইনের গীত।

ঘ- ঘাটুগান, ঘোষা গান, ঘটনামূলক গান

চ- চুটকী গান, চরকার গান, চর্যাপদের গান, চাষের গান, চণ্ডীমঙ্গলের গান, চৈত পার্বনের গান, চন্দ্রাবতীর গান, চাঁদ সওদাগরের গান, চৌদ্দ মাদলের গান।

ছ- ছড়া গান, ছাদ পেটানো গান, ছুবচনির গান, ছাত্তার মাষ্টারের গান।

জ- জন্মাষ্টমীর গান, জলভরার গান, জরাজরির গান, জারি গান, জিকির, জালালের গান, জোলার গান।

ড- ডাকের ছড়া গান।

ঢ- ঢপ গান, ঢেঁকির গান।

ত- তত্ত্ব গান, ত্রিনাথের গান, তরজা গান, তাহেরের গান।

থ- থোয়া ব্রতের গান

দ- দ্বিজবংশীদারের গান, দস্যু কেনারামের পালা গান, দেওয়ান ভাবনার গান, দোলযাত্রার গান, দিশা গান, দুর্গাপুজার গান, দোতরার গান।

ধ- ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, ধান ভাঙ্গার গান, ধামাইল গান, ধুয়া গান, ধর্ম পূজার গান।

ন- নবান্নের গান, নাথ গীতি, নাম কীর্ত্তন, নৌকা বাইচের গান, নিমাই সন্যাসের গান, নারী ব্রত গান, নদীভিত্তিক গান, নূরে খানের গান, নিবারণ পণ্ডিতের গান।

প- পটগান, পটুয়া গান, পাঁচালি গান, পাট চাষের গান, পাট কাটার গান, পালকি বহকের গান, পান চিনির গান, পালা গান, পীর-ফকিরের গান, পুঁথিগান, প্রভাতি গান, পৌষ পার্বণের গান, পৌষ সংক্রান্তির গান, প্রেম গান।

ফ- ফকিরালী গান, ফলস কাটার গান, ফকিরি গান।

ব- বচন গান, বনবিবির গান, বন্দনা গান, বন্ধুয়া গান, বয়াতির গান, বসন্ত রোগের গান, বর্যার গান, বদর পীরের গান, বর্ণনামূলক গান, বর সাজানো গান, বরবরণ গান, বর বিদায় গান, বশীকরণ মন্ত্র গান, বিশ করমের গান, বাতজ্বর নির্মূলের জন্য মন্ত্র গান, বাউল গান, বাদ্যানির গান, বারমাসী গান, বাঘাই শিরনির গান, বাসি গোসলের গান, বাসি বিবাহের গান, বিয়ের গান, ব্যাঙ বিয়ের গান, বৈষ্ণব গান, ব্রত গান, বেহুলার গান, বৃষ্টির গান, বিচ্ছেদ গান, ব্রাহ্ম গান, বিবেকের গান, বিষহরির গান, বেড়া ভাসানোর গান, বৈঠকী গান, বৌ-ভাত অনুষ্ঠানের গান।

ভ- ভজনগান, ভাই ফোটার গান, ভাওয়াইয়া গান, ভাব গান, ভাসান গান, ভাত ছোঁয়ানির গান, ভাষার গান, ভক্তিমূলক গান, ভাট কবি ছফির উদ্দিনের গান।

ম- মনসা পূজার গান, মঙ্গল গান, মরমী গান, মামুদজান ফকিরের গান, মহরমের গান, মকবুল বয়াতির গান, মাইজভান্ডারী গান, মাগনের গান, মাজারের গান, মারফতি গান, মালসি গান, মাদার পীরের গান, মাঝির গান, মেহেদী তোলার গান, মেয়েলী গান, মেঘের গান, মেঘানী ব্রতের গান, মুর্শিদী গান, মুক্তিযুদ্ধের গান, মহেন্দ্র ঘোষালের গান, মর্সিয়া গন, মেলার গান, মজিবুর রহমান তালুকদারের গান।

য- যাত্রা গান, যাদু বিদ্যার মন্ত্র গান, যুদ্ধের গান, যুগের গান, যোগ শাস্ত্রের গান।

র- রঙের গান, রামায়ণ গান, রাম-লক্ষ্মণের গান, রামু মালীর গান, রয়ানি গান, রাখালিয়া গান, রাজা হরিশচন্দ্রের গান, রাধা-কৃষ্ণের পালা গান, রূপবানের গান।

www.pathagar.com

ল– লখিন্দরের গান, লক্ষ্মী পূজার গান, লালনের গান, লেটোদলের গান, লৌকিক গান, লাইলী-মজনুর গান, লীলা গান, লোকনাথের গান।

শ– শিবের গান, শাক্ত সঙ্গীত, শিলারীর গান, শীতলা পুজার গান, শিলুক গান, শ্রমিকের গান, শ্যামাসঙ্গীত, শাহ কলাদরের গান।

ষ– ষষ্ঠী ব্রতের গান, ষষ্ঠী মঙ্গলের গান।

স– সংকীর্তন, সত্যপীরের গান, সারিগান, সকিনা বিবির গান, সোহাগ মাগার গান, স্বদেশী গান, সখী বা সই পাতানোর গান, সফর আলী ফকিরের গান, সুলা গাইনের গান, সোহেলী গান, সাপুরে গান।

হ– হাইট্যারা গান, হিজড়াদের গান, হোলি খেলার গান, হাসেম পাগলের গান, হাছন রাজার গান, হাইর গান, হীরা মতির গান।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল

বাংলাদেশের নদী-নৌকা-নাইয়া-বিল-হাওর অধ্যুষিত অঞ্চলের গানই ভাটিয়ালি। এতে গবেষকদের মতে বৃহত্তর ময়মনসিংহের জলাভূমি বা ভাটি অঞ্চলের হাওর প্রধান এলাকার গানের নামই ভাটিয়ালি। অর্থাৎ ভাটি কিশোরগঞ্জের অধিকাংশ জনপদের নামকরণও রয়েছে ভাটিপ্রধান, যেমন – ভাটি, ভাটুয়া, ভাটিপাড়া, ভাটিবরাটিয়া, ভাটি খাগড়া, প্রভৃতি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভাটি কিশোরগঞ্জের নদী-নৌকার-মাঝি-মাল্লাদের মুখ থেকে উৎসরিত গানের নামই ভাটিয়ালি। অর্থাৎ আমাদের ধারণা, ভাটি কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলই হলো ভাটিয়ালি গানের আদি উৎপত্তিস্থল বা প্রাচীন সঙ্গীতাঞ্চল। পরে তা পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে তা ছড়িয়ে পড়ে। একটি কথা অতি স্পষ্ট যে, বৃহত্তর ময়মনসিংহের দু'টি জেলা অঞ্চলই শুধু হাওর অঞ্চল। একটি কিশোরগঞ্জ, অন্যটি নেত্রকোনা। বাকি সব উজান অঞ্চল নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে হাওর-জঙ্গল-মৈষের শিং- এই তিনে ময়মনসিংহ। মৈমনসিংহ গীতিকার গীতি কবিদের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ষোড়শ শতক। কবি গানের কবিয়ালদের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে চৌদ্দশতক। অথচ ভাটিয়ালী গান এখানে তারও পূর্বে প্রচার লাভ করেছে। ফলে দ্বাদশ শতক থেকে আলোচ্য এ অঞ্চলে মনসা মঙ্গল, পদ্মপুরাণ, পুঁথি অথবা কবি গান ছাড়াও মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ পালা গানে ভাটিয়ালী গানের রাগ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা মধ্যযুগীয় কবি কিশোরগঞ্জের কবিকন্যা চন্দ্রাবতী রচিত 'দস্যু কেনারাম' পালা কাব্যে ভাটিয়ালী শব্দ উচ্চারণ করে গান বা ভাটিয়াল নদী বিষয়ক উদ্ধৃতি উল্লেখ আছে নিম্নরূপঃ

ঠাকুর কহিল মোর দ্বিজবংশী নাম
শুনিয়া চমকিয়া উঠে দস্যু কেনারাম।
তুমি ঠাকুর দ্বিজবংশী যার নাম শুনি
পাগলা ভাটিয়ালী নদী বহে যে উজানী।

কিশোরগঞ্জের প্রাচীন কবি দ্বিজবংশীদাসের গানে উল্লেখ আছে 'ভাইট্যাল নদী বহে যে উজানী'। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ভাটিয়াল শব্দ উচ্চারণ থেকে ভাইট্যাল শব্দ ব্যবহারের অপিনিহিতির ফলে এখানে ভাইটাল~ভাটিয়াল অতঃপর ভাটিয়্যাল থেকে ভাটিয়ালি হয়েছে। যেমন গঙ্গা থেকে গাঙ্গ বা গাঙ অথবা গাং শব্দের উৎপত্তি, তেমনি ভাটি থেকে ভাইট্যা, ভাইট্যা থেকে ভাইট্যাল অথবা বঙ্গ থেকে বঙ্গাল আবার বঙ্গাল থেকে বাঙ্গাল অথবা বাঙ্গাল থেকে বর্তমানে বাঙ্গালী বা বাঙালি শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গাল বা বাঙাল পাড়া নামে প্রাচীন জনপদ রয়েছে ভাটি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায়। অতএব ভাটিয়ালি গানের উৎপত্তি স্থল বলতে ভাটি কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের হাওর এলাকাকেই নির্দেশ করে। কথায় আছেঃ

উজান দেশে থাকরে বন্ধু
ভাটি দ্যাশে ঘর

www.pathagar.com

আইতে যাইতে আপন হইছে
চোখে দেখার পর।

অথবা

আবদুছ ছাত্তার ভূঞা (মাষ্টার) এর গান:
ও নদী রে তুই আর কতকাল খেলবি নিঠুর খেলা
তর বুকেতে কত মাঝি ডুবলো অ বেলা।

অথবা

ওরে রঙ্গীলা নাইয়া তুমি রঙ্গের পানসি বাইয়া
কোন ঘাটেতে করলা নোঙ্গর তুমার পানসি লইয়া।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতি-স্থল বা ব্যবহার এলাকা

ভাটিয়ালি গানের বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে গানগুলোর আদি উৎস ভূমি যে অঞ্চলই চিহ্নিত হোকনা কেন, পরবর্তীতে এর বিস্তৃতি বা ব্যবহার এলাকাগুলো হলো ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিস্তীর্ণ ভাটি দেশ বলে খ্যাত ও কথিত অঞ্চলসমূহ ছাড়াও ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা পর্যন্ত এর ব্যাপকতা রয়েছে। অন্য দিকে বাউল গান, ঘাটু গান, নৌকা বাইচের গান, বাংলার সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে কোন গানই আজ আঞ্চলিকতার শব্দ সুর দিয়ে এর উৎপত্তিস্থল বা বিস্তৃতিস্থল বা ব্যবহার এলাকা চিহ্নত করা খুবই কঠিন। তবে কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেগুলোতে কিছু কিছু চিহ্নত গান বা গানের উৎপত্তিস্থল বিস্তৃতিস্থল বা ব্যবহার এলাকা প্রাধান্য লাভ করে থাকে। এ সব এলাকার শব্দ উচ্চারণ ও গানের প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে গানের মধ্যে। সেই দিক বিবেচনায় জেলা কিশোরগঞ্জ ভাটিয়ালি, ঘাটু, ভাসান ও নৌকা বাইচের গানের একটি স্বতন্ত্র লোকসঙ্গীত অঞ্চল হিসেবে খ্যাত ও প্রসিদ্ধ।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের স্রষ্টাদের তালিকা

বাউল, ভাটিয়ালি, মারফতি, মুর্শিদী, বিচ্ছেদ – এগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক কণ্ঠের সুর-প্রধান গান। এসব গানে তেমন তাল নেই। তবে বেশি বাদ্য যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় না। গায়ক কতক শব্দ পর পর উচ্চারণ করে মূল স্বর-সুরটি ধরে দীর্ঘটান দেন। কথা ও সুরের এই টান বা লহর উচ্চ গ্রামে উঠে শেষ পাদে এসে নেমে আসে। প্রলম্বিত এই টানের শক্তি স্থিতি গায়কের দম বা মর্জির উপর নির্ভর করে। এসব গান সম্পূর্ণ অশ্লীলতা মুক্ত। বাংলার আর কোনো লোক সঙ্গীতের এই গুণ নাই। তাই জীবন ও জগৎ দর্শনের সুগভীর বিষয়সমূহ অতি সহজেই দার্শনিক যুক্তিতর্কে এ গানের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে। কিশোরগঞ্জের লোকসঙ্গীতে যাদের নামে ভনিতা আছে তারা হলেন: দ্বিজবংশীদাসের গান, চন্দ্রাবতীর গান, চন্দ্রনাথের গান, আদুরী নাথের গান, জগন্নাথ দাসের গান, মামুদজান ফকিরের গান, সফর আলী ফকিরের গান, ফকির চান্দের গান, অখিল ঠাকুরের গান, আমর শীলের গান, তাহের উদ্দিনের গান, লক্ষ্মীকান্তের গান, ঈশান নাথের গান, খইন্তা পাগলের গান, কদ্দুস বয়াতির গান, নিত্যানন্দ দাসের গান, সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়ার গান, খলিল ফকিরের গান, ইন্তাজ ফকিরের গান, আনোল শাহর গান, কেরামত আলীর গান, মাতু ফকিরের গান, কানা ফরিদের গান, মাতু মিয়ার গান, ছফির উদ্দিনের গান, রামু মালীর গান, কানাই নাথের গান, বলাই নাথের গান, জোগেশ সূত্রধরের গান, সুবল সূত্রধরের গান, দেওয়ান আহমদ রেজার গান, আবদুছ সাত্তার ভূঞার গান, গিয়াস উদ্দিনের গান, নিজাম সরকারের গান উল্লেখযোগ্য। বিশেষত লোক সঙ্গীতের স্রষ্টা সমাজের দুঃখী শিল্পী মানুষ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে তারা সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নানাভাবে নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকা

দ্বিজবংশী দাস (কিশোরগঞ্জ), আবদুল জলিল (তারাইল), আলাল উদ্দিন (করিমগঞ্জ), চন্দ্র নাথ (নিকলী), আবদুর করিম (কিশোরগঞ্জ), অশ্বিনী (তাড়াইল), চন্দ্রাবতী (কিশোরগঞ্জ), হাসেম পাগল (অষ্টগ্রাম), বিপিন বিহারী বিশ্বাস (পাকুন্দিয়া), জগন্নাথ দাস (নিকলী), মামুদজান ফকির (নিকলী), মহেন্দ্র ঘোষাল (অষ্টগ্রাম), আশারাম নাথ (পাকুন্দিয়া), সফর আলী ফকির (নিকলী), নূরে খান শাহ (অষ্টগ্রাম), কাসু ঠাকুর (কিশোরগঞ্জ), ফকির চান্দ (করিমগঞ্জ), ছাত্তার মিয়া (অষ্টগ্রাম), শাহ আবদুল আজিজ ফকির (কিশোরগঞ্জ), সৈয়দ আব্দুল্লাহ (তাড়াইল), হরনাথ নমশূদ্র (বাজিতপুর), অনিল সরকার (কিশোরগঞ্জ), আবদুল্লা, আমির উদ্দিন (নিকলী), কুকি বেগম (পাকুন্দিয়া), কুমুদ দাস, মোহাম্মদ মাতু মিয়া (বাজিতপুর), হরিচরণ (তাড়াইল), কানাই নাথ (পাকুন্দিয়া), অমরশীল (কিশোরগঞ্জ), ইন্তাজ ফকির (নিকলী), তারা চাঁন, মিয়া হোসেন বয়াতি (কিশোরগঞ্জ), খলিল ফকির (নিকলী), শাহ কলন্দর (কটিয়াদী), ছফির উদ্দিন (কিশোরগঞ্জ), নূর হোসেন বাউল (নিকলী), জোগেশ সুত্রধর (পাকুন্দিয়া), রামু মালী (কিশোরগঞ্জ), আলেপ শাহ (কিশোরগঞ্জ), দেওয়ান আহমদ রেজা (বাজিতপুর), রামগতি (কিশোরগঞ্জ), কেরামত আলী (কিশোরগঞ্জ), মনির উদ্দিন, নিবারণ পন্ডিত (কিশোরগঞ্জ), আবদুল খালেক (কিশোরগঞ্জ), যোগেশ কর্মকার, হরিবল নাথ (কিশোরগঞ্জ), আবদুছ ছাত্তার ভূঞা (কিশোরগঞ্জ), তাহের উদ্দিন, কৃষ্ণ কান্ত (কিশোরগঞ্জ), মানিক শাহ (তাড়াইল), অখিল ঠাকুর, ঈশান নাথ (তাড়াইল), খেলু পাগলা (করিমগঞ্জ), লক্ষ্মী সাহা, আবদুল জব্বার (কিশোরগঞ্জ), মোঃ নূরুল আলম (করিমগঞ্জ), আলা উদ্দিন, দ্বিজদাস (কিশোরগঞ্জ),আবু তাহের (অষ্টগ্রাম), ভোলার বাপ, লক্ষ্মী কান্ত (পাকুন্দিয়া), খইন্তা পাগল (কটিয়াদী), কুমুদিনী দাস্যা, মনাই মিয়া, মহিউদ্দিন আহমেদ, বাছির মিয়া, ব্রজেন্দ্র মাস্টার, ইসমাইল মোল্লা, ফজলুর রহমান, মারফত আলী (ভৈরব), ইসলাম উদ্দিন (করিমগঞ্জ), গোলাপ মিয়া (ভৈরব) শামসুদ্দীন, ছানা মিয়া, মোক্তার উদ্দিন, জাকির শাহ (কটিয়াদী), ফজলু, কাঞ্চন, আছলাম শেখ, কদ্দুস, ইদ্রিস (কিশোরগঞ্জ), নিত্যানন্দ দাস (পাকুন্দিয়া), কাজি মোহন, গফুর মিয়া (অষ্টগ্রাম), মহেন্দ্র (অষ্টগ্রাম), নূর আহমদ (কিশোরগঞ্জ), রমনী মোহন আচার্য (কিশোরগঞ্জ), হরিদাস বনিক (বাজিতপুর), সুরেণ ব্রাক্ষণ (ভৈরব), আব্দুর রহিম (করিমগঞ্জ), মোহাম্মদ ফিরুজ (অষ্টগ্রাম), আতরচাঁন, শরৎনাথ, উমেদ আলী ফকির (করিমগঞ্জ), হাবিবা (পাকুন্দিয়া), সজতন (ভৈরব), সৈয়দ নূরুল আওয়াল তারামিয়া (কিশোরগঞ্জ), মলু হোসেন তালুকতার (নিকলী), কাচা ঠাকুর (নিকলী), গিয়াস উদ্দিন (কিশোরগঞ্জ), কানা ছালেক (কটিয়াদী), অন্ধ স্বপন (কটিয়াদী), কানা ফরিদ (কটিয়াদী), সুরভী (কিশোরগঞ্জ), রত্না (কিশোরগঞ্জ), নূরুল ইসলাম স্বদেশী (করিমগঞ্জ), নায়েব আলী (ভৈরব), জামিনি কুমার দেবনাথ (ভৈরব), লিয়াকত (কটিয়াদী), মোস্ত ফা (কটিয়াদী), রাজু (কিশোরগঞ্জ), মনির (অষ্টগ্রাম), আমির আলী (কিশোরগঞ্জ), লাল চাঁন (নিকলী), মহিউদ্দিন (কিশোরগঞ্জ), মন্টু গোসাই (কিশোরগঞ্জ), উমেশ সাধু (কিশোরগঞ্জ), ইদ্রিস (তারাইল), মারফত আলী (ভৈরব), আঃ মান্নান (কিশোরগঞ্জ), বাচ্চু সরকার (কিশোরগঞ্জ), শাহিদ মিয়া (পাকুন্দিয়া), মোস্তফা (কিশোরগঞ্জ), মোক্তার উদ্দিন (বাজিতপুর), ফরিদ মিয়া (কটিয়াদী), নূর আলী (নিকলী), হেলাল (কিশোরগঞ্জ), এনামূল (অষ্টগ্রাম), কদ্দুছ (কিশোরগঞ্জ), কামাল সরকার (হোসেনপুর), তাহের (নিকলী), নূর উদ্দিন (হোসেনপুর), উমেশ সরকার (কিশোরগঞ্জ), ফজলুর রহমান (কিশোরগঞ্জ), আলম শাহ (কিশোরগঞ্জ), সিরাজ উদ্দিন, জালাল সরকার (কিশোরগঞ্জ), ফাইজুল ইসলাম (হোসেনপুর), ওয়াহাব সরকার (কিশোরগঞ্জ), মোঃ আবুল হাশেম (করিমগঞ্জ, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী), এ.কে.এম জসিম উদ্দিন হীরু (কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী), আবদুর রহমান ভূইয়া ওরফে বাবুল ভূইয়া (কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী), মোঃ মজিবুর রহমান (কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী), হোসনে আরা বেগম (কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী), মোঃ আবুল কাশেম (নিকলী), এ.কে.এম কিবরিয়া (করিমগঞ্জ), মেহেদী হাশেম দীপু (কিশোরগঞ্জ)।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের দলের তালিকা: সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়া ও তার দল, বাউল গিয়াস উদ্দিন ও তার দল, গোপাল চন্দ্র দাস ও তার দল, গনেশ ও তার দল, ক্ষেত্রমোহন ও তার দল, বাউল ইসলাম উদ্দিন ও তার দল, বাউল এলাহী বকস ও তার দল, রত্না ও তার দল, নিজাম সরকার ও তার দল।

সনাক্তকৃত সামষ্টিক দলীয় সঙ্গীতের তালিকা: জারী গান, সারি গান, রামায়ন গান, ঘাটুগান, নৌকা বাইচের গান, কীর্তন গান, মালশী গান, ধামাইল গান, পালাগান, চৌদ্দ মাদলের গান, নিমাই সন্যাসের গান, গুনাই বিবির গান, রূপবানের গান, মহররমের গান, মাইজ ভাণ্ডারির গান, মাজারের গান প্রভৃতি।

সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা: বাউল, ভাটিয়ালী, বিচ্ছেদী, মুর্শিদি, মারফতি, সাধন সঙ্গীত, এক তারা গান, গোঁসাই গান, গুরুবাদী গান, বৈষ্ণবী গান, পুঁথি গান, ফকিরি গান, বিবেকের গান, বন্ধুয়া গান, ব্রাহ্মগান, ব্রত গান, বিশ করমের গান, বিষহরি গান, শিলারীর গান, শ্যামা গান, স্বদেশী গান প্রভৃতি। এসব একক সনাক্তকৃত সঙ্গীতের সাধকদের সাধকের কণ্ঠে আত্মতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, নিগূঢ় তত্ত্ব, সাধন তত্ত্ব দয়াল তত্ত্ব, পীর তত্ত্ব, গুরু তত্ত্ব, সংসার তত্ত্ব, প্রেম তত্ত্ব, মাতৃ তত্ত্ব, লোক তত্ত্ব, দেশ তত্ত্ব, বিরহ তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্বের নানান দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বাউল-ভাটিয়ালী-মুর্শিদী-মারফতি প্রভৃতি প্রথমে ব্যক্তি চেতনার গান, একক কণ্ঠের গান পরে তা মুখে মুখে সমষ্টি চেতনায় উত্তীর্ণ হয়।

সনাক্তকৃত লোকবাদ্যযন্ত্রের তালিকা: লোকসঙ্গীতে লোক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার লোক সঙ্গীতে যে সব লোক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা নিম্নে তুলি ধরা হল ঃ একতারা, দোতারা, লাউয়া, চটিয়া, খঞ্জন বা খঞ্জুরী, খোল, করতাল, মন্দিরা, ঢোল, ঢোলক, বাঁয়া, তবলা, সারিন্দা, বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশি, কাঁশি, শিঙ্গা, মাদল প্রভৃতি।

সনাক্তকৃত বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদী, মুর্শিদি, মারেফতি ছাড়াও বাউল, ব্যান্ড, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক সঙ্গীত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬)

এলাকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন দলীয় লোক সঙ্গীত শিল্পীদের বাণিজ্যিকভাবে বার্ষিক মূল্যমান এলাকায় কীর্ত্তন দল, রামায়ণ গানের গল, বাউল গানের দল, মুর্শিদি গানের দল, মারফতি গানের দল, বাউল গানের দল, এবং একনাম কীর্ত্তনের দল প্রভৃতি দলের একক দলের হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক বার্ষিক মূল্যমান আয় হয় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।

সনাক্তকৃত বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা: হিরালীর গান, ব্যাঙ বিয়ের গান, বাঘাই সিন্নীর গান, হাইট্যারার গান, বৃষ্টির গান, সই পাতানো গান, পুঁথি পাঠের গান, কবিরাজী গান, ছাদ পিটানো গান, ধান কাটা গান, পাল্কি বাহকের গান, পটুয়ার গান, কবি গান, গুরু মন্ত্রের গান প্রভৃতি।

সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা: ঘাটুগান, কবিগান, গোমরা বা হিজরাদের গান, দ্বিজবংশীদাসের গান, চন্দ্রাবতীরগান, সুলাগাইনের গান, গোরক্ষনাথের গান, নৌকাবাইচের গান, ভাসান গান, বিয়ের গান, ব্রত গান, মাদার পীরের গান, বেহুলার গান, লক্ষিন্দরের গান, ত্রিনাথের গান, শিবের গান, ঝুমুর গান, একতারা গান, দোতরার গান, ব্রাহ্মগান, গাইনের গীত, উড়ি গান, হোলির গান, গাজীর পট গান, ভাদুগান, বদর পীরের গান, শাহ কলন্দরের গান, রাধা কৃষ্ণের গান, পীর ফকিরের গান, বৈষ্ণব গান, গোসাই গান প্রভৃতি।

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা: দ্বিজবংশীদাস, চন্দ্রাবতী, মনসুর বয়াতী, নয়ান চন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রনাথ, আদুরী গান, মামুদজান ফকির, জগন্নাথ দাস, ফকির চান্দ, সৈয়দ আবদুল্লাহ, কানাইনাথ, বলাই নাথ, অখিল ঠাকুর, অমর চন্দ্রশীল, রামমালী, রাম কানাই নাথ, রাম গতি, নিবারন পণ্ডিত, হরিবল নাথ, কৃষ্ণ কান্ত, ঈশান নাথ, দ্বিজদাস, লক্ষীকান্ত, ছফির উদ্দিন, হরি দাস বণিক, নিত্যানন্দ দাস, কুমুদিনী দাসী, পুঁথিকার মুন্সি আবদুর রহিম, মুন্সি আজিম উদ্দিন, মুন্সি আবদুল করিম প্রভৃতি।

www.pathagar.com

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ সর্ম্পকিত: আমরা জানি নবম শতাব্দীর দিব্যক কৈবর্তের বিদ্রোহ ব্যতিক্রম একটি ঘটনা। এ ঘটনা ধারারই উত্তরসুরী জেলা কিশোরগঞ্জের মানুষ। এ ছাড়াও কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি এসব আন্দোলন আজও জেলা কিশোরগঞ্জেরগণ মানসে সুগভীর রেখাপাত সৃষ্টি করে আছে। এ ছাড়াও এসব আন্দোলনে রচিত হয়েছে এ অঞ্চলের অসংখ্য লোক সঙ্গীত। সর্বোপরি সকল লোক সঙ্গীত উপকরণাদি আমাদের নির্লিপ্ত অবহেলায় ক্রমেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। একে উদ্ধার করে যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া না হলে আমাদের আলোকিত অতীত আগামী প্রজন্মের কাছে কল্পনাপ্রসূত কল্পকথার মত অবিশ্বাস্য গালগল্প হিসেবেই প্রতিভাত হবে। কিশোরগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির অপরিসীম উপাদান ও উপকরণের বিশাল ভান্ডার থেকে প্রতীকী কিছু উদ্ধৃতি এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। উদ্ধৃত অংশগুলো গভীর অভিনিবেশ সহকারে উপলব্ধি করলে কিশোরগঞ্জের লোকজ সাহিত্য, লোকজ সংস্কৃতি এবং লোকসঙ্গীতের বিশালতা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খ. সংরক্ষণ সর্ম্পকিত: গান গেয়ে দেখানো যেমন সহজ লিখে এমনকি স্বরলিপি করে তা প্রমাণ করা এমন সহজ নয়, বরং খুবই কঠিন কাজ। লিখে কোন গানের সুর বা ঢং কোন দিনই শ্রুতির মাধুর্যে ধরা পড়ে না। যেমন সিলেট-এর সুর কিরূপ বা কি ধরনের, নোয়াখালী বা চট্টগ্রামের সুর কিরূপ বা কি ধরনের, উত্তর বঙ্গের সুর কি রূপ বা কি ধরনের, তার সঙ্গে কিশোরগঞ্জের গানের সুর কিরূপ বা ঢং কিরূপ, তা বাস্তবে পরিবেশন না হলে বোঝা যাবে না। এছাড়া অন্যকোন উপায়ে তা বুঝানো সম্ভব নয়। তেমনি সংরক্ষণ পদ্ধতিতেও প্রত্যেক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বা আঞ্চলিক কবিদের গানের কথা, শব্দ, উচ্চারণ ইত্যাদি যদি জানা না থাকে তাহলে কোনভাবেই অঞ্চলভিত্তিক সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সফলতা লাভ করা যাবে না। লোকসঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তার ভাষা, স্বর, সুর ও উচ্চারণভঙ্গির বিশেষ ঢং। ভাষা মানুষের প্রতিনিয়ত জীবনধারণ ও জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি। কিশোরগঞ্জ জেলার আঞ্চলিক সঙ্গীত সৃষ্টি ও রচনায় তার আঞ্চলিক ভাষা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগকে লোক সঙ্গীতের একটি প্রধানতম প্রযুক্তি ও অবলম্বন হিসেবে বিবেচনায় রেখে এ প্রবন্ধে আঞ্চলিক ভাষার বিষয়টিকেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য তথ্য: কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি জেলার ভাটি অঞ্চলের হাওর এলাকা অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি নিজস্ব ভাষা আছে যা একমাত্র স্থানীয় অধিবাসী ব্যতীত অন্যের পক্ষে বোঝা খুবই দুষ্কর। যেমন টাইঙ্গা – সিগারেট বা বিড়ি, ফুলুছ – টাকা, মাক্কি – লোক, বলামাক্কি – পুলিশ, কুর্দি – ধান/চাল/ভাত ইত্যাদি, আবি – চা/পানীয়, আশাইগ্যা – পান, অলকরা – প্রকাশ করা। প্রমিত ভাষা রীতির বাইরে অঞ্চল ভেদে প্রত্যেক দেশেই বা প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এমনি ভাবে একটি নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা বা কথ্য ভাষা প্রচলিত আছে যাকে বলা যায়: এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি। "দোছরা নগরের মাক্কিরে ছুহুমঅল করলে বোদ্দামি" অর্থাৎ "ভিনদেশী মানুষকে নিজেদের ভাষা শেখানো বোকামি।" এ স্থানীয় ভাষাকে সুকুন, সুউন, সুহুম, ছুহুম ইত্যাদি নামে বা অভিধায় বলা হয়ে থাকে।

উপসংহার: সঙ্গীত মানুষের জীবন সংগ্রামেরই এক শৈল্পিক সৃষ্টি। বাঙালি আবহমান কালধরে সঙ্গীত প্রিয় জাতি। তার জীবন চেতনা, আনন্দ, বেদনা, আর বাঁচার অধিকার নিয়ে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক যাবতীয় ভাবনার জীবন সংগ্রামের এক অনুসঙ্গ তার সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে বেশি। আর এ সঙ্গীত ধারার আদি এবং অকৃত্রিম ধারার নামই লোকসঙ্গীত। লোকসমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এ গীতই লোক গীতি বা লোক সঙ্গীত নামে পরিচিত। আমরা জানি, নিরক্ষর বা অশিক্ষিত গ্রামীণ অবহেলিত হতদরিদ্র মানুষের রচিত এই লোক গান কখনও কখনও বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পীদের মাধ্যমে তা বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন অকুতভয় দেশপ্রেমিক ক্ষুদিরামের ফাঁসির প্রেক্ষাপটে রচিত লোক সঙ্গীত "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" অথবা শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠে গাওয়া গান "আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই" অথবা শিল্পী আব্দুল আলীমের কণ্ঠে গাওয়া গান "এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া এত যত্নে গড়িয়াছে সাঁই" অথবা বিপুল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে

www.pathagar.com

গাওয়া গান "গুরু উপায় বলনা, জনম দুঃখী কপাল পোড়া আমি একজনা" অথবা কুমার বিশ্বজিৎ এর কণ্ঠে গাওয়া গান "জন্মিলে মরিতে হবে ভবেরই রঙ্গ হবে সাঙ্গ সবাই" অথবা ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে গাওয়া গান "মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে।" এসব লোক গান বাংলা ও বাঙালি জাতিকে যে কতটা অনুপ্রাণিত ও প্রনোদিত করেছে তা আমরা সচেতন মানুষ অবশ্যই উপলব্ধি করি। ড. নীহার রঞ্জন রায়ের মতে বাংলার ইতিহাস সাহিত্য সংস্কৃতি ও সঙ্গীত রচনা করেছে বাংলার ছোট-বড় অসংখ্য নদী। এ নদীগুলি বাংলা ও বাঙালির প্রাণ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীম উদ্‌দীন, ড. আশরাফ সিদ্দিকীসহ অনেকেই এ সব সত্য তথ্যের সমর্থন করে তারাও বলেছেন বাংলার এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে একটি নদী নেই, বাংলার এমন কোন নদী নেই যেখানে নদীর তীরে একজন লোকগায়ক বা কবি নেই। হাজার নদীর হাজার কবির হাজার গায়কের এদেশ বাংলাদেশ। কথায় আছে, দেশ জাগার আগে জাগে কবি আর বাউল। এই বাউল বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের আবেদন আদিকাল থেকে আজও সর্বজনীন। বাংলার এ অমূল্য সম্পদ লোকসঙ্গীত যা জাতীয় ঐক্য, সংহতি, জীবনবোধ ও লোকসাহিত্য রূপে স্বীকৃত। এই সাহিত্যের এত বিশাল ভাণ্ডারের অন্যতম শাখা এই লোকসঙ্গীত। আমরা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রকাশে এর নবমূল্যায়ন প্রত্যাশা করি।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ

মৈমনসিংহ গীতিকা, শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত
বাংলা লোক সঙ্গীত ও ভাটিয়ালী গান, ড. ওয়াকিল আহমদ
বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত।
বাংলাদেশের লোকগীতি, ড. অবদুল ওয়াহাব।
ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শাকির উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত
কিশোরগঞ্জের লোক ঐতিহ্য, অধ্যক্ষ প্রিন্স রফিক খান
কিশোরগঞ্জের ইতিহাস, মো. সাইদুর ও মোহাম্মদ আলী খান সম্পাদিত
নেত্রকোনার বাউল গীতি, গোলাম এরশাদুর রহমান
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস, মুহাম্মদ মুসা

ব্যক্তি

রাষ্টপতি ও প্রধান মন্ত্রী পুরষ্কার প্রাপ্ত লোকসঙ্গীত শিল্পী, সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিয়া, কিশোরগঞ্জ।
বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন লোক সঙ্গীত শিল্পী, মো. আবুল হাশেম, কিশোরগঞ্জ।
বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন লোক সঙ্গীত শিল্পী, এ.কে.এম. জসিম উদ্দিন হীরু, কিশোরগঞ্জ।
বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন লোক সঙ্গীত শিল্পী, মো. মজিবুর রহমান, কিশোরগঞ্জ।
বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন লোক সঙ্গীত শিল্পী, হোসনে আরা বেগম, কিশোরগঞ্জ।
প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত গীতিকার ও সুরকার, আবদুস সাত্তার ভুঁএগ্রা, কিশোরগঞ্জ।

www.pathagar.com

৬.২ জামালপুর জেলার লোকসঙ্গীত

লুলু আবদুর রহমান

ভূমিকা: শস্যশ্যামল সোনার দেশ এই বাংলাদেশ। প্রাচীনকালে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল এই অঞ্চল। এই সব জনপদের মধ্যে 'বঙ্গ' জনপদটি 'সুবাহ্ বাঙ্গালা' 'বেঙ্গল এ্যাক্ট' 'পূর্ব পাকিস্তান' হয়ে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র যার নাম বাংলাদেশ। নদীমাতৃক এই দেশ আদিকাল থেকে সুজলা সুফলা। পাহাড় থেকে বয়ে আসা পলিমাটি এই দেশকে করেছে উর্বর। এ ছাড়া খালবিল, নদী-হাওড়ে মাছ উৎপাদন ছিল প্রচুর। সহজভাবে বাঁচার জন্য তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা গোষ্ঠীর নানা বর্ণের মানুষ এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। শারীরিক গঠনগত দিক থেকে আমরা দেখতে যেমন, আমাদের আদি পিতা-মাতারা ঠিক এমন ছিল না, দুই হাতের দশটি কর্মনিপুণ আঙ্গুল, পায়ের পাতা, এমনকি সোজা হয়ে চলার সাধ্যও তাদের ছিল না; কিন্তু তাদের মানবিক গুণাবলি ছিল। আমাদের এই বাংলাদেশে মানুষ কবে থেকে বসবাস শুরু করেছে তার সঠিক হিসাব এখনও জানা যায়নি। তবে যখন থেকেই মানুষ এই দেশে বসবাস করুক না কেন, আবহাওয়াজনিত কারণে এদেশের মানুষের মন হয়েছে কোমল, নরম আর মানুষ হয়েছে অসীম ধৈর্য্যশীল।

'বৃহত্তর অর্থে আমরা অস্ট্রালয়েড নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সাথে মিশ্রিত হয়েছে মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড জনগোষ্ঠী। তবে সাংস্কৃতিক বিবেচনায় আমাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পড়তে হয়নি। বরং তারাই আমাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে'।

জেলা পরিচিতি: জামালপুর বর্তমান লোকসাংস্কৃতিক জেলা বলতে আমরা ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে হয়ে শেরপুরসহ যে জেলা গঠিত হয়েছিল তাকেই বোঝাব। এই জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে টাঙ্গাইল, পূর্বে ময়মনসিংহের ফুলপুর ও হালুয়াঘাট, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা। দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে যতদূর জানা যায় হযরত শাহ্ জামাল (র.)-এর নামানুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয়েছে জামালপুর। দেশের বৃহত্তম দুটি নদীর একটি ব্রহ্মপুত্র এই জেলার বুকচিরে জামালপুর শহর ঘেঁষে ময়মনসিংহ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। অপর বৃহত্তম নদী যমুনা, জেলার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সোজা সরল রেখার মতো দৌলতিয়ায় পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদী দুটি এবং এদের শাখা-প্রশাখা ও পাহাড়ি অসংখ্য ঝর্ণা এ জেলার লোকমনকে করেছে দারুণ প্রভাবিত।

প্রাচীনকাল থেকে এ জেলার মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াতের একমাত্র পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছিল নদীপথ।। তাই নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল গঞ্জ, হাটবাজার এবং ছোট-বড় শহর। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দেওয়ানগঞ্জ, বকসিগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, নান্দিনা, মেলানদহ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ি। ইসলামপুর প্রাচীনকাল থেকেই কাঁসার বাসন-কোসনের জন্য প্রসিদ্ধ। জামালপুরের বিখ্যাত 'যমুনা সার কারখানা' জামালপুরের সরিষাবাড়িতে অবস্থিত। জামালপুরের কাঁচবালি আজও কাঁচ তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ জেলার প্রধান ফসল-ধান, পাট, ইক্ষু। দেওয়ানগঞ্জে 'জিল-বাংলা' চিনিকল অবস্থিত।

এখানে হিন্দু-মুসলমান, গারো, হাজং, কুচ, বানাই, হদি, প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তবে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা সমতল ভূমিতে, আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে জেলার উত্তর সীমান্তে পাহাড়ে কিংবা পাহাড়ের পাদদেশে। আদিবাসীদের মধ্যে গারো সম্প্রদায়েরাই

www.pathagar.com

কেবল মাতৃতান্ত্রিক। আদিবাসীদের সামাজিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমানদের থেকে একেবারেই পৃথক। এ জেলাতে যতগুলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে তাদের মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যাই বেশি। গারোরা নিজেদেরকে 'মান্দি' বলে পরিচয় দিতেই সবচেয়ে বেশি স্বস্তিবোধ করে। 'মান্দি' শব্দের অর্থ 'মানুষ'। এ ছাড়া আছে কুচ ও হাজং; এরা সনাতন ধর্ম পালন করে থাকে। গারোরা আগে 'সাংসারেক' ধর্ম পালন করত। বর্তমানে তারা প্রায় সবাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

লোকসঙ্গীত: লোকসঙ্গীত লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা। ওয়াকিল আহমদ 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' বইয়ে প্রস্তাবনাতে লিখেছেন, 'লোকসাহিত্য লোকমনের ফসল। লোকসাহিত্য সচেতন মনের বাণী সাধনা নয়'। আবার আহমদ শরীফ তার 'সাহিত্য তত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রাকৃতজনের মৌখিক রচনাকে বলে লোকসাহিত্য'। লোকসাহিত্যও ব্যক্তি বিশেষের রচনা। তবে তা মানুষের মুখে মুখে উচ্চরিত হয়ে কালে কালে শ্রুত হয়ে শ্রুতিস্মৃতিরূপে চালু থাকে বলেই মূল রচয়িতার ভাব ভাষা ও ভঙ্গি অবিকৃত থাকে না, জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে কেবল রূপান্তর লাভ করে অঙ্গে ও অন্তরে। তাই এগুলোতে মূল রচয়িতার নাম নিশানা হারিয়ে যায়, একারণেই এগুলোকে লোকসাধারণের সৃষ্ট সাহিত্য বা গণরচনা কিংবা সমাজ সৃষ্টি বলে অবিহিত করা হয়। 'লোকরচনা বা লোকসাহিত্য মাত্রই আঞ্চলিক'। আমরা আগেই বলেছি লোক সঙ্গীত লোক সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা। আমরা জামালপুর জেলার লোকসঙ্গীত নিয়েই এখন পর্যালোচনা করবো। বৃহত্তর জামালপুর জেলায় নিম্নের লোকসঙ্গীতগুলো সনাক্ত করতে পেরেছি। যেমন জারি, সারি, বারমাসি গান, মেয়েলি গীত, বিয়ের গীত, মুর্শিদি, বাউল, ঘাটু গান, মালসী, মাঙ্গনের গান, আনুষ্ঠানিক গান, ব্যাঙ বিয়ের গান, ছাদ পেটানো গান, একদিল গান, পালা গান, মর্শিয়া, মঞ্চ গান, কেচ্ছা গান, ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া, আদিবাসী লোক সঙ্গীত ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা

জারি:'জারি' ফারসি শব্দ। অর্থ কান্না বা শোক। যদিও কারবালা যুদ্ধের বিষাদময় ঘটনাকে জারিতে বর্ণনা করা হতো, কিন্তু এ অঞ্চলের বিশেষ ঘটে যাওয়া দুঃখময় ঘটনা 'গীদেল' বা গায়েন বা বয়েতি জারি গানে গেয়ে থাকেন। এরূপ দু-একটি জারি গানের নাম বলা যেতে পারে। যেমন-বকসিগঞ্জের মেরুরচর অঞ্চলের 'খাইরুনের জারি'। শ্রীবরদীর (কাকিলাকুড়ার) জমেলার জারি। খাইরুনের জরির লেখক মৃত আবদুর রহমান। বয়েতি মোঃ শহিজল হক গ্রাম মেরুরচর থানা বকসিগঞ্জ এ অঞ্চলে খাইরুনের জারি গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে জারিটি চিত্রজগতেও স্থান দখল করে নিয়েছে। খাইরুনের জারির একটি ধুয়া এখানে বর্ণিত হলো।

খাইরুন লো তুই কান্দি করবি কী
চুলের আগুন চুলেত থুয়ে
পুনাই কোল নি ...খাইরুন লো।

জমেলার জারির একটি ধুয়া:
জমেলা তেল কালা দেখতে ভালা
আয়না বান্দে খোঁপাতে
...দেখল চেরাগ লাগায়ে হে।

এ অঞ্চলের জারির গীদেল যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তারা হলেন-সহিজল, সাদা চৌকিদার, কলিমদ্দি এবং সাধুর পাড়ার প্রখ্যাত গীদেল মৃত আমজাদ আলী।

জারি গান গীদেল নেচে নেচে গায়। সাধারণত এ গান আসরে পরিবেশিত হয় এ গানের 'দোহার' বা সহযোগী গায়ক গোলাকার হয়ে মাঝখানে বসে এবং ধুয়া ধরে গানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। গীদেল বা মূল গায়ক দোহারের চারদিকে ধূতি পরিধান করে হাতে রুমাল বা চামর নিয়ে হেলে দুলে বৃত্তাকারে গান পরিবেশন করে থাকে। মূল গায়কের পায়ে ঘুঙ্গুর থাকে।

www.pathagar.com

সারি: জামালপুরের লোকসঙ্গীতের মধ্যে সারি একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। বাংলাদেশের বৃহত্তম দুটি নদী এ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত। নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় মাঝিরা সারিবদ্ধ হয়ে এ গান গায় বলে একে সারি গান বলা হয়। এ গানের তাৎপর্য হলো যেখানে কর্ম আছে সেখানেই সারি গান আছে। সারি গান সাধারণত নৌকা বাইচের সময় গাওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও যে কোনো শক্তির কাজের সময় যেমন, গাড়ি ঠেলা, গাছের গুড়ি ঠেলে সরানো, ব্রিজের বল্লী পোতার সময় শ্রমিকেরা এক সাথে সুর ধরে এ গান গেয়ে থাকে। আবদুল ওয়াহাব সরকার তার 'বাংলাদেশের গীতি' বইয়ে বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত লোক সাহিত্য 'সংকলন' ২২ খন্ড ৬-পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়েছেন: 'সারি গান নদীমাতৃক বাংলাদেশের নিজস্ব সৃষ্টি। আদিকালে বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চল সমুদ্রের মতো দেখাত। আদিকাল থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম নৌকা তৈরি হতো। চলন্ত নৌকার বৈঠার তালে তালে কথা সাজিয়ে বাংলার আদিম সামাজ থেকেই সারি গানের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সারি গান এ জেলায় বর্তমানে বিপন্নপ্রায় বেশ বয়স্ক দু'জন সারি গানের গায়কের নাম এখানে উল্লেখ করা হল: ১। ভোলা সেক ২। ধলু সেক। দু'জনের ঠিকানাই এক। গ্রাম মেরুরচর, বকসিগঞ্জ, জামালপুর। নিম্নে একটি সারি গান উল্লেখ করা হলো:

উজান খাইল মেঘমেঘ আইলরে মইশাল
ভাটি খাইল বানেরে
ওরে আমার ছোকরা মইশাল রে
ছেড়া অঞ্চল ধরিয়া টানে রে
কালো ছোকরা মইশাল বন্ধু রে।
তুই মইশালের দুঃখ দেইখারে
মইশাল ছাতি করিব দান রে
ওরে আমার ছোকরা মইশাল রে।

মুর্শিদি: মুর্শিদ অর্থ পথপ্রদর্শক। যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। আরবি ইরশাদ শব্দটির অর্থ নির্দেশ। যিনি ইশরাদ বা নির্দেশ দেন তাকে মুর্শিদ বলে। সে অর্থে মুর্শিদকে গুরু বলা যেতে পারে এই মুর্শিদ বা গুরুর প্রতি ভুক্তিবিষয়ক সঙ্গীতকে মুর্শিদি গান বলে।

এ গানের উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রাম। জামালপুর জেলাতেও এর প্রচলন দেখা যায়। জামালপুর বকসিগঞ্জ অঞ্চলের মুর্শিদ হামিদুল ইসলাম (টিকরকান্দি) এ গানের রচয়িতা, সুরকার এবং শিল্পী। এর ছাড়াও মুর্শিদ ছামিউল হক, (কুশলনগর), মুর্শিদ মহন, মুর্শিদ মহিরউদ্দিন (ফুলকের চর, ইসলামপুর), তারা বয়েতী (নালিতাবাড়ি), হাফিজ তারা (বাজিতখিলা) এরা সবাই মুর্শিদি গান গেয়ে থাকেন। মুর্শিদ হামিদুল ইসলামের একটি মুর্শিদি গান নিম্নে দেওয়া হলো:

আমার মাটির অঙ্গ বানাইয়া
দেখেছ হাটাইয়া
শুকুরিয়া জানাই ওগো সাই। (২ বার)
মহব্বতের একজন তুমি
খুঁজে বেড়াই আজও আমি
নির্জনে বসে রইছ তুমি একাই। ঐ
পীর-দরবেশ ফকির বাদশা
গাহে তোমারি গান
জীন ইনসান পশু-পাখি
সব তোমারি দান
রবি-শশি গ্রহতারা

www.pathagar.com

সব তোমারি গড়া
বিধাতা হয়ে আছ আপন ঠিকানাই। (সংক্ষিপ্ত)

আনুষ্ঠানিক গীত: কোনো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত গাওয়া হয়। যেমন বিয়েতে হলুদের অনুষ্ঠান, নবজাতক সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক, মানত সম্পর্কিত গীত ইত্যাদি। মেয়েরা সম্মিলিতভাবে বা এককভাবে এ ধরনের গীত গেয়ে থাকে যেমন: বিয়ের হলুদ অনুষ্ঠানের গীত:

হলদি তো হলদি গো
সব-অ রঙের হলদি গো
কও কও হলদি তোমার জনমের কথা গো।
আমারি জনম-অ গো
ছায়ে মাটির তলে গো
আমি আসছি বাছার বিয়ের সঙ্গে গো।

অথবা,

কেমন হাতের কেমন হলদি বাটিছ গো
বালির গায়ে তুলিতে হলদি মিলিছে গো
থও হলদি থও হলদি সাতাসি গো
বালির ভাউজি আসিয়ে হলুদ মাখিব গো।

মেয়েলি গীত: মেয়েলি গীত জামালপুরের লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। মেয়েলি গীত শুধু মেয়েরাই পরিবেশন করে থাকে এ অঞ্চলে একক বা সম্মিলিতভাবে মেয়েরা এ গীত পরিবেশন করে থাকে। আমাদের সমাজে নারীরা সাধারণত নির্যাতিতা। নারীদের করুণ নির্যাতনের চিত্র এ গীতে উঠে আসে। যেমন:

কেয়া সুন্দরী আগনে (আঙিনা) শুরে
ময়ুরের পাংখা দিয়ে
আগনে শুরিতে শুরিতে কেয়া
কিসের কুরিনে (বিলাপ) কর
আমারি মনে হছে কালোনী মায়ের কথা
তোমারি মায়ের বদলে কেয়া আমার মায়েরে ডাকিও
তোমার মায়েক ডাকিলে গো সাধু
বাড়া বানবের কব-অ
আমারি মায়েক ডাকিলে গো সাধু
কোলে তুলে নিব-অ।

বিয়ের গীত: সামাজিক যত অনুষ্ঠান আছে বিয়ের অনুষ্ঠান তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিয়ে শুধু ব্যক্তিগত বা জাতিগত অনুষ্ঠান নয়, এক সমাজভুক্ত সকলেই বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করে থাকে। আবদুল ওয়াহাব সরকার তার 'বাংলাদেশের লোকগীতি'তে লিখেছেন, বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে যে সব লোকাচার দেখা যায় তার মূল উৎসব দুটি: সংস্কারবোধ ও আমোদপ্রিয়তা বা উল্লাস। তিনি বিয়েকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১। বিয়ের পর্ব: গায়ে হলুদ, মেহেদি তোলা, পান-খিলি, বর-স্নান, বরণ ডালা- ইত্যাদি। ২। বিয়ের অনুষ্ঠান: বরবরণ, কনে সিংরান, বর বিদায় ইত্যাদি। ৩। বিয়ের পর: বধূবরণ, পাশাখেলা ইত্যাদি। কনে বিদায় অনুষ্ঠানে জামালপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নের সঙ্গীত পরিবেশিত হয়:

www.pathagar.com

বাড়ির শোভা বাগ-বাগিচা
ঘরের শোভা বেটি গো-সুন্দর ময়না
এতদিন-অ পালিলাম ময়না
ঠোঁটের আদার দিয়ে গো-সুন্দর ময়না। ঐ
এতদিন-অ পালিলাম ময়না
দুধ-অ ভাত-অ দিয়ে গো সুন্দর ময়না
যাবার কালে গেলে গো ময়না
শুন্যে উড়াল দিয়ে গো-সুন্দর ময়না।
ঘর ভরা আই-অ গো থাকিতে
ময়নাক করল চুরি গো-সুন্দর ময়না।
বাড্ডিক ভরা মজলিস গো থাকিতে
ময়নাক করল চুরি গো-সুন্দর ময়না। ঐ

মালসী: মালসী গান জামালপুর অঞ্চলের পুরনো গান। বৃটিশ আমলে জমিদারদের দাপট ছিল প্রচুর। সুখের সাগরে এরা গা ভাসিয়ে চলতো। জমিদারদের আনন্দ ফূর্তির জন্য এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গঞ্জে বা বড় বড় গ্রামীণ বাজারে পতিতা পল্লী ছিল। খদ্দরকে আকর্ষণ করার জন্য পতিতা পল্লীতে মালসী গান গাওয়া হতো। একটি ছোকরাকে মেয়ে সাজিয়ে এই গান গাওয়া হতো। বয়স্ক দুজন তালেব আলী বয়েতি ও রইচ উদ্দিন বয়েতি, চককাউরিয়া, বকসীগঞ্জে মালসী গানের গায়ক হিসাবে পাওয়া গেছে। তাদের গাওয়া গান সংগ্রহ করেছেন কবি রজব বকশী:

আমার মন গিয়েছে আনারসে
তুলতে বাসনা
তুলতে বাসনা গো আমার
দেখতে বাসনা।
গিয়েছিলাম বাগানেতে
আনারস কী ধরছে গাছে
থাকলে তুমি খাইও ছিড়ে
অন্যেরে বিলাইও না। ঐ

মাঙ্গনের গান বা মাউনের গান: মাঙ্গনের গানকে জামালপুর জেলায় 'হুতুম তুলার' গানও বলা হয়ে থাকে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি না হয়ে খরা দেখা দিলে গ্রাম্য কিশোরীরা গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি চাউল সংগ্রহ করে খাবার আয়োজন করত। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা আশিজন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কাজেই খরা দেখা দিলে 'আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই' বলে সৃষ্টিকর্তার নিকট আবেদন করে থাকে। আর কিশোরী মেয়েরা কলা গাছ পুঁতে একটি গর্ত করে দুর্বা, হলুদ দিয়ে তাতে পানি ঢালে আর সমস্বরে গান গায়। এক জন কিশোরীকে 'হুতুম' সাজিয়ে তাকে মারধর করত। লোকমনে বিশ্বাস: ঐ হুতুম যদি কাঁদে তাহলেই বৃষ্টি হবে। হুতুম তোলার গান:

হুতুমের মাও লো শুয়ে
কাটনি কাটিল শুয়ে
আমার হুতুম বাত (বাড়ি) নাই
কেডা খাব শুয়ে।
হুতুমের মায়ের লম্বা চুল
ঝাড়িয়ে দিব বিন্নের ফুল।

www.pathagar.com

বাউল গান: বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে বাউল গান একটি প্রধান ধারার গান। সংসারত্যাগী সাধক সম্প্রদায়কে বাউল সাধক বলা হয়। বাউল সাধক দ্বারা রচিত গানকেই বাউল গান বলা হয়। বাউল গান ও বাউল সাধকের শ্রেষ্ঠ সম্রাট লালন শাহ। লালন শাহের ধর্ম ছিল মানব ধর্ম। তাঁর কাছে কোনো প্রকার জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিভেদও ছিল না। লালন গেয়েছেন:

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতির কি রূপ
দেখলাম না দুই নজরে'।

বাউলেরা স্রষ্টাকে ভালোবাসেন। এই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তারা অসীমের সন্ধান করেন। বাউল গানে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচারিত হয়। মানুষই তাদের কাছে বড়।

বাউল গানের উৎপত্তিস্থল গড়াই ও মধুমতি নদীর পশ্চিম পাড়ের বদ্বীপ অঞ্চল হলেও জামালপুর জেলাতে এ গানের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে জামালপুরের চানমিয়া বাউল (মেলানদহ), করবান আলী বাউল (নিমাই মারি,কাউনিয়ার চর), রতন সরকার (ঝিনাইগাতি), আমিরুল ইসলাম (ঝিনাইগাতি), লালমিয়া বাউল (বকসীগঞ্জ), মুকুল বাউল (বকসীগঞ্জ), আমেনা বেগম (সারমারা,বকসীগঞ্জ), তারা বাউল (নালিতা বাড়ী), হাফিজ তারা বাউল (শেরপুর) এরা সবাই প্রসিদ্ধ বাউল গায়ক ও সাধক।

বারমাসি গান: বারমাসি গানে বছরের বারমাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকাঙ্ক্ষা-নিরাশার কথা বর্ণনা করা হয়। বারমাসি অপেক্ষাকৃত লম্বা গান। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে এ গানের বর্ণনা শুরু হয়। বারমাসি গান জামালপুর জেলায় নাই বললেই চলে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথাও দু'একটা গানের সুর শোনা যায়। বকসীগঞ্জের ইয়াজ উদ্দিন এবং মালির চর বকসীগঞ্জের সোরহাব মণ্ডল, এই দু'জনকেই শুধু বারমাসি গায়েন হিসেবে পাওয়া গেছে।

ব্যাঙ বিয়ের গান: জামালপুর অঞ্চলে ব্যাঙ বিয়ের গানও বৃষ্টির জন্য গাওয়া হতো। লোকমনের ধারণা ব্যাঙ জলে বাস করে। খরা হলে যদি ব্যাঙ বিয়ে দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই বৃষ্টি হবে। ব্যাঙ বিয়ের গান নিম্নরূপ:

ব্যাঙ ব্যাঙ জলের ব্যাঙ
বিষ্টি আইলে ম্যালে ঠ্যাং
ব্যাঙ বড় রসিয়ারে
আইলোরে নতুন পানি
ব্যাঙ করে কানাকানি
নূয়া জামইর কান্দে ছাতি
কোলা ব্যাঙে মারছে লাথি
নূয়া জামইর গোঁফে তা
ব্যাঙ বলে তুম তা না না।

ঘাটু গান: জামালপুর জেলায় একসময় ঘাটু গানের খুবই প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই গান বিলুপ্তির পথে। পাখিমারা, বকসীগঞ্জের প্রসিদ্ধ ঘাটু মুনছুর আলী সাম্প্রতিক কালে মারা গেছেন। তালেব আলী ঘাটু ও রইচ উদ্দিন ঘাটু বকসীগঞ্জ চককাউরিয়াতে এখনও বেঁচে আছে। ঘাটু গানে একজন ছেলে ছোকরাকে মেয়ে সাজিয়ে, তাকে দিয়েই গান গাওয়ানো হতো। তখনকার দিনে একজন ঘাটুর মূল্যমান বেশ ছিল। নিম্নে একটি ঘাটু গানের নমুনা দেয়া হলো:

ও হারে চেংরা বন্ধুরে
গরমী জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না
ঘর তুলে দে নদীর কূলে।

www.pathagar.com

ঘর তুইলাছি সারি সারি
চতুর্দিকে বাঁশের দেউড়ি
মধ্যে একখান টিনের চইড়ি
ঘর তুইলাছি নদীর কূলে। ঐ

একদিল গান: জামালপুর জেলার লোক সঙ্গীতের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারা একদিল গান। একদিল গান পীর মানতি গান। এ গান পীর মুর্শিদ এবং দেবতাকে উৎসর্গ করে গাওয়া হয়ে থাকে। যে কোনো সময় মানুষ বিপদাপদে পড়লে বিপদ উদ্ধারের জন্য একদিল গান মানত করে থাকে। সাধারণত নিঃসন্তান বাবা-মা সন্তান পাওয়ার জন্য এ মানত করে থাকে। গরু-মহিষের শাবকের আশাতেও অনেকে এ মানত করে থাকে। একদিল গানে প্রধান একজন গায়ক বা বয়েতি থাকে আর চার-পাঁচ জন দোহার (সহযোগী গায়ক) হিসেবে কাজ করে। প্রথমে আসরের চারদিকে চারটি খুঁটি পুঁতে চাদুয়া টাঙ্গানো হয়। তারপর মাঝখানে দোহার বসে, বৃত্তাকারে বয়েতি নেচে নেচে এ গান করে। গান করার সময় সবাই আলাদা আলাদা পোষাক পরিধান করে। আসরের মাঝখানে রাখা হয় একটি পানির ঘট। এই ঘটে পীরের নাম করে তিনবার চামর ডুবানো হয়। এই চামরই একদিল গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কথিত আছে যে, এই চামর কেউ কোনোদিন চুরি করে নিতে পারে না। বয়েতি মোঃ আবদুর রহিম (ফকির), সহযোগী বয়েতি সুরুজ আলী, আনোয়ার ও সহিজল সর্বসাং বাইল্যে গাঁও, উপজেলা ঝিনাইগাতী, আমাদের জানালেন যে, একদিল গানের নাকি কেউ কোনোদিন ক্যাসেট করতে পারে না। তারপর আসরের চারকানি (চারদিক) বন্দনা করে, পীর ও উস্তাদের নাম বন্দনা করে গান শুরু করেন। মানত ছাড়া একদিল গান গাওয়া হয় না। একদিল গানের দু'একটি গানের লাইন এখানে দেয়া হলো:

একদিল পীর বড় পীর
বাঞ্জা গাইয়ের খায় ক্ষীর
দু'কূলে জাহেরী করে
বাঞ্জা গাইয়ের খায় ক্ষীর
হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীর ...

কেচ্ছা গান: কেচ্ছা গান জামালপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত একটি ধারা। এ গান গাতক বা গীদেল একা একাই আসরে বৃত্তাকারে নেচে নেচে অঙ্গি-ভঙ্গি দেখায়ে গেয়ে থাকে। কেচ্ছা গানে প্রধান বাদ্যযন্ত্র দোতারা ও জরি। বাদকেরা আসরে বসে বাজনা বাজায়। গায়েন ধুতি পড়ে হাতে রুমাল নিয়ে এ গান গায়। কেচ্ছা গান সাধারণত গ্রীষ্মকালে বাড়ির দহলে আসর বসিয়ে গাওয়া হয়। তখন গায়েনের গায়ে শুধু একটি হাতাকাটা গেঞ্জি থাকে। কেচ্ছা গানগুলোর মধ্যে গফুর বাদশার কেচ্ছা, সোনাভানের কেচ্ছা, মরিচমতি কন্যার কেচ্ছা, মানিক মতি কন্যার কেচ্ছা ও জরিনা সুন্দরীর কেচ্ছা এখনও এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে গেঁথে আছে। শ্রীবরদীর সহিদ, ছাবু, কান্দুলীর বাক্কী, দুলাল, বকসীগঞ্জের প্রখ্যাত গাতক আমজাদ আলী বর্তমানে কেচ্ছা গান গেয়ে থাকে। আমজাদ আলীর শতাধিক কেচ্ছা গানের ক্যাসেট বাজারে রয়েছে।

মঞ্চ গান: মঞ্চ গানকে রংপুর অঞ্চলের ঝুমুর গানের সাথে তুলনা করা যায়। এ গানকে আমরা ঝুমুর গানও বলতে পারি। স্বাধীনতা পূর্বকালে জামালপুর জেলার গ্রামে গ্রামে মঞ্চ গানের রেওয়াজ ছিল সর্বাধিক। তখনকার দিনে মানুষকে প্রতিযোগিতা করে বেঁচে থাকতে হয়নি। ধান, পাট ও রবিশস্য ছিল কৃষকের প্রধান ফসল। কোনো কোনো কৃষক জমিতে বছরে একবার মাত্র ফসল উৎপাদন করত। কাজেই তাদের জীবনে অবসর ছিল প্রচুর। এ অঞ্চলে মুসলমান রায়তদের জমিদার ছিল হিন্দু। জমিদার বাড়িতে একটি বড় আটচালা ঘর থাকতো। এটাকে কেউ কেউ নাটমন্দিরও বলতো। এই নাটমন্দিরে সারা বর্ষাকালে বিভিন্ন গানের রিহার্সেল হতো। এ গানগুলির মধ্যে মঞ্চ গানই অন্যতম। তখনকার দিনে গ্রামে মঞ্চের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবে মঞ্চের বিকল্প হিসেবে ৩/৪টি চৌকি একত্র করে মঞ্চের ব্যবস্থা করা হতো। মঞ্চগানে নারীদের

www.pathagar.com

ভূমিকা সব সময় পুরুষ দিয়ে করানো হতো। মঞ্চ গানে হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল, করতাল বা জরি, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। মঞ্চগানে সকল পাত্র পাত্রী সংশিষ্ট পোষাক পরিধান করতো। এ অঞ্চলের মঞ্চ গানগুলোর পালার নাম কৃষ্ণলীলা, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন, কংসবধ, নিমাইসন্ন্যাস, সাগরভাসা, পুষ্পমালা, মেহারনিগার, আলোমতি প্রেমকুমার, শাহএমরান-চন্দ্রভান, গফুরবাদশা-বানেছাপরী, লালভানু, জরিনাসুন্দরী, আনোয়ারা ও ফুলকুমারী ইত্যাদি।

মঞ্চগানের উৎপত্তিস্থল নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া হলেও জামালপুর অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। সম্প্রতি জামালপুর বেলটিয়াতে একটি মঞ্চগানের দল বিদ্যমান। মঞ্চগানে নায়ক-নায়িকা গানের মাধ্যমে তাদের আবেদন প্রকাশ করে। আর অন্যান্য পাত্র-পাত্রী কথপোকথনের মাধ্যমে আবেদন প্রকাশ করে থাকে। তবে কোনো কোনো মঞ্চগানে বিবেকের ভূমিকায় একজনকে গান পরিবেশন করতে দেখা যায়। এখানে মঞ্চগানের একটি উদাহরণ দেয়া হলো:

নায়ক: শোন আনোয়ারা কিসের লেখাপড়া
লেখিতে পড়িতে আমার প্রেমের হইল জ্বালা...

অন্যখানে নায়িকা: পুবালী বাতাসে গায়ের বসন যায় উড়িয়া
রাখিতে না পারি যৌবন অঞ্চলে ঢাকিয়া গো
অঞ্চলে ঢাকিয়া...

ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া: ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গান জামালপুর অনঞ্চলের গান নয় ।এ গান রংপুর অনঞ্চলের গান। তবে এ গানগুলো খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানে আধুনিক গায়কেরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাঝে মাধ্যে ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া গেয়ে থাকেন।

ছাদ পেটানো গান: সাধারণত দালানের জল ছাদ করার সময় শ্রমিকেরা সারিবদ্ধভাবে এ গান গেয়ে তালে তালে ছাদ পেটায়। এজন্য এ গানকে সারি গানও বলা যেতে পারে। ছাদে একজন ছোকরাকে মেয়ে সাজিয়ে ঘুঙ্গুর পায়ে নাচানো হয়। ছাদ পেটানো একটি গান এখানে পরিবেশিত হলো:

বন্ধুয়া বন্ধুয়া গো
যার বা ঘরে সুন্দর মেয়ে
তার কি ভাতের অভাব পড়ে
চাকর ছ্যাড়া রাইখ্যা দিছে কোন অভাব নাই।
বিয়ে দিল ধুমে ধামে সাধের জামাই যায়না ঘরে
দক্ষিন ঘরে শুয়ে নিদ্রা যায়।
শশুরে কয় পুভা (জারজ) পোলা পাইছ তুমি রসুগোলা
আরো পাইছো আমৃতি মিঠাই।
রে বন্ধুয়া দেশে নাই।
তোর লাগিয়া সোনার দেহ পুড়ে করলাম ছাই
রে বন্ধুয়া দেশে নাই।

মর্শিয়া: জামালপুর জেলায় স্বাধীনতা পূর্বে মর্শিয়া গানের বেশ প্রচলন ছিল। এ অঞ্চলের লোক এ গানকে 'মর্চে' বলে জানে। মর্চে গানে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনা করা হতো। এ গান বেশি সংখ্যক মানুষ এক সাথে গেয়ে থাকে। সবাই লাঠি-ফলা নিয়ে শরীরে লাল রং মেখে যুদ্ধের অভিনয়ের সাথে সাথে এ গান গেয়ে থাকে। বর্তমানে জামালপুর অঞ্চলে এ গান একেবারেই লুপ্ত।

আদিবাসী লোকসঙ্গীত: আমরা পূর্বেই বলেছি এ জেলার উত্তর সীমানায় নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আধার গারো পাহাড় জুড়ে রয়েছে অদিবাসীদের বসবাস। এদেরও রয়েছে নানা কৃষ্টি-কালচার। ঐতিহ্যবাহী সমাজ

www.pathagar.com

সংস্কৃতি এদের জীবনকে করে রেখেছে আনন্দমুখর। আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের একটি 'আজিয়া' বা লোকসঙ্গীত এখানে উল্লেখ করা হলো-

স্বাগতিক: আইয়া ও-ও-ও-
বাওনিসা রে-বাআ না আরা
কচ্চি নাসা রে আংগেন না আরা
না আ কনি মান্দেমিং
মাই মাচং রাং কমিং না আরা।

(বাংলা: আপনি কোথায় থেকে এসেছেন বা কোথায় যাবেন, কোন গাঁয়ের কোন গোত্র আপনি?)

আগন্তক: আইয়া ও-ও-ও-
আঙা ইয়া সংওনি রে বা আ
মান সংদং সংমাচি রে আং ওয়া।
(বাংলা-আমি অমুক গ্রাম থেকে এসেছি। মায়ের গ্রামে এসেছি।)

ভাবার্থ: কোনো গ্রামে নতুন অতিথি প্রবেশের সময়ে স্বাগতিক ও আগন্তুক ব্যক্তিদের পরিচয় পর্বের লোকসঙ্গীত।

উদাসিনী গান: জামালপুর জেলার আঞ্চলিক গান না হলেও এ জেলায় এ গানের প্রচলন খুবই ছিল। বাংলাদেশের মানুষের মন খেয়ালি প্রকৃতির মতই খেয়ালি। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য 'লোক' মনকে করে দারুণ প্রভাবিত। মানুষের হৃদয় হয়ে উঠে আলোড়িত ও আন্দোলিত। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় মানুষের হৃদয় হয় পরিবর্তিত। মন হয় কখনও উদাস কখনও আনন্দে উদ্বেল।

কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলের মানুষ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান বা পাট নিড়ানি দেওয়ার সময় মাঠে কয়েকজন মিলে একসাথে উদাসিনী গান গাইত। মাঠে মাঠে গান গাওয়ার সময় এরা কোনো বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করত না। এ গান অপেক্ষাকৃত লম্বা গান। শ্রমজীবী মানুষের জীবনের চিত্র বিধৃত থাকতো উদাসিনী গানে। বর্তমানে এ জেলায় এ গান প্রায় বিলুপ্ত। শ্রীবরদী উপজেলার আবুয়ার পাড়ার সাইদুর রহমানের কাছ থেকে পাওয়া উদাসিনী দু'টি গানের প্রথম কলি উদ্ধৃত করা হলো:

ও মইষাল রে...
মইষ চরাও মইষাল বন্ধুরে
মইষাল সুরমা নদীর কূলে
ছাতি নাই মাইথাল নাই মর (মোর) মইষাল
সদাই গামছা মাথে মইশাল রে...
আমার বাড়ি যাইও মইষাল রে
কিনে দিমু ছাতি
বাপে মায়ে দিছে গালি মইষাল
মইষালী বাতারী (ভাতার) মইষাল রে...
ও কি হায় মর কালা গহিন দেইখ্যা
ধইরো হালও রে...
কালা বাপও মাও আমার নিদারুণ
টাকা নিল ষোল পণ
ও কি হায় মোর কালা
বিয়া দিল মাগ (মাগী) মরার কাছে রে...

www.pathagar.com

উপসংহার: বহুদিন ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত সঙ্গীতই 'লোকসঙ্গীত'। বর্তমানে মিডিয়ার বদৌলতে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে কর্মব্যস্ত জীবনে কোনো সঙ্গীতই উচ্চরিত হতে দেখা যায় না। লোকসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। এই মূল্যবান সম্পদ জামালপুর তথা সারা বাংলাদেশ থেকে একেবারেই হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনের নানা লোকজ কর্মকাণ্ড এবং মানবিক সংবেদনশীলতা। বিলুপ্তপ্রায় এসব অমূল্য সম্পদ 'লোকসঙ্গীত' কে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমীর মতো দেশের গবেষণামূলক বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে এবং বেশ সময় নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

তথ্যপঞ্জি

আবদুল ওয়াহাব সরকার, বাংলাদেশের লোকগীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ- ১৩।
আবদুল ওয়াহাব সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪।
আহমদ শরীফ, সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৩৮১, পৃ- ৪০৮।
আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৯।
আবদুল ওয়াহাব সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ- ২০।
আবদুল ওয়াহাব সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫।
সংগ্রহ, কবি রজব বকশী, বকসীগঞ্জ, জামালপুর।
আবদুল ওয়াহাব সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪।
সংগ্রহ, লতিফা বেগম, কলেজ রোড, শ্রীবরদী, শেরপুর।
সংগ্রহ, লতিফা বেগম, প্রাগুক্ত।
সংগ্রহ, লতিফা বেগম, প্রাগুক্ত।
সংগ্রহ, লতিফা বেগম, প্রাগুক্ত।
সংগ্রহ, জবেদা খাতুন, উত্তর শ্রীবরদী, শেরপুর।
আবদুল ওয়াহাব সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬।
আবদুল ওয়াহাব সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩।
সংগ্রহ, ক্ষমা চক্রবর্তী, প্রভাষক, বাংলা, ঝিনাইগাতী কলেজ, শেরপুর।
সংগ্রহ, রজব বকশী, প্রাগুক্ত।
আবদুর রহিম (ফকির), বাইল্যে গাঁও, ঝিনাইগাতী।
মোঃ আবুল কাশেম মেম্বার, সাতানী শ্রীবরদী, শেরপুর।
প্রাঞ্জল এম সাংমা, হারিয়াকোনা, শ্রীবরদী, শেরপুর।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ শরীফ, সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৩৮১।
আবদুল ওয়াহাব সরকার, বাংলাদেশের লোকগীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।
ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ঢাকা, ৩৮/২ক, বাংলা বাজার, ঢাকা।
রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন, মানব সমাজ, অনুবাদ, ডঃ সুবোধ চৌধুরী।
আবদুল হাফিজ, লোকসমাজ ও মানব সমাজ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সপ্তদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৪০৬।
নূরুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৯৬৫।

www.pathagar.com

৬.৩ টাঙ্গাইল জেলার লোকসঙ্গীত

শফিউদ্দিন তালুকদার

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রে উনিশতম জেলা হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার জন্ম হয়। এ জেলার জন্ম শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক প্রয়োজনের ফল ছিল না। টাঙ্গাইল ছিল জেলার মর্যাদা লাভের উপযোগী আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি জনপদ। সুপ্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনকে যুগে যুগে পরিপুষ্ট করেছে। আর ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সেই পুষ্টতাকে পূর্ণ করে জনজীবনের সাথে একাত্ম করেছে। তাই জনইতিহাসেও টাঙ্গাইলের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অস্বীকার করা যায় না। মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে ছোট ছোট পরগনায় বিভক্ত করেন। সে সময় কাগমারি ও আটিয়া পরগনাকে অবলম্বন করে টাঙ্গাইল গঠিত হয়েছিল। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে আটিয়া পরগনায় প্রথম শাসক নিযুক্ত হন শাহানশাহ বাবা আদম কাশ্মিরী (র.)। অপরদিকে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে আটিয়া পরগনায় শাসনভার লাভ করেন তাঁর ভাগ্নে শাহজামান (র.)। মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) বাংলার সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) সর্বপ্রথম টাঙ্গাইলসহ মুসা খানের অধীনস্থ প্রায় সমুদয় এলাকায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। টাঙ্গাইল জেলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে। অতঃপর এ জেলা মুঘলদের অধীন থেকে বাংলার মুঘল সুবাদারগণের শাসিত হয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)।

টাঙ্গাইল জেলার নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী তিব্বত-বর্মীদের মিশ্রণ বিশিষ্ট প্রাক-আর্য অস্ট্রিক নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জাতিগত উপাদান এসেছে আলপাইন বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নরগোষ্ঠী থেকে। আদি নরডিক বা তথাকথিত আর্যজাতির রক্তধারার প্রভাব ক্ষীণ হলেও এ জেলার অধিবাসীদের ওপর পড়েছে। এরপরে মুসলমান আমলে তুর্কী, ইরানী ও আরব দেশীয় রক্তধারার প্রভাব এ জেলার মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক এ জেলায় বসবাস করে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ময়মনসিংহ জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর ৮টি থানার সমন্বয়ে টাঙ্গাইল জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলায় টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর, কালিহাতী, ভূঞাপুর, বাশাইল, মির্জাপুর, নাগরপুর, দেলদুয়ার, সখিপুর ও ধনবাড়ি এই বারটি উপজেলা রয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটি জেলা। এর সম্ভার যেমন বিচিত্র, শিল্পমানে তেমনি উৎকৃষ্ট। টাঙ্গাইল জেলার লোকসাহিত্য, টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত, ভূঞাপুরের জনজীবন ও সংস্কৃতি, টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলো ছাড়া এ জেলার লোকসংস্কৃতি কিংবা লোকসঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা হয় নি। লোকসংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী শাখা লোকসঙ্গীতের ব্যাপ্তি রয়েছে এ জেলা জুড়ে।

ধুয়াগানঃ ধুয়াগান লোকসঙ্গীতের একটি শক্তিশালী শাখা। 'ধুয়া' শব্দটি সংস্কৃত 'ধ্রুব' শব্দ থেকে এসেছে। 'ধ্রুব' এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থির বা অচঞ্চল। গানের যে অংশ স্থির থাকে অর্থাৎ বারবার গাওয়া হয় তা-ই ধুয়া। ধুয়াগান দীর্ঘ প্রকৃতির গান। এ গানের তাল, ছন্দ ও লয় লম্বা। ধুয়াগানে বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি, উর্দু ও সংস্কৃত শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। টাঙ্গাইল জেলার ধুয়াগানগুলোতে

www.pathagar.com

টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ রয়েছে। ধুয়াগানের প্রথম কিংবা শেষ স্তবকে রচয়িতার নাম উল্লেখ থাকে। এ গানের কোনো পাণ্ডুলিপি থাকে না।

যুগযুগ ধরে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ এ গান রচনা করে আসছে। রোদ-বৃষ্টির মধ্যে ক্ষেতে কাজ করার সময় বিশেষ করে ধান, পাট ও অন্যান্য শস্য নিড়ানির সময় কৃষকেরা ধুয়াগান গায়। ধান, পাট ও অন্যান্য শস্য নিড়ানির সময় প্রচণ্ড রোদের তাপে যখন কৃষকদের সারা দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে; কিংবা বিরামহীন বৃষ্টিতে যখন শরীর ভিজতে থাকে তখন পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য কৃষকেরা ধুয়াগান গেয়ে থাকে। আসর করেও ধুয়াগান পরিবেশিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক আসরও হয়ে থাকে। ধুয়াগানের প্রতিটি দলে একজন মূল গায়েন ও তিন থেকে পাঁচজন পর্যন্ত 'দোহার' বা পাল দোহার থাকে। ধুয়াগানে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

কখনো এককভাবে দলগতভাবে এ গান পরিবেশিত হয়। চিত্তবিনোদনের জন্যও এ গানের আসর হয়। ধুয়াগানের রচয়িতা, সরকার ও শিল্পীও থাকে গ্রামের নিরক্ষর কিংবা অর্ধশিক্ষিত মানুষ। ধুয়াগানের বিষয় বিন্যাস বিচিত্র। ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি, ঐতিহাসিক ঘটনা, সমসাময়িক মুখরোচক ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আধ্যাত্মিকতা, আন্দোলন সংগ্রাম, প্রেম-বিরহ, হাস্যরসিকতা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি ধুয়াগানের বিষয় বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। ভূমিকম্প বিষয়ে একটি ধুয়াগানের অংশবিশেষ উল্লেখ করছি।

১৩০৪ সনের ভূঁইকাপের বিধান
হইলো রে গুড় গুড়া গুড় কম্পমান
লোকের হুস ছিলোনা না ছিলো গিয়ান,
ওরে স্বর্গে উতাল ভরকে পাতাল
পাইলাম না তার কোন অনুমান
গায়েব বুঝি করলো ছোবাহান
বাংলাতে ভাঙলো জিলা ইংরাজের কল-কুঠি-দালান ॥

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, ভূঞাপুর, গোপালপুর, মির্জাপুর, দেলদুয়ার ও কালিহাতী উপজেলার পশ্চিমাংশে ধুয়াগানের প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও জামালপুর জেলার চরাঞ্চলে এ গানের প্রচলন রয়েছে।

বৃষ্টি নামানি গানঃ বৃষ্টি নামানি গান সমবেত গান। এ গান সাধারণত গ্রামাঞ্চলের ছয় থেকে দশ বৎসরের ছেলেরা গেয়ে থাকে। টাঙ্গাইল জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা বৃষ্টিকে 'বিষ্টি' 'বোরাক' বা ' দেওয়া' বলে। বৃষ্টির কামনায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে গ্রামের ছেলেরা দলবেঁধে গ্রামের প্রতিটি উঠোনে গড়াগড়ি খায়। এ সব ছেলেদের অধিকাংশই থাকে ন্যাংটা। বাড়ির বৌ-ঝিরা কলসি ভরে গড়াগড়ি খাওয়া ছেলেদের ওপর পানি ঢেলে দেয় এবং মনের আনন্দে তারা বৃষ্টি নামানি গান গেয়ে পিচ্ছিল করে দেয় ওঠোন। সমস্বরে বলে ওঠে:

তিল খ্যাতে বসিয়া
তিলের মোতা ধরিয়া
সোনার দেওয়া নামো রে
অধরে।

বৃষ্টি নামানি গান বিলুপ্ত হতে চলেছে। টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার চরাঞ্চল ব্যতীত এ গান আর কোথাও শোনা যায় না।

মালসী গানঃ বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নওগাঁ ও টাঙ্গাইল জেলায় প্রচলিত এক শ্রেণীর প্রেম-বিচ্ছেদমূলক লোকসঙ্গীতের নাম মালসী। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে মালসী সঙ্গীতের উদ্ধৃতি রয়েছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মালসী রাগিনীর নামানুসারে মালসী সঙ্গীতের নামকরণ হয়েছে। অষ্টাদশ

www.pathagar.com

শতাব্দীতে রামপ্রসাদ রচিত ভক্তিমূলক শ্যামা সঙ্গীত মালশ্রী রাগিনীতে গাওয়া হতো বলে এগুলো বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে 'মালসী' নামে পরিচিত। টাঙ্গাইল জেলার মালসী গানে মালশ্রী রাগিণী ব্যবহৃত হয় না। চটুল ছন্দে পরিবেশিত হয়। গানগুলোও সংক্ষিপ্ত। একক কিংবা দ্বৈতকণ্ঠেও গাওয়া যায়। টাঙ্গাইল জেলায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক ও লৌকিক প্রেমবিষয়ক মালসী গানের প্রচলন রয়েছে। মালসী গান বিলুপ্ত হতে চলেছে। বর্তমানে এ জেলার ধনবাড়ি ও মধুপুর উপজেলায় মালসী গানের প্রচলন দেখা যায়। নিম্নে একটি মালসী গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করছি:

ঘাটে ক্যানে আইলাম লো সই শ্যামের বাঁশি ক্যান বাজে না
প্রতিদিন তার বাঁশি বাজে আইজ ক্যানে বাঁশি বাজে না ॥

পালকির গান: পালকি মানুষের কাঁধে বাহিত যান বিশেষ। আয়তক্ষেত্রবিশিষ্ট। চারদিক কাঠ দিয়ে মোড়া, ছাদটা ঢালু। দু'দিকে দুটো দরজা থাকে। বাইরের দিকে নক্শা করা। ভেতরে দুজন মানুষের বসার জায়গা থাকে। ওপরের দিকে থাকে কাঠের লম্বা বাট। বিয়ে, অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে জমিদার, জোতদার, তালুকদার কিংবা রক্ষণশীল পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমনের জন্য অন্যতম প্রধান বাহন ছিল পালকি। পালকি বাহকদের বলা হতো 'বেহারা'। বাগদী, বাউড়ি ও মেঠেল সম্প্রদায়ের লোকেরা পালকি বহন করতো। বেহারারা পালকি কাঁধে নিয়ে চলতে চলতে গান গাইত। তাদের গানের বিষয়বস্তু ছিল-সাবধানতা, প্রকৃতি, তাৎক্ষণিক দৃশ্য, মানুষ ইত্যাদি। পালকির গান আমাদের লোকসঙ্গীত থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে।

বিচ্ছেদে গান: 'বিচ্ছেদ' এর আভিধানিক অর্থ বিয়োগ বা বিরহ। বিচ্ছেদ গানে না পাওয়ার বেদনা ব্যক্ত হয়। পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির, গুরুর সাথে শিষ্যের এবং নায়ক-নায়িকার বিরহই মূলত এই গানের মূল উপজীব্য। কোনো কোনো বিচ্ছেদ গানে রাধা-কৃষ্ণ রূপক নিয়ে রচিত। বাউল গানের আসরে বিচ্ছেদ গান পরিবেশিত হবেই। বিচ্ছেদ গানে দোতারা ঢোলক, জুরি ব্যবহৃত হয়। টাঙ্গাইল জেলায় প্রচলিত একটি বিচ্ছদ গানের অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি:

আমার সুখের নিশি ভোর হইলো
বন্ধু রয় বিদ্যাশে
উড়ে যাও উড়ন্ত পাখি রে
প্রাণ বন্ধুর তালাশে ॥

ধান ভানার গান: ঢেঁকির সাহায্যে ধান হতে চাল বের করার পদ্ধতিতে "ধানভানা" বলে। টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ভাষায় ধানভানাকে 'বারাভানা" বলা হয়। ঢেঁকিতে ধান ভানতে ভানতে গ্রাম্য মহিলারা গান গাইত। এটি মূলত সমবেত কর্মসঙ্গীত। এই গানের মধ্যে মেয়েলি ঘরানার কথোপকথন, ব্যাঙ্গোক্তি ও চটুল রসিকতা স্থান পেত। এ গানের রচয়িতা, সুরকার শিল্পী নারীরাই। টাঙ্গাইল জেলায় ধানভনার গান এখন বিলুপ্ত।

ভাটিয়ালি গান: ভাটিয়ালি গান বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। 'ভাটি' শব্দটিকে কেন্দ্র করে ভাটিয়ালি গানের উৎপত্তি হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভাটির চলমান স্রোতের ওপর নৌকার পালে বাতাস লাগিয়ে মাঝিরা যে গান গাইত তাই-ই ভাটিয়ালি গান। এ গানের উৎপত্তি টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বলে জানা যায়। একদিকে অনন্ত আকাশ নদীর অন্তহীন বিস্তার অপর দিকে বিষণ্ন নিঃসঙ্গতাই ভাটিয়ালির বৈশিষ্ট্য। এ গানের বিষয়বস্তু লৌকিক প্রেম ও আধ্যাত্মিক প্রেম। ভাটিয়ালি গান এখন বিলুপ্ত।

মেয়েলি গান: নারী জীবনের প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশা, আনন্দ বেদনা, কামনা-বাসনা, হাসি-কান্না, উল্লাস-বিষাদ মেয়েলি গানে প্রকাশ পায়। মেয়েলি গানের উৎস মূলত পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করে। এ গানের রচয়িতা ও শিল্পী নারীরাই। গানের ভাষা সহজ সরল। একক কিংবা দলগতভাবে মেয়েলি গান পরিবেশিত হতে পারে। তবে দলগতভাবে পরিবেশিত হলে এ গানের পূর্ণাঙ্গতা ফুটে ওঠে। এক সময় টাঙ্গাইল জেলাজুড়ে মেয়েলি গানের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এ গান বিলুপ্ত। নিম্নে টাঙ্গাইল জেলার একটি মেয়েলি গানের উল্লেখ করছি:

মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বোনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেও চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির শাড়ি গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।
মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বোনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেও চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির জামা গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।

চটকা গান: 'চটুল' শব্দ থেকে চটকা শব্দটির উদ্ভব। চটকা চটক জাতীয় গান। দর্শক শ্রোতার মনে যে গান রঙের চটক ধরায় তাই চটকা গান নামে পরিচিত। সাধারণত প্রেম-বিষয়ক হালকা চটুল কথাবার্তা নিয়েই চটকা গান রচিত হয়। কখনো গভীর ব্যঞ্জনাময় সমাজচিত্র, কখনো চটুল ছন্দে গীত-আনন্দ হাসি আর কৌতুকের অভিব্যক্তিকে ভরপুর কখনো বা এ গানে প্রকাশ পায় গভীর দীর্ঘশ্বাসের মর্মবেদনা। টাঙ্গাইল জেলায় চটকা গান বিলুপ্তির পথে। এ জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ, জামালপুর, দিনাজপুর, রংপুর ভারতের উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার এবং আসামের গৌরিপুর জেলায় এ গানের প্রচলন রয়েছে।

ভজন গান: স্রষ্টার নৈকট্যলাভের আশায় ভজন গান পরিবেশিত হয়। মানব গুরুর চরণ সেবা করে ভক্তরা পরম গুরুর নৈকট্য পেতে চায়। ভজন গানে ভক্তরা পরম গুরু কিংবা গুরুকে 'দয়াল' 'দয়াল চান', 'দয়াল গুরু' 'মুর্শিদ' মুর্শিদ চান ইত্যাদি নামে ডাকে। ভজন গানের আসর শুরু হয় পীর-মুর্শিদের বন্দনামূলক গান দিয়ে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে ভজন গানকে 'ফকিরান্তি' গান বলে। ভক্তদেরকে বলা হয় 'ফকির'। ফকিরগণ কোনো না কোনো পীরের মুরিদ হন। ভজন গানের আসর আরম্ভ হয় গভীর রাতে; শেষ হয় সুবেহ সাদেকের পূর্বে। কোনো মুরিদানের ওঠোন কিংবা আঙ্গিনায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে। গানের সাথে জিকির হয়। আসর যখন জমে ওঠে তখন আবেগ আপ্লুত হয়ে ভক্তরা একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। ভক্তদের এই কোলাকুলিকে টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ভাষায় 'দশাধরা' বলে। বাউল গানের আসরেও ভজন গান পরিবেশিত হয়। ভজন গানে একতারা, খোল, করতাল, কয়া, পাতল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

জারি গান: জাফা দীর্ঘ কাহিনীমূলক গান। এটি দলগত উপস্থাপনা। জারিগানের মূল গায়েনকে বলা হয় 'বয়াতি'। বয়াতিকে যারা সহযোগিতা করে তাদেরকে বলা হয় 'দোহার' বা 'পাল দোহার'। কোনো কোনো জারি গানে আসর বন্দনা করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক জারিগানের আসরও হয়। ধর্মীয় কাহিনী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়বস্তু নিয়ে জারিগান পরিবেশিত হয়। হাস্যরসাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক, প্রেমমূলক কাহিনীও জারিগানে স্থান পায়। টাঙ্গাইল জেলায় ইমাম চুরির জারি, জঙ্গনামার জারি, নওখরিদার জারি, ফাতেমার জারি, বন্যার জারি, বাঘের জারি, আকালের জারি, বৌ বন্ধকের জারি, রহিমা বিবির জারি, মোহররমের জারি, কছরনামার জারি, হাসানের বিষপানের জারি, শেখ ফরিদের জারি, এজিদ বধের জারি, ইসমাঈল নবীর জারি প্রভৃতি পরিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

সারি গান: সারিগান লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান শাখা। সারিগানকে 'হারিগান' 'হাইরগান'ও বলা হয়। এ গানকে নৌকা বাইচের গানও বলে। সারিগান বলতে সাধারণত নৌকা বাইচের গানকেই বুঝায়। মূলত বাইচের নৌকার মাল্লারা বা বাইচালরা সারিবন্ধভাবে বসে বৈঠার তালে তালে যে গান গায় তাকে সারিগান বলে। চর্যাপদে 'সারি' শব্দ আছে 'বীণার ছড়' অর্থে। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে (১৪৯৪) সারিগানের উল্লেখ আছে। শ্যাম চাঁদ গুপ্ত (১৭৭৪-১৮৫৪)-এর রচিত সারিগান সংগ্রহ করে রামপ্রাণ গুপ্ত 'সারিগান' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর আমলে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অবলম্বন করেই সারিগানের উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছে। ড. ওয়াকিল আহমদ সারি গানের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। যেমন,

১. সারি শ্রম-সঙ্গীত
২. সারি সমবেত সঙ্গীত
৩. সারি তাল প্রধান সঙ্গীত
৪. সারি প্রধানত পুরুষের গান।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল অর্থাৎ টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলাকে সারিগানের পিতৃভূমি বলা হয়। এ ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলাকে সারিগানের সঙ্গীতাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। টাঙ্গাইল জেলার মধ্যে গোপালপুর, ভূঞাপুর, মির্জাপুর, কালিহাতী, ঘাটাইল, নাগরপুর উপজেলা সারিগান সমৃদ্ধঅঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে সারিগানের মূল গায়েনকে বলা হয় 'বয়াতি'। ময়মনসিংহে 'দোহার' বা 'পাটমাঝি' বলে। বাইচাগণ 'পাল দোহার' হিসেবে বৈঠার তালে তালে গানে অংশ নেয়। সারিগানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে টিকারা ও খুঞ্জুরি ব্যবহৃত হয়। সারিগানকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. বন্দনা
২. প্রতিযোগিতায় যাওয়ার সময়
৩. বাইচে বিজয়ী কিংবা পরাজিত হওয়ার পর
৪. বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের সময়।

সারিগানের অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

পাখি উড়িলো রে কইতরের জোড়া
উড়িতে না পারে পাখি হইয়্যাছে ব্যাজোড়া
পাখি উড়িলো রে ...।
পরথোম আল্লাহ বিসমিল্লাহ খোদারই জবান
হরদমে হরদমে লইয়্যে আল্লাহ নবীর নাম
পাখি উড়িলো রে ... ॥

ধামালী গান: টাঙ্গাইল অঞ্চলে কয়েকজন পীর ফকিরের মাজারকে কেন্দ্র করে ধামালী গান হতো। বর্তমানে কালিহাতী উপজেলার বাঘুটিয়া গ্রামে একটি অজ্ঞাত মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাজার প্রাঙ্গণে ধামালী গান হয়। ধামালী প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়। পূর্বে আশেকান নারী-পুরুষ একত্রে ধামালী গানে অংশ নিত। বর্তমানে শুধু পুরুষেরাই অংশ নেয়। ধামালী গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল, কারা, জুরি ও বাঁশি ব্যবহৃত হয়। ধামালী গান লুপ্ত হতে চলেছে।

বারোমাসী গান: বার মাস বা ছয় ঋতুর চিত্র চরিত্র অবলম্বনে মানব-মানবীর আনন্দ-অশ্রুর আবেগ-উচ্ছ্বাসময় গীতিই 'বারোমাসী'। এ গানকে বারাশে, বারোমাস্যা, বারাইস্যা, বারোসা, বারাসিয়া, বারাইসা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। টাঙ্গাইল অঞ্চলে এ গান বারোমাসী গান নামেই পরিচিত। নারী সুখ নারীর দুঃখকে কেন্দ্র করেই বারেমাসী গানের কাহিনী আবর্তিত। বিরহিণী নারীর আর্তির প্রকাশ বারোমাসী গানের

www.pathagar.com

উপজীব্য। প্রবাসী স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর মন ও জীবনের বিরহ-ব্যথা অথবা প্রেমিকের অনুপস্থিতিতে প্রেমিকার বিরহ-ব্যথা বারোমাসী গানে প্রকাশ পায়। বিরহ-ব্যথা এককে মাসে এককে রকম হয়।

বারেমাসী গান অত্যন্ত দীর্ঘ প্রকৃতির গান। এ গানের সুর কখনো করুণ, কখনো রসালো। এ গানে ধর্মের কোনো তত্ত্বকথা নেই। গ্রাম্য করিয়ালরাই বারোমাসী গানের রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পী। টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, ময়মনসিংহ, সিরাগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, নওগাঁ অঞ্চলে বারোমাসী গানের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই গান টাঙ্গাইল অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। টাঙ্গাইল অঞ্চলের বিলুপ্ত কয়েকটি বারোমাসী গানের নাম। যেমন- কমলার বারোমাসী, নীলা দেবীর বারোমাসী, দুবলী কইন্যার বারোমাসী, তুরা কইন্যার বারোমাসী, রাধারাণীর বারোমাসী, বন্ধুয়ার বারোমাসী, শান্তি কইন্যার বারোমাসী প্রভৃতি।

ঘাটু গান: ঘাটু পাহাড়ি অঞ্চলের গান। ঘাটু গানের বিষয়বস্তু প্রেমনির্ভর। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমই ঘাটুগানের মূল উপজীব্য। প্রেমের মধ্যে পরকীয়া ভাব লক্ষ করা যায়। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গরিব কৃষকেরা প্রতি বছর কার্তিক মাসে আসামে নৌকা নিয়ে ছন কাটতে যেত। অবস্থান করতো তিন মাস। পাহাড়ে বাঘের ভয়ে তারা প্রতিদিন সন্ধের পূর্বেই ঘাটে বাধা নৌকায় চলে আসতো। সারাদিন পরিশ্রমের পর বিনোদনের জন্য তারা নিজ নিজ নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে গান পরিবেশন করতো। ঘাটে বাঁধা নৌকায় অথবা গান গেয়ে ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়তো বলেই এ গানের নাম ঘাটু হয়েছে বলে জানা যায়। সুন্দর চেহারার কিশোর বালককে বালিকা সাজিয়ে ঘাটু পরিবেশিত হয়। ঘাটুগানের নায়ক-নায়িকাকে 'ছোকড়া' ও 'ছেড়ি' বলা হয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঘাটুগানের দুটো ধারা রয়েছে। যেমন,

১. শ্যাম
২. রাই

কৃষ্ণকে 'শ্যাম' এবং রাধাকে 'রাই' নামে অভিহিত করে ঘাটু গান গাওয়া হয়। ঘাটু গান রঙ্গিলা, মুরলী, জলভরা এবং বিচ্ছেদ এই চারটি ভাগে বিভক্ত। ঘাটুগান এখনো পরিবেশিত হয়। তবে নৌকার পাটাতনের ওপর নয়, আসর করে। চৌকি সাজিয়ে, খোলা মাঠে কিংবা আঙ্গিনায়। ঘাটু প্রতিযোগিতামূলক গান। প্রতিটি ঘাটুর দলে একাধিক মূল গায়েন বা 'বয়াতি থাকে। পাঁচ থেকে সাতজন দোহার বা পাল দোহার থাকে। এরা একই আসরে বসে। ঘাটু গানের কোনো পাণ্ডুলিপি থাকে না। বন্দনা গীত হয়। এ গানের পয়ারগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যেমন,

বারে বারে বলছি শ্যাম গো
কমল নিদ্রা কইরো না,
একটা গাছে দুইটা কলি
একটা ছোট একটা বলী
একটা কলির মূল্য শ্যাম গো
তোমায় বেচলি হবে না ॥

গানের মাধ্যমেই "শ্যাম' রাইকে, 'রাই' শ্যামকে প্রশ্ন করে এবং গানের মাধ্যমেই উত্তর দিয়ে থাকে। গানের সাথে নাচ হয়। ঘাটু নাচ খুবই আকর্ষণীয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সারিন্দা, ঢোলক, করতাল, খুঞ্জুরি, জুড়ি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ঘাটুগান বিলুপ্তির পথে। টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি, মধুপুর, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার কাশিমপুর, জামালপুর জেলার কেন্দুয়া ও ইসলামপুরে ঘাটুগানের দল রয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার প্রায় প্রতিটি উপলোয় বাউলগান, কবিগান. দেহতত্ত্ব, মরমি, মারেফতি, কীর্তন, পালাগান ও বেহুলার গানের আসর হয়। সঙের গান ভূঞাপুরের ফলদা, গোবিন্দাসী, টাঙ্গাইলের ছোট বাশালিয়া, দাইন্যা, রসুলপুর অঞ্চলে রয়েছে। দেলদুয়ার ও মির্জাপুরেও এ গানের দল রয়েছে। বিপন্ন হতে চলেছে ভিক্ষুকের গান। এ জেলার লোকসঙ্গীতের তালিকা থেকে হারিয়ে গিয়েছে বিচার গান ও চরকার গান।

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীত স্রষ্টা (মৃত): শ্যাম চাঁদ গুপ্ত (১৭৭৪-১৮৫৪), কেদারপুর, টাঙ্গাইল। শাহ আজাহার (১৮৬৫-১৯৬০), বিন্নাইরচর, নাগরপুর। নহর চাঁন ফকির (মৃ. আনুমানিক ১৯৫০), জাশিহাটি, বাসাইল। আহেদুল্লাহ মণ্ডল (মৃ. ১৯৬১), নলুয়া, ভূঞাপুর। রাধা বল্লভ (মৃ. আনুমানিক ১৯৬২), আজগানা, মির্জাপুর। মেন্দু সরকার (মৃ. আনুমানিক ১৯৬২), ভারই, ভূঞাপুর। শের আলী দেওয়ান, (মৃ. ২২ আগস্ট, ১৯৮১), দেওহাটা, মির্জাপুর। কোরবান আলী মোগল (মৃ. ১৯৮২), দিঘলআটা, গোপালপুর। খোরশেদ আলী (১৯২৭-১৯৯২), করাতিপাড়া, বাসাইল। ইউনুস আলী (১৯২৭-১৯৯২), ভাদগ্রাম, মির্জাপুর। আবুল কাশেম (১৯২৯-১৯৯৩), খাকজানা, টাঙ্গাইল। আবদুল শাহ ফকির (১৯০৬-১৯৮৪) বাঘুটিয়া, কালিহাতী। কাইমুদ্দিন শাহ (১৯০১- ?), গোপালপুর, নাগরপুর। মাজম আলী দেওয়ান (মৃ. ২২ অক্টোবর, ১৯৮৩) আদাবাড়ি, কালিহাতী। খন্দকার মকবুল হোসেন (মৃ. ৯ নভেম্বর ১৯৯৯), গোপিনাথপুর, ভূঞাপুর। নাসির উদ্দিন (১৯৩০-১৯৯৭), চামারি ফতেহপুর, মির্জাপুর। আবদুল সরকার (মৃ. ২০০৩), খোদ নিকলা, ভূঞাপুর। ছাবেদ আলী, চর ঝাওয়াইল, গোপালপুর। সায়েদ আলী, কুতুবপুর, ভূঞাপুর।

লোকসঙ্গীত স্রষ্টা (জীবিত): গণেশ রক্ষিত (জ. ২৭ চৈত্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ), শাখারিয়া, গোপালপুর। বেল্লাল মিঞা (জ. ১৯৫৪), পানানগ্রাম। তরব আলী দেওয়ান, (জ. ১৯৪২), বারিন্দা, নাগরপুর। রাধাবল্লভ চৌধুরী (জ. ১৯৪৮), গ্রামটিয়া, মির্জাপুর। সিরাজ মিঞা (জ. ১৯২৫), সারুটিয়া, টাঙ্গাইল। হাবিবুর রহমান (জ. ১৯৬০), শুভল্যা, মির্জাপুর। বাহাদুর আলী খান (জ. ১৩২৩ বঙ্গাব্দ), বামনহাটা, ভূঞাপুর। সুনীল চন্দ্র দাস (জ. ১৯৪৯), পালিমা, কালিহাতী। নজরুল ইসলাম (জ. ১৯৫৯), শাখারিয়া, গোপালপুর। শাহান শাহ, কচুয়া, সখিপুর। জামাল উদ্দিন তালুকদার, গোপিনাথপুর। আফসার আলী খান, অর্জুনা, ভূঞাপুর। আনছার আলী, বাইচাইল, ঘাটাইল। আবদুল হালিম, কচুয়া, সখিপুর। আবদুস সামাদ, চাপড়ি। রওশন আলী, ননী গোপাল, মধুপুর। আবদুর রহমান, বৈতর, দেলদুয়ার। আবদুল জুব্বার, দিঘলআটা। ইসমাইল হোসেন, মোহাইল, গোপালপুর। মতিয়ার রহমান, ধুবলিয়া, ভূঞাপুর। গোলাম মওলা, চামারি ফতেহপুর, মির্জাপুর। আব্দুল ওহাব, বেড়াডাকুরি, গোপালপুর। জামাল উদ্দিন, জামুর্কী, মির্জাপুর।

লোকসঙ্গীত শিল্পী (মৃত): ইজ্জত আলী তালুকদার, (জ. ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, মৃ. ২০০৪ খ্রি.), ঝাওয়াইল, গোপালপুর। দিলবর মাতাব্বর (মৃ. ১৯৮৮ খ্রি.), মশাজান, মির্জাপুর। রেফাজ উদ্দিন (মৃ. ১৯৮৮ খ্রি.), ভারই, ভূঞাপুর। জসিম উদ্দিন সরকার (মৃ. ১৯৯৭ খ্রি.), ভারই, ভূঞাপুর। সিকিম উদ্দিন (মৃ. ১৯৭৫ খ্রি.), অলোয়া। আদু খাঁ (মৃ. ২০০৩ খ্রি.), নিকলা, ভূঞাপুর। আয়ান ফকির (মৃ. ১৯৯৭ খ্রি.) গাজুটিয়া, নাগরপুর। আতাব ফকির (মৃ. ১৯৭৫ খ্রি.) পুংলি, কালিহাতী। সাবিত্রি বালা সূত্রধর (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) ঝাওয়াইল, গোপালপুর। শাহ আলী (মৃ. ২০০১ খ্রি.), ঝুপনা মুশুদ্দি, মধুপুর। ইয়াদ আলী শেখ, (মৃ. ২০০০ খ্রি.), বামনহাটা, ভূঞাপুর। নূর মোহাম্মদ (মৃ. ২০০৩ খ্রি.) কুমুল্লি নামদার, টাঙ্গাইল। আমীর সরকার, (মৃ. ১৯৭৯ খ্রি.) হাজরাবাড়ি। ময়েজ উদ্দিন শেখ, (মৃ. ২০০২ খ্রি.) ঝাওয়াইল। তসর আলী ভূঞা (মৃ. ২০০১ খ্রি.) ঝাওয়াইল, গোপালপুর। জালাল উদ্দিন (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) বাওশাইদ, দেলদুয়ার। হেলাল উদ্দিন (মৃ. ১৯৮০ খ্রি.) ভারই, ভূঞাপুর। জয়েন উদ্দিন শেখ (মৃ. ১৯৯৮ খ্রি.), কুরপান মণ্ডল (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) নলুয়া। আবদুল হামিদ (মৃ. ১৯৯৮ খ্রি.) মাইজবাড়ি, ভূঞাপুর। রোস্তম আলী (মৃ. ২০০০ খ্রি.) গোহালিয়াবাড়ি, কালিহাতী। সদর উদ্দিন (মৃ. ২০০৩ খ্রি.) বেলটিয়াপাড়া, গণি মণ্ডল (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) জুঙ্গীপুর। দারোগ আলী (মৃ. ২০০১ খ্রি.) নলুয়া। আনোয়ার হোসেন (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) নিকরাইল। ছলিম উদ্দিন (মৃ. ১৯৮৮ খ্রি.) ভাদুরীর চর। আবদুস সামাদ (মৃ. ১৯৮৯ খ্রি.) ভাদুরীর চর, ভূঞাপুর। মকরম আলী (মৃ. ১৯৮৮), মধুপুর।

লোকসঙ্গীত শিল্পী (জীবিত): ফটিক আলী (জ. ১৯৩৪), কামান্না, দেলদুয়ার। কোরান আলী (জ. ১৯৪৪) মানরা, নাগরপুর। ওয়াজেদ আলী (৬২), বোরহান আলী (৫৫), ধলা মিঞা (৪২), আব্দুস সালাম (৩৫), চামারি ফতেহপুর, মির্জাপুর। মর্তুজ আলী (৭৫), ফলদা, ভূঞাপুর। আম্বিয়া বেগম (৪৫), দাপনাজোড়, বাসাইল। মর্জিনা বেগম (৪৫), চর বাদিরিয়া, ময়েন উদ্দিন পাগল (৮০), ফকির আবুল হোসেন (৭২),

www.pathagar.com

দক্ষিণ পাথালিয়া, আনসার আলী (৬১), খোন্দকার আজহার আলী (৫৬), ঝাওয়াইল, গোপালপুর। কাশেম আলী বয়াতি (৮২), ডিগ্রির চর, আয়েজ উদ্দিন (৭৮), নলুয়া, অছিম উদ্দিন চকিদার (৫৫), গোবিন্দপুর, কফিল উদ্দিন (৮০), অর্জুনা, ভূঞাপুর। আবদুল হামিদ (৫৩), খাকজানা, টাঙ্গাইল। রাধা বল্লভ চৌধুরী (৬৭), গ্রামাটিয়া, হামিদ আলী চৌকিদার (৫৮), মশাজান, ফরিদ আলী বয়াতি (৬১), ভাদগ্রাম, মির্জাপুর। রহিজ মাতাব্বর (৯০), দত্তপাড়া, টাঙ্গাইল। আরশেদ আলী আসমান (৪৮), মাদারজানি, গোপালপুর। মনিরুজ্জামান মনির (৫০), বীরহাটি, ভূঞাপুর। কানু রঞ্জন দাস (৫০), শাখারিয়া, আবুল কালাম (৬০), বালোবাড়ি, শুকুর আলী (৫৫), বালোবাড়ি, গোপালপুর। হায়দার আলী জামাদ্দার (৭৫), গোপিনাথপুর, মনোরঞ্জন দাস (৫৮), জগৎপুরা, গকুল চন্দ্র দাস (৫৬), অর্জুনা, কাদের আলী (৭১), তেরিল্যা, শহিদুল ইসলাম (৪০), বীরহাটি, ভূঞাপুর। ফজর আলী (৬৮), আলমনগর, গোপালপুর। রমজান আলী (৫৫) গোপিনাথপুর, ভূঞাপুর। শাহ আলম (৫৭), খাকজানা, টাঙ্গাইল। হাসমত আলী (৭০), কচুয়া, সখিপুর। সাগর আলী (৬৫), পৌলি, কালিহাতী। রেখা রাণী সরকার (৪০), করটিয়া, টাঙ্গাইল। হেলাল উদ্দিন (৬২), কাউলাজানী, মির্জাপুর। সুনীল সরকার (৫৬) গাততলা, দেলদুয়ার।

ধুয়াগানের শিল্পীদল, বামনহাটা, ভূঞাপুর। মূল গায়েনঃ বাহাদুর আলী খান (৭৮), দোহার বা পাল দোহারঃ হাবেল খাঁ (৫৬), মর্তুজ আলী (৬০) আবদুর রহিম (৬৫) তৈয়ব আলী (৫১), **ধুয়া ও জারীগানের শিল্পীদল, বেড়াডাকুরি, গোপালপুর**। মূল গায়েনঃ আব্দুল ওহাব (৪৪), দোহার বা পাল দোহারঃ শফিকুল ইসলাম ঠাণ্ডু (৩৬), আকাব্বর আলী (৪৫), মতিয়ার রহমান (৩৮), আবদুর রাজ্জাক (৩৫), তোফাজ্জল হোসেন (৩১), লিয়াকত আলী (৩৩), মজনু মিঞা (৩০), সুলতান আলী (৫০), আলমাছ আলী (৪৫)।

জারী, ধুয়া ও পালাগানের শিল্পীদল, কালিহাতী। মূল গায়েনঃ আবদুল গফুর দেওয়ান (৬০), দোহার বা পাল দোহারঃ মফিজ উদ্দিন (৫৮), নয়ন উদ্দিন (৫৯), আদাবাড়ি, শমসের আলী (৬২), মাদারিয়াপাড়া, ইন্তাজ আলী (৫৫), আবদুস সালাম (৫৫), আমীর আলী (৬০), জমির আলী (৫৬), কাজিপাড়া।

ধুয়াগানের শিল্পীদল, ভাদুরীর চর, ভূঞাপুর। মূল গায়েনঃ মর্তুজ আলী (৭৫), দোহার বা পাল দোহারঃ আবু বকর (৫৫), আবদুল হাই (৬৭), ইবরাহীম আলী (৬৫), মোবারক হোসেন (৫৮), নয়া মিঞা (৪০), আবদুল বাছেদ (৫০), আবদুল সালাম (৩৫), মতিয়ার রহমান (৬০)। **জারীগানের শিল্পীদল, জিগাতলা, ভূঞাপুর**। মূল গায়েনঃ খন্দকার মর্তুজ আলী (৭২), দোহার বা পাল দোহারঃ আব্দুর রহিম (৫৫), আবুল ফজল (৩৮), এমদাদুল হক (৫২), খন্দকার আবদুল বাছেদ (৫০), আবদুল বাছেদ (৫৩)।

ঘাটু ও মালসীগানের শিল্পীদল, ধনবাড়ি। মূল গায়েনঃ কিতাব আলী (৪০), দোহার বা পাল দোহারঃ লাল মিঞা (৩০), মোহাম্মদ আলী (৩৫), ধরাটি আঙ্গারিয়া, মোনায়েম খান (৩৮), বাবলু মিঞা (২৭), ধরাটি ঘাঘরা। **পালাগানের শিল্পীদল, ধনবাড়ি**। মূল গায়েনঃ আব্দুস সামাদ (৫০), দোহার বা পাল দোহারঃ আলমাস আলী (৪৫), ঈশা মিঞা (৫১), শহীদ আলী (৩২), বাবলু মিঞা (৪০), ঘাঘরা বরমপুর। **ধুয়াগানের শিল্পীদল, ধনবাড়ি**। মূল গায়েনঃ ময়না মিঞা (৫৮), দোহার বা পাল দোহারঃ আসর উদ্দিন (৪৫), পাতলা চরা, খলিলুর রহমান (৭০), শহীদুল ইসলাম (৬০), আবদুস সামাদ (৫০), জহির উদ্দিন (৪১), ঘাঘরা বরমপুর।

বাণিজ্যিক মূল্যমান: বাউল গান, কবিগান, ঘাটুগান, জারীগান, ছাদ পোটানো গান, সারিগান প্রভৃতি বিভিন্ন আসরে পরিবেশনা, সিডি ও ক্যাসেট প্রকাশসহ বাণিজ্যিকভাবে বার্ষিক মূল্যমান অনুমানিক প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। উল্লেখিত সঙ্গীতের মেধা স্বত্বের মালিক লোকসঙ্গীত শিল্পীগণ।

বিপন্ন লোকসঙ্গীতের তালিকা: ঘাটু গান (দলগত), ভজন গান (একক), পালা গান (দলগত), জারী গান (দলগত), মালসী গান (দলগত), চটকা গান (একক), ধামালী গান (দলগত)।

লুপ্ত লোকসঙ্গীত: মেয়েলী গান (একক/দলগত), বারোমাসি গান (একক), ধানভানার গান (দলগত), চরকার গান (একক), পাল্কির গান (দলগত), ভাটিয়ালী গান (একক/দলগত)।

www.pathagar.com

প্রচলিত লোকসঙ্গীত: ধুয়া গান (একক/দলগত), সারি গান (দলগত) কবি গান (দলগত), বাউল গান (দলগত), বিচ্ছেদ গান (দলগত), মারফতী গান (একক/দলগত), কীর্তন গান (একক/দলগত), সঙের গান (দলগত), মামী-ভাগ্নের গান (একক/দলগত), ছাদ পেটানোর গান (দলগত)।

সুপারিশমালা

ক. স্থানীয় গবেষকদের মাধ্যমে প্রচলিত, বিপণ্ন ও লুপ্ত লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ও এ সব সঙ্গীতের উৎপত্তি, বিস্তৃতি এলাকা, উপস্থাপনা, পরিবেশন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. বছরে কমপক্ষে একবার উপজেলা পর্যায়ে লোকসঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা। অঞ্চলভিত্তিক সঙ্গীতস্রষ্টা, শিল্পী ও গবেষকদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মাননা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

গ. ক্যাসেট কিংবা ভিডিও, সিডির মাধ্যমে লোকসঙ্গীতগুলো সংরক্ষণ করা।

ঘ. বছরে অন্তত একবার জেলাভিত্তিক লোকসঙ্গীত বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা। স্থানীয় গবেষকগণ লোকসঙ্গীতের যে কোনো একটি শাখা নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার: টাঙ্গাইল জেলার লোকসংস্কৃতি ও এর উল্লেখযোগ্য শাখা লোকসঙ্গীত বিষয়ে মৌলিক কোনো গবেষণা হয় নি বললেই চলে। এ জেলার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীতের অজস্র উপাদান। আর এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারলে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে।

তথ্য নির্দেশ

নূরুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার টাঙ্গাইল, ১৯৯০, পৃ. ৩২।
শফিউদ্দিন তালুকদার, ভূঞাপুরের জনজীবন ও সংস্কৃতি, জলসা প্রকাশন, ভূঞাপুর, ২০০৪, পৃ. ১৬, ৩২।
মফিজুল ইসলাম সম্পাদিত টাঙ্গাইল জেলার লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মোঃ আব্দুল করিম মিঞা, টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
শফিউদ্দিন তালুকদার: ভূঞাপুরের জনজীবন ও সংস্কৃতি, জলসা প্রকাশন, ভূঞাপুর, ২০০৪।
মামুন তরফদার, টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য, ক্যাবকো, টাঙ্গাইল, ২০০৫।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত জাতীয় ফোকলোর সম্মেলন সম্মেলন-২০০৭ এ উপস্থাপিত শফিউদ্দিন তালুকদারের প্রবন্ধ- টাঙ্গাইল জেলার ধুয়াগান: বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পমূল্য, পৃ. ১।
শফিউদ্দিন তালুকদার, তদেব, পৃ. ১২৭।
শফিউদ্দিন তালুকদার, তদেব, পৃ. ১১৭।
ড. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৫৮৯।
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর- লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা-১৯৬৭, পৃ. ১৬৭৮।
ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত: আলকাপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,মে-২০০৩, পৃ. ৯৯।
শিল্পী কিতাব আলী, ধরাটি আঙ্গারিয়া, ধনবাড়ি, টঙ্গাইল।
শফিউদ্দিন তালুকদার, তদেব, পৃ. ১০৮, ১০৯।
ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসঙ্গীত সারিগান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩।
শফিউদ্দিন তালুকদার, তদেব, পৃ. ৩।
শফিউদ্দিন তালুকদার, টাঙ্গাইল জেলার নৌকাবাইচ ও সারিগান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ আয়োজিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, পৃ. ৩।
শফিউদ্দিন তালুকদার, তদেব, পৃ. ৯৯।
আতোয়ার রহমান, বারোমাসী বা বারমাস্য গান, লোক উৎসবে ঐতিহ্য চেতনা, সম্পাদনা-শাহিদা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১।

www.pathagar.com

৬.৪ ময়মনসিংহ জেলার লোকসঙ্গীত

ফরিদ আহমদ দুলাল

ভূমিকা: হাজার বছরের ইতিহাস-সমৃদ্ধ বাঙালির জীবনে রয়েছে লোকসংস্কৃতির পরম্পরা। লোকসংস্কৃতির বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে লোকসঙ্গীতের বিচিত্র বর্ণিল প্রাঙ্গণ। বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদের নানা অঞ্চলের মানুষের লোকসংস্কৃতির চরিত্র অভিন্ন নয়। প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের জীবনাচার প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি ও ফসল, খাদ্যাভ্যাস, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক-ঐতিহাসিক-নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যানুপাত সবকিছুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; আর এসব অনুষঙ্গের সাথে সঙ্গতি রেখেই বাঙালির লোকসংস্কৃতির মেজাজ ও অবয়ব।

আধুনিক শহুরে শ্রেণীর কাছে অনাদর অবহেলা পেলেও বাংলা গানের প্রবল ধারাটি এখনও লোকসঙ্গীত। এখনো জনপ্রিয় গানগুলোর সিংহভাগই সরাসরি লোকসঙ্গীত অথবা লোকসঙ্গীত-আশ্রিত। দীর্ঘ অবহেলায় বিপন্ন অথচ সর্বাধিক লোকপ্রিয় অনুষঙ্গটিকে খুঁজে-পেতে জনসমক্ষে তুলে আনা সহজ কর্ম না হলেও ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রার আবশ্যিকতার স্বার্থে দুর্লঙ্ঘ্য কাজটি করতে উদ্যোগী হবেন কেউ কেউ, এমন বিশ্বাস থেকেই বর্তমান রচনার উদ্যোগ।

জেলা পরিচিতি: প্রচলিত কাহিনী-কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতির ঐতিহাসিক নির্ভরতা না থাকলেও ময়মনসিংহ জেলার নামের সাথে সঙ্গীতের নানামুখী সংশ্লিষ্টতাকে বাতিল করে দেবার সুযোগ নেই। 'My men sing' 'আমার মানুষেরা গান করে'– একথা বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সত্য। যে লোকসঙ্গীতের জন্য বাংলাদেশ একদিন বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছিল সেই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বৃহত্তর ময়মনসিংহের সুর-সংশ্লিষ্টতার কথাই ঘোষণা করে। সঙ্গীত যেহেতু ইতিহাস-ভূগোল-প্রকৃতি ও মানুষ সংশ্লিষ্ট সেকারণেই ময়মনসিংহের লোকসঙ্গীতের সাথে পরিচিত হবার সুচনায় এ সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক নানা বিষয়ে সামান্য ধারণা উপস্থাপন করছি।

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও শেরপুর এই ছয়টি জেলা নিয়ে পরিচিত বৃহত্তর ময়মনসিংহ। ইংরেজ শাসনের সুবিধার্থে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে ময়মনসিংহ, আলাপসিংহ, জাফরশাহী, রণভাওয়াল, পুখুরিয়া, কাগমারি, আটিয়া, ষড়বাজু, সেরপুর, সুসঙ্গ, নাসিরুজিয়াল, হোসেনশাহী, হোসেনপুর, হাজরাদি, খালিয়াজুরী, জয়নশাহী, কুড়িখাই, নসরৎশাহী, লভিরপুর, মকিমাবাদ, আটগাঁও, বলরামপুর, ববিকান্দি, বাউখণ্ড চন্দ্রপ্রতাপ, ইদগা, ইছফাবাদ, রায়দোম, সিংহ-দরজিবাজু, কাসেমপুর, নিকলী, সাগরদী, হাউলী, জফুজিয়াল, ইছাপুর, বরদাখাত, পাতিলাদহ, তলন্দর ও ইছপসাহী এই ৩৯টি পরগনা নিয়ে গঠিত হয়েছিলো তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা।

ভৌগোলিক সীমারেখা বিবেচনায় ময়মনসিংহ জেলার পূর্বদিকে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা; পশ্চিমে গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলা; উত্তরে ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্য এবং দক্ষিণে মানিকগঞ্জ, ঢাকা, গাজিপুর ও নরসিংদী জেলার অবস্থান। ময়মনসিংহ নামের বিস্তীর্ণ এ জনপদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। এককালে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জেলা হিসেবে খ্যাত ময়মনসিংহ পরবর্তীকালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বেশ কিছুটা ছোট হয়ে আসে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল পৃথক জেলার স্বীকৃতি পাবার পরও ময়মনসিংহ ছিল উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। ময়মনসিংহ জেলাকে পরিচয় করিয়ে দিতে বলা হতো 'হাওর জংগল মৈষের সিং এই তিনে ময়মনসিং'। ময়মনসিংহের ভূ-প্রকৃতিতে একদিকে নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ জলাভূমি-হাওর অঞ্চল, মধুপুর ও ভাওয়ালের বিশাল বনাঞ্চল, ময়মনসিংহ-জামালপুরের সমতল অঞ্চল, শেরপুর-ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চল, টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ

www.pathagar.com

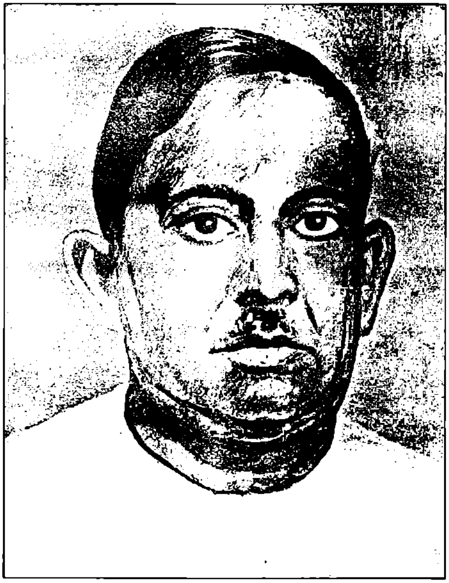

জালাল উদ্দীন খাঁ

বিলাঞ্চলসহ উর্বর ভূমি এ জনপদকে দিয়েছে বৈচিত্র্যের সমাহার। ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কারণে এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবিকা এবং সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। বিশেষত এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক আদিবাসীদের অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় মোট জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা এ অঞ্চলে একেবারেই নগণ্য। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে উপস্থাপিত হলো।

ময়মনসিংহ: এ জেলার উর্বর ভূমি ধান, পাট, সবজি ও রবিশস্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। মৈমনসিংহ গীতিকার মতো বিস্ময়কর লোকগাথা, পরিশীলিত সঙ্গীত ভুবন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিশাল আধার এই ময়মনসিংহ। এ জেলার পূর্বে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা; পশ্চিমে শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা; উত্তরে গারো পাহাড় ও ভারতের আসাম রাজ্য এবং দক্ষিণে গাজীপুর জেলা। জেলার মোট আয়তন ৪,৫৮৭ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা ৪২ লাখ ৪৩ হাজার ৯শ' ৩৬ জন। বর্তমানে আনুমানিক ৫০ লাখ। জেলায় উপজেলার সংখ্যা ১২টি: ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল, ভালুকা, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, গফরগাঁও, হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া। জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলাকে দিয়েছে শিক্ষা নগরীর মর্যাদা। দেশের একমাত্র মহিলা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন, প্রথম গার্লস ক্যাডেট কলেজ এবং কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় এ জেলায় অবস্থিত। এশিয়ার বৃহত্তম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ সদরে স্থাপিত। যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসেন। আনবিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ সদরেই স্থাপিত। এছাড়াও আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, মুকুল নিকেতনের মতো দেশখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ জেলায় অবস্থিত। এ জেলার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি। এ জেলার লাল বিরই, কালজিরা ধানের চাল, গফরগাঁও ও ফুলবাড়িয়ার বরুকার বেগুন, ফুলবাড়িয়ার হলুদ এবং মুক্তাগাছার মণ্ডার খ্যাতি সারাদেশে। জনসংখ্যার সিংহ ভাগই মুসলমান। তবে হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গারো, হাজং, বর্মণ, কোচ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষ জেলার হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, ভালুকা, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়াসহ বিভিন্ন উপজেলায় বাস করে। ময়মনসিংহ দেশের প্রাচীনতম শহরগুলোর অন্যতম। এখানে অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য, পুকুর-দীঘি রয়েছে। জেলা সদরের বুক চিড়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ।

টাঙ্গাইল: নিম্ন জলা ভূমিময় অসংখ্য বিল, সমতল কৃষিভূমি এবং বিশাল বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল জেলা সৌন্দর্য, শৌর্য-বীর্য, লোকশিল্পে এক সমৃদ্ধ জনপদ। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার

www.pathagar.com

টাঙ্গাইল মহকুমা পৃথক জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ জেলার কৃষি ধান, পাট, সরিষা, সবজি, কলাই ও আখ চাষে ঋদ্ধ। জেলার বিস্তীর্ণ বিলাঞ্চল ও নিম্ন জলাভূমিতে প্রচুর মাছ ও জলজ ফুল-ফল পাওয়া যায়। টাঙ্গাইল জেলার মোট আয়তন ৩,৪১৪.৩৯ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ৩০ লাখ ২ হাজার ৪২৮ জন। বর্তমানে আনুমানিক ৪০ লাখ। জেলায় মোট উপজেলার সংখ্যা ১১টি। টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতি, ঘাটাইল, মধুপুর, সখিপুর, বাসাইল, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, গোপালপুর, ভূয়াপুর ও নাগরপুর। টাঙ্গাইল জেলার পূর্বে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলা; পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ জেলা (যমুনা নদী); উত্তরে জামালপুর এবং দক্ষিণে মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলা অবস্থিত। টাঙ্গাইল জেলায় কৃষিজীবীর সংখ্যাই প্রধান। জেলায় মৎসজীবী ও শ্রমজীবীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। টাঙ্গাইলের কৃষিপণ্যের মধ্যে মধুপুরের আনারস, টাঙ্গাইলের ফুলকুপি; কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁতের শাড়ি, কাগমারির কাঁসা এবং পোড়াবাড়ির চমচমের খ্যাতি সারাদেশে। এছাড়াও টাঙ্গাইলের কাঁঠাল (মধুপুর) জেলার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রসনা তৃপ্ত করে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় টাঙ্গাইল জেলার রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। রাজনীতিতে টাঙ্গাইল জেলার মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক-এর খ্যাতি যেমন দেশজোড়া তেমনি মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর বীরত্বগাঁথাও কিংবদন্তিতুল্য। টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া, ধনবাড়ি, সন্তোষ, দেলদুয়ার, পাকুটিয়া, নাগরপুর, হেমনগর এর জমিদারদের খ্যাতিও সারাদেশে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও জমিদারদের অনেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

জামালপুর: জামালপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী কাঁসা শিল্প সারাদেশে সমাদৃত। ইসলামপুরের কাঁসার বাসনপত্র বাংলাদেশের বাইরেও সমাদৃত। এ অঞ্চলের গুড়, পানিফল ও বেগুনের খ্যাতি সারাদেশে। জামালপুর জেলার মোট আয়তন ২,০৩১.৯৮ বর্গ কিলোমিটার। জেলার পূর্বে ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলা; পশ্চিমে যমুনা নদী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলা; উত্তরে ভারতের মেঘালয়, কুড়িগ্রাম ও শেরপুর জেলা এবং দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলা অবস্থিত। জামালপুর জেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ২১ লাখ। জনগোষ্ঠীর সিংহ ভাগই মুসলমান, খুব সামান্যই হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ ও অন্য ধর্মাবলম্বী; যা মোট জনসংখ্যার ২.১৫ শতাংশের বেশি নয়। উপজাতীয়দের মধ্যে গারো, হদি, কুরমি ও মাল সম্প্রদায়ের মানুষের আবাস রয়েছে জামালপুর জেলায়। প্রশাসনিকভাবে জামালপুর জেলার সৃষ্টি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এ জেলার মোট উপজেলার সংখ্যা ৭টি: জামালপুর সদর, বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ ও সরিষাবাড়ি। ৭টি উপজেলার ৬টিতেই আছে পৌরসভা। জামালপুর জেলার কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, পাট, আখ, গম, বেগুন, সরিষা, মিষ্টিআলু, কালাই ইত্যাদি প্রধান। জামালপুরের শাহ্ জামালের মাজার, দুরমুঠের শাহ কামালের মাজার, দয়াময়ী মন্দির, নয়াপাড়া দূর্গ দর্শনীয় স্থান, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৭২ - ১৭৯০), নীল বিদ্রোহের স্মৃতি (১৮২৯) জামালপুরবাসীর অহংকারের বিষয়। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় জামালপুর অঞ্চলের মানুষের আছে উল্লেখযোগ্য অবদান।

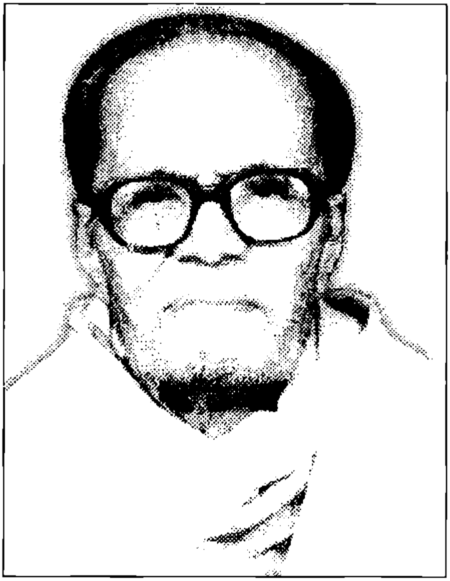

বাদল চন্দ

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ: বীর ঈশা খাঁ, দ্বিজবংশী দাস, কবি চন্দ্রাবতী, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনিরুদ্দীন ইফসুফ-এর স্মৃতিধন্য জেলা কিশোরগঞ্জ। একদিকে বিস্তীর্ণ হাওর-ভাটি অঞ্চল অন্যদিকে উর্বর কৃষি ভূমি, একদিকে লোক-সংস্কৃতির বিমূর্ত শাখার বৈচিত্র্যময় লীলাক্ষেত্র অন্যদিকে লোকজ শিল্পের মূর্ত শাখার বিপুল বৈভব; সব মিলিয়েই সমৃদ্ধ কিশোরগঞ্জ জেলা। কিশোরগঞ্জ জেলার মোট আয়তন ২,৫৩৭ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ২৪ লাখ। ১৯৮৪ সালে কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, ইটনা, অষ্টগ্রাম, মিঠামইন, বাজিতপুর, কুলিয়ার চর, ভৈরব বাজার, কটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, নিকলী এই ১৩টি উপজেলা নিয়ে স্বীকৃতি পায় কিশোরগঞ্জ জেলা। ব্রহ্মপুত্র, নরসুন্দা,মেঘনা,ধনু, বাউলাই,কালী নদী, সুতী নদী, আড়িয়াল খাঁ, ফুলেশ্বরী, সোয়াইজানী এসব নদীর জলধারার পাশে কিশোরগঞ্জ জেলায় রয়েছে বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চল। সঙ্গত কারণেই কিশোরগঞ্জের মানুষের জীবিকা কৃষি প্রধান হলেও মৎসজীবীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এককালে কিশোরগঞ্জ জেলার তাঁত শিল্পের খ্যাতি থাকলেও আজ আর তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে প্রস্তুত দুগ্ধজাত খাদ্য পনির-এর সিংহ ভাগ প্রস্তুত হতো কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম ও নিকলীতে। মানের দিক থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার পনির খুবই উন্নত। কিশোরগঞ্জ কিস্‌সা কাহিনী, পালাগান, সারিগান, জারি গান, নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি,আউল-বাউল লোক-সংস্কৃতির এসব শাখার জন্য ঐতিহ্যবাহী। ইতিহাসখ্যাত ঈশা খাঁর জঙ্গলবাড়ি দুর্গ করিমগঞ্জ উপজেলায়, কিশোরগঞ্জ সদর থেকে মাত্র সাত-আট কিলোমিটার দূরে। পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্ধু দুর্গ বীর ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত আরেক অঞ্চল। এগারসিন্ধুর প্রাচীন নগরী ও নৌ বাণিজ্য বন্দর। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্মৃতি নিয়ে আজো আছে বেবুধ রাজার দীঘি এগার-সিন্ধুতেই। যে প্রামাণিক বংশের সাথে কিশোরগঞ্জের নামের সংযোগ সেই প্রামাণিকের পুকুর জলটঙ্গি কিশোরগঞ্জ শহরের এক দর্শনীয় স্থান। দেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জ সদরের শোলাকিয়ার মাঠে। দেশের অন্যতম নদী বন্দর ভৈরব বাজার কিশোরগঞ্জেই। অবশ্য প্রাচীন নিদর্শনগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত-নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

নেত্রকোনা: পাগলপন্থী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিধন্য জেলা নেত্রকোনা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। জেলার মোট আয়তন ২,৮১০.৪০ বর্গ কিলোমিটার। নেত্রকোনা জেলার পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা; পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা; উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও গারো পাহাড় এবং দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলা অবস্থিত। জেলার মোট জনসংখ্যা ১৯ লাখ ৩৭ হাজার ৭শ ৯৪ জন। জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশই মুসলমান, বাকিরা হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত নেত্রকোনা জেলায় উপজেলার সংখ্যা ১০টি: আটপাড়া, বারহাট্টা, দুর্গাপুর, খালিয়াজুরী, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, পূর্বধলা এবং নেত্রকোনা সদর: এর মধ্যে পৌরসভার সংখ্যা ৪টি। নেত্রকোনা জেলার ভূ-প্রকৃতিতে একদিকে আছে হাওর অঞ্চলের জলাভূমি, অন্যদিকে পাহাড়ি

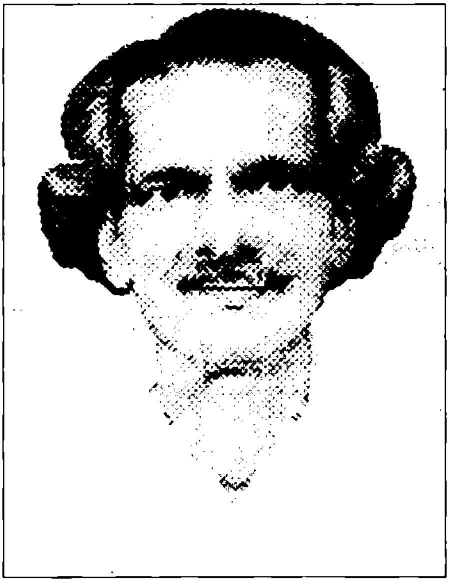

বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

মিঠুন দে

অঞ্চল এবং প্রধানত সমতল কৃষিভূমি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবান্বিত জনপদ নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেন মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক কবি চন্দ্রকুমার দে, খালেক দাদ চৌধুরী, রাজনৈতিক অঙ্গনের কিংবদন্তি কমরেড মনি সিংহ, কর্নেল তাহের, নলিনী রঞ্জন সরকার প্রমুখ। কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইল বাড়ি দূর্গ, খোঁজার দীঘি, দূর্গাপুরের কমলারানীর দীঘি, খালিয়াজুরী উপজেলার সালকি মাটি কাটা গ্রামের পুরাকীর্তি, নেত্রকোনা সদরের মদনপুর গ্রামের হযরত শাহ সুলতান কমরুদ্দিন রুমীর মাজার দেশের মানুষের কাছে দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। নেত্রকোনা জেলার বালিশ মিষ্টির খ্যাতি জেলার গণ্ডি ছাড়িয়েও। নেত্রকোনা জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের আদিবাসীর বাস এবং দূর্গাপুর উপজেলায় বিরিশিরিতে রয়েছে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী।

শেরপুরঃ বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের মেঘপুঞ্জ, পর্বত রাজ্যের বৈচিত্র্য ছুঁয়ে অবস্থান নিয়েছে শেরপুর জেলা। বৃহত্তর ময়মনসিংহের সবকয়টি জেলাই আগে ময়মনসিংহ জেলার মহকুমা থাকলেও শেরপুর ছিল জামালপুর মহকুমার একটি থানা। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর জেলায় উন্নীত হলে শেরপুর থানা হয় জামালপুরের একটি মহকুমা, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে দেশের সকল মহকুমা যখন জেলায় উন্নীত হয় তখন শেরপুর মহকুমাও জেলায় উন্নীত হয়ে যায়। ব্রহ্মপুত্র, ভোগাই, নিতাই, কংশ, সোমেশ্বরী, মহারথী, মালিঝির মত অসংখ্য জল স্রোতের হরিৎ উপত্যকায় গড়ে উঠেছে প্রাচীন জনপদ শেরপুর। শেরপুর জেলার পূর্বে ময়মনসিংহ জেলা; দক্ষিণ-পশ্চিমে জামালপুর জেলা এবং উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতি, শ্রীবরদী, নালিতাবাড়ি ও নকলা এই পাঁচটি উপজেলা নিয়ে ১৯৮৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেরপুর জেলার পত্তন হলেও ভূতত্ত্ব, নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস, শিল্পকলা, রাজনীতি জনপদের সুদীর্ঘ অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। গাজীর খামার বা গড়জরিপা থেকে গাজী বংশের শের আলী গাজী দীর্ঘ ২১ বছর কাল এ এলাকার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর নামেই নামকরণ করা হয় শেরপুর জেলার। শেরপুর জেলার মোট আয়তন ১,৩৫৫.৫৩ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৬শ ২৯ জন। বর্তমানে এই জনসংখ্যা আনুমানিক ১৬ লাখ ৫০ হাজার। ভারতের সাথে শেরপুর জেলার সীমান্ত এলাকা ৫০ কিলোমিটার। শেরপুর জেলায় যেমন আছে বিস্তীর্ণ পাহাড় ও বনাঞ্চল, তেমনি আছে সমতল ও জলাভূমি। শেরপুরের সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গারো সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বাস। শেরপুরের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, পাগলপন্থি বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, গণ আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের কথা। এসব আন্দোলনের সূত্র ধরে চলে আসে ফকির মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, বকশু দ্বীপমন,সোমনু সরকার, টিপু পাগলা,রবি নিয়োগীদের মতো কিংবদন্তি মানুষের নাম।

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীত পরিচয়: ভূমিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকজীবনের সাথে লোকসঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা। বাংলাদেশে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের প্রায় সবকটি ধারাই প্রচলিত আছে ময়মনসিংহ অঞ্চলে। হয়তো কোনোটি ভিন্ন নামে ভিন্ন পরিচয়ে। প্রচলিত লোকসঙ্গীতের প্রতিটি শাখাই ভাব, বিষয়, উপস্থাপনা এবং লোকপ্রিয়তায় অনন্য হবার পরও আজকের স্যাটেলাইট সংস্কৃতির আগ্রাসী বিস্তার এবং জীবনযাপনের নানা টানাপোড়েনে লোকসঙ্গীতের বেশকিছু শাখাই আজ বিলুপ্ত এবং অধিকাংশ শাখাই বিপন্নপ্রায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাউলগান, ভাটিয়ালি, কিস্‌সাপালা, কবিগান, কীর্তন, ঘাটুগান, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদি, ঢপযাত্রা, সঙযাত্রা, বিয়ের গান, মেয়েলিগান, বিচ্ছেদী গান, বারমাসী, পুঁথিগান, পালকির গান, ধানকাটার গান, ধানভানার গান, হাইট্টারা গান, গাইনের গীত, বৃষ্টির গান, ধোয়া গান, শিবগৌরীর নৃত্য গীত, গাজীর গান, পটগান, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন শাখার বিস্তারিত আলোচনার আগে সঙ্গীতে লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ উচ্চারিত হবার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় দেখি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আবাস স্থলের বর্ণনা। জীর্ণ ঘরের সন্ধান পাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর আত্মকথন অংশে–

'ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।'

একই পালায় গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে তালপাতার ব্যবহার দেখতে পাই–

'ভট্টাচার্য ঘরে বসে অঞ্জনা ঘরনী
বাঁশের পাল্লায় তালপাতার ছাউনি।'

মহুয়া পালায় দেখি গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে নল খাগড়ার ব্যবহার–

'নল খাগড়ের বেড়া আছে দক্ষিণ দোয়ারিয়া ঘর।'
মলুয়া পালায় শীতল পাটির ব্যবহার:
শীতল পাটি দিয়া বিনোদ ঘরে দিল বেড়া
উলুছনে ছাইল চাল দেকতে মনোহরা।

একই পালায়-

চৌচালা আট চালা তার ঘর যতখানি
সন্দি বেতে বান্ধা আর উলুছনের ছানি।

অন্যদিকে মহুয়া পালায় পোষাক আষাক ও সাজসজ্জার প্রসঙ্গ দেখি–

'হাজার টাকার শাল দিল আরও টেকা কড়ি।'

অথবা–

'বসন ভূষণ দিব আমি দিব নীলম্বরী।
নাকে কানে দিব ফুল কাঞ্চা সোনায় গড়ি।
গন্ধ তৈল দিয়া তোমার বাইন্ধা দিবাম কেশ
ঘরে আছে দাসী বান্দী তোমার নাই ক্লেশ।
হীরামণি যেথায় পাইবাম ভালা বান্যা দিয়া
লক্ষ টাকার হার তোমায় দিবাম গড়াইয়া।
আর যে কত দিবাম কন্যা নাহি লেখাযোখা
সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কামরাঙা শাখা।
উদয়তারা সাড়ী দিবাম লক্ষ টাকা মূল
হীরামনি দিয়া তোমার জইরা দিবাম চুল।

www.pathagar.com

চন্দ্রহার গড়াইয়া দিবাম নাকে দিবাম নথ
নূপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শত শত॥'

মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় অন্তত পাঁচটি মূল্যবান শাড়ির নাম পাওয়া যায়। শাড়িগুলো হচ্ছে– নীলাম্বরী শাড়ি, পাটের শাড়ি, অগ্নি পাটের শাড়ি, উদয়তারা শাড়ি ও আসমান তারা শাড়ি। কঙ্ক ও লীলা পালায় শিবু গাইনের বন্দনা অংশে আছে–

'গাহানা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী
সভার প্রসঙ্গে কিছু পাই চাউল কড়ি।।
ইনাম বকসিস কিছু সভাপদে চাই
কর্মকর্তার কাছে একখান নববস্ত্র পাই।'

এভাবেই লোকসঙ্গীতে সমকাল ও সমাজ বাস্তবতা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে লোকশিল্পীদের মেধাবী পরিবেশনায়। নিম্নে বৃহত্তর ময়মনসিংহে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শাখার উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট লোকসঙ্গীতের ধারাবাহিক পরিচিতি, উৎপত্তিস্থল, বিস্তৃতি, ব্যবহার এলাকা, পরিবেশন কলা, সম্ভাবনা ও সংকট সহ নানা প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়াস থাকছে।

বাউলগান: উকিল মুন্সী, জালাল খাঁ, মিরাজ আলী, তৈয়ব আলী, জমির ফকির, জংবাহাদুর, প্রভাত চন্দ্র সুত্রধর, রশিদ উদ্দিন, নবী হোসেনের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাউল গানের আঙ্গিনা আজ অনেকটাই ম্লান। তার পরও বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জ জনপদ আজও বাউলগানের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে বাউল গানের পরম্পরা যারা নিষ্ঠার সাথে ধরে আছেন তাদের মধ্যে আব্দুল মজিদ তালুকদার, বাউল সম্রাট ইদ্রিস আলী, আব্দুল খালেক দেওয়ান, উমেদ আলী, আবেদ আলী, চান মিয়া, অন্ধসিরাজ, ফাইজ উদ্দিন, মাহাতাব উদ্দিন, ছদর উদ্দিন, একদিল মিয়া, মমতাজ উদ্দিন, রামলাল, খালেক সরকার, শনতারা, আলেয়া বেগম, জালাল উদ্দিন, আবুল কাশেম তালুকদার, সুনীল কর্মকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাউল সম্রাট জালাল খাঁ ও জমির মুন্সির গান বাংলা গীতিকবিতার ভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন।

ঘাটুগান

www.pathagar.com

ঘাটুগানঃ লোকজ সংস্কৃতির ধারায় ঘাটুগান অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা এবং ঢাকা জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এ ধারার গানের প্রচলন দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাটুগানের প্রচলন শুরু হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর শেষার্ধেও এ অঞ্চলে ঘাটুগানের প্রচলন দেখা যায়, তবে সাম্প্রতিক সময়ে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া ঘাটুগান খুব একটা শোনা যায় না। ময়মনসিংহের ভালুকা, ত্রিশাল, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া এবং নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামে ঘাটুগানের প্রচলনের তথ্য পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার 'আইরাদি' গ্রামের নাম ঘাটুগানের জন্য খুবই খ্যাতিমান। অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ঘাটুগানের গীতিকারদের মুন্সিয়ানাও লক্ষণীয়। ঘাটুগানের ক্ষেত্রে আরো একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো যারা ঘাটু গানের নৃত্য-গীত পরিবেশন করে তাদের মেয়েদের মত দীর্ঘ চুল এবং গান পরিবেশনার সময় মেয়ে সেজে নৃত্য-গীত পরিবেশনের রীতি প্রচলিত। ঘাটুগান সম্পর্কে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব গল্প কাহিনীর প্রচলন আছে তাতে সহজেই ধারণা করা যায় ঘাটুগানের সাথে সমকামিতার নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত রচয়িতাদের যোগ্যতা বোঝাতে এখানে কটি ঘাটুগানের উল্লেখ করা হলো:

* আমার চেংরা বন্ধুরে
ঢাকা শহরের কমলা কিন্যা দে।

* আসিতে না পারি সইগো তোমার বাড়ি বাদলে
যখন উঠে মন পিরিতি
তেঁতই পাতায় দুইজন শুতি
মনের বাঞ্ছা আমার পূর্ণ হইল না।

* হায়রে পিতলের কলসী তরে লইয়া যাইমু যমুনায়
কলসীরে তোর গলায় ধরি
লইয়া যা মোরে বন্ধুর বাড়ি
ঐ দেখা যায় ছোকরা বন্ধু পানসি নাউয়ের গুণ টানায় ॥

* আরে কোকাফেতে যাওরে কোকিল
পতি আমার সেই বনে।
যাহার ঘরে আছেরে পতি
উল্লাস করে সারা রাতি পতিরে লয়ে
ওরে পতি হারা হইয়াগো আমি ঘুইরা বেড়াই নগরে ॥

* গাঙ্গে আইলো নতুন পানি
সবাই দিল বানা
প্রাণ বন্ধুর পিরিতের লাগি নাইওর দিলাম মানা ॥

কখনো কখনো ঘাটুগানে দেশপ্রেম এবং রাজনীতির কথাও উচ্চারিত হতে দেখি। নিচের গানে বাণীর দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে এ সত্য।

* যাওরে ভাই ঘরে যাও
শেষ দেখা দেইখা যাও
খুদিরামের আশা কইরো না।
আমি খুদি মইরা গেলে
আছে খুদির লক্ষ ভাই
ফেরাঙ্গিরে ভয় কইরো না ॥

www.pathagar.com

বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ঘাটুগানের মধ্যে কিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার আংগারিয়া গ্রামে মোঃ কিতাব আলী বয়াতির গাওয়া ঘাটুগান:

কে দিল পীরিতের বেড়া
লিচু কামলার বাগানে
ও লিচু কামলার বাগানে গো, লিচু কামলার বাগানে (২)।
হাইরে মনে যদি ইচ্ছা করি
বেড়া ভাইঙ্গা যাইতে পারি
কমলার বাগানে ...।
কমলার বাগানেতে যাইয়া গো কমলা খাব দু'জনে
কে দিল পীরিতের বেড়া ...

একই গান ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার আইরাদির ঘাটু শিল্পীরা গায়:

কে দিল পীরিতের বেড়া, লেচুর বাগানে
(এ অংশ ঘাটু গাইবে)
লেচুর বাগানে সইগো লেচুর বাগানে।।
(এ অংশ দল গাইবে)
ছোট ছোট লেচুগুলি বঁধু তুলে আমি তুলি
বঁধু দেয় আমার মুখে, আমি দেই বঁধুর মুখে।
(ঘাটু গাইবে)
লেচুর বাগানে সইগো ... (দল গাইবে)

ভাসান যাত্রা

www.pathagar.com

এসব ঘাটুগানের কোনো লিখিত রূপ নেই। সবই ঘাটু শিল্পীদের মুখে মুখে প্রচারিত, যা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

সারিগান: নৌকা বাইচে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা নৌকা চালানোর সময় নিজেদেরকে উজ্জীবিত করে নিতে যে সব গান গেয়ে থাকে তা-ই সারিগান নামে পরিচিত। নৌকায় ঢোল কর্তালসহ এসব গান পরিবেশিত হয়। নদী বিধৌত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনার হাওর অঞ্চল, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গইল জেলার নিম্নাঞ্চল ও নদ-নদীতে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সাধারণত বর্ষাকালে। কবি রওশন ইজদানী 'মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য' রচনায় লিখেছেন, 'নৌকা বাইচের সারিগান ছাড়াও মোমেনশাহী অঞ্চলে অনুরূপ এক সারি গানের প্রচলন আছে, তা অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীদল মাঠে দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় কাজের তালে তালে গেয়ে থাকে। ইমারতের ভিত বা ছাদ গড়ার সময় সুরকি পেটার তালে তালে সারিগানে কাজ সম্পাদনের দ্রুততা বৃদ্ধি পায়, কর্মের মধ্যবর্তী ক্লান্তি নাশ করে ও শ্রমিকের প্রাণে নতুন প্রেরণা যোগায়' কবি রওশন ইজদানীর সাথে অনেকেই একমত হতে পারেনি। কবি রওশন ইজদানীও তার রচনায় নিজের বক্তব্যের সপক্ষে কোনো উদাহরণ দেননি। ইমারত তৈরির সময় যে গান গাওয়া হয় তা মূলত ঘাটুগানের ভিন্ন একটি রূপ।

সারিগানে বয়াতি দিশা ধরিয়ে দিয়ে ইচ্ছামত মিলিয়ে মিলিয়ে গান তৈরি করে থাকেন। তাই দেখা যায় সারিগানে অনেক পালাগান, ঘাটুগান, জারীগান, বাউলগান এমনকি এ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলোও সন্নিবেশিত হয়ে যায়। নৌকা বাইচে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে বয়াতিগণ রংবেরং গান তৈরি করে থাকেন। সারিগানে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যেমন ঘাট থেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর সময় বয়াতী গাইছে:

কালি দরে যাবো আমি ওমা নন্দরানী
কালি দরে যাবো আমি-
নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, বয়াতী তখন গাইছে:
মাগো কালিদর সাগরের পানি নাগের বিষে কালা
সেই না নাগ মাইরা দূর করবাম বিষের জ্বালা।

এই ভাবে বয়াতি গান তৈরি করে যাবে আর বাইচালগণ তালে তালে বৈঠা ফেলে দিশা ধরবে। নৌকার মাঝখানে তক্তার উপর দাঁড়ানো বাদকদল বাদ্য বাজাবে। আর বাইচের মোড়লগণ এক পা সামনে এক পা পেছনে ফেলে দুলকি তালে গানের সাথে নৃত্য করবে। আড়ং এ প্রবেশের সময় এবং আড়ং থেকে ফেরার সময় বিভিন্ন রকমের সারিগান গাওয়া হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি গানের সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ, রূপের বাহার গো
বাহার গো ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ ॥
আউলা চুলের বাউলা খোঁপা বাহার তাতে নাই
বেণীর খোঁপায় ফুল গুজিলে পাগল হইয়া যাই।
রূপের বাহার গো---
জল ভরিতে না লয় মনে প্রাণ সই গো
কেমনে যাব যমুনারি ঘাটে ॥
রাধিকা যমুনায় যায় গো হেলিয়া ঢলিয়া।
পাছে পাছে কানু চলে মুরলী বাজাইয়া ॥ (প্রাণ সই গো)
চলতে গেলে বাজে রাধার চরণে মেকুর
তার মধ্যে কালা মেঘে আসমান করলো ঘোর ॥
কেমনে ভরে জল রাধা মেঘে হইল আন্ধি

www.pathagar.com

মাডির কলসী ভইঙ্গা গেল হাতে রইল কান্দি ॥
পিড়িত যতন পিড়িত রতন পিড়িত গলার হার
ঐ যে পিড়িত কইরা যেজন মরে সফল জনম তার।
পিড়িত রতন পিড়িত যতন পিড়িত বড় লেডা
ছাড়াইলে ছাড়ান যায় না টেংরা মাছের কাডা।
বর্ষা কালে পিড়িত ভাইরে কাঁঠালের কোষ
যে না বুঝে এর মজা তার জনম দোষ ॥
কাওয়া কালা কুলি কালা কালা মাথার কেশ
চিরল দাঁতে মিসি দিয়া পাগল করলো দেশ ॥ (কালাচান)
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশি নারে মধ্যে মধ্যে ছেদা
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশি কলঙ্কিনী রাধা।
বাঁশি না বাজাইয়া কানু রাখে কদম ডালে
লিলুয়া বয়ারে বাঁশি রাধা রাধা বলে ॥
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশি না-রে জলে ভাইস্যা যায়
বালুর চরে ঠেইক্যা বাঁশি রাধার গুণ গায়।
ঢেউ দিও না ঢেউ দিওনা ঢেউ দিওনা জলে গো প্রাণ সজনী
আর জলে ঢেউ দিওনা।
পুস্কুনির চাইর পারে তুতা-ময়নার বাসা
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে কি আজব তামাসা গো ॥ (আর জলে)
পুস্কুনিতে নাইরে পানি কি করব তার সোতে
যে বা নারীর পুরুষ নাই কি করব তার রূপে গো ॥ (ঐ)
আম গাছে নাইরে আম কুডা কেনে লাড়
তোমার আমার নাই পিড়িতি আস্কি কেনে ঠার গো ॥ (ঐ)
বৈঠা টান দিওরে পাটের বাজার চড়া
আর যাব না শ্বশুড় বাড়ি মোরগে দেয়না ধরা ॥
আগে আমি শ্বশুড় বাড়ি গেলে পরে ভাই
ইষ্টি আইছে খেসি আইছে দৌড়াইত সবাই ॥
উত্তর পাড়ার হাঁস আনিত দক্ষিণ পাড়ার ডিম
পশ্চিম পাড়ার দুধ আনিত পূর্ব পাড়ার সীম ॥
ফুলঝুড়ি ছিকা সাজাইয়া রাখতো ঢেপের খই
গামছায় বাইন্দা মাচায় থুইতো চিনি পাতা দই ॥
আজকে আমার শ্বশুর বাড়ি পুরান হইয়া গেছে
চুরাশির আদর তাইতে ষাইটেতে নামিছে ॥
শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি শোন বাইচাল ভাই
তিন দিন পর ঝাটার বারি শুন হে সবাই ॥

আড়ং-এ জিততে পারলে নৌকার বাইচালগণ সমস্বরে উল্লাস প্রকাশ করে থাকে গান গেয়ে। সে গানের দুটি নমুনা:

পবন কাঠের নাও- নাওরে শুন্য ভরে উড়াল দিয়া যাও
মাঝি বাওরে বাও- মন পবনের নৌকা বাইয়া যাও

www.pathagar.com

মন পবনের নৌকা খানি মধ্যে মধ্যে গোড়া
ছুবের মধ্যে গিয়া নৌকা শুন্যেমারে উড়া।
ও ইছাপুরের নাও নাওরে
আড়ং জিত্যা খানি লইয়া যাও যাওরে
শাবাশ শাবাশ শাবাশ
ডিক ডিক ডিক ...

আড়ং ভেঙ্গে গেলে নৌকার মালিক আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে সারিগান গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। শ্রেষ্ঠ বয়াতি বা হাইরল তখন সারিগান পরিচালনা করে। বাইচালরা তখন তাল রক্ষা করে বৈঠা নাড়ে এবং সুর ধরে। সে গানের সুর তাল ও মেজাজ থাকে ভিন্ন। যেমন:

লীলুয়া বাতাসে আইজ কেনে শ্যামের বাঁশি রাধা বলে
রাধা বলে বাঁশিরে আজ কেনে শ্যামের বাঁশি রাধা বলে
শুন ললিতে কই তুমারে শ্যাম পিড়িতের লান্ছনা
শ্যাম পিড়িত আমারে ছাড়লো না।
বাইচালারা যখন বাড়ির দিকে ফেরে তখন গায় বাড়ি ফেরার পালা:
মায়ের কথা মনে হইল রে লক্ষণ ভাই, ভাইরে চল ঘরে যাই
পিতা গেল পুত্র শোকে দুঃখের সীমা নাই
ঘরে ছিল মা জননী আছে কি বা নাই
বেলা গেল সইন্দা হইল মায়ের আদরের
ডাকে চল ঘরে চল ॥

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এমনি অসংখ্য সারিগানের সন্ধান পাওয়া যাবে যেগুলো আমাদের লোকসঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডারকেই শুধু নয়, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকেও সমুন্নত করবে গোটা বিশ্বে।

বৃষ্টির গান: শুধু বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় নয়, বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামেই বৃষ্টির প্রার্থনায় ছেলেমেয়েদের গান গাইবার প্রথা চালু আছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক গ্রামেই বৃষ্টির গান পরিবেশনের নিয়ম চালু আছে। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টি না হলে কৃষক জমিতে বীজ বুনতে পারে না। তখন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা একত্র হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে গান গায়। বিভিন্ন বাড়ি থেকে চাল-ডাল-তেল-নুন-মরিচ-পিয়াজ চেয়ে নিয়ে সিন্নি রান্না করে। বৃষ্টির প্রার্থনায় ব্যাঙের বিয়ে দেয় তারা। বৃষ্টির প্রার্থনায় বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব গান গীত হয়ে থাকে তা থেকে কয়েকটি নিচে দেয়া হলো:

আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই
আল্লাহ মেঘ দে।
এ বাড়িগর পানি নাই
চিকায় মুতিছে
হাড়ি কলসি ধুইয়া নিয়া
ছিকায় তুলিছে।
আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই
আল্লাহ মেঘ দে।
আসমানের উপর খোদার ঘর
মন্দির মসজিদ তারপর

www.pathagar.com

হায়রে খোদা পানি দে
ক্ষেত পুইড়া গেল যে।
হাইলা রাজারা তের ভাই;
লাঙ্গল ধোয়ার পানি নাই।
বিষ্টি আয় বিষ্টি আয় বিষ্টি আয় রে
ধান পাট জমি জিরাত
পুইড়া যায় পুইড়া যায় পুইড়া যায় রে
বিষ্টি আয় বিষ্টি আয় রে।
ধান গেল মরিয়া
ধানের ছোবা ধরিয়া
সোনার দেওয়া নামো লো
শরীর গেল ঘামিয়া।
আয় রে বিষ্টি আয়
চইড়া মেঘের নায়
তুই না আইলে ভাই
ক্ষেত খামারের ফসল যে ভাই
রক্ষা নাহি পায়।

লোক বিশ্বাসে ব্যাঙ বৃষ্টি দেবতার স্ত্রী, স্বামী সমস্ত উদ্ভিদ জগতের কর্তা, তাদের মিলনে ক্ষেত উর্বর হবে; তাই বৃষ্টির কামনায় ব্যাঙ বিয়ে দেয়। গীত হয়:

আম পাতা লড়ে চড়ে
কাডল পাতা ঝরে
এক ফোডা পানির লাইগ্যা
কাইন্দা কাইন্দা মরে।
আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই॥

একটি নির্দিষ্ট স্থানে চার কোনায় চারটি কলা গাছ পুঁতে তাতে রঙিন কাগজ মুড়ে ব্যাঙ বিয়ের আসর বসানো হয়। সেই আসরের মধ্যবর্তী স্থানে গর্ত করে পানি দিয়ে পূর্ণ করে গর্তে একটি ব্যাঙ বেঁধে রাখা হয় এবং মেগে আনা চাল-ডালের খিচুরি রান্না করে নিজেরা খায় এবং অন্যদের খাওয়ায়। মাগনের সময় ছেলে মেয়েরা যে গান গায় তা নিম্নরূপ:

ব্যাঙের ঝিয়ের বিয়া
ষোল্ল মোরগ দিয়া
ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা
আম পাতা দিয়া দিলাম ছানি
তেওনা পড়ে ম্যাঘের পানি
জাম পাতা দিয়া দিলাম ছানি
ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা
ব্যাঙাজীর বিয়া
পাথলা মাতাত দিয়া
আলের ফলা চাঙ্গো থুইয়া

www.pathagar.com

গিরস কান্দে বন্দে বইয়া
ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা।

ব্যাঙ বিয়ের পর জল কাদায় একাকার করে ছেলে মেয়েরা। গ্রাম বাংলার ব্যাঙ বিয়ের এসব লোকাচার বর্তমান সময়ের এক দুর্লভ দৃশ্য।

বিয়ের গান ও মেয়েলি গীত: বৃহত্তর ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিয়ে অনুষ্ঠানের নানাপর্যায়ে বিভিন্ন গীত গাওয়া হয়ে থাকে। এসব গীত সাধারণত মেয়েরাই গেয়ে থাকে। বিয়ের গীতের বৈচিত্র্য সামান্য তুলে ধরতে চেষ্টা করছি:

গায়ে হলুদের গীত:

ভাবীজান বুবুজান দুলুনীরে মেন্দি দ্যা সাজাই
যখন-না মেন্দির গাছ রোওয়া হৈল
কত মাউগে ঠিগাইর কথা কৈল
যখন মেন্দির একনা পাতা ধরল
তখন সাধুর (বরের) কিবা মনে পড়লো
যখন-না গাছ পাতায় পাতায় ভরলো
তখন সাধুর কইন্যারে মনে পড়লো।
গাঙ্গের পাড়ে তাল গাছ ঝিলিমিলি করে
শোভাজানরে বিয়া দিয়াম সামনের শুক্কুর বারে।
আরচি ভইরা মিছরি দিয়াম দাঁতের শোভা লাগে
কটকি ভইরা সিন্দুর দিয়াম কপাল চডক মারে
বোতল ভইরা জিগুস দিলাম চুল বাইয়া পড়ে।
তুলগো মেন্দি, তুলগো মেন্দি
তুইল্যা মেন্দি জোড় কুলা সাজাইয়া (২)
বাটক মেন্দি বাটক মেন্দি
বাটক মেন্দি জোড় পাডা ফেসিয়া গো (২)
যাওরে মেন্দি যাওরে মেন্দি
যাওরে মেন্দি আমার সাধুর তালাসে (২)
তোমার সাধু কেমনে চিনবাম
আমার সাধুর হাতে বাটিল মেন্দি (২)।
তুইল্যা হলদি, তুইল্যা হলদি
তুইল্যা হলদি জোড় কুলা সাজাইয়া (২)
বাটক হলদি বাটক হলদি
বাটক হলদি জোড় পাডা ফেসিয়া গো (২)
যাওরে হলদি যাওরে হলদি
যাওরে হলদি আমার সাধুর তালাসে (২)
তোমার সাধু কেমনে চিনবাম
আমার সাধুর বাটিল হলদি (২)

বরের প্রস্তুতি ও সাজ সাজ্জার গীত:

আগে দু-না কইছলা সাধু না করিবা বিয়া
অহন কেরে ভাও অইচ দাঁড়ি মুছ কামায়া

www.pathagar.com

আগে দু-না কইছলা সাধু না করিবা বিয়া
অহন কেরে পাউডার লাগাও আয়নার পায় চায়া।
আগে দু-না কইতা কথা মুহেরে কুচকায়া
মুচকি মুচকি আস অহন বিয়ার-না বাস পাইয়া।
উড়ে পঙ্কি আজারে উড়েগো পঙ্কি বাজারে
পঙ্কি উড়েগো আমার বানিয়ার দুকানে
ছেড়া যবর উলাইস্যা ছেড়া যবর বিলাইস্যা
নাক ফুল কিনে গো ছেড়া বাছিয়া বাছিয়া
ছেড়ি যবর অমুহি ছেড়ি যবর ঠমুহি
নাকফুল মিলেগো ছেড়ি ফিকিয়া ফিকিয়া
ছেড়া যবর এহায়্যা ছেড়া যবর বেহাইয়া
নাক ফুল আনে গো ছেড়া টুহাইয়া টুহাইয়া।

বিয়ের গীত:

লাল শাড়ি তুলতুল খালাজীর বিয়া
সাদ্দিন ধইরা জামাই আইছে মুকুট মাথাত দিয়া।
নাস্তা দিলে খায়না বিদায় দিলে যায় না
বেলাজা জামাইডা এইরহম কিয়া।
বইন গো বইন কাইন্দ্য না শ্যামের গলা ভাইঙ্গো না
ভাই গেছে নছিবপুর কিন্যা আনবো চম্পাফুল
চম্পা ফুলের গন্ধে জামাই আইয়ে আনন্দে
খাওগো জামাই বাডার পান সুন্দরীরে করি দান।
সুন্দরী কাঁইখ্যা তেল সিন্দবু মাইক্কা
হাডের লুক পাগল অইছে সুন্দরীরে দেইখ্যা।
হাতে লওগো লীলা কাঠারি
মুখে লওগো লীলা সুপারি
হাত বাড়াইয়া তোমার বিয়ার কাবিন।
কাবিন ফালবাম আমি ছিড়িয়া
কবুল দিলাম আমি ঘুরাইয়া
আরো ছয়মাস থাকবাম আমি মায়াজির কোলে বইয়া।
যুদি পাইতাম আমি কটরার বিষ
খাইয়া মরতাম আমি অচম্বিৎ
তেওনা যাইতাম গো মায়া পরের গলা জুইরা।
উত্তরে থুনে আইল রে নাপিত কান্ধে কেন ছাতি
বাইর কইরা দাও ধবল ফিরা বম্প নাপিত পাটিত।
নাপিতেরা সাত ভাই বুইড়া নাপিত বাইত নাই।
চাইল দিলাম ডাইল দিলাম আইন্ধা খাবার খড়ি নাই
সারারাত পহর দিলাম চকিদার দিয়া
পরবাইতের সুম নিবার আইল খেড়কী দুয়ার দিয়া।
ফেইচকা চুইলা মাগির নিগা জাত আরাইলাম।

www.pathagar.com

কোন বা জাইলার ছাইলা গো
মাথা বোঝাই ছাতা গো
কোন বা ধোপার ছাইলা গো
শরীল বোঝাই কেদো গো।
কোন বা ঢুলির ছাইলা গো
ঘারে গজের দাগও গো
কোন বা মুচির ছাইলা গো
হাত পাও কেন কাটা গো
মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বুনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেই চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির শাড়িগো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।
মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বুনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেই চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির জামা গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।
মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বুনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেই চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির সাজের জিনিস গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।

বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের বন্ধু এবং কনের বান্ধবীদের মধ্যে গানে গানে তর্ক যুদ্ধ বাঁধে,তারই একটি নমুনা দিচ্ছি নিচে-

বর পক্ষ: পিডা খাইলাম চিড়া খাইলাম
আরো খাইলাম খাসি
বিয়া কইরা নিতাম আইছি
খেদমতের দাসী।

কনে পক্ষ: পান খায় পান সুন্দরী
কতা কয় ঠারে
পানের জন্ম তারিখ
কুন কুন বারে ?

বর পক্ষ: চালুন দিয়া আনুইন পানি
অজু কইর‍্যা লই
হের পরে সবার সামনে আমি

পানের জন্ম তারিখ কই।
নশার মাথায় লাল পাগুড়ি
কন্যারমাথায় কেশ
শিঘ্রী শিঘ্রী বিয়া পরাও
রাইত অইলো শেষ।

এমনই আরও অসংখ্য গীত বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকজ জীবনের বিয়ের অনুষ্ঠানে গীত হতে দেখা যেত। এসব গীত বিভিন্ন এলাকায় নানান বাণী ও সুরে প্রচলিত আছে। এখনো এসব গীতের অধিকাংশই গ্রামে-গঞ্জে খোঁজ নিলে সন্ধান পাওয়া যাবে; কিন্তু হতদরিদ্র এদেশে এসব বিলুপ্ত প্রায় লোকগীতিগুলো সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেই।

বারোমাসী গান: নারী জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ-মিলন ও বিচ্ছেদ জনিত অনুভূতিগুলো পল্লবিত হয়ে ওঠে বারোমাসী গানে (বারোমাইস্যা)। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বারোমাসীর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বারোমাসী গানের পংক্তিতে পংক্তিতে নারীর বিরহ বেদনাজনিত মর্মপীড়ার করুণ আকুতিগুলো ফুটে ওঠে। কোথাও কোথাও কিছুটা ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। মকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারোমাসীতে ছদ্মবেশধারিণী চণ্ডীর কাছে ফুল্লরার বর্ষব্যাপী দুঃখময় সংসার জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলোতেও বারোমাসী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে গীত হচ্ছে বারোমাসী গান। কোন কোন অঞ্চলের বারোমাসী গানে বারোমাসের চাষাবাদের প্রতিটি পর্যায় ও ঘটনাকে বর্ণনা করা হতো। সমাজ-সভ্যতা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানান অনুষঙ্গ ধারণ করে আছে এসব বারোমাসী গান। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন জনপদে গাওয়া হত শান্তির বারোমাসী, কমলার বারোমাসী, অরুণের বারোমাসী, নীলার বারোমাসী, নিমাইয়ের বারোমাসী, ধলুফা সুন্দরীর বারোমাসী, ফলের বারোমাসী, বাবা মায়ের বারোমাসী, ছেলেমেয়ের বারোমাসী সহ অসংখ্য বারোমাসী গান। কিশোরগঞ্জের পাগলা গ্রামের করম আলী ফকিরের কাছ থেকে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে সংগৃহীত বারোমাসীতে শোকাতুরা মা ফাতেমার বেদনার প্রতিটি মাস যাপনের বৈচিত্র্যময় চিত্র ফুটে উঠেছে। বারোমাসীটি নানান কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দীর্ঘ বারোমাসীটি সব শেষে তুলে ধরা হলো, তার আগে দু'একটি বারোমাসীর কিছু অংশ তুলে ধরছি।

নেত্রকোনা জেলার বারোমাসী গান:

আমার প্রাণবন্ধুয়া দেশে আইল না।
কত মাইনষের আনি গুনি গো আমার বন্ধুর মতন কেউরে দেখি না।
সই গো, বৈশাখ গেল জষ্টি আইল- আম কাডাল পাইক্যা রইল গো
কত জনায় খায়া গেল আমার বন্ধে খাইল না ॥
সই গো, আষাঢ় মাসে আইল পানি- শাওন মাসে নাও দৌড়ানি গো
কত লোকে দেখল গিয়া আমার বন্ধে দেখল না।
সই গো, ভাদ্দর আশিন সেও গেল কাতি মাসো সামনে রইল গো
গুয়া গাছে ছড়ি আইল বন্দে আমার দেখল না ॥
সই গো, আগুন মাসে দাওয়ামারি পাকছে ক্ষেতের ধান গো
আমার ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই রইল কাটুয়া ত আইল না ॥
সই গো, পুষ-মাঘ আইল শেষে আমার বন্ধু নাইরে দেশে
বিরথাই বিছাইলাম আমি তুশকের বিছানা,
বন্ধু আমার দেশে আইল না ॥
ফালগুন মাসে গাছে গাছে কত ফুল ফুইট্টা রইছে গো
আমার যৈবন গাছের ফুল মিছা- ভমর ফিরা্যা আইল না ॥

www.pathagar.com

জামালপুর জেলার বারোমাসী গানঃ

হায়রে তুলার বালিশ কথা বলে না
মাগো তোমার জামাই বাড়ি আমি যাবো না।
দালান দেইখ্যা দিছ বিয়া
খাগা মা তর দালান ধুইয়া
তর জামাইয়ের দালান দেইখা আমি ভুলি না ॥
হায়রে তুলার বালিশ কথা বলে না
মাগো তোমার জামাই বাড়ি আমি যাবো না ॥
তুমগর জামাই চাকরি করে
দেওয়ানগঞ্জের সুগার মিলে।
মাঝে মাঝে পত্র লেখে বন্ধু আসেনা ॥

টাঙ্গাইল জেলার বারোমাসী গানঃ

এহিতো জৈষ্টি না মাসে লো
নীল হায়রে গাছে পাকা ফল
আম খাইলাম শত শত গো আরে ও
আরো পঙ্ক গাভীর দুধ
সাধুর এইও মাসও গেল।
এইও মাসও গেলরে সাধুর
নারীর পঞ্চবান
বিয়া কইরা থুইয়া গেলা গো
হায়রে না লইলা তালাশ ॥
এই না মাস গেলরে সাধুর বাড়িল যৌবন
ভোমরায় যে ছাড়ে ফুল ও গো আমার মধুর কারণ
সাধুর এইও মাস গেল ॥
কত পাষাণ বানছ রে সাধু
তোমরই অন্তরে ॥
জৈষ্ঠ মাসে মিষ্টি ফল
আষাঢ় মাসে বর্ষার জল
সাওন মাস কাটাইলাম আমি
সায়রে সায়রে ॥
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা
আশ্বিন মাসে শশা মিঠা
কার্তিক মাস কাটাইলাম আমি
কাতরে কাতরে ॥
আগুন মাসে নয়া নতুন
পৌষ মাসে তুষের আগুন
মাঘ মইসা শীত লাগল নারীর
অন্তরে অন্তরে ॥
ফাগুন মাসে ন'গুন জ্বালা
চৈত্র মাসে শরীল কালা

www.pathagar.com

বৈশাখ মাস কাটাইলাম আমি
বৈসারে বৈসারে ॥

ময়মনসিংহ জেলার বারোমাসী গানঃ

চৈত্রে গিমা তিতা
বৈশাখে নালিতা মিঠা
জ্যৈষ্ঠে কৈ
আষাঢ়ে ভোর পান্তা শ্রাবণে দৈ
ভাদ্রে তালের পিঠা
আশ্বিনে শশা মিঠা
কার্তিকে ওল
আঘ্রানে খলসা মাছের ঝোল
পৌষে কাঞ্জি মাঘে তেল
ফাল্গুনে গুড় আদা বেল।

শেরপুর জেলার বারোমাসী গানঃ

নিলাজ বন্ধু রে
গেল নিশি ছিলি কার ঘরে ॥
আসবা বইলা চইলা গেল
না আসিল ফিরে
নানান জাতের মণ্ডা মিঠাই
সাজাই তোমার তরে ॥
আষাঢ় গেল শ্রাবণ আইলো
গাঙ্গে নয়া পানি
আমার এই যৈবন খানি
কচু পাতার পানি ॥
শ্রাবণ মাস চলিয়া গেল
হইয়াছি মাতাল
ভাদ্র মাসে গাছের তলায়
ঝইরা পড়ে তাল
তালের পিঠা বানাইয়া
কারে বা খাওয়াই
এদিক সেদিক চাইয়া দেখলাম
প্রাণের মানুষ নাই ॥
আগুন মাসে চৌদিকে
পাকলো আমন ধান
কোন শহরে রইছ আমার বন্দু কালা চান ॥
নতুন ধানে ভাজলাম কত
মুড়ি চিড়া খই
গাছে পাকা সরবি কলা
গামছা বান্ধা দই।

www.pathagar.com

এমনি অসংখ্য বারোমাসী গান বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। লক্ষ করলেই দেখা যাবে বিভিন্ন অঞ্চলের বারেমাসী গানের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। এবারে কিশোরগঞ্জের সেই বারোমাসী যেটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যে গানে পাওয়া যাবে এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন, যেখানে মরুর দেশ আরব আর সবুজ শ্যামল বাংলা একাকার হয়ে গেছে গানের বাণীতে:

ধুয়া: হায় হায় ফাতেমা কান্দে আরশে ধরিয়া,
ইমাম উছেন, শহীদ হইছে কারবালাতে গিয়া।
ফাতেমার বলন্ত ইমাম দুইন্যাই ছাইড়াছে,
চান্দ মুখে জোয়াব নাই মা বলিব কে ?
আল্লা-পরথম কার্তিক গো মাসে যাদু যায় গো রণে,
আসিব কি না আসিব অরসিত মনে।
সোনার পালং জোড়-মন্দির খালি রইল পড়িয়া,
কোথায় গেল ইমাম উছেন জননী ছাড়িয়া।
হায় হায়রে-আগুন মাসে ফাতেমা গো সবে খায় ন'য়া,
দৈ দুধ সর-লনী সবে খায় মেওয়া।
রান্ধিয়া বাড়িয়া অনাথ কারবা পাতে ঢালি,
কে বলিব মা বলিয়া এইনা দু:খে মরি।
হায় হায়রে- পোষ মাসে ফাতেমা গো ইন্নছ স্থানের ভাও,
কোল ছাড়িয়া কোলের যাদু কোন স্থানে যাও।
কোল ছাড়িয়া কোলের যাদু কোলের লইল মনি,
দেখিলে প্রাণ জোড়াজুরি না দেখিলে মরি।
হায় হায়রে-মাঘ মাসে ফাতেমা গো জারে কম্পমান,
অন্তরে আগুন গো জ্বলে তনে বড় টান।
সুতার কাপড় তুলার বালিশ তুইল্যা লইল কোলে...
দারুন শেমুলের বালিশ মুখে রাও না করে।
হায় হায়রে-ফাগুন মাসে কুকিল বলে দুলা মিয়া কই,
চলিলাইন গো ফাতেমা সিন্নি লইয়া আই।
মদিনা বিছড়াইয়া মাগো শা মর্তুজা আলী,
মালখানা ঘরেতে দেখি জোরে পালং খালি।
হায় হায়রে-চৈর্তিক মাসে ফাতেমা গো মক্কা হইল ছাড়া,
সারা দুইন্যাই খুঁইজ্যা মাগো অইয়া গেল সারা
শা মর্তুজা আলী যুদি অইত আমরার বাপ,
তে কেনে এজিদার পালে দিত এত তাপ।
বরকত জননী যুদি অইত আমার মা,
তে কেনে মরণকালে পানি পাইলাম না।
হায় হায়রে-বৈশাগ মাসে ফাতেমা গো কি করুইন বসিয়া
তোমার যাদু কান্দন করে কাডা শির লইয়্যা।
ডাইন হস্তে কঙ্কেনাবান্ধ্যা বাম হস্তে কপাল,
আড়াই দিন আছলাইন মা গো ইল্লাল্লার দরবার।
হায় হায়রে-ফাতেমা যে বলে জবরীল তুমি আমার ভাই,

www.pathagar.com

আজকা আস্তে ইমাম উছেন রইল কোন ঠাই।
আইন্যা দেও আইন্যা দেও ভাইরে বলি যে তোমারে,
নয়নেরই পুতলী আমার আইন্যা দেও আমারে।
হায় হায়রে-জৈষ্ঠ মাসের মিষ্ট ফল গাছে নাই সে পাকে,
গাছের ফল পরিধন (প্রহরাধীন) ডাইলে পাইকা থাকে।
গাছের ফল গাছে রইল না অইল ভক্ষণ,
মিরগ (মৃগ) শীগারে গেল ভাই দুনুজন।
হায় হায়রে-আষাঢ় মাসে ফাতেমা গো করুইন বড় আশা,
দুই পুত্র দিয়াছে আল্লা খেলিতাইন পাশা।
দিনত গেল অবশেষে বেইল ত বেশী নাই,
আজকা অস্তি ইমাম উছেন কোথায় লইল দুইবাই।
হায় হায়রে- আয়রে ও আয়রে উছেন আয় আয় মায়েরই কোলে,
আইছ রে আঙ্গিনার মাইঝে তুইল্যা লইব কোলে।
তোর মা ফইরাদী আইল অই আল্লার দরবারে।
হায় হায়রে-শাউন মাসে ফাতেমা গো ফজরে জাগিলাইন,
ইলাইদার (ঘরের চাকর) ইলাইদার পানি দেও মাগো অজু করিবাইন।
অজু করিয়া মাগো ডাইনে- বায়ে চায়,
আগুনের কুয়া জ্বলে ফাতেমারই গায়।
হায় হায়রে-ভাদ্দর মাসে সকলে যে তালের পিডা খাইল,
সেই মাসে ফাতেমা গো স্বপনে দেখিল।
ছাউয়াল ছাউয়াল বইলা মাগো স্বপনে জাগিল।
কোথায় রইলে বুকের ছাউয়াল বুকে দুঃখু দিল।
হায় হায়রে-আশ্বিন মাসে ফাতেমা গো স্বপনে দেখিয়া,
কাইন্দা উঠিলাইন মাগো দুই পুতের লাগিয়া।
শিশুকালে পুত্র শোগ দিলা যে আমারে,
সেই শোগ বাইট্যা দিলাম সগল ঘরে ঘরে।

সঙযাত্রা: সংস্কৃতির ধারায় রাজশাহীর গম্ভীরা, রংপুরের ভাওয়াইয়া, ময়মনসিংহের ঘাটুগান যেমন স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে তেমনি বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল অঞ্চলের সঙযাত্রাও স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। এক সময় টাঙ্গাইল জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সঙযাত্রার প্রচলন থাকলেও সাম্প্রতিক সঙযাত্রাপালা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এখনো টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি, এলেঙ্গা, ঘাটাইল, ভূয়াপুর সহ কিছু কিছু গ্রামে সঙ যাত্রার প্রচলন আছে। সঙ অত্যন্ত জনপ্রিয় এক শিল্পমাধ্যম। মূলত সঙ হাস্যরসাত্মক পরিবেশনা। সমস্ত পরিবেশনা জুড়ে সঙ শিল্পীরা দর্শক শ্রোতাদের হাসিয়ে অস্থির করে তোলেন। সঙের পরিবেশনায় কোনো কোনো সময় শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তবে হাস্য রসের মাধ্যমে সঙ শিল্পীরা তির্যক ব্যাঙ্গ এবং সমাজ সংসারের নানান অসঙ্গতির দিকেও দিক নির্দেশ করে। সঙ শিল্পীরা উদ্ভট পোষাক পরিধান করেন, রূপসজ্জা করেন কিম্ভুতকিমাকার। সঙের পরিবেশনা প্রধানত সংলাপনির্ভর এবং সেসব সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে সঙ শিল্পীরা চমৎকার মুন্সিয়ানায় উপস্থাপন করে দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে থাকেন। সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীরা কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। সেসব গানের অসংখ্য সংগ্রহ থেকে দু'চারটি নিচে উপস্থাপন করা হলো–

www.pathagar.com

স্বরস্বতি বন্দনা করি গো
আরো যতো দেবগণও গো
আরো যতো দেবী গণও
আরো যতো মুনি গণ গো॥
হায় এসো মাগো স্বরস্বতি
কণ্ঠে এসে হও গো স্থীর করি মিনতি।
এই আসরে না আসিলে গো
অধমের কি হবে গতি॥
গায়ে দেও মা প্রবল শক্তি
মুখে দেও মা মধুর শ্রুতি
এই আসরে না আসিলে গো
অধমের কি হবে গতি ॥
এত বড় হইছি বাবা বিয়া করাও না ॥
মাইশের বাবা করায় বিয়া গো
আমার জাইরা বাবায় করায় না ॥
আমাগোর বাবা মইরা গেলে গো
ফকিরকে পয়সা দিমু চাইর আনা ॥
মাইশের বাবা কত মরে গো
আমাগোর জাইরা বাবা মরে না ॥
ইবার বিয়া না করইলে গো
তোমার সংসারের কাজ করমু না।
আমায় বিয়া না করাইলা গো
ভাইরেও বিয়া না করাইলা গো
ও বাবা তুমি একটা কর না ॥
ভাই সকল বিয়া কইরেন না (২)
একটা করলে করতে পারেন
দুইটা বিয়া কইরেন না ॥
সখে দুই বিয়া করলেম
দুই বিয়ার কারণে আমার
নয়ন হারালেম।
আরেক বিয়া করলে পরে
ভাইরে ভাই আমি আর বাচুম না ॥
ও দুইডা পয়সার জন্য মান সম্মান
পয়সা নাই যার ঘরেতে।
পয়সা নাই যার মরণ ভালো এ সংসারেতে ॥
ডাক্তার যখন রোগী বাড়ি যায়
যদি পয়সা নাহি পায়
খাটি ঔষধ দেয়না তারে
রং করা জল দেয় ঢেলে ॥
মামলাটি বাজিলে পরে
উকিল মুক্তার জিজ্ঞাসা করে

www.pathagar.com

পয়সা না দিলে পরে
জয়কে নিয়া দেয় জেলে ॥
নারী: কথা বলবো না কথা বলবো না রে
ফিরিয়ে নে তোর রূপার বাজু
পরবো না পরবো না রে ॥
পুরুষ: কেন কথা কইবি না কইবি না
ওলো সুন্দরী।
নারী: কথা বললে দিতে হবে সোনার চুড়ি
পরবো আমি ঢাকাই শাড়ি
আনতে ভুল না ॥
পুরুষ: কেয়া ফুলের খোঁপা লো তোর
হিজল ফুলের মালা।
নারী: চাষার ছেলে বুঝবে কি আর
মোর পিরিতের জ্বালা।
পরবো আমি পাটাই শাড়ি
আনতে ভুল না।।

কীর্তন: গ্রাম বাংলার প্রতিটি মহল্লায় প্রতিদিন শোনা যাবে কীর্তনের সুর, খোল আর মৃদঙ্গের ধ্বনি। আর প্রতিটি মন্দিরে বছরে একবার কি দুবার আয়োজন হয় কীর্তনের আসর। কখনো একদিন কখনো দুদিন আবার কখনো ছাপান্ন প্রহর কখনো বাহাত্তর প্রহর। এসব কীর্তনের আসরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় এ অঞ্চলে কীর্তনের জনপ্রিয়তারই বহিঃপ্রকাশ। কখনো কখনো বিভিন্ন উপলক্ষে ধনাঢ্য হিন্দু বাড়ি অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কীর্তনের আসর আয়োজিত হয়ে থাকে। এসব আয়োজনে পালাকীর্তন, লীলাকীর্তন, ঢপকীর্তন ইত্যাদি পরিবেশিত হয়ে থাকে। কীর্তনীয়ারা যতদিন কীর্তনের সাথে জড়িত থাকেন ততদিন নিজেদের সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজেদের সাধারণ মানুষ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখেন; কিন্তু তারপরও বাউল সম্প্রদায়কে যেভাবে আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কীর্তনীয়ারা তেমনটি নয়।

গাইনের গীত: গাইনের গীত একসময় বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। একজন গায়েন একদল দোহার নিয়ে গাইনের গীত পরিবেশন করে থাকেন। গায়েন দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি হাস্যরসের মোড়কে সমাজের নানান অসঙ্গতিও তুলে ধরেন গাইনের গীতের মাধ্যমে।

উল্লেখিত ধারায় লোকসঙ্গীত ছাড়াও ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, কিসসাপালা, কবিগান, জারিগান, হাইট্টারাগান ইত্যাদি বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকায়ত জীবনে যথেষ্ট প্রচলিত এবং প্রবল জনপ্রিয়তার দাবিদার।

সুপারিশ: বৃহত্তর ময়মনসিংহের সমৃদ্ধ এই লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না গেলে আমাদের এই বিশাল সম্পদ একদিন খোয়া যেতে বাধ্য। প্রযুক্তির উৎকর্ষ যখন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত তখন সঙ্গত কারণেই প্রযুক্তিকে কেউ কেউ সমাজ সংস্কৃতির জন্য অভিশাপ মনে করাটা অমূলক নয়; কিন্তু সেই প্রযুক্তিকে সংস্কৃতি রক্ষার কল্যাণকর উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট করে বিপণ্নপ্রায় সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ ও প্রচার কার্যকর করে তুলতে পারলে নিশ্চয়ই সে সংকট কেটে যাবে। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মনে শুভবুদ্ধির উদয়। প্রয়োজন ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে লোকসঙ্গীত উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিটি মাধ্যমের মেধাবী শিল্পীদের খুঁজে নেয়া এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দুঃস্থ গ্রামীণ শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে। আঞ্চলিক ও জাতীয় লোকসঙ্গীত উৎসব হয়ে উঠতে পারে বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণের সোপান। সংস্কৃতির উন্মূলপনা চারিত্র পরিহার করে তাকে মাটি-মানুষ ও শেকড়-ঘনিষ্ঠ করে তুলতে লোকসঙ্গীত উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই আমাদের আশাবাদ।

www.pathagar.com

৬.৫ গারো-হাজংদের লোকগীতি

মতেন্দ্র মানখিন

বাংলাদেশে প্রায় ৩০/৪০টির মতো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। এসব নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয় যেমন ভিন্ন ভিন্ন নামে, তেমনি রয়েছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মুখের ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক ব্যবস্থা, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কোনো জাতিই একক এবং আলাদাভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারছে না। সভ্যতার অগ্রগতির যুগে কোন না কোন সমাজের সাথে তাদের মেলামেশা, উঠাবসা করতে হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় কোন জাতিই তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারছে না। এদিক দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ পড়ছে বেশি। তাই সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীরা আজ বিভিন্ন চাপের সম্মুখীন। তবু নিজেদের পরিচয়, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিকাংশ জেলাগুলোতেই গারো-হাজং কোচ, ঢালু, হদি, বানাই প্রভৃতি আদিবাসী-সম্প্রদায় বাস করে। এদের মধ্যে এসব অঞ্চলে সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গারো-হাজং সম্প্রদায়ই সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গারো-হাজং সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গারো-হাজংদের আকর্ষণীয় গৌরবময় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কারণে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু বর্তমান সময়ে যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে গারো-হাজংদের সেই লোকগীতি তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

গারোদের লোকগীতি: গারোদের লোকগীতিগুলোর লিখিত কোনো স্বরলিপি নেই। এটা মুখে মুখে রচিত ও গীত হয়ে থাকে। মুখে মুখে বংশপরম্পরায় পুরুষানুক্রমে এটা চলে আসছে। কালের প্রবাহে এজন্যেই এসব লোকগীতিগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমান প্রচলিত গারো লোকগীতিগুলোর মধ্যে রে-রে, হাজিয়া, খাথাদকা, খাবি-রিংআ, সেরেনজিং ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোর উপর এখন সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

গারো নৃত্যগীত (চিচাম ও তার দল)

www.pathagar.com

রে-রে গীত: রে-রে গীত সাধারণত ৩/৪ পুরুষ ও ৩/৪ জন মহিলা দুই দলে মুখোমুখী পাল্টা-পাল্টি উপস্থিত বুদ্ধিতে রে-রে বানিয়ে গাইতে হয়। বাদ্য বাজনার সাথে তাল রেখে, সামনে ঝুঁকে, পিছনে ফিরে হাতে পায়ে তাল রেখে রে-রে গাওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন একজন করেও গাওয়া যায়। পুরুষ অথবা মহিলা যেকোনো দলের প্রথম একজন রে-রে শুরু করবে। সে প্রথম একলাইন গাইবে-পরের লাইন সবাই মিলে গাবে এবং শেষে এক সাথে হাররে বা হারারা গেয়ে বাহার দিবে। রে-রে সাধারণত ৪ প্রকারের শুনা যায় যথা- ১। রঙের খেলা, ২। পিরীতি, ৩। রামায়ণী ও ৪। সীমাসা।

রঙের খেলা: রে-রে

এটা আধুনিক গানের মতো প্রায়। চলমান বাস্তবতার উপর রে-রে বানিয়ে মুখে মুখে গাওয়া হয়। গারো ও বাংলা দুই ভাষার সংমিশ্রণেও এটা গাওয়া যায়। এখানে প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য, মাধুর্য একাকার হয়ে মিশে অপরূপ এক সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি হয়। যেমন

১. পুরুষ: হো... গিচ্চাকজিপা বিবালখো (আকে খালমা সালমত্তআ) ২
মন ধীরে ধীরে যায় নম নাংনি নকওনা ॥ হা-রে-রে ॥

২. মহিলা: হো... মন ধীরে ধীরে যায় (নম নাংনি নকওনা) ২
বসিয়া নিরলে কান্দিয়া কল্পনা ॥ হা-রে-রে ॥

৩. পুরুষ: হো... বসিয়া নিরলে (কান্দিয়া কল্পনা) ২
মানা করি তোমারে জলের ঘাটে যাইওনা ॥ হা-রে-রে ॥

৪. মহিলা: হো... মানা করি তোমারে (জলের ঘাটে যাইওনা) ২
গোপনীয় কথাখো মানষের লগে কইওনা ॥ হা-রে-রে ॥

বাংলা ব্যাখ্যা

১. পুরুষ: এখানে বলছে হে প্রিয়া, এই ফুল তোমার জন্য আমি ডাল থেকে ছিঁড়ে এনেছি। তোমার খোঁপায় খুব মানাবে। তোমার প্রেম, তোমার সৌন্দর্যের কাছে আমার সমস্ত কিছু আমি সমর্পণ করেছি।

২. মহিলা: হে প্রিয়, আমিও তোমাকে ভালবাসি। আমি তাই নীরবে নিভৃতে বসে তোমার কথাই সব সময় কল্পনা করছি। আমার মন, প্রাণ তোমার জন্যই কাঁদছে, তোমাকে পাওয়ার জন্য।

৩. পুরুষ: এখানে পুরুষ তার প্রেমিকাকে নিষেধ করছে, তুমি আর একা একা জল আনতে ঘাটে যেও না। যদি অন্য কোনো পুরুষ তোমাকে ভালবেসে ফেলে, তোমাকে প্রেম নিবেদন করে।

৪. মহিলা: মহিলা বলছে না, আমি ওরকম খারাপ মেয়ে না। তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে ভালবাসি না। কিন্তু সাবধান, আমাদের এ গোপন প্রেম, ভালবাসার কথা কেউ যেন জানতে না পারে। কেউ জানতে পারলে মা-বাবা ... করবে।

পিরীতি: রে-রে

এই রে-রে সাধারণত মাছের নাম দিয়ে গাওয়া হয়। মাছই এখানের প্রেমিক প্রেমিকার প্রতীক। বোয়াল মাছ, রুই, কাতল, শিং, মাগুর, কই যত রকমের মাছের নাম করে এই রে-রে গাওয়া হয়।

১. পুরুষ: হো... বরবিলা কানজিয়া বরবিলা কামজিয়া
মিক্ষা ওয়াসিসিয়ানা কই মাগুর উজিয়া ॥ হা-রে-রে ॥

২. মহিলা: হো... মিক্ষা ওয়াসিসিয়ান (কই মাগুর উজিয়া) ২
বড় ছিল বোয়াল মাছ নিল চিলে ধরিয়া ॥ হা-রে-রে ॥

বাংলা ব্যাখ্যা

১. পুরুষ: পুরুষ বলছে বরবিলা কামজিয়া নামক বিলে অনেক মাছ। বর্ষার সময় সামান্য বৃষ্টি হলেই

www.pathagar.com

শিশু শিল্পীদের পরিবেশিত গারো গান

অনেক কই, মাগুর উজায়। জাল দিয়ে সেই অনায়াসে ধরা যায়। বর্ষার সময় খাল, বিল, নদী নালায় ভরা যৌবন আসে, মেয়েরাও যৌবনে এলে কই, মাগুরের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

২. মহিলাঃ মহিলা এখানে নিজেকেই বোয়াল মাছের সঙ্গে তুলনা করে বলছে। অর্থাৎ পুরুষকে টিটকারী দিয়ে বলছে তুমি শুধু ছোট ছোট কই মাগুর নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু আমার মত বড় মাছ কি তোমার চোখে পড়ে না। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম, তুমিতো আমাকে চাইলে না।

রামায়ণীঃ রে-রে

এই রে-রে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে গাওয়া হয়। এখানে প্রধান উপজীব্য বিষয় রাম, লক্ষণ, সীতা, রাবণ, হনুমান ইত্যাদি।

(১) পুরুষঃ হো... রাম লক্ষণ দুই ভাই (বনবাসচা রেয়েংজক) ২
সীতা হরণ করিয়া রাবণ রাজা খাতাংজক ॥ হা-রে-রে ॥

(২) মহিলাঃ হো... সীতা হরণ করিয়া (রাবণ রাজা খাতাংজক) ২
নিকরিককানো বগিলা বাচ্চাধাকা রেয়েংজক ॥ হা-রে-রে ॥

বাংলা ব্যাখ্যাঃ

১. পুরুষঃ পুরুষ রাম ও লক্ষণ দুই ভায়ের বনবাসে গিয়ে যে দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেই কাহিনী বলছে। সমাজে কিছু কিছু দুষ্ট চরিত্রের লোক থাকে তাদের জন্য মানুষ কোনোদিন ভাল থাকতে চাইলেও তা পারে না। পরস্ত্রী হরণ খুবই নিন্দার কাজ।

২. মহিলাঃ বিলের ধারে বসা বককে জিজ্ঞেস করছে। রাবন সীতাকে হরণ করে কোন দিকে গেছে? বেচারী মেয়েরা মত অসহায়-কাউকে ভালবেসে বিয়ে করেও রেহায় পায় না। এই দুঃখই প্রকাশ করছে মহিলা।

সিমাসাঃ রে-রে

১. পুরুষঃ হো... গাছ হল গজারী, পাতা হল চালুনী

www.pathagar.com

সিমাসানি রেরেখো নাংমিং দোওসাল খালগানৈ ॥ হা-রে-রে ॥

২. মহিলা: হো... ফুল হইয়াতল হয়, পাথর হইয়া ভাসে
কাউয়া দুরা দুলষে বাজায় বানর হইয়া নাচে
এখানে আগানাংনা নাংগানৈ ॥

বাংলা ব্যাখ্যা:

১. পুরুষ তার প্রেমিকাকে ধাঁ ধাঁ দিচ্ছে গাছটা হল গজারী গাছের মত শক্ত, এর পাতা হল চালুনির মত গোল। বলছে-এই ধাঁধাঁর উত্তর দিতে হবে।

২. মহিলাও ছাড়বার পাত্রী নয়, সে বলছে তার ধাঁধাঁর উত্তর দিতে হবে।

গারোদের এসব রেরে কাহিনী নিয়ে লিখলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। শুধু সামান্য ধারণা দানের জন্য আমি খুব সংক্ষেপে এই উদাহরণগুলো তুলে ধরেছি।

গারো লোকগীতি:

হাজিয়া: এটা একধরনের রাগিণীবিশেষ। ওয়াংগালা বা নবান্ন উৎসব এবং পরলোগত লোকদের স্মরণ অনুষ্ঠানগুলোতে এই হাজিয়া হয়। সাধরণত বয়স্ক লোকেরা হাজিয়া গায়। এর ভাবার্থ খুবই গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

খাথাদকা: খাথা মানে কথা, দকা মানে গাওয়া। অর্থাৎ ঐতিহাসিক গল্প কাহিনীকে কথা ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করা। এটাও সাধারণত বয়স্ক লোকেরাই করে থাকে।

খাবি রিংয়া: এটাও এক ধরনের তত্ত্বমূলক গীত যা, বয়স্ক লোকেরা গেয়ে থাকে। মৃত লোকের সৎকারের সময় এই গীত গাওয়া হয়। এই 'গাওয়ার সময় খামাল বা পুরোহিত একটি লাঠির আগায় ঘুঙুর বেঁধে নেয়। সাথে আরও দুই তিন-জন দোহার থাকে। একজন দামাবাদক দামা বাজায়। খামাল খাবি গীত গায় দোহাররা তাল দেয় যেমন:

খামাল: আইওরো... আংয়ি সোমা বলংয়ে হাইনরকমাচা গাদো হাই নরনকমাচা গাদো।

মিমাং (মৃত আত্মা) উত্তর দিবে: শিশিরিখো চাকখিমাল চাকিম দংগাম বালঘ্রিঘো চাখিমাল চাকিইন দংগাম।

ব্যাখ্যা: এই গীতেও দুইদল, একদল খামাল আর একদল মৃতলোকের পক্ষে। খামাল সেই মৃতলোককে বলছে, এসো তুমি ঘরে এসো।

মৃতলোকের আত্মা বলছে: না না, এখন আমি আর তোমার ঘরে থাকার উপযুক্ত নই। আমি এতদিন বাইরেই ছিলাম। কত রোদ, বৃষ্টি, শ'য়ে শ'য়ে আমার এখন অভ্যাস হয়েছে। অযথা আমাকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি কর না।

সেরেনজিং: সেরেনজিং একটি প্রেম কাহিনীর পালা গান এবং লোকগীতিও। লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদের অমর প্রেম কাহিনীর মতই এর তাৎপর্য। সেরেনজিং একটি দুঃখী মেয়ের নাম। সে ভালবাসে ওয়ালজামকে। এটা নিয়ে অনেক সংঘাত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি একটি সমাজজীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী।

হাজংদের লোকগীতি

হাজংরা বাংলাদেশের অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী থানাগুলোতে হাজংদের বসবাস। বাংলাদেশে হাজংদের সংখ্যা আনুমানিক ১৫-২০ হাজার।

হাজংদের লোকগীতি বেশ সমৃদ্ধ। কৃষি কাজকে কেন্দ্র করে হাজংরা অনুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে জাখামারাগীত, রোয়া লাগাগীত, লেওয়াতামা, বামাইগীত উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে এ বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

www.pathagar.com

হাজং নৃত্যগীত

জাখা মারা গীত: বাঁশের চিকন বেতি দিয়ে তৈরি যা দিয়ে ছোট ছোট পোনা মাছ মারা হয়। হাজং মহিলারা সাধারণত জাখা দিয়ে মাছ ধরতে পটু। বর্ষাকালে খাল, বিল, নদীনালায় এরা দল বেঁধে জাখা মারে। তাদের কোমরে বাঁধা থাকে বেত দিয়ে তৈরি মাছ রাখবার খালই। মাছ মারা যাবার পথে তারা সঙ্গীদের আহ্বান করে 'আয়লো বইন্যিগুলা জাখা মারা জাং জাখা মারা না জালে হেংয়া মারা জাং।

অর্থাৎ এসো বোনেরা আমরা জাখা মারতে যাই। আর যদি জাখা মারতে না চায়, তাহলে 'হেংয়া' মারতে যায়। 'হেংয়া' এটাও বেত দিয়ে তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র।

রোয়া লাগা গীত: হাজং মেয়েরা দালগতভাবে রোয়া লাগায়। প্রথম রোয়ার দিন তারা গৃহ-কর্ত্রীকে কাদা মাখায় এবং একে অপরকেও কাদা মাখায়। এটা তাদের সংস্কৃতি। তাদের বিশ্বাস, প্রথম লাগামীর দিন এই কাদা না মাখলে ফসল ভাল হয় না। এই কাদা মাখামাখিকে হাজং ভাষায় প্যাক খেলা বলে। রোয়া লাগানোর সময় তারা দলগতভাবেই রোয়া লাগা গীত গায়:

গিরিগুলো ক্ষেত লাগাবাম
তিমতগুলা যায়,
রোয়া লাগা শেষ হলে
মদে ভাতে খায়।

অর্থাৎ হাজং ভাষায় গিরিগুলো মানে ক্ষেতের মালিক বা মোড়ল বুঝায়। তিমত মানে মেয়ে বা মহিলা। মোড়ল বা গৃহস্থের ক্ষেত লাগাবার জন্য মেয়েরা দল বেঁধে যায়। আর ক্ষেত লাগানো শেষ হলে সন্ধ্যায় মদ ও ভাত খাওয়ানো হয়।

লেওয়াতানা: হাজংদের লেওয়াতানা গীত খুব জমজমাট। হাজং ভাষাতেই এই গীত গাওয়া হয়। লেওয়া মানে লতানো জাতীয় গাছ। যা টানাটানি করা যায়। এই গানে পুরুষ মহিলা থাকে। পুরুষ-মহিলা দলে ৬/৮ জন করে থাকে। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে রুমাল। যখন গান গাওয়া হয় তখন একে অপরের রুমাল ধরে এঁকেবেঁকে টানাটানি করে নাচে।

রংপুর জেলাতে আচ বড় ময়না
সেই ময়না রাও করে না।

www.pathagar.com

লেওয়াতানা গানে এই দুটি লাইন আছে। এখানে ময়না বলতে তার সঙ্গিনী বা প্রেমিকা, আর রংপুর জেলা সে তো মনের রং মহল, রংমহলে যে ময়না থাকে সে হয়তো সুখেই থাকে।

বানাইগীত: হাজংরা বানাই গীত নামে নাচ গানের মহড়াও করে থাকে। এই গানেও মহিলা পুরুষ মুখোমুখি হয়ে নাচে ও গায়। যেমন পুরুষরা গায়:

টেংসোমা টেংও টেং রাজায়ও
টেংসোমা টেংও টেং।
তয়চিংরি ভালা হবাম সোমা
রাজায়ও। টেংসোমা টেংও টেং।

দেউলি: এখানে 'টেংসোমা' শব্দে কোন অর্থই আবিষ্কার করা গেল না। তবে উপলব্ধি করা যায় ভালবাসা বা সোহাগের ভাষায় এই শব্দগুলো হয়তো তারা ব্যবহার করেছে। তয়চিংরি বলতে যুবতী মেয়েকে বুঝায়। হাজং সমাজে বাঙালি হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক, বৈচিত্র্যময় ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উৎসব হচ্ছে দেউলি বা দেওয়ালি। দেউলি চরমাগা নামেও পরিচিত। চরমাগা সম্পর্ক কথা প্রচলিত আছে যে, হাজং রাখাল বালকরা তাদের গরু মহিষ জংগলে নিয়ে চড়াতো। তখন হিংস্র বাঘ ভালুক প্রায় সময় আক্রমণ করত। সেসব হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাখালেরা ঢাল, তলোয়ার, বল্লম সঙ্গে রাখতো এবং অবসর সময়ে সেই অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিত। সারা বছর মহড়ার পর দেয়ালি পূজার দিন শ্রামা বা কালীকে সাক্ষী রেখে ঢাল তলোয়ারের চূড়ান্ত মহড়া হতো। এরপর আমোদ প্রমোদসহ ভোজন-উৎসব চলতো। এই ঘটনাই 'চরমাগা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

দেয়ালি বা চরমাগা সাতদিন চলে। এই সময় তারা পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি, লেওয়াতামা, বানাইগীত, নৌকাভাঙ্গা, দেবাসুর বকাসুর, রামমঙ্গল, মহিমাসুর ছোট ছোট নৃত্যনাট্য করে এবং বিনিময় চাল ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করে। পড়ে পূজা করে সবাই মিলে খায়।

গারোদের অবস্থান: বাংলাদেশে গারোদের অবস্থান গাজীপুর জেলার শ্রীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের সব জেলা-উপজেলাতেই ছড়িয়ে রয়েছে। ভারতের নওয়াগাও, গোয়ালপাড়া, আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে গারোদের বসবাস। বাংলাদেশে গারোদের সংখ্যা প্রায় একলাখ। গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। গারোরা মায়ের দিক থেকে বংশ গণনা করে। মা যদি মানখিন গোষ্ঠীর হয় সব ছেলেমেয়েও মানখিন হবে। মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজে সাধারণত ছেলেরা জামাই যায়। একই মাহারীতে তাদের বিয়ে হয় না। ব্যাতিক্রমবশত কোথাও হয়ে গেলে তাকে 'মাদং' অর্থাৎ মাতৃগোষ্ঠীকে বিয়ে করা হয়েছে বলে সমাজ থেকে দূরে সরে যায়।

গারোদের বাদ্যযন্ত্র: গারোদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র আছে। এগুলোর মধ্যে খ্রাম, দামা, নাগ্রা, নাদিক, রাঙল, রাং, চেংচাপ, দিমচ্রাং, গংগিনা, আদুরু, কাল, আম্বাংশী উল্লেখযোগ্য।

খ্রাম: বড় আকৃতির কাঠের খোলে গরুর চামরা দিয়ে দেয়া যন্ত্রকে খ্রাম বলে।

দাম: খ্রামের ছোট আকৃতির যন্ত্রকে দামা বলে। খ্রাম ও দামার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩/৪ হাত।

নাগ্রা: মাটির চারির উপর চামড়া দিয়ে ছাওয়া হয়। এটা দু'টি কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। সাধারণত কোন সম্মানিত বিশেষ অতিথির আগমন ঘটলে এবং কোন বড় পালা-পার্বণ ঘোষণার সময় নাগ্রা বাজানো হয়।

নাদিক: দামার চেয়ে আর ছোট আকৃতির যন্ত্রকে নাদিক বলা হয়।

রাঙল: পিতল মিশ্রিত গামলার মত যন্ত্রকে রাঙল বলে।

রাং: এটাও পিতল মিশ্রিত ধাতু দ্বারা তৈরি। তবে এটা ছোট আকারের চেংচাপ: গোলাকৃতি পিতল অথবা কাসার ধাতু দিয়ে তৈরি। বাংলায় করতাল নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

দিমচ্রাং: প্রায় এক হাত হালকা বাঁশ দিয়ে তৈরী। বাঁশের মাঝখানে এক ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত থাকে। বাঁশের এক পৃষ্ঠে দুটি তারের মত করে বেতি তোলে, গর্তের উপর কাঠি দিয়ে টান করে দাঁড় করানো হয়। একে কাঠি দিয়ে বাজানো হয়।

গংগিনা: ছোট আঙুলের ব্যাসাইর পরিমাণ বাঁশের টুকরা দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ ইঞ্চি মাঝখানে লম্বালম্বি ফাঁক, ফাঁকের মাঝখানে সরু করে কাঠি রাখা হয়। এর আগা সূতা দিয়ে বাঁধা থাকে। সুতা ধরে মুখে লাগিয়ে বাজালে সুন্দর আওয়াজ বা সুর সৃষ্টি হয়।

আদুরু: মহিষের সিং আগা ছিদ্র করা।

কাল: বড় থেকে ছোট করে করে প্রায় ৫/৬ টুকরা দালু বাঁশের জোড়া দিয়ে-এ কাল বানানো হয়।

আম্বাংশী: বাঁশ অথবা হালকা কাঠ দিয়ে তৈরী বাঁশি।

পোশাক-পরিচ্ছদ: গারোদের নিজস্ব পোশাক পরিচ্ছদ আছে। মেয়েরা দক-বান্দা, দকশারী, গেন্না, ব্লাউজ ও ওড়না ব্যবহার করে। পুরুষরা ধুতি, লুঙ্গি, পেন্ট, স্মার্ট, গেঞ্জি ব্যবহার করে।

অলংকার: গারোদের নিজস্ব অলংকারগুলো হচ্ছে, রিপক, রূপার চেইন, থাংকাছড়া, আধুলি ছড়া, সিকি ছড়া ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কানের দোল, হাতের বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

লোক শিল্পীদের নাম: গারোদের লোকশিল্পীদের নাম অনেক। এমুহূর্তে কাকে রেখে কাকে উল্লেখ করবো ভেবে পাচ্ছি না। তবু উল্লেখ করছি দেবজানমনি, সারামনি, লাইমরল, গসংমরল, সুনিয়া, মনিরাম, অনিলা।

লোকশিল্পী দলের নাম: ভালুকা পাড়া গারো গানের দল, ভূঁইয়া পাড়া রেরে দল, দিঘলবাড়া রেরে দল, খাবিদল, ধাইর পাড়া আজিয়া দল, ওয়াংগালা দল।

হাজংদের অবস্থান: বাংলাদেশে হাজংদের অবস্থান, সিলেট এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশে হাজংদের সংখ্যা প্রায় ১৫/১৬ হাজার।

হাজংদের বাদ্যযন্ত্রে নাম: খোল, করতাল, ঢাক, ঢোল, বাঁশী ইত্যাদি।

লোক শিল্পীদের নাম: অজ্ঞাত।

দলের নাম: অজ্ঞাত।

সুপারিশ: গারো ও হাজংদের প্রায় সব লোকসঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র কালের প্রসঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এগুলোর কোনো বাণিজ্যিক মূল্যমান নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গারো ও হাজংদের এলাকায় পৃথক পৃথক লোকসংস্কৃতি মিউজিয়াম গড়ে তোলা আবশ্যক। এর জন্যে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সর্বোপরি, নিজেদের বৈচিত্র্যসূচক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে গারো হাজংসহ সকল আদিবাসী সম্প্রদায়কে সচেতন করতে হবে।

www.pathagar.com

৭

রংপুর অঞ্চল

৭.১ দিনাজপুরের লোকসঙ্গীত

নাজমুল হক

ভূমিকা: লোকসাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে লোকসঙ্গীত। সুদীর্ঘকাল যাবত লোকমুখে প্রচলিত এবং সমাজে নিজস্ব বলে স্বীকৃত গানগুলোকে লোকসঙ্গীত নামে অভিহিত করা হয়।

আদিম সমাজে মানুষের জীবনচর্যায় সুরই ছিল প্রধান প্রকাশ মাধ্যম। এর অনেক পরে এসেছে ভাষার ব্যবহার। মানুষের সহজাত কৌতূহল ও অনুকরণ প্রবণতার কারণে সে নদী-নির্ঝরের সুমিষ্ট শব্দ, পাখির কলকাকলি এবং সমুদ্রের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, বাতাসের নিক্কণ ধ্বনি ইত্যাদিকে ধারণ করেছে আপন কণ্ঠে, আত্মস্থ করেছে তাদের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ও ধ্বনিমাধুর্য। এভাবেই সঙ্গীতের প্রথম সূত্রপাত। পরে মানুষের কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-বেদনা, প্রেম, আনন্দ-হাসি এবং ধর্মীয় অনুভূতি সুরের আবহে মিলে মিশে সৃষ্টি করেছে সমৃদ্ধ সঙ্গীত ভুবনের। সঙ্গীতের সূচনায় সঙ্গীত সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে লোকসমাজ। সুতরাং তাদের সৃষ্ট লোকসঙ্গীত আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে দিয়েছে মজবুত ভিত্তি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে- "Folk song is a music that has been submitted to the process of oral transmission, it is a product of evolution and is dependent on the circumstances of continuity, variation and selection (M. Lawters Ray)". লোকসঙ্গীতের কোনো সুনির্দিষ্ট স্রষ্টা সাধারণত খুঁজে পাওয়া যায় না, এগুলো একক অথবা দলীয়ভাবে সৃষ্ট। প্রবহমানতার মধ্য দিয়েই লোকসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। দিনাজপুর জেলার লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এ জেলার লোকসঙ্গীত যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য স্বতন্ত্র, তেমনি লোকসঙ্গীতের মূল প্রবণতাটিও এর মধ্যে সংরক্ষিত। সনাক্তকৃত অধিকাংশ লোকসঙ্গীতেরই রয়েছে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

আবদুর রহমান বয়াতি

www.pathagar.com

দিনাজপুর জেলার ভূখণ্ড, মানুষ, সমাজ ও ইতিহাস

ক. প্রাচীন পুরাভূমি, 'পুণ্ড্রবর্ধন' ও 'বরেন্দ্রভূমির' বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিনাজপুর বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের সর্বশেষ জেলা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার আয়তন ছিল ৩,৯৪৮ বর্গমাইল। ১৯৮৪ সালের নতুন প্রশাসনিক বিন্যাসের ফলে দিনাজপুর অঞ্চল তিনটি জেলায় রূপান্তরিত হয়: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়। অখণ্ড এই জেলার বর্তমান জনসংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক। ভূ-গঠন অনুযায়ী দিনাজপুর জেলার ভূ-প্রকৃতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: ১. হিমালয় পাদদেশের পলি অঞ্চল ২. তিস্তা প্লাবিত পলি অঞ্চল এবং ৩. বরেন্দ্র অঞ্চল। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ভূমি সাধারণভাবে সমতল। সবচেয়ে উঁচু ভূমি 'তেঁতুলিয়া' সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৯৭ মিটার উঁচু। এটি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক উচ্চতা। জেলার প্রধান নদী আত্রাই, ঢেপা,পুনর্ভবা, করতোয়া, টাঙ্গন, নাগর।

খ. দিনাজপুর জেলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে- আদি-অস্ট্রালয়েড, ভেড্ডিড, মঙ্গোলীয়, আর্য এবং সেমেটিক নৃজাতিক গোষ্ঠীর মানুষ। এ জেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নৃ-গোষ্ঠী সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, মাহালী, মুষহর, মালপাহাড়ী, পলিয়া, কোচ, রাজবংশী ইত্যাদি। আর্য-হিন্দু ও উপশাখার মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য,শূদ্র, কৈবর্ত, কায়স্থ, তাঁতি, কামার-কুমার ইত্যাদি এবং সেমেটিক গোষ্ঠী ও ধমার্ন্তরিত মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে সৈয়দ, শেখ, পাঠান, নস্য প্রভৃতি। হিন্দু সমাজে বিদ্যমান আছে বর্ণভেদ প্রথা যদিও বর্তমানে তা প্রকট নয়। মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু বহিরাগত থাকলেও বিপুল সংখ্যাক মুসলিম জনগোষ্ঠী রাজবংশী, কোচ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত। রাজবংশী কোচ ও পলিয়া জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয় এককালে বিদ্যমান থাকলেও তারা এখন হিন্দু ধর্মে আত্তীকৃত হয়েছে এবং নিজেদের পরিচয় দেয় রাজবংশী বলে। এ জেলায় বিপুল সংখ্যক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর সাক্ষাৎ মেলে। ধর্মাচরণে আদিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু আদিবাসী সর্বপ্রাণবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের বহু লৌকিক আচার পালন করে। জেলার মধ্যাঞ্চলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এবং অন্যত্র মুসলিম অধিবাসীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক প্রথা মুসলিম, হিন্দু ও আদিবাসী ভেদে স্বতন্ত্র। তবে নবান্ন, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং লোকসঙ্গীত লোকনাট্য পরিবেশনায় ধর্মীয় ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না। এ ক্ষেত্রে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষণীয়। দিনাজপুর জেলার জনগোষ্ঠীর মূল পেশা কৃষি। ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগ তেমন একটা দেখা যায় না। শিক্ষার হার পঞ্চাশ শতাংশের মতো।

গ. দিনাজপুরের নামকরণের ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বুকানন হ্যামিলটনের মতে, গৌড়ের সিংহাসনে অনধিকার প্রবেশকারী '*দিনওয়াজ*' বা 'রাজা গণেশের' সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পৃক্ততার সূত্রেই জেলার এ নামকরণ। ঠাকুরগাঁও জেলার নামকরণের পেছনে পার্শ্ববর্তী মৌজা নিশ্চিন্তপুরের কথা উল্লেখ করা হয়। ঐ গ্রামের নারায়ণ চক্রবর্তী

আবুল হাসেম তালুকদার

www.pathagar.com

শিপ্রা কর্মকার

ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দুই ভাইয়ের বসত বাড়িকে প্রতিপত্তির কারণে গ্রামবাসীরা নাম দিয়েছিল 'ঠাকুরবাড়ি'। সেখানে ১৮০০ সালে একটি থানা স্থাপিত হয়। পঞ্চগড় জেলার নামকরণ হয় ঐ অঞ্চলে অবস্থিত পাঁচটি গড়ের অবস্থানের ভিত্তিতে। বর্তমানে পঞ্চগড় জেলার ভূখণ্ড ব্যতীত অবশিষ্ট দিনাজপুর জেলা খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতকে মৌর্য শাসন, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ৫৪৪ খ্রি. পর্যন্ত গুপ্ত শাসন, খ্রিস্টীয় ৭৫৬ থেকে ১১৬২ পর্যন্ত পাল বংশের শাসন, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১২০৪ খ্রি পর্যন্ত সেন রাজাদের শাসন, অতঃপর মুসলিম শাসন; ষোড়শ শতকের শেষে থেকে বৃটিশ অধিকার পর্যন্ত দিনাজপুর রাজবংশের এবং ১৭৬৫ সালের পর বৃটিশদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ১৭৮৬ সালে দিনাজপুর একটি প্রশাসনিক জেলায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় এ জেলা। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সর্ব উত্তরের নবগঠিত জেলা পঞ্চগড়ের ভূখণ্ড প্রাচীনকাল থেকে বৃটিশ আমল পর্যন্ত কামরূপ কামতা ও কোচবিহার রাজ্যের শাসনাধীন ছিল।

দিনাজপুরের লোকসঙ্গীত: সনাক্তকৃত তালিকা

প্রাচীন ভূখণ্ড ও বিচিত্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দিনাজপুরে বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীতের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের একটি তালিকা প্রণীত হলো:

১.ভাওয়াইয়া ২. কীর্তন ৩. পাঁচালী ৪. মেয়েলি গীত বা বিয়ের গান বা হেরোয়া ৫. মহররমের জারি ৬. দেহতত্ত্বের গান ৭. মারেফতি ৮. ফাতেমার জারি ৯. গুরুসঙ্গীত ১০. তুক্‌খা ১১. খেমটা ১২.ধর্মপূজার গান ১৩. মনসার আসান ১৪. মেঘার গান ১৫. হুদমা দেও-এর গান ১৬ মেচেনী বা ভেদাই খেলার গান ১৭. যুগীর গান ১৮. মানিক পীরের গান ১৯. কৃষ্ণলীলার গান ২০. মাহুত বন্ধুর গান ২১. গাজীর গান ২২. সত্যপীরের গান ২৩. মাগনের গান ২৪. মাদারের গান ২৫. মাড়োয়ার গীত ২৬. সোনারায়ের গান ২৭. হালুয়া-হালুয়ানীর গান ২৮. গোরক্ষনাথের গান ২৯. চড়কের গান ৩০. ডাক গান ৩১. নটুয়া গান ৩২. দুর্গা পূজার গান ৩৩. শীতলা পূজার গান ৩৪. তিস্তাবুড়ির গান ৩৫. জঙ্গের গান ৩৬. সোরি গান ৩৭. বন্ধু পাঁচালি বা বন্ধু আলার গান ৩৮. চোকচুন্নি বা চোরচুন্নির গান ৩৯. মানিকচন্দ্রের গান ৪০. মনসা মঙ্গলের গান ৪১. বাউল সঙ্গীত ৪২. মরমিয়া প্রভৃতি।

দিনাজপুর অঞ্চলে 'পালাটিয়া', ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে 'ধাম গান' এবং পঞ্চগড় অঞ্চলে 'হুলির গান' নামে নাট্যগুণসম্পন্ন (লোকনাট্য) এক ধরনের লোকসঙ্গীত শীতকালে পরিবেশিত হয়। এতে সংলাপ, অভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীতের মিশ্রণ থাকে। কবিগানও এই জেলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ জেলার কয়েকজন বিখ্যাত কবিয়ালের নাম-নীলমণি সরকার (পুনট্রি) পদ্মলোচন সরকার (নান্দইর), নরেশচন্দ্র সরকার (সুইহারী, দিনাজপুর) ক্ষিতিশচন্দ্র পাল (কাহারোল), আজিমুদ্দিন সরকার (পার্বতীপুর), মালতী রানী (কাহারোল)। পালাগান বা লোকনাট্যের কয়েকটি দলের নাম-মহাদেবপুর পালাটিয়া দল (বীরগঞ্জ), দোহচি পালাটিয়া দল (কাহারোল), কৈকুরী পালাটিয়া দল (বীরগঞ্জ), টেগরা পালাটিয়া দল (কাহারোল)।

www.pathagar.com

সঙ্গীত পরিচিতি

সন্টু দাস

১. **'ভাওয়াইয়া'** 'ভাব' বা 'ভাওয়া' (নিচু জমি) শব্দ হতে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি। নিচু অঞ্চল গরু মহিষের চারণ ক্ষেত্র থেকে মৈষাল বা বাউদিয়ার কণ্ঠ হতে বেয়ে আসা ভাবের গানের নামই হচ্ছে ভাওয়াইয়া। প্রেম, বিরহ এবং নারীমনের অপ্রাপ্তিজনিত ভাব এই গানে প্রতিফলিত হয়। এর রয়েছে দীর্ঘ এবং উঁচু নিচু টান। এগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র দোতরা।

২. **চটকা, খেমটা, ক্ষিরল:** ভাওয়াইয়া গানেরই ভিন্ন আঙ্গিক চটকা ও ক্ষিরল। সাধারণত প্রেম-বিষয়ক হালকা, চটুল ও আদিরসাত্মক গীতি সমাজের প্রতি কটাক্ষ ও শ্লেষের ভাবটিও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। সমাজের করুণ ছবি ও মর্মবেদনার চিত্রও প্রতিফলিত হয় এর মধ্যে।

৩. **কীর্তন:** দেবতার উদ্দেশে যে কোনো ভক্তিমূলক গানকে কীর্তন বলা হলেও মূলত রাধাকৃষ্ণ লীলা-সংক্রান্ত পদগুলিকেই কীর্তন নামে আখ্যায়িত করা হয়। কীর্তন দু প্রকার- ক) নাম কীর্তন খ) পালা কীর্তন। নাম কীর্তনে কেবল রাধাকৃষ্ণের নাম গীত এবং পালাকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের লীলার বিভিন্ন পর্যায় গীত হয়। যেমন রূপ, রাস, মাথুর, মানভঞ্জন ইত্যাদি। কীর্তনের গায়ন পদ্ধতি-নৃত্য ও গীত। বাদ্যযন্ত্র, হারমোনিয়াম, খোল, মৃদঙ্গ, করতাল বা জুরি। কপালে চন্দনের বড় তিলক এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কীর্তন এ জেলার প্রধানতম সঙ্গীত।

৪. **পাঁচালী:** পাঁচটি শৈলীর মিশ্রণে পরিবেশিত হয় পাঁচালী। শৈলীগুলো হচ্ছে সঙ্গীত, বাদ্য, ছড়া, নৃত্য ও গানের লড়াই। বিশেষ ভঙ্গিতে পায়চারী করে গাওয়া হয় বলে এর নাম পাঁচালী বলে কেউ কেউ মনে করেন। এক ধরনের আখ্যায়িকা প্রধান গান।

৫. **হেরোয়া/মেয়েলী গীত/বিয়ের গান:** ছেলে বা মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বর বা কনের বাড়িতে একদল গ্রামীণ বয়স্ক মহিলা কখনো একত্রে দাঁড়িয়ে কোমর দুলিয়ে, কখনো বসে হেরোয়া বা বিয়ের গান পরিবেশন করে। গীতের বিষয়বস্তু বর বা কনের নিজের পক্ষের আত্মীয়দের গুণগান গাওয়া এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা রটনা বা গালিগালাজ করা। কনের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষেও ঐ স্থানে হেরোয়া পরিবেশিত হয়। হেরোয়ায়, বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

৬. **মহরমের জারি, ফাতেমার জারি, জঙ্গের গান, মর্সিয়া:** মহররমের বিষাদময় ঘটনার স্মরণে এই সব গান পরিবেশিত হয়। মহররমের জারি পুরুষরা দলবদ্ধভাবে গায়। মর্সিয়া ও জঙ্গির গান একক সঙ্গীত। ফাতেমার জারি মহিলারা সুর করে গায়। কোনো গানেই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

৭. **দেহতত্ত্বের গানে** দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে ধর্মীয় তত্ত্ব আরোপের মাধ্যমে একতারা ও খোল সহযোগে গীত হয়।

www.pathagar.com

৮. **'গুরুসঙ্গীত'** গুরু বা দীক্ষাদাতার প্রশংসা কীর্তন করে গীত হয়। বাদ্যযন্ত্র একতারা। গুরু সঙ্গীতকে বাউল গানও বলা হয়।

৯. **'তুকখা' বা 'মনশিক্ষা'** ধর্মীয় উপদেশমূলক গান। বৈরাগিণীরা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে একতারা সহযোগে এ ধরনের গীত পরিবেশন করে।

১০. **'ধর্মপূজার গান'** ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ও তার কল্পিত মূর্তিতে অর্ঘ্য নিবেদন করে পরিবেশিত হয়। বাদ্যযন্ত্র দোতরা ও ঢোল।

১১. **'মারেফতি'** এক ধরনের ধর্মীয় সঙ্গীত এ গানে মনকে পাখি ও বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে ঈশ্বর আরাধনার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়। গায়ক শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং গেরুয়া বা লাল আলখাল্লা পরিহিত থাকে। মাথায় থাকে পাগড়ি বা লাল কাপড় প্যাঁচানো। বাদ্যযন্ত্র একতারা।

১২. **'মেঘার গান':** এটি উর্বরতাসূচক বৃষ্টি আবাহনমূলক সঙ্গীত। মেঘকে আহবান করে গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে একদল নারী কূলো, ঘট এবং পূজার সামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় দলীয়ভাবে এই গান পরিবেশন করে।

১৩. **'মাগনের গান':** শিবের গাজন এবং অন্য দেবতার পূজা উপলক্ষে একদল নারী বা তরুণ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে নৃত্য পরিবেশন করে এই গান গায়। গায়ক-গায়িকার দল চাল-ডাল চেয়ে নেয় বলে এর নাম 'মাগন'।

১৪. **গাজীর গান:** বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের প্রত্যাশায় গাজীপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এই ধরনের গান পরিবেশিত হয়। বাদ্যযন্ত্র খোল, করতাল।

১৫. **মানিকপীরের গান:** কৃষকের গরুবাছুর সুরক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যাধি থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় মানিক পীরের অলৌকিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে এই সঙ্গীত গীত হয়।

১৬. **যুগীর গান:** যুগী হচ্ছে এক শ্রেণীর সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। তারা ন্যাড়া মাথা এবং সাদা ধুতি গায়ে একতারা বাজিয়ে ধর্মীয় গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

১৭. **মাদারের গান:** মাদার গাছকে মাদার পীর কল্পনা করে পীরের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আখ্যানমূলক এই গান একতারা খোল করতাল সহযোগে পরিবেশিত হয়।

১৮. **সোনারায়ের গান:** গবাদি পশু ও বাঘের অধিপতি সোনারায় বা সোনা পীরের নামে পরিবেশিত সঙ্গীত।

১৯. **গোরক্ষনাথের গান:** এ গানও গবাদি পশুর অধিপতি গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্য বর্ণনাকেন্দ্রিক।

২০. **'শীতলা পূজা ও দুর্গাপূজার গান':** এই গানগুলো সংশ্লিষ্ট দেবীর পূজা উপলক্ষে তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে পরিবেশিত হয়। বাদ্যযন্ত্র ঢোল, করতাল, খঞ্জনি।

আদিবাসী শিল্পী মারিয়া সরেন

www.pathagar.com

২১. **নটুয়া সঙ্গীত:** দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সঙ্গীত। লোকনাট্যের আঙ্গিকে একটি উঁচু স্থানে বা মঞ্চে এ গান পরিবেশিত হয়। শ্রোতাদের মাঝখানে থাকে গায়েন। তার সাথে থাকে বাপতিয়া বা জোকার, দোহার এবং ছোকরা। গান পরিবেশিত হয় মঞ্চের চারদিকে ঘুরে ঘুরে। বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ এবং এক জোড়া করতাল। সঙ্গীত পরিবেশনবীদের পোশাক সাদা ধুতি ও গেঞ্জি। গানের বিষয় রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা। নটুয়া গানকে 'খন' বা 'নিশা' নামেও অভিহিত করা হয়।

২২. **'হুদমা দেও-এর গান':** বৃষ্টির অধিপতি হুদমা-দেওয়ের উদ্দেশে একদল বয়স্ক নারী বৃষ্টি আহবানের জন্য রাতের বেলা নির্জন স্থানে গিয়ে নগ্ন অবস্থায় হুদমা দেওকে উদ্দেশ্য করে এধরনের গান গায়। গানের কথায় থাকে প্রচুর আদিরস।

ভূপতি নারায়ণ রায়

২৩. **'লক্ষীর গান':** লক্ষী পূজার সময় পুরুষ্টু ধান ক্ষেতে গিয়ে কৃষকেরা লক্ষীর উদ্দেশ্য ছড়া জাতীয় গান গায়।

২৪. **'সত্যপীরের গান':** সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে মনোবাসনা পূরণের উদ্দেশে এই গান একক বা দলীয়ভাবে পরিবেশিত হয়। বাদ্যযন্ত্র দোতরা ও করতাল।

২৫. **'হালুয়া-হালুয়ানীর গান':** হাস্যরসাত্মক অভিনয় প্রধান ও কাহিনীনির্ভর গান। কৃষিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা, প্রেম, রসিকতা, সামাজিক কাহিনী ইত্যাদি বর্ণিত হয়। দলীয় সঙ্গীত মঞ্চনির্ভর। বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম, ঢোল, খঞ্জনি।

২৬. **'তিস্তাবুড়ি, ভেদাই ও মেচেনী খেলার গান':** নদীর বিপদ থেকে রক্ষা ও বৃষ্টি আহ্বানমূলক এবং শিব প্রশস্তি কেন্দ্রিক গান। নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই।

২৭. **'মনসার ভাসান':** চাঁদ সদাগর ও মনসা দেবীর মধ্যে সংঘাত কেন্দ্রিক কাহিনীনির্ভর পালাগান। ১০ থেকে ১৫ জন গায়েন অংশগ্রহণ করে। ঢোল, কাঁসর, জুরি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ছোকরার নাচ অতিরিক্ত আকর্ষণ। মনসা পূজার সময় এ গান পরিবেশিত হয়।

২৮. **'চোর চুন্নির গান':** পালা জাতীয় হালকা ব্যঙ্গ রসাত্মক কাহিনীনির্ভর সঙ্গীত। নাট্যরসসম্পন্ন।

২৯. **'বন্ধুআলা, বন্ধুপাঁচালী':** নরনারীর মান-অভিমান, প্রেম বিরহ, সামাজিক অসঙ্গতি ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গায়েনের অংশগ্রহণে এ গান পরিবেশিত হয়। শীতকালের রাত্রিবেলা ঢোল করতাল ইত্যাদি সহযোগে গীত হয়।

৩০. **সোরি গান:** কৃষিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও কাহিনীগল্প আকারে দলীয়ভাবে রাত্রিবেলা পরিবেশিত হয়। নারীবেশী পুরুষ গায়েন ও ছোকরা এ গানের মূল আকর্ষণ। বাদ্যযন্ত্র ঢোল ও মৃদঙ্গ। নারী চরিত্রের শেষে 'সোরি' যুক্ত হওয়ার কারণে এ গানের এই নামকরণ। যেমন: শীতলসোরি, অম্বলসোরি।

www.pathagar.com

৩১. **চরকের গান:** চড়ক পূজা উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে পরিবেশিত সঙ্গীত। এটি মাগনের গানও বটে।

৩২. **'ডাক গান':** লক্ষ্মী পূজার সময় সুপুষ্ট ধানের ক্ষেতে গিয়ে এক ধরনের ছড়া জাতীয় ছন্দ উচ্চারণ করে গীত সঙ্গীত। লক্ষ্মীর গানের অনুরূপ।

৩৩. **'মাড়োয়ার গীত':** বর ও কনেকে বসার জন্য মঞ্চ তৈরি করে চারদিকে কলাগাছ পুতে আসন প্রস্তুত করা হয়। এর নাম 'মাড়োয়া'। মাড়োয়ার চারদিকে বসে পল্লী রমণীরা যে গীত পরিবেশন করে, তাই মাড়োয়ার গীত।

৩৪. **'মনসা মঙ্গলের গান':** বৈশাখ মাস জুড়ে এ গান পরিবেশিত হয়। বাড়ির অঙ্গনে দুটি খুঁটির মাঝখানে একটি ঘট ঝুলিয়ে নিচে রোপিত তুলসী গাছে পানি সেচনের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ তুলসী গাছকে ঘিরে খোল করতাল সহ নাম-কীর্তন করে দর্শনার্থীরা।

৩৫. **'বাউল ও মরমীয়া সঙ্গীত':** লালন গীতির ভাবানুসারী গান। এ গানের গায়কেরা সংসার ত্যাগী নয়। মরমীয়া গানে একেশ্বরবাদী ধারণা প্রতিফলিত হয়। একতারা, খোল, জুরি, ও মৃদঙ্গ সহযোগে এ গান পরিবেশিত হয়।

তলিকাভুক্ত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি স্থল:

	লোকসঙ্গীত	উৎপত্তি স্থল	**পরবর্তী বিস্তৃতি স্থল**
১.	ভাওয়াইয়া, চটকা, ক্ষিরল, খেমটা মাহুত বন্ধুরগান	কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও রংপুরের উত্তরাঞ্চল	পঞ্চগড় অঞ্চল, ঠাকুরগাঁয়ের পূর্বাঞ্চল, দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চল
২.	কীর্তন কৃষ্ণলীলা	দিনাজপুর জেলার মধ্য-দক্ষিণাঞ্চল	ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ের পূর্বাঞ্চল
৩.	মহররম সম্পৃক্ত সঙ্গীত সমূহ	ঠাকুরগাঁও ও আটোয়ারী থানা	সমগ্র জেলা
৪.	মারেফতি, মুর্শিদি, তুকখা গুরুসঙ্গীত, দেহতত্ত্ব, বাউল ও মরমিয়া	দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল ও ঠাকুরগায়ের মধ্যাঞ্চল	সমগ্র জেলা
৫.	হেরোয়া	পঞ্চগড় থানা	তেঁতুলিয়া, বোদা দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী থানা
৬.	মেয়েলী গীত, বিয়ের গান	---	সমগ্র জেলা
৭.	ধর্মপূজার গান, মনসার ভাসান, মেঘারগান, হুদমা দেও-এর গান, মেচেনী ও ভেদাইখেলার গান, হালুয়া-হালুয়ানীর গান, নটুয়া গান, ডাক গান, চড়কের গান, তিস্তা বুড়ির গান, সোরি গান, বন্ধুপাঁচালি, চোরচুন্নির গান, মনসামঙ্গলের গান	জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চল	পঞ্চগড় অঞ্চল। জেলার অন্যত্র সামান্য পরিমাণে লক্ষণীয়
৮.	সত্যপীরের গান	---	সমগ্র জেলা
৯.	মানিকপীর, গাজীপীর, সোনারায়, গোরক্ষনাথ, মানিকচন্দ্রের গান।	রংপুর অঞ্চল	পঞ্চগড় অঞ্চল

লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা (একক)

মোঃ আনছার আলী, পঞ্চগড়, ভাওয়াইয়া
মোঃ ইউসুফ আলী (বাবু), পঞ্চগড়, ভাওয়াইয়া ও পল্লীগীতি
পৌষমোহন বসাক, পঞ্চগড়, লোকসঙ্গীত, বাউল
রমেশচন্দ্র রায়, ঠাকুরগাঁও, মরমীয়া ও সত্যপীরের গান
যশোদা রানী, দিনাজপুর, কীর্তন
নিতাই সরকার, দিনাজপুর, কবি গান
গনেশ্বর বর্মন, ঠাকুরগাঁও, মনসার ভাসান

www.pathagar.com

লোকবাউল সম্প্রদায়ের দলীয় গান

সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকা

বরুন দাস (কীর্তন), দিনাজপুর। **প্রহল্লাদ চন্দ্র বর্মন,** পঞ্চগড় (ভাওয়াইয়া ও লোকসঙ্গীত)। **বেবী,** পঞ্চগড় (ভাওয়াইয়া ও লোকসঙ্গীত)। **শরিফা রানী,** ঠাকুরগাঁও (মেয়েলীগীত) **অনিমেষ চন্দ্র রায়,** দিনাজপুর (ভাওয়াইয়া)। **নন্দিনী রায়,** দিনাজপুর, (ভাওয়াইয়া)। **সমরেশ রায়,** দিনাজপুর (কীর্তন)। **দুলাল চন্দ্র,** দিনাজপুর (লোকসঙ্গীত)। **মিতা রায়,** দিনাজপুর (লাকসঙ্গীত)। **লক্ষীকান্তরায়,** দিনাজপুর (লাকসঙ্গীত)।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের তালিকা

'লোকবাউল সম্প্রদায়', দিনাজপুর। মহাদেবপুর পালাটিয়া দল দিনাজপুর। দোহচি পালাটিয়া দল, দিনাজপুর। নিশ্চিন্তপুর লোকসঙ্গীত দল, ঠাকুরগাঁও। কাজলদিঘি পল্লীসঙ্গীত সংঘ, পঞ্চগড়, ময়দানদিঘি সাংস্কৃতিক দল, পঞ্চগড়, **গাংচিল** সাস্কৃতিক সংগঠন, দিনাজপুর। সাগরদাস ও তারদল (কীর্তন), দিনাজপুর।

দলীয় সঙ্গীতের তালিকা

ক. কীর্তন খ. পাঁচালী গ. হেরোয়া বা মেয়লী গীত ঘ. মহররমের জারি ঙ. ধর্মপূজার গান চ. মনসার ভাসান ছ. মেঘার গান জ. হুদমাদেও-এর গান ঝ. মেচেনী ও ভেদাই খেলার গান ঞ. কৃষ্ণলীলার গান ট. মাগনের গান ঠ. মাদারের গান ড. মাড়োয়ার গীত ঢ. হালুয়া- হালুয়ানির গান ন. চড়কের গান ত. নটুয়া গান থ. তিস্তাবুড়ির গান দ. সোরি গান ধ. বন্ধু পাঁচালী ন. চোরচুন্নির গান প. মনসামঙ্গলের গান।

একক সঙ্গীতের তালিকা

ক. ভাওয়াইয়া খ. দেহতত্ত্বের গান গ. মারেফতি, মুর্শিদি ঘ. ফাতেমার জারি ঙ. গুরুসঙ্গীত চ. তুকখা ছ. খেমটা জ. যুগীর গান ঝ. মানিকপীর, গাজীপীর, সত্যপীর, সোনা রায়, গোরক্ষ নাথ এর গান ঞ. মাহুত বন্ধুর গান ট. ডাকগান ঠ. দুর্গা ও শীতলা পূজার গান ড. জঙ্গের গান ঢ. মানিকচন্দ্রের গান ন. বাউল সঙ্গীত ত. মরমীয়া।

লোকবাদ্যযন্ত্রের তালিকা

একতারা, দোতরা, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, কাঁসি, গোপীযন্ত্র, খমক, খঞ্জনী, ঘুঙুর, নূপুর, সারিন্দা, বাঁয়া, তবলা, বাঁয়ার, ডুগডুগী, ঘন্টা, করতাল, খোল, মৃদঙ্গ, বাঁঝর, মন্দিরা, বাঁশি, পাতার বাঁশি, মুখা বাঁশি, মাদল, গুবগুবি, ঝুমুর, কাড়া, আড় বাঁশি, টেমটেমি, ভেঁপু।

www.pathagar.com

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

ক. ভাওয়াইয়া খ. কীর্তন গ. পাঁচালী ঘ. মনসার ভাসান ঙ. কৃষ্ণলীলার গান চ. সোরি গান ছ. পালা গান জ. কবি গান।

৮. বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬)

লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এবং পরিবেশনার নিরিখে এক একটি সঙ্গীতের মূল্যমান সাধারণভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও এর বার্ষিক প্রাপ্য মূল্য অবিশ্বাস্য রকম উল্লেখযোগ্য। ২০০৬ সালের বাজার মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দিনাজপুর জেলায় কয়েকটি লোকসঙ্গীতের শিল্পীরা নিম্নবর্ণিত হারে সম্মানী বা পারিশ্রমিক পেয়েছেন।

ভাওয়াইয়া: ৫০জন শিল্পী ২০০ টাকা হারে ১০০টি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে পেয়েছেন = ১০ লক্ষ টাকা। পালাটিয়া বা পালা গানের প্রতিটি দল এক রাতে ৩০০০ টাকা হারে সম্মানী পেলে ৫০টি দল ৫০টি অনুষ্ঠান করে সম্মানী পেয়েছেন ৭৫ লক্ষ টাকা। ২০টি কবি গানের দল ১০০০ টাকা প্রতিরাতে গ্রহণ করে ৩০টি অনুষ্ঠান করে সম্মানী পেয়েছেন ৬ লক্ষ টাকা। অনুরূপভাবে, পাঁচালী-২ লক্ষ টাকা, মনসার ভাসান ১ লক্ষ টাকা, কৃষ্ণলীলা-১ লক্ষ টাকা এবং সোরি গান ৫০,০০০ টাকা হিসেবে এ জেলায় ২০০৬ সালে লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মোট মূল্যমান ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

ক. মেয়েলী গীত খ. ফাতেমার জারি গ. তুক্‌খা ঘ. খেমটা ঙ. ধর্মপূজার গান চ. যুগীর গান ছ. মেচেনী ও ভেদাই খেলার গান জ. সোরি গান ঝ. বাউলসঙ্গীত ঞ. মরমীয়া ট. তিস্তাবুড়ির গান।

৯. লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা

ক. গুরুসঙ্গীত খ. মেঘার গান গ. মাহুত বন্ধুর গান ঘ. মাগনের গান ঙ. ডাক গান চ. হালুয়া- হালুয়ানির গান ছ. চোর চুন্নির গান জ. বন্ধু পাঁচালী ঝ. মানিকচন্দ্রের গান ঞ. মনসা মঙ্গলের গান ট. হুদমাদেও-এর গান।

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিকানা

লোকসঙ্গীতের স্রষ্টারা আপন মেধা ও সৃষ্টিশীলতা দ্বারা যে সঙ্গীত রচনা করেন তার আর্থিক মূল্যমান বা স্বত্ব তাদের কাছে সংরক্ষিত থাকে না। ফলে স্রষ্টা হিসেবে তাদের প্রাপ্য থেকে তারা হন বঞ্চিত। ভাওয়াইয়া, কীর্তন, মনসার ভাসন, কৃষ্ণলীলা, পাঁচালী, সোরী গান-এর রচয়িতারা সঙ্গীতগুলো রচনা করলেও সেসব পরিবেশন করেন অন্য শিল্পীরা। বলাবাহুল্য, পরিবেশনকারী শিল্পীরাই গ্রহণ করেন সম্মানী। এর স্বত্ব রচয়িতারা পান না। তবে কবি গান ও পালা গানের রচয়িতারা এককালীন আংশিক সম্মানী পেয়ে থাকেন। এর পর প্রতি পরিবেশনের অর্থ গ্রহণ করেন ম্যানেজার বা সরকার। সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা অনির্দিষ্ট অর্থ পেয়ে থাকেন।

সুপারিশমালা

ক. লোকসঙ্গীত সংগ্রহ প্রসঙ্গে: বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসঙ্গীত সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে যে বিস্তৃত অনুসন্ধান প্রয়োজন, বাস্তবে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। সে কারণে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তৃণমূল পর্যায়ে উপযুক্ত গবেষক প্রেরণ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লোকসঙ্গীত বা লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ করে আনতে হবে। মাঠ পর্যায়ে নিবিড় অনুসন্ধানের কোনো বিকল্প নেই।

খ. সংরক্ষণ সম্পর্কিত: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত লোকসঙ্গীতের ধারণকৃত বা লিপিবদ্ধ উপকরণসমূহ যথাযথভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণার উপযোগী করে তোলা আবশ্যক। বিশেষত, লোকসঙ্গীত বা লোকসংস্কৃতির মূল্যমান নির্ণয় ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. উপস্থাপন সম্পর্কিত: স্থানীয়, থানা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পযায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রেণীভিত্তিক লোকসঙ্গীত সর্ব সাধারণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতিকে

www.pathagar.com

নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে ব্যাপকভাবে। বার্ষিক, আঞ্চলিক ও জাতীয়ভিত্তিতে লোকসঙ্গীতের পরিবেশনা ও উপস্থাপনার আয়োজন করা একান্ত আবশ্যক। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে লোকসঙ্গীত, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ. মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীতের 'মেধাস্বত্ব' বিষয়টি আমাদের দেশে পরিচিত নয়। লোকসঙ্গীতেরও মূল্যমান আছে, এমনকি লোকসঙ্গীত রচরিতার মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা জাতীয় নীতিমালার মধ্যে পড়ে এধরনের চিন্তা এদেশে নতুন, যদিও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি আর অবহেলিত নয়। হয়তো এমনও দেখা যাবে যে, দিনাজপুর জেলার 'কীর্তন গানের' স্বত্ব সংরক্ষণ করছে ভারত। অথবা 'ভাওয়াইয়া' গানেরও অর্থমূল্য নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতির প্রতিটি বিষয়ের স্রষ্টাদের উপযুক্ত মূল্য প্রদান এবং তাদের মেধার স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের অনুসরণে বাংলাদেশেও আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, লোকসংস্কৃতির স্রষ্টাদের মেধাকে কোনো ক্রমেই বঞ্চনার শিকার হতে দেয়া যায় না।

উপসংহার: দিনাজপুর জেলার লোকসঙ্গীতে রয়েছে বিপুল বৈচিত্র্য। সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলোই অবহেলার শিকার। কোনো কোনোটি বিপন্ন, কোনটি অবলুপ্ত। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ জেলায় প্রাপ্ত সব ধরনের লোকসঙ্গীতই আমাদের ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচিতির জন্য উল্লেখযোগ্য। সতরাং এসব লোকসঙ্গীতকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা অতি জরুরি। পাশাপাশি, লোকসঙ্গীতের প্রাণ এদের স্রষ্টা ও শিল্পীদের মূল্যায়ন করে লোকসঙ্গীতের মূল্যমান নির্ণয় ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক লোকসঙ্গীতগুলোকে সমন্বয় করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচারের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করা যায়।

তথ্য সূত্র

জেলা গেজেটীয়ার দিনাজপুর, ১৯৯১
নাজমুল হক, উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা
বিভিন্ন সাক্ষাৎকার।

www.pathagar.com

৭.২ রঙ্গপুরের (রংপুরের) লোকসঙ্গীত

মোতাহার হোসেন সুফী

ভূমিকা: ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভূখণ্ড রঙ্গপুর। রঙ্গপুর প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে পাঁচ জেলায়- রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বিভক্ত। রঙ্গপুরের ইতিহাসের উৎস যেমন প্রাচীন, সাহিত্যচর্চার উৎসও তেমনি প্রাচীন। রঙ্গপুরের আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতে চর্যাপদে ব্যবহৃত বহুশব্দের প্রয়োগ প্রমাণিত হওয়ায় রঙ্গপুরের সাহিত্যচর্চার ইতিহাসের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণিত। লোকসঙ্গীতের সম্পদে সমৃদ্ধ রঙ্গপুর। লোকসঙ্গীত সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রবেশ না করে সহজ কথায় ও সহজভাবে বলা যায়, লোকসঙ্গীত লোকমুখে প্রচলিত লোক সাধারণের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্গীত। রঙ্গপুরের গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রচয়িতা কে বা কারা কালের ব্যবধানে আজ তা সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি)

একদা রঙ্গপুরের গ্রামে, জনপদে ধামালী, মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচাঁদের গান, সত্যপীর ও মানিক পীরের গান, গাজীর গান, গাজনের গান, গোয়ালীর ছড়াগান, মনসার ভাসান গান, কুষান গান, যুগীর গান, সিদ্ধাহাড়ির গান, মালসী গান, মইরচা গান, শাড়ি বানানী গান প্রভৃতি ব্যপকভাবে প্রচলিত ছিল। পল্লীতে পল্লীতে যেসব পালাগান প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমীর সাধুর গান, রহিম সাধুর গান, চাম্পাবতী কন্যার পালাগান, মোনাই যাত্রা প্রভৃতি। জনপ্রিয় প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের কথা। এছাড়াও প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে মইষাল গান, চটকা গান, মেয়েলী গান, রাখালিয়া গান, বৈষ্টম বাউদিয়ার গান, বিরহ গান, দোতারার গান প্রভৃতি।

শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, ভারতীয় উপমহাদেশীয় সাহিত্যের মধ্যে চর্যাগীতিকা সঙ্গীতের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাগীতিকার সমসাময়িক কালের রচনা নাথগীতিকা। নাথগীতিকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ "মানিকচন্দ্র রাজার গান" বা "গোপীচন্দ্রের গান"। স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন সংগ্রহ করেছেন "মানিকচন্দ্র রাজার গান" এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগ্রহ করেছেন "গোপীচন্দ্রের গান"। "মানিকচন্দ্র রাজার গান" বা "গোপীচন্দ্রের গান" রঙ্গপুরে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত থাকলেও গানের প্রথম সংগ্রাহক স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন লোকমুখে প্রচলিত এই গান লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে এশিয়াটিক সোসাটির জার্নালে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" নাম দিয়ে তা প্রকাশ করেন।

১. **মানিকচন্দ্র রাজার গান:** মানিকচন্দ্র রাজার গানে মুখ্যস্থান অধিকার করেছে রাজা মানিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের তরুণ বয়সে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনের করুণ ও বিষাদাত্মক কাহিনী। তরুণ বয়সে রাজকুমার গোপীচাঁদ সন্নাসগ্রহণে উদ্যত হলে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী কাতর অনুনয় করে নিষেধ করে এভাবে:

যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে।
তখন কেনে ধর্ম্মিন রাজা না গেলেন সন্নাসি হইয়ে।
এখন হইনু রূপের নারী তোরে যোগ্যমান।
মোক ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরান।

২. **গোপীচন্দ্রের গান:** যোগী বা জুগী জাতীয় গায়কদের মুখ থেকে শোনা গান লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। লৌহ, বংশখণ্ড ও অলাবু দ্বারা প্রস্তুত গোপীযন্ত্রের সাহায্যে আসরে কিংবা ভিক্ষার সময়ে পরিবেশন করা হতো এই গান। তরুণ বয়সে রাজকুমার গোপীচাঁদের সন্ন্যাস গমনকালে রানী অদুনার কাতর ক্রন্দন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী-

www.pathagar.com

কান্দে রদুনা রানী ধরিয়া রাজার পাও।
এহেন বয়সের বেলা ছাড়িয়া না যাও।।
ছাড়িয়া না যাইও রাজা দূর দেশান্তর
কার জন্যে বান্ধিলেন শয়ন মন্দির ঘর।।

রঙ্গপুরের নাথযুগী সম্প্রাদায়ের মধ্যে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" বা "গোপীচন্দ্রের গান" ছাড়াও "গোরক্ষবিজয় গান" "মীনচেতন" "ময়নামতীর গান" প্রচলিত ছিল। এগুলি "যুগীযাত্রা" নামে পরিচিত।

৩. **সিদ্ধাহাড়ির গান**: নাথ ঐতিহ্যানুসারে চর্যাগীতিকার কানুপা নাথগুরু হাড়িপা। তিনি বাংলার রাজা গোপীচাঁদের সমসাময়িক ছিলেন। রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে একদা "সিদ্ধাহাড়ির গান" নামে কানুপা হাড়িপা-গোপীচাঁদের কাহিনী গীত হতো। এই গানের রচয়িতার নাম আবদুল জব্বার। খুব সম্ভবত তিনি রংপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। "সিদ্ধাহাড়ির গান" রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার কোনো গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধৃত হয়।

৪. **রহিম সাধুর গান**: রঙ্গপুরের পল্লী অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিবেশিত হতো "রহিম সাধুর গান"। বর্তমানে এই গানের অস্তিত্ব আছে কিনা জানা নেই।

৫। **গোয়ালীর ছড়াগান**: বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলেও নাথ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার অস্তিত্ব ছিল। নাথ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত "গোয়ালীর ছড়াগানের" সন্ধান পাওয়া গেছে। "গোয়ালীর ছড়াগান" গোরক্ষনাথের ছড়া নামেও পরিচিত। গোয়ালীর ছড়াগানের অংশবিশেষ এরূপ:

পদ্মা ফুলের গানরে মোর
শতো ডিংগা চলে
এ্যাক কুড়ি ফল পাড়ি
কোড়ায় ডাক ছাড়ে।

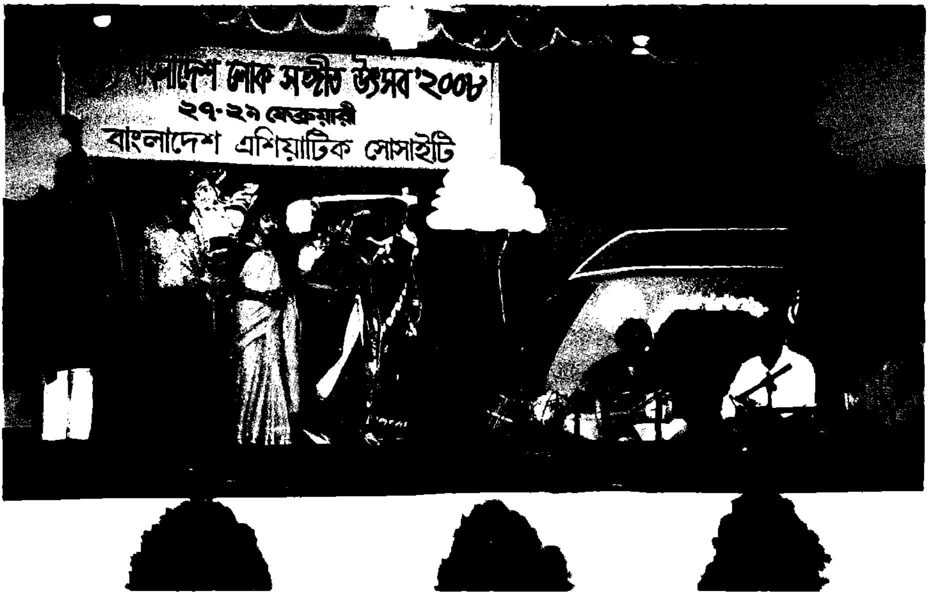

বৃহত্তর রংপুরের কুড়িগ্রামস্থ ভাওয়াইয়া একাডেমীর লোকসঙ্গীত

www.pathagar.com

৬. **গোরক্ষনাথের গান:** রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে জাগগান, ময়নামতীর গানের ন্যায় প্রচলন ছিল গোরক্ষনাথের গান। গোরক্ষনাথের গানের "জন্মখণ্ড" অংশে অনবদ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে নাথ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথের জন্মবৃত্তান্ত। গোরক্ষনাথের গানের জন্মখণ্ড প্রথমাংশ এরূপ-

ঘেচু কার চিলি মিলি কোকিল করে যাও।
শ্বেত কাগা ডাকিয়া বলে রজনী পোয়ায়।
প্রভাত হইল নিশি অতিশয় বিয়ান।
পূর্ব দুয়ারী বাড়ীখানি দিলে ছড়ছান।

৭. **জাগের গান:** আদি মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রচনা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণর প্রেমলীলার গান। রাধাকৃষ্ণের মানবিক প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকে রঙ্গপুরে প্রচলিত ছিল। কানাই ধামালী জাগের গানের অংশবিশেষ।

ঝম্প দিয়া পড়ি মিশে সেই কালা জলে
রতিরাম দাস রাস গায় কুতুহলে
কামাই ধামালী পালা এতদূরে সারা
বৈষ্ণবেতে গাও হরি শক্তে গাও তারা।।

৮. **সোনাপীরের গান:** আবিষ্কৃত জাগের গানের অধিকাংশে "সোনারায়" বা সোনাপীর নামক একজন মুসলমান পীরের মাহাত্ম্যকীর্তন প্রাধান্য লাভ করেছে। সোনাপীরের জন্মবৃত্তান্ত গান এরূপ:

পীরের বরে জন্ম হৈল পুন্ন মাসীর চান।
বাপে মায়ে রাখলো তার সোনারায় নাম।।
সোনা রায় নাম রাখলো সোনার বরণ।
জোড়া মানিক্য দিয়া গড়িয়াছে নয়ন।।

৯. **বারমাসী গান:** মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ মঙ্গলকাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী মঙ্গলকাব্যের অপরাপর কাহিনীর ন্যায় আসরে গীত হতো। "চণ্ডীমন্ডল" কাব্যে ব্যাধ কালকেতুর পত্নী ফুল্লরার বারমাসীর উল্লেখ আছে। ফুল্লরার বারমাসীর অনুসরণে পরবর্তীকালে বছরের বার মাসে পতি বিরহিনী নারীর বিরহ ব্যথাকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বারমাসী গান। সংগৃহীত প্রথম বারমাসী গানের প্রথমাংশ নিম্নরূপ:

পোতাম বইশাক মাস নারীরো মনের আশা
পতির সাথে খেলমো অংগের খেলা।
হাট বাজার নাগলো পতি ভাংলো সাদের মেলা
এ হ্যান যৈবোন কালে থাকি যে এ্যাকেলা।

১০. **পালাগান:** রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত পালাগান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল সেগুলোর মধ্যে "মনসার ভাসান যাত্রা", "সত্যপীরের গান", "মোনাইযাত্রা" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রঙ্গপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জনপ্রিয় পালাগানগুলির অন্যতম "মোনাইযাত্রার" ব্যাপক প্রচলন ছিল। "মোনাইযাত্রা" পালাগানের প্রচলন প্রসঙ্গে দীনাদাস গীদাল গানের সুরে বিবৃত করেন:

তেলেঙ্গা শাহা আদি রচয়িতা
যত কিতাবেরও কতা কহি যওন করি
কতা সারি সারি।

১১. **মধুমালার গান:** রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে জাগগান, ময়নামতীর গান ও অনুরূপ অন্যান্য গানের ন্যায় কাহিনীভিত্তিক "মধুমালার গান" ও একদা বহুল প্রচলিত ছিল। "মধুমালার উপাখ্যান" রচয়িতার নাম কবি

www.pathagar.com

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ

সাকের মামুদ। কবি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচিতি দান প্রসঙ্গে বলেছেন:

রিকাইতপুর গ্রাম বসতি আমার
মুক্তিপুর নাম বটে শুন পরগণার
সরকার অশ্বাঘাট হিস্যায় নও আনী
রাজ রাজেশ্বর গৌরনাথ নৃপমণি।

১২. **সত্যপীরের পালাগান:** মধ্যযুগের আরেক উল্লেখযোগ্য সম্পদ "সত্যপীরের পালাগান"। ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চলতে থাকে মিলনসাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। এর ফলে শুরু হয় সত্যপীর সম্পর্কিত গানের পালা রচনা। মুসলমান সম্প্রদায়ের জাগ্রত পীর সত্যপীর হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা সত্যনারায়ণ। শঙ্কর আচার্যের সত্যপীরের পাঁচালীতে উল্লেখ আছে:

সত্যপীর বলি সবে শিরে দিবে হাত
নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত।

সত্যপীরের পালাগান রচনা করেছেন কবি কৃষ্ণহরিদাস। কবি ও গায়ক কৃষ্ণহরিদাস আত্মপরিচিতি দান করে বলেছেন:

তাহের মহম্মদের গুরু সমস্ নন্দন
তাহার সেবক হয় কৃষ্ণহরি গায়ন।
হবনারায়ণ দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি
মোছলমানে বলে আল্লা ভক্তে বলে হরি।

১৩. **বিষহরার গান:** রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে একদা "বিষহরার গান" প্রচলিত ছিল। সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে সমগ্র মধ্যযুগে রচিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্য। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের ন্যায় মনসামঙ্গলও আসরে গীত হতো। সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারকে উপলক্ষ করে রূপায়িত হয়েছে চাঁদ সদাগর-বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী "বিষহরার গানে"।

১৪. **সোনারায় ঠাকুরের গান:** ব্যাঘ্রের দেবতা সোনারায় ঠাকুর। বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে সোনারায়ের পূজা প্রচলিত ছিল। সোনারায় ঠাকুরের গানের প্রথমাংশ এরূপ:

বাঘে সব নাম লইয়ে ডাকরে
ও ঠাকুর সোনারায় বাঘ সব ডাকে
বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঠাকুর হরিনাম নিয়া
হরির নাম দিয়া ঠাকুর চলিয়ে পথে যায়।

১৫. **পালাগান:** রঙ্গপুরে প্রচলিত মাত্র কয়েকটি পালাগান বাংলা একাডেমী কর্তৃক "রংপুর গীতিকা" গ্রন্থে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সংকলিত পালাগান "কইন্যা আনোয়ারের কলি" "জসমত খাঁ" "কলিরাজা" "মানিকপাল রাজা" "জয়নুব বাদশা" "হলুদ বাদশা" "অওশান কইন্যা" "জেলকদ বাদশা" প্রভৃতি। এসব পালাগান গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

www.pathagar.com

ক. **কইন্যা আনোয়ারের কলি:** এই পালাগানটি রঙ্গপুরের হরিপুর ডাকঘরের এলাকাধীন কেল্লাবাড়ী গ্রামের মোহাম্মদ আছর উদ্দিনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই পালাগানের কাহিনী শুরু হয়েছে এভাবে:
[বাওয়া]

বইরাটো নগরে আচিল
শাহা এমরান নাম
আরে ওহে
ওরে আনোয়ারের কলি কইন্যা
পাগলো বানান!

খ. **জসমত খাঁ:** এই পালাগানটি রঙ্গপুরের শোভাগঞ্জ নিবাসী হরে মামুদের পুত্র আবদুল শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই পালাগানে সন্নিবেশিত "বন্দনার" প্রথমাংশ এরূপ:

আরে ও দেওয়ানী হে
আরে মাধোব
বনদি মওলাহক আল্লাজি
কোন শবদে দুনিয়া গড়ি
বেহেস্তে দোজোগ
কল্লেন জেন পরী হে।

গ. **কলিরাজা:** এই পালাগানটি রঙ্গপুরের হরিপুর ডাকঘর এলাকাধীন কেল্লাবাড়ী গ্রামে মরহুম হেদায়েতউল্লার পুত্র মোহাম্মদ আছরউদ্দিনের কাছ থেকে সংগৃহীত। এই পালাগানের কাহিনী শুরু হয়েছে এভাবে:

আহা আল্লা মাবুদ মওলা
আরে ওহে
পরোবদিকার
কাঁই বুজপ্যার পারে আল্লা
আরে ওহে
মহিমা তোমার

ঘ. **মানিকপাল রাজা:** এই পালাগানটি কুড়িগ্রামের কাশিমবাজার গ্রামনিবাসী মোশারফ গীদালের কাছ থেকে সংগৃহীত। এই পালাগানের কাহিনী শুরু হয়েছে এভাবে:

দিশা: কিছুই জানিনারে ভাই
শ্যাষে কি হবে।
বাওয়া উজানী নগোরোত আচিল
দ্যাকোরে
মানিকপাল আজা নাম।

ঙ. **জয়নুব বাদশা:** এই পালাগানটি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার বেলকা গ্রামের আজিমউদ্দিন শেখের পুত্র হেলালউদ্দিন শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই পালাগানের কাহিনীর শেষাংশ এরূপ:

ভূপতি ভূষণ বর্মণ

www.pathagar.com

দিশা: কইন্যা ছাড়িয়া যায়রে
মায়ের কোল করি খালি
হায়রে বেন্টি জামাইক বিদ্যায় বাশ্‌শা
দুই চউকোত বয়রে পানি।।

চ. **হলুদ বাদশা-** এই পালাগান কুড়িগ্রাম জেলার বজরা ডাকঘরের এলাকাধীন চবচরিতা গ্রামনিবাসী মোহাম্মদ রিয়াজুল হকের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই পালাগানের কাহিনী শুরু হয়েছে এভাবে:

হলুদ নামেতে বাশশা
বল্লব শওরে
নওবাহার নামে কইন্যা
আচে তার ঘরে।

ছ. **অওশন কইন্যা:** এই পালাগানটি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার বেলকা গ্রামের মরহুম অপরউদ্দিন শোখের পুত্র গফুর উদ্দিন শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই পালাগানের কাহিনী শুরু হয়েছে এভাবে:

বাওয়া অওশন নামোতে কইন্যা
পশ্চিম দ্যাশোতেরে
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)।
চাঁদ শুরুজের নাহান কইন্যা
দিনে আইতে জ্বলে রে
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)।

জ. **জেলকদ বাদশা:** এই পালাগানটি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার বেলকা গ্রামের আছিমউদ্দিনের পুত্র হেলালউদ্দিনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই পালাগানের কাহিনী শুরু হয়েছে এভাবে:

জেলকদ নামতে বাশশা
জাবেল শওরেরে
কোরানেতে হাফেজ বাশশা
কোরান গলার মালারে...

১৯. **মালসী গান:** রঙ্গপুরের গ্রাম গ্রামান্তরে মালসী নামে এক প্রকার চটুল গানের প্রচলন ছিল। দীর্ঘস্থায়ী পালাগান শুনে যখন শ্রোতাদের মনে একঘেঁয়েমী সৃষ্টি হতো সে সময় পালাগানের ছোকরা গায়ক এই চটুল মালসী গান গেয়ে আনন্দমুখর করে তুলতো পরিবেশকে:

চ্যাংড়া বন্ধুরে নউতোন গালোতে
মশায় কামড়াইচে।

২০. **রাখালিয়া গান:** রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে "রাখালিয়া গান" নামে একধরনের পল্লীগীতির প্রচলন ছিল। রাখাল যুবকের মনের বিচিত্র ভাব ব্যক্ত হয়েছে "রাখালিয়া গানে"। রাখালিয়া গান মূলত গোচারণের গান।

২১. **বেণাকুশার গান:** রঙ্গপুরের গ্রাম গ্রামান্তরে প্রচলিত ছিল "বেণাকুশার গান"। পল্লীর গায়কগণ নিজস্ব উদ্ভাবিত সঙ্গীতযন্ত্র "বেণাকুশার" সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন।

২২. **কুষান গান:** রঙ্গপুরের পল্লীর গায়কেরা রামায়ণের করুণ রসাত্মক কাহিনীর বিশেষ বিশেষ অংশ অবলম্বনে রচনা করতেন কাহিনীকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধবনের পালাগান। রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর পুত্রদ্বয় লব ও কুশকে কেন্দ্রকরে রচিত হয়েছিল কাহিনীকেন্দ্রিক পালাগান "কুষান গান"।

২৩. **মর্সিয়া গীতি:** রঙ্গপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে আবহমানকাল থেকে মর্সিয়াগীতি বা জারীগানের প্রচলন আছে। আসারে পরিবেশিত জারীগান "মহররমের জারী" নামে খ্যাত। রঙ্গপুর জেলার কোন কোন এলাকায় মহরমের জারী "কাশেম সখিনার পালা" পরিবেশিত হতো।

www.pathagar.com

২৪. **বৈষ্টম বাউদিয়ার গান:** একদা রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে "বৈষ্টম বাউদিয়ার গান" নামে ধর্ম সমস্যামূলক গান প্রচলিত ছিল। গানের উৎস প্রাচীন। ধর্ম সমস্যার সমাধানে বৈষ্ণব বলেন "সর্ব ধর্মের মূলতত্ত্ব এক"। যিনি গুরু তিনি হরি তিনিই আল্লাহ: এক ঈশ্বরই নানা বিভূতিতে প্রকাশ করে আপনাকে। একের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বৈষ্ণব বলেন-চারের প্রভাব সর্বত্র। "চারি বেদ, চারি কাল, চারি অবতার আর চারি গুরু"। এমনকি কুরআনের মধ্যে চারের কথা আছে।

নয়ন সরি কোরাণের মধ্যে লেখা আছে।
আখ, আতস, খাগ, রাই।।
আখেতে জন্মিল আল্লা আতসে জন্মিল যত দেবগণ।
খাকেতে জন্মিল খেতি তৃণগণ।।
বাড়তে জন্মিল যত বেরাদিগণ
এইরূপ আল্লা সৃষ্টি করিল ধারণ।।

২৫. **মেয়েলি সঙ্গীত:** রঙ্গপুর জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে মেয়েলি সঙ্গীতের প্রচলন আছে। মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ঘর বাঁধার স্বপ্ন, বধূজীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত ও প্রতিক্রিয়া এবং মেয়েদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয় মেয়েলি সঙ্গীত। ঘরে বিবাহযোগ্য বয়স্কা মেয়ে থাকলে পিতামাতার চোখে নিশ্চিন্ত ঘুম আসে কি করে? প্রতিবেশীর মনে জাগে প্রশ্ন:

তুই ঝুনানারী
বাবা দুলা আলিগো
ঝুনানারী
কই পড়ে তোর
বাবার চৌউখের পানিগে

২৬. **বৈষ্ণব গান:** রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চলে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীকে ও শ্রী চৈতন্যের শৈশবজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত করছে বৈষ্ণব গান। শিশু নিমাই-এর প্রতি মায়ের কাতর আহবান ধ্বনিত হয়েছে এই বৈষ্ণব গানে।

বাছা নিমাইরে
মাকে ছাড়িয়া বাছা না যাইস সন্ন্যাসে

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বৈষ্ণব গানে কৃষ্ণ বা কানাইকে সংসাররূপী ভবসমুদ্র পার হওয়ার কান্ডারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে-

ওঠ কানাইয়া রে, ক্যামন করিয়া হব দরিয়া পরে
আষাঢ় শাওন মাসে মধুরসে কানাই দেওয়া বর্ষেরে

২৭. **বাউল গান:** বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলা বাউল গানের উদ্ভবস্থল। উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলার ন্যায় রঙ্গপুরেও প্রভাব পড়েছে বাউল গানের। ভবনদী পার হওয়ার জন্য কাতর আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে রঙ্গপুরে প্রচলিত বাউল গানে:

সন্ধ্যারানী

www.pathagar.com

মানিক রায়

ও তুই পার করিয়া দে ঘাটের ঘাটিয়াল রে
ও ঘাটিয়াল পাঁওয়া ধরো তোরেরে।

২৮. **হাসির গান:** রঙ্গপুরের লোকসঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ হাসির গান। রঙ্গ তামাশা ও কৌতুক করে নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য আসরে পরিবেশন করা হতো হাসির গান। এই ধরনের একটি হাসির গানের অংশবিশেষ:

খাও মোর আই, আই মোর নাতো
কিদিয়া আন্দিম মুই
নিলজিয়া কচু শাগের পাতো।।

২৯. **শোকসঙ্গীত:** রঙ্গপুরের লোকসঙ্গীতের এক মূল্যবান সম্পদ শোকসঙ্গীত। প্রিয়জন স্বামীর মৃত্যুতে বিরহকাতরা বিধবা স্ত্রীর আর্তনাদ:

কিসের মোর কাপড়া
কিসের মোর চোপড়া
কিসের মোর ছাবন মাখা
স্বামী ধন মরিচে
সেন্দুর মোর উঠিচে
হাতের খসিয়া গেইচে শাঁখা।

৩০. **ঘুমপাড়ানী গান:** রঙ্গপুরের উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীত ঘুমপাড়ানী গান। এই গানের উৎস প্রাচীন। মাতা শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছেন এরূপ একটি ঘুমপাড়ানী গানের প্রথমাংশ:

তোর বাবায় নিন গেইচে ছাওয়া তুইও নিন যা।
নিন যা নিন যারে ছাওয়া তুইও নিন যা।

৩১. **আকিকার গান**: রঙ্গপুরের লোকসঙ্গীতের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ আকিকার গান। আকিকা উপলক্ষ্যে বাড়ীর অভ্যন্তরে সমবেত মহিলারা আকিকার গীত পরিবেশন করে থাকে। একটি আকিকা গানের প্রথমাংশ:

আরে ঝিলিকি উঠিল বোদালী ম্যাঘ বাহার
মুখত পড়িল ছটারে
সোনা যাদুধন হামাররে।

৩২. **ছড়াগান-** রঙ্গপুরের লোকসঙ্গীতের আরেক উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছড়াগান। শিশু মনকে ভুলিয়ে রাখা কিংবা শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য রচিত হয় ছড়াগান। একটি ছড়াগানের প্রথমাংশ:

আইসরে চেংড়ীগুলো
ফুল তুলবার যাই
ফুলের মালা গালাত দিয়া
বৌ আনবার যাই।।

৩৩. **আইরির গান:** রঙ্গপুরের আঞ্চলিক ভাষায় ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে "আইরির গান"। আইরি বা ব্যাধ কর্তৃক হরিণ শিকারের কাহিনী এবং ধর্ম ঠাকুরের পূজার স্থানে হরিণের মাংসদানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে "আইরির গান"। আইরির গান এর নিদর্শনের প্রথমাংশ:

www.pathagar.com

আইরিরে দেইস আইরি তুঞি
ধরমক খানিক থান

৩৪. **শাড়ী বানানী গান**- একদা কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল রঙ্গপুর। তাঁতে শাড়ী বোনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে "শাড়ী বানানী গান"। এই ধরনের একটি গানের প্রথমাংশ-

তাঁতী ভাই, শাড়ী খান বানেয়া দে
তাঁতী ভাই, শাড়ী খান বানেয়া দে মোক
কি ছন্দে বানামু শাড়ী তাকো শুনিয়া নে
তাঁতী ভাই, তাকো এনা কয়া দেঞো তোক।

৩৫. **দিশুয়াল ভাইয়ের গান:** রঙ্গপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের গানের মধ্যে "দিশুয়াল ভাইয়ের গান" প্রসিদ্ধ। দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য" দিশুয়াল ভাইয়ের গান"। এই ধরনের একটি গানের প্রথমাংশ:

দিশুয়াল ভাই দ্যাশের ময়াল
কতদূর
অন্তরের ভিতর থাকি
দ্যাশের কথা উঠি জাগিহে

৩৬. **মাছের বিয়ার গান:** রঙ্গপুরের নদীতীরবর্তী জনপদসমূহে বসতি ছিল জেলেদের। জেলেদের গলায় ছিল গান। এই ধরনের গান "মাছের বিয়ার গান"। কৌতুকরসে ভরপুর "মাছের বিয়ার গান" নিম্নরূপ:

মাছ মধ্যে ইলশা মাছ রাজা হেন জানে।
রুইমাছ কাতর হইল লোকের বা কানে
য়্যালেঙ্গা জ্যামারীর মাছ ইলিশার টলকরে।
বাউল মাছ কোতোয়াল হয়া সবাকে ডাকে আনে।।

৩৭. **ভাওয়াইয়া:** ভাওয়াইয়া শব্দটি ভাব (ভাও-ভাওয়া +ইয়া= ভাওয়া) শব্দ হতে উৎপন্ন। ভাবে বিভোর প্রাণের স্ব প্রকাশিত উচ্ছ্বাস বলে এই গান ভাওয়াইয়া নামে খ্যাত। ভাওয়াইয়া গানের অধিকাংশ পূর্বরাগ নিয়ে রচিত। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতের প্রাচীনতম নিদর্শন:

পর্থম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া
আর কতকাল রহিম ঘরে একাকিনী হয়া
রে বিধি নিদয়া।

৩৮। **মইষাল গান:** মইষালী জীবনের পটভূমিতে যে সমস্ত ভাওইয়াগান রচিত হয়েছে সেগুলো মইষালী গান নামে অভিহিত। পল্লীর তরুনীরা মইষাল বন্ধুদের উদ্দেশ্যে প্রাণের আবেগে গান গেয়ে ওঠে:

কোন দ্যাশেতে যান মইষাল বন্ধুরে
কোন দ্যাশেতে যান মইষাল বন্ধু
মইশের পাল লইয়া...

মীরা রায়

www.pathagar.com

৩৯. **চটকা গানঃ** ভাওয়াইয়া গানেরই একটি অংশের নাম চটকা গান। লঘুস্তরের বা চটকদার বিষয় ও ক্ষিপ্রতালের সুর অবলম্বনে রচিত হয় চটকা গান।

ও দিদি শোনেক একটা কথা কং
তোক ছাড়া আর কাক শাইকাং
তুই ছাড়া আর কবার জাগায় নাই।

ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতে একদিকে যেমন আছে পল্লীর শান্ত ও স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ তেমনি আছে সহজ ও সরল পল্লীর জনজীবন। পল্লীবাসীর নিস্তরঙ্গ জীবনের সহজ ও সরল মনের সচ্ছন্দ প্রকাশ এই গানে। বিদগ্ধজনের কলা নৈপুণ্য ভাওয়াইয়া গানে অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। যুগের প্রভাবে অপসংস্কৃতির জোয়ারে নাগরিক মনে ধীরে ধীরে কমে আসছে লোকসঙ্গীত তথা ভাওয়াইয়া গানের আবেদন। শিক্ষিত জনের উদাসীনতায় ও অনাদরে নিস্প্রভ ভাওয়াইয়া গান। তবে পল্লীর জনজীবনে ভাওয়াইয়া গানের আবেদন অম্লান। তাদের প্রাণমন আজো আলোড়িত করে এই গান। এই গানে তারা খুঁজে পায় অসীম পরিতৃপ্তি। পল্লীবাসীর প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর ভাওয়াইয়া গান। লোকজীবনে ভাওয়াইয়া গান এক অমূল্য সম্পদ।

৪. **সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতির উৎপত্তিস্থল**

১। মানিকচন্দ্র রাজার গান- নীলফামারী জেলা থেকে পল্লীগায়কদের মুখে শোনা গান।
২। গোপীচন্দ্রের গান- নীলফামারী জেলা থেকে পল্লীগায়কদের মুখে শোনা গান।
৩। সিদ্ধাহাড়ির গান- রঙ্গপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলা থেকে সংগৃহীত।
৪। রহিম সাধুর গান- রঙ্গপুর জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
৫। গোয়ালীর ছড়াগান- রঙ্গপুর জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
৬। গোরক্ষনাথের গান- রঙ্গপুর জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
৭। জাগের গান- রঙ্গপুর জেলার পীরগাছা থেকে সংগৃহীত।
৮। সোনাপীরের গান- রংপুর জেলার পীরগাছা থেকে সংগৃহীত।
৯। বারমাসী গান- রংপুর জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
১০। মোনাইযাত্রা- রংপুর জেলার কোতয়ালী উপজেলায়। পালিচড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
১১। মধুমালার গান- গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থেকে সংগৃহীত।
১২। সত্যপীরের পালাগান- রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মহীপুর থেকে সংগৃহীত।
১৩। বিষহরার গান- রংপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
১৪। সোনারায় ঠাকুরের গান- রংপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
১৫। বৈষ্টম বাউদিয়ার গান- রংপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
১৬। কইন্যা আনোয়ারের কলি- গাইবান্ধা জেলার হরিপুর ডাকঘরের কেল্লাবাড়ী গ্রাম থেকে সংগৃহীত
১৭। জসমত খাঁ- গাইবান্ধা জেলার শোভাগঞ্জ থেকে সংগৃহীত।
১৮। কলিরাজা- গাইবান্ধা জেলার হরিপুর ডাকঘরের কেল্লাবাড়ী গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
১৯। মানিকপাল রাজা- কুড়িগ্রাম জেলার কাশিমবাজার গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
২০। জয়নুব বাদশা-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জউপজেলার বেলকা গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
২১। হলুদ বাদশা- কুড়িগ্রাম জেলার বজরা ডাকঘর এলাকার চবচরিয়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
২২। অওশন কইন্যা- গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
২৩। জেলকদ বাদশা- গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
২৪। মালসী গান- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
২৫। রাখালিয়া গান- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
২৬। মর্সিয়া গীত- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

২৭। মেয়েলী গীত- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
২৮। বৈষ্ণব গান - রংপুরেরগ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
২৯। বাউল গান- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
৩০। হাসির গান- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
৩১। শোকসঙ্গীত- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
৩২। ঘুমপাড়ানী গান- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
৩৩। আকিকার গান- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
৩৪। ছড়াগান- রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।
৩৫। আইরির গান- রংপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
৩৬। শাড়ী বানানী গান- রংপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
৩৭। দিশুয়াল ভাইয়ের গান- রংপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
৩৭। মাছেররিয়ার গান- রংপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত।
৩৮। ভাওয়াইয়া- নীলফামারী জেলা থেকে সংগৃহীত

৫. সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতিস্থল বা ব্যবহার এলাকা।

১। মানিকচন্দ্র রাজার গান- নীলফামারী জেলা থেকে রংপুর গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই গান বিস্তারলাভ করে।
২। গোপীচন্দ্রের গান- নীলফামারী জেলা থেকে রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
৩। সিদ্ধাহাড়ির গান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা।
৪। রহিম সাধুর গান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা।
৫। গোয়ালীর ছড়াগান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা।
৬। গোরক্ষনাথের গান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা।
৭। জাগের গান- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র। রাজশাহী ও পাবনা জেলাতেও বিস্স্থারলাভ করে।
৮। সোনাপীরের গান- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
৯। বারমাসী গান- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
১০। মোনাই যাত্রা- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা।
১১। মধুমালার গান- গাইবান্ধা জেলা থেকে রংপুর, নীলফামারী জেলার সর্বত্র।
১২। সত্যপীরের পালাগান- রংপুর থেকে গাইবান্ধা, নীলফামারী জেলার সর্বত্র।
১৩। বিষহরার গান- রংপুর থেকে নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
১৪। সোনারায় ঠাকুরের গান- রংপুর থেকে নীলফামারী জেলার সর্বত্র।
১৫। বৈষ্টম বাউদিয়ার গান- রংপুর থেকে নীলফামারী জেলার সর্বত্র।
১৬। কইন্যা আনোয়ারের কলি- গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
১৭। জসমত খাঁ- গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
১৮। কলিরাজা- গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
১৯। মানিকপাল রাজা- কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
২০। জয়নুব বাদশা- গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
২১। হলুদ বাদশা- কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
২২। অওশন কইন্যা- গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
২৩। জেলকদ বাদশাহ- গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
২৪। মালসী গান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী, কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।

www.pathagar.com

২৫। রাখালিয়া গান- রংপুর নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার নদীতীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা।
২৬। মর্সিয়া গীত- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
২৭। মেয়েলী গীত- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
২৮। বৈষ্ণব গান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী জেলার সর্বত্র।
২৯। বাউল গান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
৩০। শোক সঙ্গীত- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী জেলার সর্বত্র।
৩১। ঘুমপাড়ানী গান- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
৩২। আকিকার গান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র।
৩৩। ছড়াগান- রংপুর জেলা থেকে নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
৩৪। আইরির গান- রংপুর ও নীলফামারী জেলার সর্বত্র।
৩৫। শাড়ী বানানী গান- রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
৩৬। দিশুয়াল ভাইয়ের গান- রংপুর জেলা থেকে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।
৩৭। মাছের বিয়ার গান- রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম নদীতীরবর্তী বিস্তীর্ন এলাকা
৩৮। ভাওয়াইয়া- মইষাল ও চটকা রংপুরনীলফামারী লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার সর্বত্র।

৬. সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকাঃ

১। মানিকচন্দ্র রাজার গান- স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন এই গানের সংগ্রাহক।

২। গোপীচন্দ্রের গান- শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এই গানের সংগ্রাহক।

৩। গান- পন্ডিতরাজ যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য তর্করত্ন এই গানের সংগ্রাহক। কবি ও গায়ক রতিরাম দাস এই গানের রচয়িতা।

৪। বারমাসী গান- বাংলা একাডেমী নিয়োজিত এস এম সামীয়ুল ইসলাম এই গানের সংগ্রাহক।

৫। কন্যা বারমাসী- এই গানের রচয়িতা জয়ধর বানিয়া। তাঁর নিবাস জানা নেই।

৬। মোনাইযাত্রা- রংপুর জেলার কোতয়ালী উপজেলার পালিচড়া গ্রামে তেলেঙ্গা সাহা ফকির ওরফে তেঙ্গা গীদাল এই পালাগানের প্রসিদ্ধ গায়ক। এই পালাগানের অন্যান্য গায়ক নসির গীদাল ও তাঁর ভাতিজা আমিরউদ্দিন গীদাল। এই পালাগানের আরেক বিশিষ্ট গায়ক দীনাদাস গীদাল। দীনাদাস গীদালের ওস্তাদ ছিলেন বাতাসু গীদাল।

৭। মধুমালার গান- মধুমালার উপাখ্যান রচয়িতার নাম কবি ও গায়ক সাকের মামুদ। তাঁর নিবাস ছিল গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বর্ধনকোট।

৮। সত্যপীরের গান- কবি ও গায়ক কৃষ্ণহরিদাস এই গানের রচয়িতা। তাঁর নিবাস ছিল রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মহীপুর গ্রামে।

৯। সোনারায়ের গান- শ্রী বৃন্দাবন ভট্টাচার্য এই গানের সংগ্রাহক।

১০। মর্সিয়া গীত- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ঝাড়বিশিলা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী অন্ত্য মধ্যযুগের কবি কাজী হেয়াত মামুদ জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেন। মর্সিয়া গীতের উৎস জঙ্গনামা কাব্য।

১১। পালাগান- আনোয়ারের কলি কইন্যা, জসমত খাঁ, কলিরাজা, মানিকপাল রাজা, জয়নুব বাদশা, হলুদ বাদশা, অওশন কইন্যা, জেলকদ বাদশা প্রভৃতির সংগ্রাহক বাংলা একাডেমী নিয়োজিত এস,এম সামীয়ুল ইসলাম।

১২। ভাওয়াইয়া- প্রথম গান লিপিবদ্ধ করেন স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন।

www.pathagar.com

ভাওয়াইয়া একাডেমীর লোকসঙ্গীত

৭. সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের তালিকা:

খ্রিস্টীয় ৯ম ১০ম শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের পাশাপাশি নাথ ধর্মের প্রভাবে সৃষ্টি হয় নাথসাহিত্যের। নাথসাহিত্যের প্রভাবে রঙ্গপুরে (রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম) সৃষ্টি হয় মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষনাথের গান প্রভৃতি। মধ্যযুগের সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রভাবে জাগের গান। রোমান্টিক কাব্য মধুমালতীর প্রভাবে মধুমালা গানের প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পালাগানের প্রচলন হয়েছে। আসরে ও উৎসবে উল্লিখিত গানগুলো গীত হতো। অতীতে রঙ্গপুরের। (রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম) গ্রাম গ্রামান্তরে গানের দল ছিল।

কালচক্রে অধিকাংশ গান ও গানের দল বিলুপ্ত হয়েছে। রঙ্গপুরে (রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম) ভাওয়াইয়া গান বহুল প্রচলিত ও সমাদৃত। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ভাওয়াইয়া শিল্পীদের সংগঠন আছে। ঢাকায় ভাওয়াইয়া একাডেমী ও ভাওয়াইয়া অঙ্গন আছে।

ইংরেজ আমলে ভাওয়াইয়া গানকে জনপ্রিয় করেন পল্লীগীতিসম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমদ। হিজ মাস্টার্স ভয়েজ কোম্পানীতে রেকর্ডকৃত আব্বাসউদ্দিন আহমদের সুরেলা কণ্ঠের ভাওয়াইয়া গান সে সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর যে সকল ভাওয়াইয়া শিল্পী গীতিকার এবং সুরকার ভাওয়াইয়া গানের চর্চা ও বিকাশে আজীবন ভূমিকা রেখে পরলোকগমন করেছেন তাঁদের মধ্যে আবদুল করীম, কাজী মকবুল হোসেন, এ.কেএম আবদুল আজীজ, মহেশচন্দ্র রায়, হরলাল রায়, মোহাম্মদ কছিমউদ্দিন, মোঃ নমরউদ্দিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

জীবিত ভাওয়াইয়া শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারগণের মধ্যে হাফিজুর রহমান, মুস্তাফা জামান আবাসী, ফেরদৌসী রহমান, নীনা হামিদ, মোঃ সিরাজউদ্দিন, রথীন্দ্রনাথ রায়, নাদিরা বেগম, রায়হানা বেগম, সৈয়দ গোলাম আম্বিয়া, আজিজুল ইসলাম, শরীফা রানী, সাহিদা বেগম, বেগম সুরাইয়া, এ,কে এম মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

৮. **সামষ্টিক গানের তালিকা:** বিষহরার গান, সোনারায় ঠাকুরের গান, কইন্যা আনোয়ারের কলি, জসমত খাঁ, কলিরাজা, মানিকপাল রাজা, জয়নুব বাদশা, হলুদ বাদশা, অওশন কইন্যা, কুষান গান, কাসেম সখিনার পালা প্রভৃতি।

৯. **এককগানের তালিকা:** মেয়েলি সঙ্গীত, বৈষ্ণব গান, বাউল গান, হাসির গান, শোকসঙ্গীত, ঘুমপাড়ানী গান, আকিকার গান, ছড়াগান, আইরির গান, শাড়ী বানানী গান, দিশুয়াল ভাইয়ের গান, মাছের বিয়ার গান, ভাওয়াইয়া গান, মইশাল গান, চটকা গান প্রভৃতি।

১০. **বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকাঃ** ভাওয়াইয়া, ছড়াগান, মেয়েলি গীত প্রভৃতি।

১১. **বিপন্ন গানের তালিকা**- পালাগান, রাখালিয়া গান, বারমাসী, মেয়েলী গীত, ছড়াগান, মর্সিয়া গীত, ঘুমপাড়ানী গান প্রভৃতি।

১২. **লুপ্ত গানের তালিকা:**

মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের গান, যুগীযাত্রা, সিদ্ধাহাড়ির গান, ধর্মপূজার গান, গোরক্ষনাথের গান সোনাপীরের গান, মোনাইযাত্রা, মধুমালার গান, আইরির গান, শাড়ী বানানী গান, দিশুয়াল ভাইয়ের গান মাছের বিয়ার গান প্রভৃতি।

১৩. **সনাক্তকৃত লোকবাদ্য যন্ত্রের তালিকাঃ** গোপীযন্ত্র, যুগীযন্ত্র, খঞ্জনী, মন্দিরা, বেণাকুশান, ডাকালী, ব্যানা, সারিন্দা, খোল, করতাল, দোতরা, বাঁশী, ঢোল প্রভৃতি।

১৪. **সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্ব মালিক কারা:**

ভাওয়াইয়া শিল্পীগণ মেধাস্বত্বের মালিক। বেসরকারি সংস্থা, জেলা তথ্য অফিস, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সচেতন নাগরিক কমিটি তাদের কর্মকান্ড প্রচারের জন্য শিল্পীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করে পারিশ্রমিক প্রদান করে থাকে।

১৫. **এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যমান:**

লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান-(২০০৬)

শুধু ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীরা সম্মানীর বিনিময়ে জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে।

১৬. **সুপারিশমালা:**

ক. **সংগ্রহ সম্পর্কিত:** রঙ্গপুরের, (রংপুর নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলায়) এখনও যেসব লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে সেগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিরূপণের জন্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে অনেক লোকসঙ্গীত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এসব গান সংগ্রহ করা আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যেমন মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের গান, সিদ্ধাহাড়ির গান, মোনাইযাত্রা প্রভৃতি। বর্তমানে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলো অডিও ও ভিডিওতে ধারণ করে সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

খ. **সংরক্ষণ সংক্রান্ত:** শিল্পকলা একাডেমীর শাখা আছে রঙ্গপুরের বিভিন্ন জেলায়। প্রত্যেক জেলায় বিলুপ্ত ও প্রচলিত লোকসঙ্গীত সংগ্রহের জন্য বেতনভোগী সংগ্রাহক প্রয়োজন। সংগৃহীত লোকসঙ্গীতের সিডি (ভিডিও এবং অডিও) খ্যাতিমান শিল্পীদের আলোকচিত্র ও জীবনী প্রকাশ করা অপরিহার্য। শিল্পকলা একাডেমী লোকসঙ্গীতের নিদর্শন, খ্যতিমান শিল্পীদের আলোকচিত্র ও জীবনী সংরক্ষণের উপযুক্ত স্থান।

গ. **উপস্থাপন সংক্রান্ত:** সিডি (ভিডিও এবং অডিও) তে ধারনকৃত লোকসঙ্গীত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। নববর্ষ বরণ, ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে এর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক জেলার লোকসঙ্গীত উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হতে পারে অন্য জেলায়।

www.pathagar.com

ঘ. **মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত:** প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলি সঙ্গীতশিল্পীদের চর্চা ও সাধনার ফলে অর্জিত সম্পদ। তাই এর মেধাস্বত্ব যাতে সঙ্গীত শিল্পীগণ ভোগ করতে পারেন সে ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সঙ্গীতশিল্পীদের তাঁদের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মানী প্রদান করেন না। এ ব্যাপারে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আগ্রহী হয়ে সঙ্গীতশিল্পীদের মূল্যায়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৭. **উপসংহার:** রঙ্গপুরের (রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম) লোকসঙ্গীতের প্রধান ধারার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের পাশাপাশি লোকসঙ্গীতগুলোর বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করা হলো। এসব লোকসঙ্গীতে লোকমানসের ও জীবনযাত্রার পরিচয় ফুটে উঠেছে। লোকসংস্কৃতি একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর মানসচর্চার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এজন্য লোকসঙ্গীতের মূল্য অপরিসীম। লোকসঙ্গীতগুলি যাতে চিরতরে হারিয়ে না যায় সেজন্য সংরক্ষণ করার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি-মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী।
উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা, মুহাম্মদ আবু তালিব।
গোপীচন্দ্রের গান, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম সংস্করণ-১৮৯৬
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রঙ্গপুর শাখা, সন ১৩১৫ ২য় সংখ্যা
পল্লীগীতিতে ধর্মভাব, শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপধ্যায় প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৫
লোকসাহিত্য (তৃতীয় খন্ড), বাংলা একাডেমী প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭১
বাংলা লোকসাহিত্য, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য ১ম সংস্করণ-১৯৫৪
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রঙ্গপুর শাখা, সন ১৩১৫ ৪র্থ সংখ্যা
সাহিত্য প্রসঙ্গ-শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেন, প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৭
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩২২ (প্রথম সংখ্যা)
লোকসাহিত্য (প্রথম খন্ড), বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৬৫
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩১৭, প্রথম সংখ্যা।
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
রংপুর গীতিকা (প্রথম খন্ড), বদিউজ্জামান সম্পাদিত বাংলা একাডেমী ১৯৭৭
লোকসাহিত্য (প্রথম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৭০
উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, সামীয়ুল ইসলাম প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩
উত্তরবঙ্গের মেয়েলি গীত, অধ্যাপক হাসান হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জলিল সম্পাদিত বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৬৯।
উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ও বিয়ের গীত, সংগ্রহ ও স্বারলিপি কাজী নাসির
বিয়ার বাড়ী মুহাম্মদ আবদুল গনী, প্রকাশকাল-১৯৭৭
ঠাকুর পঞ্চানন ও রাজবংশী জাতি (পান্ডুলিপি), উমেশচন্দ্র বর্মণ।
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সন ১৩১৬, তৃতীয় সংখ্যা।

www.pathagar.com

৮

রাজশাহী অঞ্চল

৮.১ পাবনা জেলার লোকসঙ্গীত

পরিতোষ কুমার কুণ্ডু

ভূমিকা: লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বৃহত্তর পাবনা অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভাস্কর্য, পুরাকীর্তি উন্মুক্ত আকাশের নিচে, মন্দিরে, গুহায় টিকে থাকলেও সাহিত্য-চিত্র-লোকশিল্প-সঙ্গীত সেভাবে টিকে থাকতে পারে না। একে বেঁধে রাখতে হয় সুরে-রঙে-রেখায়। সাহিত্য-শিল্প রেখায় পংক্তিতে জীবনের কথাকে ফুটিয়ে তোলে বিচিত্র ভঙ্গিতে। জীবন জিজ্ঞাসার শিল্পময় তৃষ্ণা পাবনা জেলার কবি-সাহিত্যকদের অন্তরে যুগে যুগে জেগে উঠেছিল; কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, ব্রতকথা সেই চেতনাতেই বিধৃত। প্রাচীন মধ্যযুগের জীবন পটে এ অন্তর-জিজ্ঞাসা অস্পষ্ট অন্তত লিখনীতে, যা কিছু সন্ধান মেলে তা কেবল লোক সাহিত্যের বদৌলতে। লোকশিল্পের জনশ্রুতি, ব্রতকথা, লোকগীতি, আখ্যান বর্ণনায় তৎকালীন এ জেলার তো বটেই, সেই সঙ্গে বাংলাদেশের লৌকিক ধারার কথাও ফুটে উঠেছে।

পাবনা জেলা বলতে বৃহত্তর পাবনা জেলা (পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা) বুঝায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের এ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতকে প্রকৃতভাবে জানতে হলে, বুঝতে হলে আমাদের আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতকে উপেক্ষা করা যায় না। পাবনা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের জীবনের সাথে তার সংস্কৃতি মিশে একাকার হয়ে আছে। পাবনা অঞ্চলের মানুষের যে জীবনব্যবস্থা অশিক্ষা, দারিদ্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এ অঞ্চলের মানুষের নিত্যদিনের সাথী, জীবনের এই বাস্তব সত্য পাবনার লোকসঙ্গীতে প্রতিফলিত। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে পাবনা অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

জেলা পরিচিতি: বৃহত্তর পাবনা জেলা পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত। সংক্ষেপে জেলা দু'টির পরিচয় তুলে ধরা হলো।

পাবনা জেলা: পাবনা জেলার অন্তর্গত নয়টি উপজেলা। এগুলো হলো পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, সুজানগর, বেড়া ও সাঁথিয়া। এ জেলার আয়তন ২৩৭১.৫০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া জেলা, পূর্বে মানিকগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে গঙ্গা নদী, নাটোর ও কুষ্টিয়া জেলা। বর্তমান পাবনা জেলা প্রাচীনকালে বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২৮ সালে মতান্তরে ১৮৩২ সালে জেলার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করলেও জেলাটির ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক সীমারেখা কখনও নির্দিষ্ট থাকেনি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, সম্প্রসারণ ও বিভাজন লক্ষ করা যায়। জেলাটির সীমারেখার বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছিল ১৮৭৭ ও ১৮৮১ সালে। এ সময় জেলার উভয় পাশ দিয়ে প্রবহমান পদ্মা-যমুনার গতিধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। '৮০-র দশক থেকে পাবনা বৃহৎ জেলার মর্যাদা হারিয়েছে। এ সময় পাবনা ও সিরাজগঞ্জ দু'টি পৃথক জেলায় বিভক্ত হয়। পাবনা জেলায় ১৮৫৯-৬০ খ্রি. নীল বিদ্রোহ হয়েছিল।

www.pathagar.com

পাবনার ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ তিনগম্বুজ বিশিষ্ট ভাঁড়ারা মসজিদ (১১৭৬ হিজরি), তিনগম্বুজবিশিষ্ট কাজীপাড়া মসজিদ (ভাঙ্গুরা), শেঠের বাংলা, হাণ্ডিয়ালের নবরত্ন মন্দির, তাড়াশের কপিলেশ্বর শিব মন্দির, জোড় বাংলা মন্দির, মাসুম খাঁর মসজিদ, সমাজ গ্রামের মসজিদ (৯৫৮ হিঃ), পাইকপাড়া মসজিদ ও বুড়াপীরের দরগা, নওগাঁ মামা-ভাগ্নের মসজিদ। দেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতাল এখানে অবস্থিত।

পাবনা জেলার জনসংখ্যা ২১,৫৩,৯২১জন; পুরুষ ৫১.১৭%, মহিলা ৪৮.৮৩%। মুসলমান ৯৫.১২%, হিন্দু ৪.৫০%. খ্রিষ্টান ০.২২%, অন্যান্য ০.১৬%। এ জেলায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ২,৩৫৩, মাজার ৫, মন্দির ৪২০, গির্জা ১১, তীর্থস্থান ২।

জেলার জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি। পেশাজীবীদের মধ্যে কৃষিজীবী ৩৪%, কৃষি শ্রমিক ২২.৭৭%, অকৃষি শ্রমিক ৪.৪৬%, ব্যবসা ১৩.২৭%, চাকরি ৭.২৬%, পরিবহণ ২.১৮%, তাঁত ২.৮৫%, অন্যান্য ১৩.২১%। অধিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীণ ২৯%, ক্ষুদ্র চাষী ৪৯%, মধ্যম চাষি ১৮%, বড় চাষি ৪%।

জেলার শিক্ষার হার ২৬.৮%। এর মধ্যে পুরুষ ৩১.৮%, মহিলা ২১.৫%। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পাবনা অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ জেলার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ক্লাব ৪৪৫, পাবলিক লাইব্রেরি ৬৬, সমবায় সমিতি ১১২৪, নাট্যমঞ্চ ৩, নাট্যদল ১৯, যাত্রাপাটি ৩, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ৪৬, মহিলা সংগঠন ১২৩, সিনেমা হল ২৭, কমিউনিটি সেন্টার ১, শিল্পকলা একাডেমী ১, শিশু একাডেমী ১, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ৩৩০।

পাবনা জেলা লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধ। রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ, প্রবচন ধাঁধা, হেয়ালী, লোক কাহিনী, কবি, জারী, সারি, ভাটিয়ালী, বাউল, ছড়া, মেয়েলী গীত, গাথা, গীতিকা অর্থাৎ লোক সংস্কৃতির সব রকম ধারা এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

সিরাজগঞ্জ জেলা: অধুনা সিরাজগঞ্জ জেলা হিসেবে পরিচিত হলেও কিছুদিন আগেও তা পাবনা জেলার অন্তর্গত ছিল। সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, কাজীপুর, কামারখন্দ, বেলকুচি, চৌহালি, রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর।

এ জেলার আয়তন ২৪৯৭.৯২ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা জেলা, পূর্বে টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা, পশ্চিমে পাবনা, নাটোর ও বগুড়া জেলা।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মধ্যে ১৯২২ সালে উল্লাপাড়া উপজেলার সলঙ্গাহাটে মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ এর নেতৃত্বে এক সম্মেলনে পুলিশের গুলিতে সিরাজগঞ্জের অনেক লোক হতাহত হয়। এ ঘটনা ইতিহাসে 'সলঙ্গা বিদ্রোহ' বা 'সলঙ্গ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এছাড়া এখানে জমিদারদের বিরুদ্ধে ঘটেছিল 'পাবনা কৃষক বিদ্রোহ' (১৮৭৩)। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার ইউসুফ শাহী পরগনায় এ বিদ্রোহের সূচনা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলার জনসংখ্যা ২৭,০৭,০১১ জন; তার মধ্যে পুরুষ ৫১.১৪%, মহিলা ৪৮.৮৬%। জাতিগতভাবে মুসলমান ৯২%, হিন্দু ৬.৫%, অন্যান্য ১.৫%। তারাশ উপজেলায় মাহাতো নামে কিছু আদিবাসী রয়েছে। এদের নিজস্ব ভাষাও আছে।

জেলার জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি। পেশাজীবীদের মধ্যে কৃষি ৩৫.৪৯%, শিল্প ২.৭৮%, ব্যবসা ১১.৯৮%, কৃষি শ্রমিক ২১.৪৫%, অকৃষি শ্রমিক ৫.৭৭%, হস্তশিল্প ৫.৫৭%, চাকরি ৫.৪৯%, অন্যান্য ১১.৪৫%।

জেলার শিক্ষার হার ২৭%। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩.৪%, মহিলা ২০.২%। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এ জেলার সুনাম রয়েছে। এখানে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে ক্লাব ৪২৪, পাবলিক লাইব্রেরি ১২, নাট্যমঞ্চ ২, সাহিত্য সমিতি ৯, নাট্যদল ২৫, সিনেমা হল ২৭, পাঠাগার ৬৫, মহিলা সংগঠন ৩৪৩, শিল্পকলা একাডেমী ১, শিশু একাডেমী ১।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিত)

মেয়েলি গীত: মেয়েলি গীত বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের অন্যতম লোকসঙ্গীত। গ্রামীণ নারী জীবনের আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না মেয়েলি গীতের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। পাবনার মেয়েলি গীতের মাধ্যমে প্রেম-বিরহ, বেদনা মিশ্রিত একান্ত নারী হৃদয় সঞ্জাত অনুভূতি ও সেকালের গ্রামীণ জীবনের অনেক ছোট ছোট ছবি ফুটে ওঠে। মেয়েদের মুখে মুখে রচিত এসব গীতে প্রাচীনকালের সমাজ ও জীবনের স্পর্শ রয়েছে। সেই আদিকাল থেকেই নারীর রূপ সৌন্দর্যের বন্দনা করে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত সৃষ্টি হয়ে আসছে। আমরা এখানে পাবনার একটি মেয়েলি গীত উদ্ধৃত করছি, যার মধ্যে গ্রামের শ্যামলা মেয়ের রূপের বর্ণনা। শ্যামলা সুন্দরীর গীত:

আগর চন্নন বাট্যে রে শ্যামেলা
শ্যামেলা গেল শ্রীঘরে রে নারী
শ্যামেলা সুন্দরী।।
শ্রীঘরে যায়রে শ্যামেলা
শ্যামেলা রসের ঝাপি খোলেরে নারী।
শ্যামেলা সুন্দরী।।
আগে পাছে দাসীরে বাঁদী
মদ্দি চলিলো শ্যামেলা নারী
শ্যামেলা সুন্দরী।।

এই গীতের বাণী ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে শ্যামল রঙ রমণীর রূপের খ্যাতি। সে তার রূপ রসের ঝাঁপি খুলে দাসী-বাঁদীর মাঝখানে চলাফেরা করে।

পাল্কীর সম্মান এককালে নৌকা বা গাড়ির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। জামাই গরুর গাড়িতে চড়ে শ্বশুর বাড়ি এলে রসিকতা করে মেয়েরা গাইত:

জামাই আইলো গড়্যা-গাড়ীত চইড়্যা
আরে ছিরে ছি!
দামান্দের মায়েক বেচিব, পাল্কীর ট্যাহা গোছাইব
তবে গা দেব আমরা
জরিণাকে তুল্যারে ছিরে ছি।

বরস্যা গান: বরস্যা গান এ অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত। কৃষকগণ ক্ষেতে কাজ করতে করতে শ্রমোপনোদনের জন্য এই গান করে। এখানে বিরহিণী নারীর প্রেমজনিত বিরহ-বেদনার কথা উপজীব্য হলেও ঋতুচক্রের কথা এতে ফুটে উঠে। যেমন:

আগুন মাসে নূতন খানা, পৌষ মাসে নাইওর মানা রে,
মাঘ মাইসা শীত গেল নারীর বুকেতে-
বিদেশেতে রইলা প্রাণ-বন্ধুরে।
ফাল্গুন মাসে তিনগুণ জ্বালা
চৈত্র মাসে বরণ কালা রে
আমায় দিলা হাতের কাঁকন বৈশাখে। বিদেশেতে...।।
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ় মাসে ইন্দ্র জল রে
শ্রাবনেতে গেল নারী নাইওরে। বিদেশেত...।।
ভাদ্র মাসে আউলা কেশে, আশ্বিন মাসে বানের শেষে রে
কার্তিক মাসে গেল নারী কাতরে। বিদেশেতে...।।

www.pathagar.com

বারো মাসে বছর গেলো, প্রাণের বন্ধু দ্যাশে আইলে রে
আসলো বন্ধু বসলো নারীর শিয়রে
বিদেশেতে যাইও না প্রাণ-বন্ধুরে।

মাঙ্গার গান ও হেঁয়ালী: লোকসাহিত্যের কিছু সম্পদ ছেলেদের মাঙ্গার গান, ছড়া ও ধাঁধাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। 'মাঙ্গা' শব্দের অর্থ-মাগা বা ভিক্ষা করা। চলন বিল অঞ্চলের তরুণ ও যুবকেরা প্রতি বছর পৌষ মাসে 'সোনারায়ের দল' গঠন করে হিন্দু-মুসলমান সকলের বাড়িতে গান গেয়ে রাত্রিকালে ভিক্ষা করে বেড়ায়। কোন্ অতীত হতে এই প্রথা চলে আসছে তা কেউ বলতে পারে না। এটা ছেলেদের সখের ভিক্ষা করা। পৌষ মাসের হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে তারা অনেক রাত জেগে গোটা মাস ধরে ভিক্ষা করে যা পায় তাই দিয়ে পৌষ-সংক্রান্তির দিন 'পুষ্না'বা 'পুষুরা' করে। পুষুরার দিন খুব সকালে উঠে ছেলেরা স্নান করে; তারপর আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা গরম করে এবং ভিক্ষালব্ধ চাউল ও অর্থে কেনা আতব চাউল, গুড়, মসল্লা প্রভৃতি সহযোগে ক্ষীর রান্না করে খায়। মাঙ্গার গান:

হামুক দামুক শামুক পাল,
আমরা হ'লাম ছাওয়াল-পাল।
ক্ষ্যাতা আন্তে মনে নাই
শীতে বড় কষ্ট পাই
ভিখ্ দাও বাড়ী যাই।
সুবোল, সুবোল।।

গানের শেষে বলে সুবোল, সুবোল অর্থাৎ ভাল কথা, এখানে ইতি-অর্থে। এরূপ অসংখ্য রসবহুল ও হাস্য-রসিকতাপূর্ণ হেঁয়ালী চলন বিলের পথে ঘাটে রাখলদের মাঝে প্রচলিত আছে।

জাগ গান: বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত জাগ গান। পৌষ-মাঘ মাসে পল্লীর বালকরা গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে এই গান গায়। জাগ গানের সংখ্যা অনেক। কালুগাজীর জাগ, সোনা রায়ের বিয়ার জাগ, সত্যপীরের জাগ, মানিকপীরের জাগ প্রভৃতি। নিচে কালুগাজীর জাগের কয়েক লাইন:

কালুগাজীর জাগ:

আশা হাতে তাজগো মাথে সোনার খরম পায়
হেলিতে দুলিতে পীর-রে গোয়াল নগর যায়।
(কারাস): ও পীর 'কালজামা গায়'
হেলিতে দুলিতে পীর-রে গোয়াল নগর যায়।
লা ইলাহা কলেমা পড়ি ছাড়িল জিকির
বাড়ীত ছিল কালুর মা-রে দেখিল ফকির।

সারি গান: নৌকা বাইচের কালে মাঝিরা তালে তালে সারি গান করে। দালানের ছাদ পিটানোর সময়েও সারি গান হয়। সিরাজগঞ্জের পোতাজিয়ায় বিজয় দশমীর দিনে সুসজ্জিত পান্‌সি নৌকার বাইচ ও সারি গানের বিশেষ ধুম আছে। সারি গানের একটি অংশ:

"উমা ধনকে বিদায় দিয়ে কি লয়ে যাব গৃহে;
সোনার কমল ভাসাইলাম জলেতে।
দশ দিন পুজলাম মায়কে বিল্ব জবা দিয়ে,
আজ বিজয় দশমী মায়ে ভাসাইলাম জলেতে।
ভাটান বাঁকে দিলাম জবা পুষ্প উজান ধায়।
আমি বিনা অভয় চরণ কেবা যেন পায়।"

www.pathagar.com

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের বেশ কিছু সময় শাহজাদপুরে কাটান, সেকথা আমাদের সকলেই জানা। শাহজাদপুরে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ নিম্নবিত্তের নিরক্ষর মানুষদের অত্যন্ত কাছ থেকে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। শুধু নিরক্ষর মানুষ নয়, তাদের সাহিত্যকেও তিনি এ সময় বুঝতে চেষ্টা করেন। কলকাতা থেকে শাহজাদপুর রবীন্দ্রনাথ সাধারণত নৌকা পথে যাতায়াত করতেন। নৌকা পথে যাবার কালে কবি একদিন শুনতে পেলেন একটি নৌকা থেকে ভেসে আসা সারি গানের সুর:

যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী
পাবনা থ্যাহা আন্যা দিব
ট্যাহা দামের মটরী।

রবীন্দ্রনাথ এই সারি গানের মধ্যে যেন এক নব দিগন্তের সন্ধান লাভ করলেন। এরপর থেকেই শুরু হয় তার লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজ। রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধ সংকলনটি এ সংগ্রহের দৃষ্টান্ত।

ধুয়া গান: বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত ধুয়া গান। জারি গানের মতো একটি সাময়িক ও আকস্মিক ঘটনা নিয়ে রচিত হয়। নির্মল আনন্দ সু-স্বাস্থ্যের বাহক, অনাবিল আনন্দদায়ক এই ধুয়া গান সু-সংস্কৃতির ধারক। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী তা' অমর, অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছে লোক মুখে। বহু রকমের ধুয়া গান রয়েছে। যেমন- ঝড়ের ধুয়া, বানের ধুয়া, বিশাউল্লাহ্ বয়াতীর ধুয়া, ভূমিকম্পের ধূয়া প্রভৃতি।

ভূমিকম্পের ধুয়া: (মালেক চাঁন্দ বয়াতী রচিত)

বারশ' বিরানব্বই সালে আজগুবী ভূঁইকম্প আইলো
লোকে বলে আল্লাহ্ আল্লাহ্-
আজ বুঝি হায় সাঙ্গ হল এ ভবের খেলা।
ওরে আইলো হুরহুরিয়ে কম্পবান,
হুস হারায়্যা হইলাম অজ্ঞান।
আচম্বিতে ভূমিকম্পে লাগলো দোলা কাঁপিবার
ওরে ছুটলো বুঝি দোজখের কামান।
বাংলা বিহারে ভাংলো কত-ফিরিঙ্গীর কলকুঠি দালান।
ওরে পাহাড় ফাইট্যা ভাইস্যা আইলো বান
ভাবছে বসে মালেক চান,
ওরে মহিষ গরু সব ধরিল ভাসান।

যাত্রা গান: পৌরাণিক বিবর অবলম্বনে রচিত এবং গ্রামের দশজনে মিলিত হয়ে সাধারণত সখের দল সৃষ্টি করে গীত। শুনা যায় এককালে এ গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু বর্তমানে যাত্রা গান বিলুপ্তপ্রায়।

ভাসানযাত্রা গান: সাধারণত শরৎ ও শীতকালে মুসলমানগণের অনেকে হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রীয় কোনো ঘটনাবলম্বনে পাঁচজনে মিলিত হয়ে ভাসানযাত্রা গান করে। সচরাচর মনসার ভাসান গানই অধিক প্রচলিত ছিল।

জারি গান: মুসলমান গৃহস্থের কোনো আকস্মিক কিংবা কৌতুকাবহ ঘটনাদি অবলম্বনে জারি গান গেয়ে থাকে। প্রত্যুৎপন্নমতি সহকারে আসরে বসেই দলপতি বা বয়াতিগণ এই সকল গানের অধিকাংশ রচনা করে। দুই দলে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলে এই গান অনেক সময় অশ্রাব্য হয়ে ওঠে।

কবি ও হোলী গান: এটিও জারি গানের মত অনেক সময় উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে আসরেই রচিত হয়। কবিগান বার মাস এবং হোলী গান কেবল দোলোৎসবের সময় বেশি শুনতে পাওয়া যায়।

কীর্তন ও সংকীর্তন: মনোহর সই কীর্ত্তন ও পদাবলী রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক এবং সংকীর্তন সাধারণত হরিলুট কিংবা নগর সংকীর্তন সময়ে গৌরাঙ্গ ও নিত্যনন্দ প্রভৃতির গুণাবলি বর্ণনায় গীত হয়।

www.pathagar.com

বাউল গানঃ একতারা, দোতরা বা গুপীমন্ত্রের সাহায্যে নাচের ভঙ্গিতে বাউল গান গাওয়া হয়। পাবনার চলন বিল অঞ্চলে বহু বাউল ফকির এক সময় ছিলেন। এখনও অনেকের দেখা মিলে। বাউল ফকির 'লালন শাহ' যদিও কুষ্টিয়ার অধিবাসী, তবে পাবনার মাটিতে বসে তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছেন। কাজেই পাবনা অঞ্চলের বাউল শিল্পীরা আজও গ্রাম-গঞ্জে লালনের গান গেয়ে বেড়ায়।

পাঁচালী গানঃ বর্তমান সময়ে বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের একটি অতি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। সাধারণ মানুষের নিত্যকার জীবন জীবিকার কথা নিয়ে রচিত এ গান মানুষকে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনই সচেতন করে তোলে। একক বা দলগতভাবে এ গান গায়। বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম (বিষয়ঃ নারী-নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি) পাঁচালী গানের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরে।

লছীমন গানঃ এ গান পাবনা, সিরাজগঞ্জের গ্রামগঞ্জে ব্যাপক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। ১৫/২০ জনের দলে একজন প্রথমে গান গায়। পরে সকলে সুর করে এক সাথে গায়। রূপবান, লছীমন, আলতাবানু প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বনে এ গান রচিত। এছাড়া ইহকাল, পরকাল ও ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয় এ গানের বিষয়বস্তু।

বিচার গান বা পালা গানঃ কবি গানের মত এ গানও দুই জন শিল্পী দুই দলে বিভক্ত হয়ে গানে গানে তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা শ্রোতাদের সাক্ষী মানে। আর একে অপরকে প্রশ্ন করে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। এ গানের আসর পাবনা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে সন্ধ্যায় আসর করে শুরু হয় শেষ হতে মধ্যরাত গড়িয়ে যায়। এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এ গান খুব জনপ্রিয়।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি স্থলঃ

(১) মেয়েলি গীত	:	পাবনা, সিরাজগঞ্জের গ্রাম অঞ্চলে এর উৎপত্তি।
(২) বরস্যা গান	:	পাবনার চাটমোহরের চলন বিল অঞ্চলে উদ্ভব।
(৩) মাঙ্গার গান ও হেঁয়ালী	:	পাবনার চাটমোহর, হাণ্ডিয়াল এবং সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, চলন বিল অঞ্চলে এর উৎপত্তি।
(৪) জাগ গান	:	পাবনার চলন বিল অঞ্চলে।
(৫) সারি গান	:	সিরাজগঞ্জের পোতাজিয়া, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া অঞ্চলে।
(৬) ধুয়া গান	:	সিরাজগঞ্জের তাড়াশ অঞ্চলে এর উৎপত্তি।
(৭) যাত্রাগান	:	পাবনা জেলায়।
(৮) ভাষাণযাত্রা গান	:	পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে।
(৯) জারি গান	:	পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায়।
(১০) কবি ও হোলী গান	:	পাবনার আটঘরিয়ার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে উদ্ভব।
(১১) কীর্তন ও সংকীর্তন	:	নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় না।
(১২) বাউল গান	:	কুষ্টিয়া জেলায় উদ্ভব।
(১৩) পাঁচালী গান	:	পাবনা সদরের দিলালপুরে উদ্ভব।
(১৪) লছীমন গান	:	পাবনার মালঞ্চি ইউনিয়নে উৎপত্তি।
(১৫) বিচার গান বা পালা গান	:	পাবনা জেলার আটঘরিয়ার কৈজুরী গ্রামে উদ্ভব।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতি স্থল বা ব্যবহার এলাকা:

(১) মেয়েলি গীত	:	বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা দেশেই এর বিস্তৃতি ঘটেছে।
(২) বরস্যা গান	:	নাটোর, বগুড়া, নওগাঁ জেলায় এর বিস্তৃতি ঘটেছে।

www.pathagar.com

(৩) মাঙ্গার গান ও হেঁয়ালী : পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী নাটোর জেলায়।
(৪) জাগ গান : পাবনা ও পার্শ্ববর্তী নাটোর জেলায়।
(৫) সারি গান : সিরাজগঞ্জ, পাবনা, পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলায়।
(৬) ধুয়া গান : বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলে।
(৭) যাত্রা গান : এর প্রচলন শুধু পাবনা জেলায়।
(৮) ভাষাণযাত্রা গান : পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায়।
(৯) জারি গান : পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায়।
(১০) কবি ও হোলী গান : পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায়।
(১১) কীর্তন ও সংকীর্তন : পাবনা, সিরাজগঞ্জ সহ সারাদেশে।
(১২) বাউল গান : পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জেলায়।
(১৩) পাঁচালী গান : বৃহত্তর পাবনা জেলায়।
(১৪) লছীমন গান : বৃহত্তর পাবনা জেলায়।
(১৫) বিচার গান বা পালা গান : পাবনা জেলায়।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা:

(১) মেয়েলী গীত : রওশনআরা, মোজাহারুল ইসলাম, মোসাঃ হোসনে আরা প্রমুখ।
(২) বরস্যা গান : বরস্যা গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায়না।
(৩) মাঙ্গার গান ও হেঁয়ালী : এ গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
(৪) জাগ গান : নবকুমার নন্দী, ধীরাজ ফকির, বিনয় পাটনী প্রমূখ।
(৫) সারি গান : নবদ্বীপ হালদার, সুভাষ চন্দ্র, মধুসূধন সরকার প্রমূখ।
(৬) ধুয়া গান : হারান উদ্দিন বিশ্বাস, মালেক চাঁন্দ বয়াতী, এম. আব্দুল করিম মিয়া প্রমূখ।
(৭) যাত্রা গান : যাত্রা গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
(৮) ভাষানযাত্রা গান : ভাষানযাত্রা গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
(৯) জারি গান : জারি গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
(১০) কবি ও হোলী গান : ওম্মত আলী বয়াতী, শহীদ বাউল এম.এ.গফুর।
(১১) কীর্তন ও সংকীর্তন : এ গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
(১২) বাউল গান : মৃত আহসান ফকির, আশরাফ আলী, ফকির আছরফ আলী, বাউল তোফাজ্জল, আব্দুল মালেক সরকার প্রমূখ।
(১৩) পাঁচালী গান : আব্দুল মালেক সরকার, মোঃ শাহজাহান আলী, এম.এ হানজালা, ওস্তাদ দেলোয়ার হোসেন প্রমূখ।
(১৪) লছীমন গান : ওস্তাদ দেলেয়ার হোসেন।
(১৫) বিচার গান বা পালা গান : শহীদ বাউল এম.এ.গফুর।

সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকা:

লোকসঙ্গীত শিল্পীরা একই শিল্পী বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীত গেয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ বিশেষ গানে এককভাবে পারদর্শী থাকেন। তাদের আলাদা আলাদা করে নির্ণয় করা কঠিন। তবে বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের যে সকল লোকসঙ্গীত শিল্পী রয়েছে নিম্নে তাদের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো:

www.pathagar.com

এম.এ. গফুর

শহীদ এম.এ.গফুর (রাজশাহী বেতারের উদ্বোধনী গায়ক), ফুল রেণু দাস (টিভি, বেতার), আব্দুল মালেক সরকার (বেতার), মো: শাহজাহান (বেতার), মো: আবুল কাশেম (বেতার), এম.এ হানজালা (বেতার), শারমিন আখতার মিতা (বেতার), মো: আবু সাঈদ (বেতার), মো: শরিফুল ইসলাম (বেতার), মোসা: শাম্মি (টিভি), আব্দুল জলিল, ওস্তাদ দেলোয়ার হোসেন (দিলালপুর), রওশন আলী ফকির (বনকুলা), মো: রহমত আলী (চরদুলাই), ওম্মত আলী ফকির (পার মালঞ্চি), তোফাজ্জল ফকির (রামচন্দ্রপুর), নবদ্বীপ হালদার (ভাউডাঙ্গা), আকবর আলী ফকির (শ্রীপুর), সুভাষ চন্দ্র (দূর্গাপুর), মধুসুধন সরকার (শ্রীপুর), মনোয়ারা বেগম (ডলি সায়ন্তনী ও বাদশা বুলবুলের মা, সোনাপট্টি), বিনয় পাটনী (সুজাপুর), নজরুল ইসলাম (আয়েনগঞ্জ), নবকুমার নন্দী (জোড় পুকুরীয়া), হাসান ফকির (রায় শিমুল), রনজিত কর্মকার (কইঝুড়ি), আব্দুল মজিদ (পিয়াদহ), লাকী খান (পাথরতলা), বাউল তোফাজ্জল হোসেন (চর ছাতিয়ানী), লুৎফর রহমান লালন (চর আশুতোষ পুর), আবেদ ফকির (কেদারপাড়া), ধীরাজ ফকির (গোপালপুর), মকরম ফকির (চারপাড়া) প্রমূখ।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের তালিকা

(১) মেয়েলি গীত	:	গ্রামের তরুণী ও মাঝবয়সী রমণীদের দল রয়েছে। তবে দলের তেমন নাম নেই।
(২) বরস্যা গান	:	বর্তমানে কোনো দলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
(৩) মাঙ্গার গান ও হেঁয়ালী	:	অঞ্চল ভিত্তিক এ গানের দল রয়েছে।
(৪) জাগ গান	:	নবকুমাররের দল।
(৫) সারি গান	:	নবদ্বীপ হালদারের দল।
(৬) ধুয়া গান	:	অঞ্চল ভিত্তিক এ গানের দল রয়েছে।
(৭) যাত্রাগান	:	বর্তমানে কোন দলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
(৮) ভাষাণ যাত্রা গান	:	বর্তমানে কোন দলের সন্ধান পাওয়া যায় নি।
(৯) জারি গান	:	এলাকা ভিত্তিক এ গানের দল রয়েছে।
(১০) কবি ও হোলী গান	:	ওম্মত আলী বয়াতীর দল, মালঞ্চী, পাবনা।
(১১) কীর্তন ও সংকীর্তন	:	ফুল রেণু দাস, মোঃ আবুল কাশেম (একক), পাবনা জয়কালী বাড়ি কীর্তনীয়া সম্প্রদায়।
(১২) বাউল গান	:	পাবনা বাউল গোষ্ঠী।
(১৩) পাঁচালী গান	:	শহীদ এম.এ. গফুর সাংস্কৃতিক একাডেমী, পাবনা।
(১৪) লছীমন গান	:	ছিন্নমূল সাংস্কৃতিক একাডেমী, গয়েশপুর।
(১৫) বিচার গান বা পালা গান	:	ওস্তাদ দেলোয়ার হোসেনের দল ও আব্দুল মালেক সরকারের দল।

www.pathagar.com

পাবনা মালেক সরকার ও তার দল

সনাক্তকৃত সামষ্টিক (দলীয়) সঙ্গীতের তালিকা

মেয়েলী গীত, বরস্যা গান, মাঙ্গার গান ও হেঁয়ালী, সারি গান, ধুয়া গান, যাত্রা গান, ভাসাণযাত্রা গান, জারি গান, কবি ও হোলী গান, কীর্তন ও সংকীর্তন, পাঁচালী গান, লছীমন গান, বিচার গান বা পালা গান।

সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা: মূলত জাগ গান ও বাউল গান ছাড়া আর কোন একক সঙ্গীত এ অঞ্চলে প্রচলিত নেই।

সনাক্তকৃত লোক বাদ্যযন্ত্রের তালিকা

ডুগডুগি, একতারা, দোতরা, ঢোলক, খোল, করতাল, প্রেমজুরী, খঞ্জরী, বেহালা, মন্দিরা, সারিন্দা, জিপসী, নাল, হারমনি, চাক, খমক, ঢোল, কাঁশি, আরবাঁশী, শংখ, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি।

সনাক্তকৃত বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

একমাত্র পাঁচালী গান বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে প্রোগ্রাম করে থাকে। বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের উল্লেখিত তালিকার অন্যান্য গানগুলোর তেমন বাণিজ্যিক মূল্যায়ন নেই।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬):

শহীদ এম.এ.গফুর সাংস্কৃতিক একাডেমীর শিল্পীরা পাঁচালী গান বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রোগ্রামে এবং প্রচার মাধ্যমে সম্মানীর বিনিময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। ২০০৬ সালে এই একাডেমীর শিল্পীরা বৃহত্তর পাবনা জেলায় গান গেয়ে লক্ষাধিক টাকা আয় করেছিল।

সনাক্তকৃত বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

বরস্যা গান, জাগ গান, ধুয়া গান, কবি ও হোলী গান।

সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা

যাত্রা গান, ভাসাণ যাত্রা গান। এ গান দু'টির অস্তিত বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলে লুপ্ত প্রায়।

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা?

লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক মূলত শিল্পীরাই। তবে লোক কবির অবদানও যথেষ্ট রয়েছে। লোকসঙ্গীতের যারা রূপকার তাদের নাম সব সময় পাওয়া যায় না। তবে বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের কিছু কিছু

www.pathagar.com

লোক কবির নাম পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার নামে স্মরণ করতে হয় বিশিষ্ট লোক কবি 'পাগলা কানাই' এর নাম। এছাড়া মখদুম বয়াতী, আলীমুদ্দি বয়াতী, ইদু বিশ্বাস, ভাজন শাহ, জবেদ আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুপারিশমালা

১. সংগ্রহ সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীত আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। এর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের প্রাচীন অনেক লোকসঙ্গীত ইতিহাসের পাতায় স্থান না পাওয়ায় হারিয়ে গেছে। অনেকগুলো বিলুপ্তির পথে। তারপরও এ অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, ড. মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক ফরিদ উদ্দীন, ড. আবদুল জলিল, ড. আবদুল খালেক প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোক সাহিত্য' প্রবন্ধ সংকলনটি এই সংগ্রহের দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের পর পাবনা অঞ্চলের লোক সাহিত্য সংস্কৃতির সংগ্রহের ক্ষেত্রে যিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন, তিনি অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন। লোক সাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে তিনি বাংলাদেশে অতুলনীয়। 'হারামনি' তাঁর সংগ্রহ গ্রন্থ। এছাড়া লোক সাহিত্য গবেষণায় ড. মযহারুল ইসলামের পাণ্ডিত্য সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। 'ফোকলোর পরিচিত এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন' গ্রন্থে পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি নিয়ে ড. মযহারুল ইসলাম যে মৌলিক গবেষণা করেছেন, তাতে 'পাবনার লোক সংস্কৃতি' সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। এ সকল মৌলিক গবেষণার পাশাপাশি বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে লোকসঙ্গীতের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু পাওয়া যায়, তার কোনো কিছু বাদ না দিয়ে অডিও ও ভিডিওতে ধারণ করে সংগ্রহ করা উচিত। যা পরবর্তীতে গবেষকদের কাছে আকর হিসেবে কাজে লাগবে।

২. সংরক্ষণ সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীত সংগ্রহ যেমন বড় কাজ, তার সংরক্ষণের কাজটিকেও ছোট করে দেখার কোনো পথ নেই। ব্যক্তি পর্যায়ে এ কাজটি আমরা অনেকেই করে থাকি। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাবনা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত সংরক্ষণের কাজটি ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। লোকসঙ্গীত ঠিকমত সংরক্ষণ করে না রাখতে পারলে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। লোকসঙ্গীত আমাদের সংস্কৃতির শিকড়। একে সংরক্ষণ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। স্থানীয়ভাবে লোকসঙ্গীত একাডেমী, সংগ্রহ শালা, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা

পাবনার পাঁচালী গান

www.pathagar.com

করে সংগৃহীত সবকিছু সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি সংগ্রহের এই পবিত্র দায়িত্ব দীর্ঘকাল ধরে পালন করে আসছে পাবনার শতবর্ষের প্রাচীন 'অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি'।

৩. উপস্থাপন সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীত শুধু সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করলেই চলবে না। একে উজ্জীবিত রাখতে হলে প্রথমে অঞ্চলভিত্তিক এবং পরে জাতীয় পর্যায়ে লোকসঙ্গীত উৎসব করতে হবে। যে মহান দায়িত্ব এবারে পালন করছে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৪. মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: যে কোনো বিষয় উদ্ভাবন গবেষণারই ফসল। তার প্রকৃত স্বীকৃতি দেওয়া সকলেরই উচিৎ। লোকসঙ্গীতগুলো অনেক অক্ষরহীন মানুষের শিল্প সাধনার ফসল। তারাই প্রকৃত মেধাস্বত্বের অধিকারী। কিন্তু লোকসঙ্গীতের সেই সকল শিল্পীরা তাদের প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্মানী হতে সর্বদা বঞ্চিত। তারা অঞ্চল থেকে কোনো স্বীকৃতি পায় না। বিধায় তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত করার দায়িত্বগ্রহণ করা উচিৎ। কৃষি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য হরিপদ কাপালীর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপসংহার: পরিশেষে বলতে পারি, বৃহত্তর পাবনা জেলার লোকসঙ্গীত থেকে অতীত জীবনের রূপ ও রীতির কথা জানতে পারা যায়। এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত জীবনের সুদূর অতীতের কল্পিত লোক কাহিনীকে কিছুটা বুদ্ধি ও নির্মল হাস্যরসকে আশ্রয় করে আদিম জাতিসুলভ বোধ থেকে মার্জিত রূপ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। এ সকল লোকসঙ্গীত রচনায় সহজ অনুপম চিত্রকল্প, অর্থ, ধ্বনিমাধুর্য কানের ভিতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে। পাবনা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, ছড়া, ধাঁধা প্রভৃতি লোকশিল্প অতীত গণমানসের চিত্ত প্রাচুর্যের কথাকে তুলে ধরে। এর গ্রথিত বিষয়ের ভাব, চিত্র হয়ে কথা কয় প্রাণে প্রাণে। লোকসঙ্গীত আমাদের সংস্কৃতির শিকড়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। একে সংরক্ষণ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। পাবনা অঞ্চলের তথা সারা দেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে পারলে দেশ এবং জাতির জন্য তা হবে মহা কল্যাণকর।

তথ্যসূত্র:

শ্রী রাধারমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ১ম, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড, পাবনা, ১৩৩৩
সি.এম.বদরুদ্দোজা, *জিলা পাবনার ইতিহাস*, পাবনা, ১৯৮৬
এম.এ.হামিদ, *চলন বিলের ইতিকথা*, পাবনা, ১৯৬৭
ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোক সংস্কৃতি, বা/এ, ঢাকা, ১৯৭৪
মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র লোক সংস্কৃতি*, বা/এ, ঢাকা, ২০০২
বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ৫, ১০ খণ্ড, ঢাকা, ২০০৩
স্মরণিকা, *পাবনা দিবস*, পাবনা ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, ১৯৯৩
তবর্ষ স্মরণিকা, পাবনা পৌরসভা, পাবনা, ১৯৭৬
তবর্ষ স্মরণিকা, অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি, পাবনা, ১৯৯০
শফিকুল ইসলাম শিবলী (সম্পাঃ), *বন্দে আলী মিয়া জন্ম শতবর্ষ স্মারক*, পাবনা, ২০০৫
ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ
পরিতোষ কুমার কুন্ডু, প্রবন্ধ, পাবনা জেলার প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন: বর্তমান প্রেক্ষাপট, *সঙ্কলন*, বাশি/এ, পাবনা, ২০০২
মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০১
সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭০)*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩
মনোয়ার হোসেন জাহেদী, *শতাব্দীর ছায়াপথে এডওয়ার্ড কলেজ*, পাবনা, ১৯৯৯
হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, বা/এ, ঢাকা, ১৯৮২
দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, ২য় খণ্ড, কলকাতা।
Nurul Islam Khan (Ed.), *Bangladesh District Gazatteers*, Pabna, Dhaka, 1974
OMalley, L.S.S. *Bengal District Gazatteers (Pabna)*, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1923

সাক্ষাৎকার:

আব্দুল মালেক সরকার, বেতার শিল্পী ও বাউল গবেষক (পাবনা)
ফুল রেণু দাস, টিভি ও বেতার শিল্পী (পাবনা)

www.pathagar.com

মোঃ শাহজাহান আলী, সাংস্কৃতিক সংগঠক (সিরাজগঞ্জ)
মোঃ আবুল কাশেম, বেতার শিল্পী (পাবনা)
এম.এ. হানজালা, বেতার শিল্পী (পাবনা)
মোঃ আবু সাঈদ, সাংস্কৃতিক সংগঠক (হামিদপুর)
মোঃ শরিফুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সংগঠক (সিরাজগঞ্জ)
মোসাঃ শাম্মি, টিভি শিল্পী, (পাবনা)
আব্দুল জলিল, সাংস্কৃতিক সংগঠক (পাবনা)
শারমিন আকতার মিতা, বেতার শিল্পী (নাজিরপুর)
ওম্মত আলী ফকির, কবি গানের শিল্পী (মালঞ্চী)
রওশন আলী ফকির, সাংস্কৃতিক সংগঠক, প্রায় ১০০ বছরের প্রবীণ (বনকুলা)
মোঃ রহমত আলী, সাংস্কৃতিক সংগঠক (সিরাজগঞ্জ)
সুভাষ চন্দ্র, সাংস্কৃতিক সংগঠক, (দুর্গাপুর)
মধুসূদন সরকার, সারি গানের শিল্পী (শ্রীপুর)
মানোয়ারা বেগম, সাংস্কৃতিক সংগঠক (সোনাপট্টি)
বিনয় পাটনী, সাংস্কৃতিক সংগঠক, (সুজাপুর)
বাউল তোফাজ্জল হোসেন, সাংস্কৃতিক সংগঠক, (চক ছাতিয়ানী)
নব কুমার নন্দী, সাংস্কৃতিক সংগঠক, (জোড়া পুকুরীয়া)
রনজিত কর্মকার (অন্ধ), সাংস্কৃতিক সংগঠক, (কইঝুড়ি)
নজরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সংগঠক, (আয়েনগঞ্জ)
লাকী খান, সাংস্কৃতিক সংগঠক (পাথর তলা)
আবেদ ফকির, সাংস্কৃতিক সংগঠক (কেদার পাড়া)
আব্দুল মজিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠক, (পিয়াদহ)
লুৎফর রহমান, লালন শিল্পী, (চর আশুতোমপুর)।

www.pathagar.com

৮.২ বগুড়া জেলার লোকসঙ্গীত

মোহাম্মদ শহীদ সারওয়ার

ভূমিকা: প্রচলিত প্রবাদ, 'বাঙালির গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গান'। এর মর্ম বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য ও গানে সমৃদ্ধ জাতি। গোলার ধানের ঐতিহ্য হারালেও গানের ঐতিহ্য এখনও হারায়নি, এ কথা দাবির সাথে বলা যায়। এ গান কিন্তু আধুনিক গান নয়, লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বাঙালির ঐতিহ্য লোকসঙ্গীতের সঙ্গে অন্যান্য দেশজাতির অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের সাধারণ সাযুজ্য অবশ্যই রয়েছে। তারপরও লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দেয়া কঠিনভাব, চিত্র, কাহিনী অবলম্বনে সুরাশ্রিত মৌখিক রচনাকেই সাধারণভাবে লোকসঙ্গীত বলা হয়। লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন সংজ্ঞায় পণ্ডিতদের মধ্যে ফারাক রয়েছে, তবে সেখানে সাধারণ ভাবে ঐক্যও বিদ্যমান।

বৃহত্তর বগুড়া জেলা পরিচিতি

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চল লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ ভূখণ্ড। এ ঐতিহ্য অনুযায়ী বৃহত্তর বগুড়া জেলাও (১৮২১ সালে স্বীকৃত) লোকসঙ্গীতসমৃদ্ধ। বৃহত্তর বগুড়ার কিয়দংশ পরিপূর্ণ বরেন্দ্র লক্ষণাক্রান্ত নয়, তথাপি তা বরেন্দ্র লোকসংস্কৃতিমণ্ডিত, লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তা-ই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের একযুগ (প্রায়) পর প্রশাসনিক বিভাজনের ধারায় ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর বগুড়া জেলা হালের বগুড়া ও জয়পুরহাট নামক দু'টি জেলায় বিভাজিত হয়।

ক. বগুড়া জেলা: এ জেলার আয়তন ২৯১৯.৯ বর্গ কি.মি.। আঞ্চলিকভাবে এ জেলার মাটি 'খিয়ারা' ও 'পলি' এ দু'ভাগে বিভক্ত। এর উত্তরে জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলা, দক্ষিণে চলনবিল, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা, পূর্বে যমুনা নদী ও নাটোর জেলা। এ অঞ্চল প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্রবর্ধনের অংশ ও ঐতিহ্যবাহী মহাস্থানগড়ের ধারক। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে মেলে, সমুদ্রগর্ভ থেকে ভারত উপদ্বীপের হিমালয় পাদদেশ সংলগ্ন যে অংশ সর্ব প্রথম জেগে ওঠে তা হলো বরেন্দ্র অঞ্চল। মহাস্থানগড়ের বিস্ময়কর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন দেখে এ ধারণা জন্মে যে, বগুড়া জেলাতেই বাংলার প্রথম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা গঠনে আর্য ভাষার বিশেষ অবদান রয়েছে। মহাস্থানগড়ের প্রাপ্ত আর্য ভাষার শিলালিপি এ ধারণার জন্ম দেয় যে, মহাস্থানময়ী বগুড়া জেলা এদেশের কৃষ্টির মানমন্দির হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবিদার। মৌর্য, পাল, সেন, মুসলমান, বৃটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত বগুড়ার ইতিহাস; যা বাঙালির ইতিহাস ও সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক।

দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন বলবনের পুত্র নাসির উদ্‌দীন বলবন ওরফে বগ্‌রা খাঁর (১২৭৯-১২৮১ খৃষ্টাব্দে) নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম বগুড়া হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। এ জেলার মুসলিম ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তবে ইতিহাস ও জীবিকার প্রয়োজনে নানা মানুষের মিলনে-মিশ্রণে বর্তমানের যে মিশেল বাঙালি, বগুড়ার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সে মিশেল পরিচয় স্পষ্টরূপে বহন করে।

বিভিন্ন ধরনের লোকসাহিত্যছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মন্ত্র, লোককাহিনী, কিংবদন্তি, লোকসঙ্গীত এখানে প্রচলিত। বিভিন্ন লোকখেলাধূলা জেলায় প্রচলিত রয়েছে। এসব মিলিয়ে এ জেলা আলাদা সংস্কৃতির স্মারকে চিহ্নিত:

মোরা বগড়ার ছৈল্
পুঁটি মাছ ধোরব্যার যায়্যা হামরা ধরি বৈল্।

খ. জয়পুরহাট জেলা: এ জেলার আয়তন ৯৬৫.৪৪ বর্গ কি.মি.। এ জেলার মাটিও 'খিয়ারা' ও 'পলি' দু'ভাগে বিভক্ত। জেলার উত্তরে দিনাজপুর জেলা, পূর্বে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে বগুড়া ও নওগাঁ জেলা, পশ্চিমে নওগাঁ জেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য।

www.pathagar.com

রাজা জয়পালের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের ধারক এ অঞ্চলটি অবশ্যই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। 'ভীমের পান্টি' নামক স্থানে গড়ুর স্তম্ভ ও নিমাই পিরের দর্গা ইতিহাসের দিকনির্দেশক। মহাস্থানগড়ের পার্শ্ববর্তী স্থান ও বৃহত্তর বগুড়ার বিভাজিত অংশ বলে এ অঞ্চলের সঙ্গেও মৌর্য, পাল, সেন, মুসলমান ও বৃটিশ শাসনামলের ইতিহাস সম্পৃক্ত থাকাই স্বাভাবিক।

বৃটিশ আমলের নিষ্ঠুর শাসনের হাত থেকে স্বদেশ রক্ষায় বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় কমরেড মোঃ আব্দুল কাদের চৌধুরী ও মিহির মুখার্জীর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বোমা মেরে ট্রেন আক্রমণে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনার পর ব্যাপক নিরাপত্তা অভিযান চালিয়ে তাদেরকে বৃটিশ বাহিনী গ্রেফতার করে এবং আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাক্ষী হিসেবে বধ্যভূমি ও গণকবরগুলো আজও অমলিন। এখানকার মানুষও বাঙালি নৃ-তত্ত্বের ধারায় আধুনিক মিশেল বাঙালির সাক্ষ্যবাহী।

বগুড়া জেলার মতো এখানে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির ধারা সমৃদ্ধ। বিচিত্র লোকখেলাধূলাও এখানে বিদ্যমান।

বৃহত্তর বগুড়া জেলার সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা ও ধারাবাহিক পরিচিতি

বরেন্দ্রের এ অঞ্চল লসিমন, একদিল (একক ও দলগত), পাতারা বা মহড়া, মেয়েলি গীত বা গীদ, ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্ড়ি, কিচ্ছা, হালকা জিকিরের গান, যুগীকাস, নিমাই চন্দ্রের গান, ঘনাইবিবি, মাদারের গান, লক্ষ্মীণ বালান্দর বা বালা লক্ষ্মীন্দরের গান, গহর বাদশা ও বানেছা পালা, ছন-কবির গান, মালসী, কবিতা ইত্যাদি লোকসঙ্গীতধন্য জনপদ।

ক. লসিমন: এটি খুব জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। নৃত্য-গীতাভিনয়ের মাধ্যমে এ গান পালা আকারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। চিকন কণ্ঠস্বর ও সুশ্রী আদলের পুরুষ নারীর পোষাক পরে, 'ছোকরা' সেজে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করে। এ ছোকরা গীতাভিনয় ছাড়াও বিশেষ ভঙ্গির খ্যামটা নাচের মাধ্যমে দর্শককে বাড়তি আনন্দ দেয়। লসিমন গানের নায়ক চরিত্রের নাম আলম সওদাগর।

খোলামঞ্চ অর্থাৎ মঞ্চহীন বৃত্তাকার মৃত্তিকার উপরই সাধারণত এ গান উপস্থাপন করা হয়। প্রধান দুই চরিত্র ছাড়াও আট থেকে দশ জনের সহযোগী দল (দোহারবৃন্দ) বা 'পাঁচদল' ৭ বাদ্যযন্ত্রে সুর তোলে ও কোরাস গায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, ঢোল, করতাল, জুড়ি ও বাঁশের বাঁশি বহুল ব্যবহৃত। কখনো অন্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়।

ওরে বিদায় দ্যান
বিদায় দ্যান লসিমন
ও লসিমন বিদায় দ্যান আমারে
তুমি যদি বিদায় না দ্যাও
তাহলে আমার বণিজ হৈবে না
খুশিমনে বিদায় দ্যান আমারে।
বিদায়লগ্নে লসিমনও গানে গানে জবাব দেয়
ও স্বামীধন লসিবে মোর
এতই দুঃখ ছিল রে ... ...

খ. একদিলের গান

এটি 'মানত' অর্থাৎ প্রত্যাশা পূরণের গান। বৃষ্টির বাসনায় মূলত এ লোকসঙ্গীত গীত হয়ে থাকে। দারুণ খরায় বৃষ্টিপ্রত্যাশী মানুষ 'গাতক' ডেকে এ গান করিয়ে নেয় গান শেষ না হওয়ার পূর্বেই আকাশের বৃষ্টি জমিনে নামবে এমন লোক বিশ্বাস এ অঞ্চলের মানুষের মনে বদ্ধমূল। এ গানের জন্য গাতকদলকে অর্থের চুক্তিতে আমন্ত্রণ করা হয়। এটি ছাড়াও গান পরিবেশনের সময় গাতক উপস্থিত শ্রোতাদের কাছ থেকে অর্থ,

www.pathagar.com

চাল-ডাল-আনাজ যাচনা করে। কখনো এককভাবে আবার কখনো বা দলগতভাবে এ গান উপস্থাপিত হয়। একক গানের ক্ষেত্রে করতাল বা জুড়ি বাজিয়ে বর্ণনামূলকভাবে বিশেষ সুরে এ লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। নায়ক, নায়িকা ও সাধুবাবার অংশগুলো গায়ক একাই পরিবেশন করে। এ ধরনের একদিল গানে সাজসজ্জার ব্যাপারটি গৌণ। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খঞ্জনী ও করতাল ব্যবহৃত হয়।

এ ধারাবাহিক গানের ভেতর দিয়ে একটি কাহিনী রূপ লাভ করে। অন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই। সাধারণ গ্রাম্যরীতি অনুযায়ী সুশ্রী চেহারার পুরুষই নারীবেশে 'ছাকরা' বা নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করে। বৃত্তাকার ভূমিমঞ্চে এ লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দর্শক-শ্রোতা ভূমিমঞ্চের চতুর্পার্শ্বে, মাটিতে বসে।

আমি কুন বনে যাবো
কুথায় গেলে বাছার লাগাল পাবো
বাছার লাগিয়া আমি গলায় দড়ি দিবো
কুথায় গেলে বাছার লাগাল পাবো
বাছার লাগিয়া আমি নদীতে ঝাঁপ দিবো
আমি কুন বনে যাবো
কুথায় গেলে বাছার লাগাল পাবো।

গ. পাতারা বা লহড়া: এই লোকসঙ্গীত মূলত ফসল কাটা-বোনা, চাষ-বাস ও কদাচিৎ অবসরেও কৃষি সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবী মানুষ গেয়ে থাকে। একক ও কোরাস উভয়ভাবে এটি গীত হয়ে থাকে। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষে তালি বাজিয়ে তাল রক্ষা করা হয়। এ গানে প্রেমপ্রসঙ্গ প্রধান, তবে কদাচিৎ নিজেদের আনন্দ-বেদনার কথাও স্থান পায়। বরেন্দ্রের নিঃসীম প্রান্তরে এ লোকসঙ্গীতের সুর তরঙ্গায়িত হয়ে প্রতিধ্বনি তোলে এবং সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্রের বিমূর্ততাকে ধারণ করে। অন্যান্য স্থানের শ্রমসঙ্গীতের মতো এ লোকসঙ্গীত কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করলেও তা ভিন্ন আবেদনে ঋদ্ধ, সে আবেদন প্রেম। বরেন্দ্র প্রান্তর তরঙ্গায়িত করে তোলা এ গানের সুর কোকিল-ঘুঘুর নৈসর্গিক সুরতুল্য।

দক্ষিণ দ্যাশে থাকো বন্ধু উত্তর দ্যাশে তোর থানা
রাইতে আইসো রাইতে যায়ো দিনে করি মানা রে
ঐ পারে তো বুনলাম ধান টিয়া খাইল রে বুইন্যা
তোমার সোনামুখে দিতে চুমা রে আমার লাখের ভাঙলো সোনা
ও প্রাণ বন্ধুয়া রে
ব্যাতের আড়ে থাকো বন্ধু ব্যাতের ভাঙো আগা
আবালকালে করলে পিরীত বন্ধু যুবাকালে ক্যানো দাগা রে
ও মোর সোনা বন্ধু রে
পান খেয়োছো চুন খেয়োছে বন্ধু দাঁত করিলে সোলা
ও প্রাণ বন্ধুয়া রে
ও মোর সোনা বন্ধু রে

ঘ. মেয়েলি গীত বা গীদ: বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বৃহত্তর বগুড়া জেলাতেও মেয়েলি গীত বা 'গীদ' ব্যাপক জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। বিয়ে, খাতনা, সাঠিরা ইত্যাদিতে এর বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। অলস অবসরে, ঘুমপাড়ানিতে এবং ঢেঁকি-জাঁতার কাজেও এটি গীত হয়ে থাকে। কিন্তু এর সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় বিবাহ উৎসবে। বৈবাহিক আচারের বিভিন্ন পর্ব-পর্যায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মেয়েলি গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ গীত ছাড়া বিয়ে ও খাতনার অনুষ্ঠান বাংলার গ্রামাঞ্চলে যেন অপূর্ণ থেকে যায়। কিছুদিন পূর্বেও ফসল ওঠা, খড়ের গাদা দেওয়া ও পিঠা-পুলির উৎসবে এ গানের প্রচলন ছিল।

www.pathagar.com

এ অঞ্চলের লোকজীবনের আনন্দ-যন্ত্রণা ও প্রেম-ব্যর্থতা ইত্যাদি এ গানে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। সমগ্র বাংলার মেয়েলি গীতের মতো এখানকার এ গীতের ভাষা সহজ-সরল ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগে বিশিষ্ট। একান্তে গাওয়ার সময় কিছু অশ্লীল গীতও তারা পরিবেশন করে থাকে, সেখানে শ্রোতা হিসেবে পুরুষের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। যে অশ্লীলতাকে চলতি গ্রাম্যতা হিসেবে চিহ্নিত করাই উত্তম। কেননা গ্রামের সাধারণ মানুষ কথা বলার সময় এমন কিছু শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করে থাকে যা ভদ্র সমাজে দূষণীয়। এ সব বৈশিষ্ট্য নিয়েই স্থানিক জীবনের ভাষা ও বক্তব্যের মাধ্যমে বগুড়া অঞ্চলের মেয়েরা হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে।

ঐ কুয়ার পাড়ে মেন্দির গাছ
ঝিরিঝিরি যে তার পাতা লো
ঐ পাড়াতে গেলে রে চুড়িয়ালা
আমরাই নিবো চুড়ি লো চুড়িয়ালা
তোমার চুড়ির দাম লো
কতোই বা টাকা লো চুড়িয়ালা
আমার চুড়ির দাম লো বাড়িআলী আটানা-চারানা লো

{চুড়ির পর অন্যান্য গ্রাম্য গহনা যেমন – মালা, নথ ইত্যাদি দিয়ে লোকসঙ্গীতটি চলতে থাকে}

ঙ. ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্‌ড়ি: এটি মূলত বৃষ্টি প্রার্থনার গান। দারুণ খরায় কিংবা ফসলী জমিতে বৃষ্টির প্রয়োজনের সময় এ অঞ্চলের কিশোর-কিশোরী দল বেঁধে, হল্লা করে ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্‌ড়ি পরিবেশন করে থাকে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরনের গানের প্রচলন রয়েছে।

বৃষ্টির সঙ্গে ফসল ও মনুষ্যজীবনের সম্পর্ক নিবিড় বলে বিশ্বের নানা অঞ্চলে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনার রীতি বিদ্যমান। চাঁপাইনবাবগঞ্জের 'ব্যাঙকুটা গীদ', রংপুরের 'হুদুমার গান', ময়মনসিংহের 'ব্যাঙের বিয়া' এগুলো একই উদ্দেশ্যে গীত কাছাকাছি শ্রেণীর লোকসঙ্গীত।

ঝাপুড়ির গীত গাওয়ার সময় দলবদ্ধ কিশোর-কিশোরীরা প্রথমে জমায়েত হয় এবং একটি স্থানে গর্ত করে তার মধ্যে কলা গাছ লাগায়। তারপর কোরাসে শুরু করে ঝাপুড়ির গান। মেয়েলি গীতের সাথে ঝাপুড়ির সাদৃশ্য থাকলেও তা মূলত মেয়েলি গীত নয়। হুদুমার গীতে প্রচুর অশ্লীলতা রয়েছে কিন্তু ঝাপ্‌ড়িতে অশ্লীলতা নেই। কম বয়সী মেয়েরা ব্যাঙ ধরে তেলসিঁদুরে সজ্জিত করে, নিজেদের সৃষ্ট ছোট চৌবাচ্চা বা গর্তে কলাগাছ লাগিয়ে গর্তের চারধারে এ গান শুরু করে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, তরকারি, মসলাপাতি ইত্যাদি চেয়ে নেয় এবং অনুষ্ঠান শেষে খিচুড়ি রান্না করে খেয়ে এ গানের সমাপ্তি টানে। এতে বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী বলে বগুড়া অঞ্চলের মানুষের লোকবিশ্বাস প্রবল। ঝাপ্‌ড়ি সচরাচর নিম্নোক্ত গীতটি দিয়ে শুরু করা হয়:

ঝাপুড়ির তলে সিকোটার মাটি
ঝাপুড়ি হামার আছে খাঁটি
পান আলা ভাই রে পান দিয়্যা যাও মা রে মা রে
হামার ঝাপুড়ির বিহ্যা হে শুক্রবারে।

চ. কিচ্ছা: সাম্প্রতিক বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলে কিচ্ছা নামে এক ধরনের লোকসঙ্গীত বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রচলিত লোককাহিনী কিংবা সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে মূলত ছড়া গানের সুরে এটি পরিবেশিত হয়। নওগাঁ অঞ্চলে এ গানের ব্যাপক প্রচলন ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। পূর্বে বরেন্দ্রের অন্য অঞ্চল থেকে গায়েন এসে এ গান পরিবেশন করত। জনমনে বিশেষ আগ্রহের কারণে স্থানিকভাবে বৃহত্তর বগুড়া জেলার কোনো কোনো স্থানে এ গানের চর্চা শুরু হয়েছে। বর্তমানে জয়পুর হাট জেলার রায়কলি বাজারের দুলাল গাতক (বয়স আনু. ৪৮) ও বাবর গাতক (বয়স আনু. ৫০) এ গান পরিবেশন করে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন। শাঁওইল বাজারের আব্দুর রাজ্জাক (বয়স আনু. ৪৮) অন্যান্য লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি কিচ্ছা পরিবেশন করে থাকেন।

www.pathagar.com

বরেন্দ্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের কাহিনী, কিংবদন্তি, পালা, সাম্প্রতিক ঘটনা ইত্যাদি-ই কিচ্ছার মূল প্রতিপাদ্য। পূর্বের বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু পালা যেমনগহর বাদশা ও বানেসা পালা, শীত-বসন্ত ইত্যাদি কিচ্ছায় গীত হয়ে থাকে। এগুলো খুব জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। এতে গানের পাশাপাশি গদ্যকথনও চলতে পারে। কখনো একক কাহিনীর বর্ণনা, কখনো প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে এ গান পরিবেশিত হয়। জুড়ি, ঢোলক, সারিন্দা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের আনুষঙ্গিক ব্যঞ্জনায় এই গানের আসর জমজমাট হয়ে ওঠে।

ছ. হালকা জিকিরের গানঃ উঠানে পোঁতা লম্বা বাঁশের আগায় লাল পতাকা দেখলে সহজেই অনুমিত হয় যে, এ গৃহে পিরের মুরিদ রয়েছে এবং এখানে ধর্মীয় লোকসঙ্গীত সামাকাওয়ালি পরিবেশিত হয়। সামাকাওয়ালির আঞ্চলিক নাম হালকা জিকিরের গান। মধ্যযুগ থেকে বরেন্দ্রে বিশেষ করে বৃহত্তর বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক পির-আওলিয়ার আগমন ঘটে। তাঁদের আচার-আচরণ ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে।

ইসলামি পীরবাদে কয়েকটি সম্প্রদায় ধর্মীয় সিদ্ধপ্রথার পাশাপাশি মনে আরো আধ্যাত্মিক জোস আনয়নের লক্ষ্যে এক ধরনের পীর-মুর্শিদি গান পরিবেশন করে থাকে। এ গানের আঞ্চলিক রূপই স্থানিকভাবে হালকা জিকিরের গান নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কাওয়ালি বেশ পুরনো ধর্মসঙ্গীত। এটি বাংলাদেশি গান না হলেও পরবর্তীকালে বাংলায় এ গান রচিত হতে শুরু করে। বাংলায় রচিত সামাকাওয়ালিগুলোর মধ্যে এক সময় বগুড়া অঞ্চলের লোকভাষা প্রবেশ করে। কিছু কিছু গান বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষাতেও রচিত হয়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই গানগুলোকে হালকা জিকিরের গান নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যদিও তা পীরবাদী মানুষ ছাড়া জনমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। সামাকাওয়ালির মতো এ গানের সময়ও হালকা বাদ্য ও হাততালি ব্যবহৃত হয়। এ গান লোকসঙ্গীত কি না তা নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনা থাকলেও এ অঞ্চলের লোকভাষায় রচিত হালকা জিকিরের গানগুলো জনপ্রিয়তা পেলে পুরোদস্তুর লোকসঙ্গীতের মর্যাদা পাবে বলেই বিশ্বাস:

দাঁড়াও এসে প্রাণের বন্ধু দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই
আমার কেন্দে কেন্দে দিন ফুরাল এই হৃদয় কপাট খুলা রইল
এই নিশি প্রভাত হইল জাগিয়্যা নিশি পোহায়
বন্ধু দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই
আর কতো সহিব প্রাণে বুঝাইলে বুঝ্ নাহি মানে
জইল্যা পুইড়্যা হইলাম ছাই, দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই
আমি তোমার অভাজনও দাস, দাসের প্রতি মিটাও মনের আশ
আমার আশামূল না হয় বিনাশ তোমার চরণের দোহায়
বন্ধু দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই।

জ. যুগীকাসঃ বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলে একসময় যুগীকাস গান ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। দলগত এ গানে ধর্মীয় প্রভাব থাকলেও ধর্ম নির্বিশেষে তা আমজনতার আনন্দের উৎস ছিল। বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে খোলামঞ্চে এটি পরিবেশিত হতো।

ঝ. নিমাইচন্দ্রের গানঃ লোকনাট্যধর্মী এ গান বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে খোলামঞ্চে পরিবেশিত হতো। এগানেও ধর্মীয় প্রভাব থাকে।

ঞ. ঘনাই বিবিঃ এ গান লোকনাট্যধর্মী। বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এ গান নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সুন্দর আদলের তরুণ এগানে নারীর পোশাকে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করে।

ট. মাদারঃ এটি মূলত মানতের সনাতন গান। গান ও গদ্য কথনের মাধ্যমে অভিনয় আকারে তা পরিবেশিত। সুশ্রী পুরুষই এগানে নারীর বেশে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করে। এ গানে ছোকরা নাচের ব্যবস্থা আছে।

www.pathagar.com

ঠ. লক্ষ্মীণ বালান্দর: এটি পালাধর্মী লোকসঙ্গীত। লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী এ গানের উপজীব্য। প্রচলিত কাহিনী লোককবিদের মুখে মুখে ঈষৎ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে নিজস্ব ধরনও সৃষ্টি হয়।

ড. গহর বাদশা ও বানেছা পালা: পুঁথি সাহিত্যের কাহিনীনির্ভর লোকনাট্য ধর্মী এ লোকসঙ্গীত ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয়। মুসলিম বীরত্ব প্রচার এর উদ্দেশ্য হলেও মানবিক প্রেমানুভূতি এর অন্যতম আবেদন।

ঢ. ছন কবির গান: এটি এক ধরনের কবি গান। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির এ গান আজ বিলুপ্ত। প্রশ্নোত্তর ধরনে তা পরিবেশিত হতো।' ৪৭ এর দেশ বিভাগ পূর্বকালে এ গান ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল।

ণ. কবিতা: বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বৃহত্তর বগুড়া জেলাতেও 'কবিতা' নামে পরিচিত এক ধরণের লোকসঙ্গীত মানুষকে আনন্দ দেয়। সমসাময়িক জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে এ লোকসঙ্গীত রচিত হয়। এ ধারাটি বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু। বাংলাদেশের অন্যত্র এটি 'পথকবিতা' নামেও পরিচিত। তবে এর প্রচলন কখনও ব্যাপক ছিল না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতগুলোর স্থানিক উৎপত্তিস্থল

ক.	লসিমন	-	জয়পুরহাট জেলা।
খ.	একদিল	-	জয়পুরহাট জেলা।
গ.	পাতারা বা লহড়া	-	বগুড়া-জয়পুরহাট জেলার গ্রামাঞ্চল।
ঘ.	মেয়েলিগীত বা গীদ	-	বগুড়া-জয়পুরহাট জেলার গ্রামাঞ্চল।
ঙ.	ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্‌ড়ি	-	বগুড়া-জয়পুরহাট জেলার গ্রামাঞ্চল।
চ.	কিচ্ছা	-	বগুড়া জেলা ও জয়পুর হাট জেলা।
ছ.	হালকা জিকিরের গান	-	জয়পুহাট ও বগুড়া জেলা।
জ.	যুগীকাস	-	স্থানিক উৎপত্তিস্থল অনির্ণীত। তবে বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঝ.	নিমাই চন্দ্রের গান	-	স্থানিক উৎপত্তিস্থল অনির্ণীত। তবে বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঞ.	ঘনাইবিবি	-	স্থানিক উৎপত্তিস্থল অনির্ণীত। তবে বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ট.	মাদারের গান	-	স্থানিক উৎপত্তিস্থল অনির্ণীত। তবে বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঠ.	লক্ষ্মীণ বালান্দর	-	স্থানিক উৎপত্তিস্থল অনির্ণীত। তবে বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ড.	গহর বাদশা ও বানেছা পালা	-	স্থানিক উৎপত্তিস্থল অনির্ণীত। তবে বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঢ.	ছন কবির গান	-	স্থানিক উৎপত্তিস্থল অনির্ণীত। তবে বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ণ.	কবিতা	-	বগুড়া ও জয়পুর হাট জেলাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য রেলসংলগ্ন অঞ্চল।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীগুলোর পরবর্তী বিস্তৃতি অঞ্চল

ক.	লসিমন	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
খ.	একদিল	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
গ.	পাতারা বা লহড়া	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঘ.	মেয়েলিগীত বা গীদ	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঙ.	ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্‌ড়ি	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
চ.	কিচ্ছা	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ছ.	হালকা জিকিরের গান	-	বগুড়া জেলা পর্যন্ত।
জ.	যুগীকাস	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঝ.	নিমাই চন্দ্রের গান	-	বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।

www.pathagar.com

ঞ. ঘনাইবিবি - বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ট. মাদারের গান - বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঠ. লক্ষ্মীণ বালান্দর - বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ড. গহর বাদশা ও বানেছা পালা - বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ঢ. ছন কবির গান - বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল।
ণ. কবিতা - বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল সহ সারাদেশ।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতগুলোর স্রষ্টা তালিকা

ক. লসিমন - অনির্ণীত।
খ. একদিল - অনির্ণীত।
গ. পাতারা বা লহড়া - অনির্ণীত।
ঘ. মেয়েলিগীত বা গীদ - জয়পুর হাট ও বগুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের মহিলারা।
ঙ. ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্ড়ি - জয়পুর হাট ও বগুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের কিশোর-কিশোরীরা।
চ. কিচ্ছা - অনির্ণীত।
ছ. হালকা জিকিরের গান - অনির্ণীত।
জ. যুগীকাস - অনির্ণীত।
ঝ. নিমাই চন্দ্রের গান - অনির্ণীত।
ঞ. ঘনাইবিবি - অনির্ণীত।
ট. মাদারের গান - অনির্ণীত।
ঠ. লক্ষ্মীণ বালান্দর - অনির্ণীত।
ড. গহর বাদশা ও বানেছা পালা - অনির্ণীত।
ঢ. ছন-কবির গান - অনির্ণীত।
ণ. কবিতা - অনির্ণীত।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতগুলোর স্থানিক শিল্পী তালিকা

ক. লসিমন - মাবুদ মণ্ডল ও তাঁর দল, কুটিল রাজবংশী ও তাঁর দল।
খ. একদিল - মাবুদ মণ্ডল ও তাঁর দল, কুটিল যোগেস রাজবংশী ও তাঁর দল।
গ. পাতারা বা লহড়া - গ্রামাঞ্চলের কৃষি শ্রমজীবী মানুষ।
ঘ. মেয়েলিগীত বা গীদ - গ্রামাঞ্চলের মহিলারা।
ঙ. ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্ড়ি - গ্রামাঞ্চলের কিশোর-কিশোরীরা।
চ. কিচ্ছা - রাইকলি বাজারের বাবর গাতক, দুলাল গাতক ও শাঁওইল বাজারের আব্দুর রাজ্জাক গাতক।
ছ. হালকা জিকিরের গান - আলম মণ্ডল, তোজাম্মেল হোসেন।
জ. যুগীকাস - ফজর আলী ও ফসর আলী।
ঝ. নিমাই চন্দ্রের গান - সুবোধ সাধু।
ঞ. ঘনাইবিবি - আব্দুল জলিল ও তাঁর দল।
ট. মাদারের গান - তুবানী গাতক ও তাঁর দল।
ঠ. লক্ষ্মীণ বালান্দর - তুবানী গাতক ও তাঁর দল, পদ্মনাথ গাতক ও তাঁর দল
ড. গহর বাদশা ও বানেছা পালা - আব্দুল জলিল ও তাঁর দল।
ঢ. ছন-কবির গান - বর্তমানে নেই।
ণ. কবিতা - অনির্ণীত।

www.pathagar.com

বগুড়ার কিচ্ছাগান

সামষ্টিক গানের তালিকা: লসিমন, একদিল, পাতারা বা লহড়া, মেয়েলিগীত বা গীদ, ঝাপুড়ির গান বা ঝাপ্ড়ি, হালকা জিকিরের গান, যুগীকাস, নিমাই চন্দ্রের গান, ঘনাইবিবি, মাদারের গান, লক্ষ্মীণ বালান্দর, গহর বাদশা ও বানেছা পালা।

একক গানের তালিকা: একদিল, মেয়েলিগীত বা গীদ, কিচ্ছা, ছন কবির গান, কবিতা।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা: লসিমন, একদিল, কিচ্ছা, ঘনাইবিবি, কবিতা।

বিপন্ন গানের তালিকা: মেয়েলিগীত বা গীদ, কিচ্ছা, হালকা জিকিরের গান, কবিতা।

লুপ্তগানের তালিকা: ছন কবির নাম।

সনাক্তকৃত লোকবাদ্যের তালিকা: ঢোল, খোল, খঞ্জনী, দোতারা, বাঁশি, করতাল, হারমনিয়াম।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক: স্থানীয় লোকশিল্পীরা ও গ্রামাঞ্চলের মহিলারা।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আর্থিকভাবে মূল্যবান গানের মূল্যমান

এখানকার লোকসঙ্গীতগুলোর সঠিক মূল্যমান নির্ণয় কষ্টসাধ্য। এতে যা আয় হয় তা নগণ্য। গায়েনরা আনন্দের জন্য গায় মাত্র। কারণ শুধু গানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এমন দল নেই। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও চর্চার সুযোগ পেলে অনেক গানই মূল্যবান লোকসঙ্গীতে পরিণত হবে। এগুলোর মধ্যে লসিমন, একদিল, কিচ্ছা, অর্থকরী গান হিসাবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। উল্লেখ্য যে, বগুড়া জেলার ইয়ুথ কয়ার নামক লোকসঙ্গীত সংগঠনটি গান করে আর্থিকভাবে লাভবান। তবে সংগঠনটি অনেক লোকসঙ্গীতেরই চলমান লোকরীতিটি ভেঙ্গে দেয়। সে কারণে সংগঠনটি পুরোপুরি ফোক সংগঠন কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

www.pathagar.com

সুপারিশমালা:

ক. সংগ্রহ: বিভিন্ন লোকশিল্পী ও মানুষের স্মৃতিতে থাকা লোকসঙ্গীতগুলো ফিল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ ও গ্রন্থিত করা।

খ. সংরক্ষণ: লোকসঙ্গীতগুলো অডিও ও ভিডিও-তে ধারণ করে জেলাভিত্তিক শিল্পকলা একাডেমীতে সংরক্ষণ করা।

গ. প্রচার: বিভিন্ন জাতীয় দিবসে দেশে ও বিদেশে লোকসঙ্গীতগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঘ. মেধাস্বত্ব: লোকসঙ্গীতগুলো টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শিল্পীদের দিয়ে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গানগুলোর আয়োজন করা এবং সম্মানজনক সম্মানী প্রদান করা।

উপসংহার: বৃহত্তর বগুড়া জেলা লোকসঙ্গীতে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল, উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশিষ্ট লোকমানসের পরিচয় লোকসঙ্গীতগুলোতে ফুটে উঠেছে। বিষয়বস্তুগত পরিচর্যা এবং উপস্থাপন কৌশলের মধ্যেও রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সাঙ্গীতিক দেহকাঠামোয় সারল্য ও শব্দ চয়নে সহজ ও নিরালঙ্কার হলেও এর অন্তরঙ্গে ঐশ্বর্য্য কম নয়। এগুলোর রসাবেদন আজো নিঃশেষিত হয়নি, বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের গতি ও চর্চা এই সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই লোকসংস্কৃতি রক্ষণের স্বার্থে গানগুলোর চর্চা, আয়োজন ও সংরক্ষণ করা এবং লোকশিল্পীদের সম্মানী ও মাসিক ভাতা প্রদানের মাধ্যমে জাতির মূল পরিচয় তুলে ধরা সবার দায়িত্ব।

সহায়ক গ্রন্থ

ড. ওয়াকিল আহমদ, লোককলা প্রবন্ধাবলি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০১।

কঙ্কন ভট্টাচার্য, লোকসঙ্গীত ও সমাজ জীবন, উৎপলা গোস্বামী সম্পাদিত লোকসঙ্গীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গরাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯২।

ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৯।

কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, (ড. তসিকুল ইসলাম সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, ২০০৭।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাপিডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩।

মোঃ আব্দুল কাইউম, লোক সাহিত্য, ৭ম খণ্ড, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ১৯৬৯।

মোহাঃ শহীদ সারওয়ার, চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসঙ্গীতে জীবন ও সমাজ, পি-এইচ.ডি থিসিস, ব্যাচঃ জুলাই২০০২, দাখিলমে, ২০০৭, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাক্ষাৎকারদাতাদের একাংশ

মোঃ তরিকুল ইসলাম, বয়স-১৯, পিতা-ইদ্রিস আলী (পোস্ট মাস্টার), গ্রাম-শাঁওইল বাজার, ডাক-শাঁওইল, জেলা-বগুড়া।

মোঃ ময়েন উদ্দিন (লসিমন গানের সহযোগী শিল্পী), বয়স-আনুমানিক ৪২, পিতা-মৃত একাব্বর মণ্ডল, গ্রাম- মোহনপুর, ডাক-মোহনপুর, জেলা-জয়পুরহাট।

মোহাঃ বাবু প্রামানিক, বয়স-আনুমানিক ৩০, পিতা-মৃত জব্বার প্রামানিক, গ্রাম-মোহনপুর, ডাক-মোহনপুর, জেলা-জয়পুরহাট।

মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, বয়স-আনুমানিক ৬৩, পিতা-মৃত ময়েন উদ্দীন, গ্রাম-চকমোহন, ডাক-নারায়ণ পাড়া, জেলা-জয়পুরহাট।

জাফের আলী মণ্ডল, বয়স-আনুমানিক ৭০, পিতা-মৃত কুড়ানো মণ্ডল, গ্রাম-বিনাহালী, ডাক-বিনাহালী জেলা-বগুড়া।

মোসাঃ জাকিয়া সুলতানা, বয়স-১৭, পিতা-মোঃ হাবিবুর রহমান, গ্রাম-মোহনপুর, ডাক-মোহনপুর, জেলা-জয়পুরহাট।

মুর্শেদা বেওয়া, বয়স-আনুমানিক ৭৫, স্বামী-মৃত আব্দুর রশিদ প্রামানিক, গ্রাম-মোহনপুর, ডাক-মোহনপুর, জেলা-জয়পুরহাট।

পরিবানু, বয়স-২৩, পিতা-মোঃ মোজাফফর হোসেন সরকার (মোজাম), গ্রাম-জামুহালী, ডাক-ক্ষেত লাল, জেলা-জয়পুরহাট।

মোঃ ইসরাফিল, বয়স-আনুমানিক ২২, পিতা-মোঃ আব্দুর রহমান, গ্রাম-বিনাহালী, ডাক-বিনাহালী, জেলা-বগুড়া।

মেহের আলী সরকার, বয়স-আনুমানিক ৯৫, পিতা-মৃত ইসাতুলাহ সরকার, গ্রাম-জামুহালী, ডাক-ক্ষেতলাল, জেলা-জয়পুরহাট।

মোঃ মসিদুল, বয়স-আনুমানিক ২৪, পিতা-মোঃ আনারুল হক (দুলো), গ্রাম-জামুহালী, ডাক-ক্ষেতলাল, জেলা-জয়পুরহাট।

মোঃ শামসুল হক, বয়স- ৪২, পিতা-মৃত আব্দুর রশিদ প্রামানিক, সহকারী শিক্ষক, জয়পুর হাট আর.বি. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুর হাট।

www.pathagar.com

৮.৩ রাজশাহী বিভাগের লোকসঙ্গীত

মাযহারুল ইসলাম তরু

ভূমিকা: লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত শাখা লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে ভাব, চিত্র, কাহিনী অবলম্বনে ছন্দময় সুরাশ্রিত রচনাকে লোকসঙ্গীত বলা যেতে পারে। George Herzog বলেন, "Folk Songs are best defined as songs which are current in the repertory of folk groups. অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, It is oral circulation that is the best general criterion of what is a folksong". ড. ওয়াকিল আহমদ-এর মতে সংজ্ঞাগুলো স্পষ্ট ও অর্থবাহী নয়। তাঁর মতে লোকসমাজে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ও সুর সংযোগে প্রচারিত রচনাকেই লোকসঙ্গীত বলা হয়। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিভাবে প্রচারিত হয় তাহাকে লোকসঙ্গীত (Folksong) বলে।' লোকসঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত। কারণ, লোকসঙ্গীতে আছে গণমনের অকপট অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির আবেদন অত্যন্ত গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। লোকসঙ্গীতে আছে সরল স্বাভাবিক জীবনের মনোরম আলেখ্য, আদর সোহাগের অনুপম মাধুর্য।

রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্রশোভিত জনপদ বৃহত্তর রাজশাহী জেলা (বর্তমানে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর জেলা) লোকসঙ্গীতে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। আলোচ্য প্রবন্ধে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার লোকসঙ্গীতের পরিচয় সহ অতীত ও বর্তমানে এর অবস্থা এবং বর্তমানের আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

জেলা পরিচিতি: বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অধীনে চারটি জেলা রয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর। সংক্ষেপে জেলাগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো।

রাজশাহী জেলা: আয়তন ২,৪০৭.০১ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে নওগাঁ জেলা, দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, কুষ্টিয়া জেলা ও গঙ্গা নদী, পূর্বে নাটোর জেলা এবং পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। এ জেলা বরেন্দ্রভূমি, দিয়ারা ও চরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলা সৃষ্টি। এ জেলা ভেঙে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয় মালদহ, বগুড়া, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসমূহ।

এ অঞ্চল প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্রবর্ধন নামক জনপদের অংশ ছিল। বিজয় সেনের রাজধানী ছিল রাজশাহী শহর থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে। ১৮৫৯-৬০ খ্রি. এ জেলায় নীল আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলার খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে সাতজন কমিউনিস্ট নেতা নিহত হন। ১৯৬৯ খ্রি. গণআন্দোলনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকটর ড. শাসুজ্জোহা শহীদ হন।

রাজশাহী জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ৯৩%, হিন্দু ৫%, খ্রিস্টান ১.৫%, অন্যান্য ০.৫%। মোট জনসংখ্যার ২.৩৪% আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। এছাড়াও ওরাওঁ ও কোচ নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এসব নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে।

জেলার জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি। শিক্ষার হার ৩০.৬১%, এর মধ্যে পুরুষ ৩৭.৬% ও মহিলা ২৩.২%। রাজশাহীর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। লোকসাহিত্য (লোকসঙ্গীত, ছড়া, প্রবাদ, লোকনাট্য, লোককাহিনী), লোক খেলাধূলা, লোকশিল্প রাজশাহী জেলার সাংস্কৃতিক ধারার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ জেলায় প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে গম্ভীরা, আলকাপ, কবিগান, মেয়েলীগীত, যোগীগান, হাপুগান, জাগগান, মাদারের গান, মনসার গান, বাউল গান, ও সত্যপীরের গান উল্লেখযোগ্য। লোকশিল্পের মধ্যে তাঁত, বাঁশ ও বেত, কাঁসা ও বিড়ি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা: আয়তন ১,৭৪৪.৩৩ বর্গ কিলোমিটার। এ জেলার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে রাজশাহী ও নওগাঁ জেলা। বরেন্দ্র, দিয়ার ও পদ্মা-মহানন্দার চরাঞ্চল নিয়ে এ জেলা গঠিত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত নবাবগঞ্জ মালদহ জেলার একটি থানা ছিল। দেশ ভাগের সময় রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় উন্নীত হয়।

১৮৩৩-৩৫ সালে দেওয়ানতুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জে নীল আন্দোলন এবং ১৯৪৯ সালে ইলামিত্র ও রমেনমিত্রের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন (কৃষক আন্দোলন বা সাঁওতালী আন্দোলন) সংঘটিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় এ জেলায় বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের সমাধি রয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জনসংখ্যা ১৪,১৯,৫৩৬ জন; তার মধ্যে পুরুষ ৫০.১২% ও মহিলা ৪৯.৮৮%, জাতিগতভাবে মুসলমান ৯৪.২৭%, হিন্দু ৪.৬৮%, খ্রিস্টান ০.২৩%, অন্যান্য ০.৮২%। মোট জনসংখ্যার ০.৫% আদিবাসী। এ জেলায় বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালের সর্বাধিক। অন্যান্য আদিবাসীর মধ্যে ওরাওঁ, রাজবংশী, মুন্ডা অন্যতম। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। জেলার জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি।

জেলার শিক্ষার হার ২৩.৮%। এরমধ্যে পুরুষ ২৮.৫%, মহিলা ১৯.১%। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এ জেলার সুনাম ব্যাপক। এখানকার গম্ভীরা আলকাপ গানের খ্যাতি দুই বাংলায় রয়েছে। গম্ভীরা বর্তমানে জেলার গণ্ডী অতিক্রম করে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে প্রচলিত আন্যান্য লোকসঙ্গীতের মধ্যে মেয়েলিগীত, কাঠগান, ঝাণ্ডির গান, মর্শিয়া গান, সারির নৌকার গান, কাহানির গান, মাদারের গান, মনসার গান, সত্যপীরের গান উল্লেখযোগ্য। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ধারাও বেশ গৌরবের। এজেলার নকশি কাঁথা, তামা-কাঁসা, পিতল, লাক্ষা, রেশম জেলার গণ্ডীর বাইরেও খ্যাতি লাভ করেছে।

নাটোর জেলা: আয়তন ১৮৯৬.০৫ বর্গ কিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে নওগাঁ ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলা। পূর্বে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে রাজশাহী জেলা। রাজশাহী জেলার অধীনে নাটোর মহকুমার সৃষ্টি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে এবং মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এ জেলায় উপজেলা ৬টি, ইউনিয়ন ৫২টি, পৌরসভা ৪টি, ওয়ার্ড ৩৬টি, মহল্লা ৯৩টি মৌজা ১২৭২টি এবং গ্রামের সংখ্যা ১৩৭৭টি।

নাটোরবাসীর সংগ্রামের ইতিহাস গৌরবময়। ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে এখানে নীল আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৭১ খৃস্টাব্দে ২৯ মার্চ মুক্তিযোদ্ধা ও পাকসেনাদের মধ্যে এক সম্মুখযুদ্ধে পাকবাহিনীর মেজর আসলাম ও ক্যাপ্টেন ইসহাক সহ ৪০জন পাকসেনা নিহত হয়।

নাটোর জেলার জনসংখ্যা ১৫,২১,৩৫৯ এর মধ্যে পুরুষ ৫০.৮৬% ও মহিলা ৪৯.১৪%। জাতিগতভাবে মুসলমান ৯০.৪৭%, হিন্দু ৮.৪৭% ও অন্যান্য ০.৪৫। বিভিন্ন উপজাতির বসবাস রয়েছে এ জেলায়। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠ আদিবাসী সাঁওতাল। এদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে।

নাটোর জেলার শিক্ষার হার ২৭%, এর মধ্যে পুরুষ ৩৩% ও মহিলা ২০.৫%। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষিকাজ। নাটোর জেলা লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, লোককাহিনী ছাড়াও রয়েছে বর্নাঢ্য লোকসঙ্গীতের ধারা। এখানে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে মেয়েলি গীত, যোগীগান, হাপুগান, ঘাটুগান, জাগগান, বারাশে বা বারমাসিগান, মাদারের গান, মানিকপীরের গান, গোরক্ষনাথের গান, বাউল গান, সত্যপীরের গান উল্লেখযোগ্য।

নওগাঁ জেলা: আয়তন ৩,৪৩৫.৬৭ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে নাটোর ও রাজশাহী জেলা, পূর্বে জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলা এবং পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। রাজশাহী জেলার অধীনে নওগাঁ মহকুমা সৃষ্টি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে।

www.pathagar.com

নওগাঁ জেলাবাসীর সংগ্রামী চেতনা অবিসংবাদিত। এখানে সংঘটিত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল আন্দোলন এবং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে জমিদারবিরোধী কৃষক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে নওগাঁবাসীর ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবময়।

নওগাঁ জেলার জনসংখ্যা ২৩,৭৭,৩১৪, এর মধ্যে পুরুষ ৫০.৬৬% এবং মহিলা ৪৯.৩৪%। জাতিগতভাবে মুসলমান ৮৪.৫১%, হিন্দু ১১.৩৯%, বৌদ্ধ ০.১৪, খ্রিস্টান ০.৫১%, উপজাতি ও অন্যান্য ৩.৪৫%। এ জেলায় বসবাসকারী উপজাতির মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ ও মাহালী উল্লেখযোগ্য। এ জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রশংসনীয়। লোকসঙ্গীত হচ্ছে মেয়েলিগীত, বারাশে বা বারমাসি গান, মালসী গান, মাদারের গান, মনসার গান, বাউলগান, সত্যপীরের গান উল্লেখযোগ্য। লোক সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মধ্যে ছড়া, প্রবাদ, লোকনাট্য, ধাঁধা, লোক খেলাধুলা ও লোক শিল্প কলাও বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার লোকশিল্পের মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজ এবং মৃৎ শিক্ষা উল্লেখযোগ্য।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. গম্ভীরা: গম্ভীরা বৃহত্তর রাজশাহী জেলার বৈশিষ্ট্যবাহী লোকসঙ্গীত। অবিভক্ত ভারতের মালদহ জেলায় এর উৎপত্তি এবং বৃটিশ আমলেই এর বিকাশ। দেশ বিভাগের পর গম্ভীরা গানের শিল্পীরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে চলে আসেন। তখন থেকে এ অঞ্চলেই এ গানের বিকাশ ঘটে ও চর্চা অব্যাহত থাকে। শিবের বন্দনা থেকে এ গানের উৎপত্তি হলেও এখন গম্ভীরা গান সমাজবাস্তবতার সঙ্গে মিশে গিয়ে যুগোপযোগী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে দেশব্যাপী। এ গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়। নানা-নাতির সংলাপে এ গানের দোহার, হারমোনিয়াম বাদক, জুড়িবাদক প্রভৃতি অংশগ্রহণ করে। গম্ভীরা গানের প্রধান গায়ক নানা-নাতির পোষাকে ফুটে উঠে বাংলার নিরাশা ক্লিষ্ট কৃষকের ছাপ। নানা চিত্তাকর্ষক কথাবার্তার মধ্যে গান পরিবেশিত হয়। দর্শক শ্রতারা প্রচুর আনন্দ অনুভব করে থাকে। আমোদপ্রিয়তা ও সরস কৌতুক পরিবেশিত হলেও

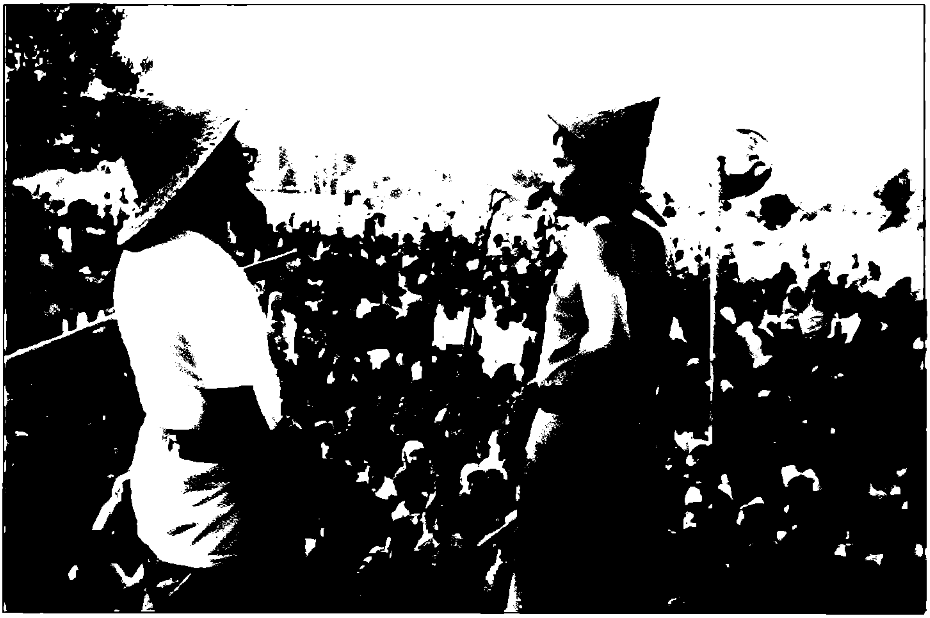

গম্ভীরা গান (মাহবুবুল আলম ও তার দল)

www.pathagar.com

এখানে লোক শিক্ষার দিকটিও উপেক্ষিত হয় না। যুগোপযোগী বিষয় দেশের, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বয়স্ক শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কুফল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয় গম্ভীরা। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার, দুর্নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে জনসচেতনা সৃষ্টি করা হয় এখানে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও মাদকাসক্ত তরুণ সমাজের বিপদগামী হওয়ার বিষয়ও এগানে বাদ পড়ে না। গানের শেষে নানা নাতিকে সংস্কারমূলক উপদেশ দিয়ে গান শেষ করেন। গম্ভীরা গানের দৃষ্টান্ত:

হে নানা শুন্যাছিস হায়রে
সর্বনাশ হয়্যাছে ষোল আনা।
কাণ্ডকীর্তি দিখ্যা শুন্যা
বিগড়্যা গেছে মেজাজ খানা।।
বাংলাদেশের কিশোর যুবক
যত আছে নানা,
বেশির ভাগই গিলছে মদ
ধরছে তাড়ি খানা।
নানা দ্যাখোতো কাণ্ডখানা।।
প্রায় বিশ লাখ বাঙালি
হয়্যাছে আসক্ত
ফেনসিডিল ও ইয়াবায়
কত শত ভক্ত
এদের ভবিষ্যৎ মরণ ছাড়া
গতি নাই হামার জানা।।
চেষ্টা তদবির চলছে নানা
সরকারি মহলে
ক্যামন করে ছাড়ানো যায়
এসব কি কৌশলে
নানা এভাবে দ্যাশকি চলে?
ভাইসব তোমরা হচ্ছে দ্যাশের মা-বাপ
তোমরাই ভবিষ্যৎ কি না?

২. আলকাপ: এ অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত হলো আলকাপ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এর চর্চা ও প্রসার বেশি। মানুষের জীবনের নানা-বিষয়-ধর্মীয়, পৌরাণিক, সামাজিক সমস্যা, ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিষয়, প্রেম ও প্রেমের কারণে সৃষ্ট সমস্যা আলকাপে পরিবেশিত হয়। নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট্যগুণ সম্পন্ন অভিনয়ের সমন্বয়ে আলকাপ গাওয়া হয়। জয়, আসর বন্দনা, দ্যাশ বন্দনা, খ্যামটা, ফার্স এবং পরিশেষে পালা এভাবে এর পরিবেশন রীতি নির্ধারিত হয়। আলকাপে ব্যবহৃত লোক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম, জুড়ি, তবলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দল প্রধান সরকার ছাড়াও দলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ছোকরা, কাইপ্যা ও অভিনেতা। ছেলেরা মেয়ের পোষাক পরিধান করে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। পালা পর্বে স্ত্রী চরিত্রে তারা অভিনয় করে। সাধারণত পুজা-পার্বণ, অন্নপ্রাশন, বৈশাখী মেলা উপলক্ষে এগানের আসর বসে। আসর বলতে সামান্য উঁচু একটি স্থান যা দর্শক শ্রোতাদের মাঝখানে বানানো হয়। অভিনেতা-গায়ক আসরেই বসে থাকে। ভূমিকা অনুসারে দাঁড়িয়ে তারা নৃত্য সুর সহযোগে গানের বিষয় উপস্থাপন করে। এ গানের বড় বৈশিষ্ট্য অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এক সময় আলকাপ গান এ অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় সঙ্গীত ছিল প্রচুর শিল্পীও দেখা যেত। এগানের আসর বসানো ব্যয়সাপেক্ষ বলে এবং

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ গান এখন কদাচিৎ হতে দেখা যায়। এখানে আলকাপের একটি বন্দনা ছড়ার অংশবিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

প্রথমে মোনাকষার বোনাকানা
আলকাপ গান করে রচনা।
তারপরেতে সুবেদার আলী ভাই
বাড়ি তাহার মালদহেতে হয়।
তার পরেতে ঝাঁকসু সরকার নামটি শুনি
তার জঙ্গীপুরে বাড়ি জানি।
আলকাপেতে সে বিখ্যাতরে ভাই।।
জাগিরুদ্দীন যাহার নাম
তার নূরপুরেতে হয়গো ধাম।
ঝাঁকসু জগু একসঙ্গেতে গায়।
সিরাজ মাষ্টার তাকে রেখেছিল ভাই।।
কার বা কতো করবো নাম
এবার শুনেন সুবল কানার গান
এই বলে ভাই
আমি দশের কাছে প্রণাম জানাই।।

৩. বারাশে বা বারমাসি গান: বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অন্যতম লোকসঙ্গীত বারাশে। বারাশে মূলত বর্ষা সঙ্গীত। এতে প্রেমজনিত বিরহ-বেদনার আর্তি বারো মাসের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্ত করা হয়। বিরহিনী নারীর প্রেম-ব্যাকুলতা ও বিচ্ছেদ-বেদনা এগানের উপজীব্য হলেও ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋতুচক্র,

আলকাপ গান (রায় চাঁদ সরকার ও তার দল)

www.pathagar.com

পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, বিলাস-ব্যাসনের কথাও এতে ব্যক্ত করা হয়। পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমের কথা থাকলেও বারাশে গানের বাণীতে যে চিত্রাবলী চিত্রিত হয়ে থাকে তা মূলত বর্ষঋতুরই। যেমন:

আষাঢ় মাসে আঁদলেতে
বোঝাই নদী নালা
পোক পাহালী বিজ্যা মরে
হারে কিনা দুখকের জ্বালা।

লৌকিক বারাশে গানে বাঙালির বিভিন্ন কাজ-কর্মেরও বিবরণ পাওয়া যায়। এই কাজকর্ম প্রধানত কৃষিই। একটি বারাশে গানে ফাল্গুন থেকে অঘ্রাণ অবধি দশ মাসের ধান চাষের পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে উৎপাদিত ধানের নামগুলোর ও বিবরণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত:

ফাল্গুন মাসে দিলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ।
বৈশাখেতে চিকচিহিনি জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।।
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে।
ছেরাবনে আউস ধান গেরহস্থেতে তুলে।।
ভাদ্র গেল আশ্বিন আইলো, কার্তিক দেয় সাড়া।
অঘ্রানেতে ক্ষ্যাতের পারে দেওরে আমন ছড়া।।
আমন ওঠে ঘরে ঘরে, দু:খ কিছু নাই আর।
আইসো এবার যাবার ব্যালা চরণ বন্দি তার।।

এক সময় বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বারোমাসি সঙ্গীতের আসর বসতো। এখন আর তেমন আসর বসছে না।

৪. মালসী: বরেন্দ্র অঞ্চলের এক সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত মালসী হিন্দু দেব-দেবীকেন্দ্রিক মালসীতে বর্তমানে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছ। দেবী মাহাত্ম্যের পরিবর্তে লৌকিকপ্রেম এগানে স্থান করে

আলকাপ গানের একটি বিশেষ মুহূর্ত

www.pathagar.com

নিয়েছে। সুরের অনুসঙ্গ হিসেবে এগানে নৃত্যও পরিবেশিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই এ গানের প্রাণ। এতে ব্যবহৃত উপমা, চিত্রকল্প, স্থাননাম, ভাষা আঞ্চলিক হওয়া শ্রোতাদের হৃদয়ে রস সঞ্চারে ফলপ্রসূ হয়। বর্তমানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এগান বিলুপ্তির প্রহর গুনছে।

বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় নওগাঁ জেলায় প্রচলিত লোকসঙ্গীত মালসীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা -

১. রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক এবং

২. লৌকিক প্রেম বিষয়ক।

এখানে লৌকিক প্রেমলীলা সম্পর্কিত একটি মালসীর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে

কালা তোর তরে
কদম তলায় বইসে থাকি
হয়না গাও ধোয়া
হয়না মাতা ঘসা
হয়না হয়না কতো কি
কালা তোর তরে
কদম তলায় বইসে থাকি।

উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও চর্চার অভাবে মালসী সঙ্গীত আজ বিলুপ্তির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. মেয়েলি গীত: মেয়েলী গীত এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই এ গীতের প্রচলন আছে। তবে এ অঞ্চলের মেয়েলি গীত বেশ সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ গীতে কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না এবং সুর, তাল, লয়ের কোন মাত্রার প্রয়োজন হয়না। নারী জীবনের আশা-নিরাশা আর আনন্দ বেদনার নানা উপলক্ষগত প্রকাশ ঘটে এ গানগুলোতে। নারীরাই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেতভাবে, কখনো এককভাবে এগান পরিবেশন করে। এজন্য মেয়েলি গীত যুগোপযোগী আবেদনকেও প্রকাশ করে। এতে অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক মৌহূর্তিক আনন্দ উচ্ছ্বাস যেমন ঝরে পড়ে, তেমনি অতীতের সুখ-দু:খময় স্মৃতি রোমাঞ্চিত হয়। দৃষ্টান্ত -

উপরে কদমগাছ ঝিকমিক করে
তারি তরে বাপ মায়ের বাড়ি নারে।
মা বাপ এ বিহ্যা দিলে কি কারণ
বিহ্যা দিলে গাঞ্জাখোরের সাথে নারে।
সারারাত গাঞ্জা খায় আগুন টুকতে পরান যায়
সোনার দেহ কালা হয়্যা গ্যালো নারে।

ব্যবহারিক ও পারিবারিক, প্রেম, কর্মসঙ্গীত বিষয়ক মেয়েলীগীত প্রচলিত থাকলেও, পারিবারিক সঙ্গীতের ভাগই বেশি। পরিবার কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। বিশেষ করে বিবাহ, গর্ভবতী রমণী ও নবজাত শিশুকে নিয়ে নারী হৃদয়ের স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশে মেয়েলি গীত প্রাণবন্ত।

৬. সারির নৌকার গান: বাংলা বছরের শুরুতে বাঁশের ফ্রেমের ওপর সারি দিয়ে তৈরি নৌকা বানিয়ে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার প্রচলন ছিল বৃহত্তম রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলে। নৌকার মাঝে শিল্পীরা অবস্থান নিয়ে কোমর পর্যন্ত নৌকা ধরে নেচে নেচে হেঁটে যেত আর গান গাইতো। এভাবে তারা বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ করতো। এগান আজ আর নেই। তবে প্রবীণ ব্যক্তিরা গানের ৪/৫ লাইন বলতে পারেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তাঁর স্মৃতি থেকে যেটুকু বলেছেন তা-ই হুবহু উপস্থাপন করা হলো-

www.pathagar.com

তোমরা বাহরিয়া দ্যাখো লোকেতে
মনোহর মাঝি নৌকা সাজিয়্যাছে।
নকুল কুমার খোল বাজাইছে
সুকুমার হাল ধর্যাছে।।

৭. ঝাণ্ডির গান: কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত মর্মান্তিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে এ গান রচিত এবং বাঁশের তৈরি বিশেষ ধরনের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

৮. মার্শিয়া জারী: কারবালায় সংঘটিত ঘটনার কাহিনী নিয়ে এগান রচিত। শিল্পীরা তাদের বুকে থাবা দিতে থাকেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

৯. কবিগান: দুই জন শিল্পী বিপরীতধর্মী দুটি বিষয় নিয়ে (দুই পক্ষ হয়) গানে গানে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন। তারা একে অপরকে প্রশ্ন করে পরাজিত করতে চেষ্টা করেন। প্রতিযোগিতামূলক এই বিষয়গুলোর মধ্যে গ্রাম-শহর, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, রাধা-কৃষ্ণ, কলম-তরবারি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১০. যোগীগান: যোগী ও যোগিনীর কাহিনী নিয়ে এ গান রচিত হয়। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ বা অন্য কোনো উৎসবে গ্রামবাসীরা সামিয়ানা টাঙিয়ে এ গানের আসর বসাতো। যোগী-যোগিনী ছাড়াও এতে যোগীর ভৃত্য ভুক্তুর দাস ও যোগিনীর ভৃত্য বাল্লুক দাস এর চরিত্র রয়েছে।

১১. হাপুগান: হাপুগান গাওয়ার পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। গায়কদের মধ্যে একজনের হাতে থাকে গুপীযন্ত্র। মূল গায়কের হাতে থাকে একটি ছোট্ট লাঠি। তিনি গান করার সময় মাঝে মাঝে মুখে এক ধরণের গানের ধুয়া ধরেন এবং বগল বাজান। বর্তমানে কোথাও হাপুগান দেখা যায় না।

১২. জাগগান: রাত জেগে এ গান গাওয়া হয় বলে এ গানের নাম জাগগান। সমস্ত পৌষ মাস ধরে বাড়ি বাড়ি জাগগান গেয়ে গায়ক দলের সংগৃহীত ধান বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ এবং তাদের সখের ভিক্ষালব্ধ চাল ও অর্থ দিয়ে পৌষ-সংক্রান্তির দিন বিপুল সমারোহে মাঠের মধ্যে ভোজের বা শিরনির আয়োজন হতো।

ঝান্ডির গান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

www.pathagar.com

১৩. কাহানীর গানঃ শীতকালে রূপকথার কাহিনীর সঙ্গে অভিনয় ও গানের সমন্বয় ঘটিয়ে এগান গাওয়া হতো। বর্তমানে তেমন আর কাহানীর গানের আসর বসে না।

১৪. মাদারের গানঃ মাদার পীরের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এ গান রচিত ও পরিবেশিত হতো। বর্তমানে ও প্রচলিত রয়েছে তবে পূর্বের মতো উদ্দীপনা লক্ষ করা যায় না।

১৫. মনসার গানঃ দেবী মনসার মাহাত্ম্য বর্ণনা তথা বেহুলা-লক্ষিন্দর-চান্দ সাওদাগরের কাহিনী নিয়ে মনসার গান রচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে।

১৬. মানিক পীরের গানঃ মানিকপীরের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এ গান রচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে। বর্তমানে এ গানের আসর তেমন বসছে না।

১৭. গোরক্ষনাথের গানঃ নাথ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব গোরক্ষনাথ এর গান এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে তেমন আসর বসে না।

১৮. বাউল গানঃ আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বাউলগান রচিত হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের বাউলেরা সাধারণত এককভাবে গান পরিবেশন করে থাকেন।

১৯. সত্যপীরের গানঃ গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী ও কিংবদন্তী নিয়ে সত্যপীরের গান রচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে। একসময় ব্যাপকভাবে চালু ছিল। বর্তমানে এ গানের আসর বসতে দেখা যায় না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি স্থল

১) গম্ভীরা	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে বর্তমান আঙ্গিকের গম্ভীরা গানের উৎপত্তি।
২) আলকাপ	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মোনাকষা গ্রামে।
৩) কবিগান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চাঁপাই-পলশা গ্রামে।
৪) ঝাণ্ডির গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার পৌর এলাকায়।
৫) মর্শিয়া গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ফকিরপাড়া-মসজিদপাড়ায়।
৬) মেয়েলী গীত	:	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর জেলার গ্রামীণ পরিবেশে উদ্ভব।
৭) যোগী গান	:	নাটোর জেলায়।
৮) হাপু গান	:	নাটোর জেলায়।
৯) জাগ গান	:	নাটোর জেলায়।
১০) সারির নৌকার গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বারোঘরিয়া গ্রামে।
১১) কাহানীর গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোহালবাড়ি গ্রামে।
১২) মালসী গান	:	নওগাঁ জেলায়।
১৩) বারাশে বা বারোমাসি গান	:	নওগাঁ জেলায়।
১৪) মাদারের গান	:	রাজশাহী জেলায়।
১৫) বেহুলার গান	:	রাজশাহী জেলায়।
১৬) মানিকপীরের গান	:	নাটোর জেলায়।
১৭) গোরক্ষনাথের গান	:	নাটোর জেলায়।
১৮) বাউল গান	:	নির্দিষ্টভাবে স্থান সনাক্ত করা যায়নি।
১৯) সত্যপীরের গান	:	রাজশাহী জেলায়।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতি স্থল বা ব্যবহার এলাকা

১) গম্ভীরা	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে উৎপত্তির পর গম্ভীরা গান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল ও সদর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পার্শ্ববর্তী জেলা রাজশাহী ও নওগাঁতেও এর বিস্তৃতি ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে গম্ভীরা প্রচারিত হয়ে থাকে।
২) আলকাপ	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও রাজশাহী জেলা।
৩) কবিগান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলা।
৪) ঝাণ্ডির গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ ও সদর উপজেলা।
৫) মর্শিয়া গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের মসজিদপাড়া ও ফকিরপাড়া মহল্লা।
৬) মেয়েলী গীত	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোর জেলার গ্রামীণ পরিবেশে।
৭) যোগী গান	:	নাটোর ও রাজশাহী জেলা।
৮) হাপু গান	:	নাটোর ও রাজশাহী জেলা।
৯) জাগ গান	:	নাটোর ও রাজশাহী জেলা।
১০) কাহানীর গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও রাজশাহী জেলা।
১১) মালসী গান	:	নওগাঁ জেলা।
১২) বারাশে বা বারোমাসি গান	:	নওগাঁ ও নাটোর জেলা।
১৩) মাদারের গান	:	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।
১৪) মনসার গান	:	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।
১৫) মানিকপীরের গান	:	নাটোর জেলা।
১৬) গোরক্ষনাথের গান	:	নাটোর জেলা।
১৭) বাউল গান	:	রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোর জেলা।
১৮) সারির নৌকার গান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।
১৯) সত্যপীরের গান	:	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর জেলা।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা

১) গম্ভীরা গান	:	মরহুম শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফী মাস্টার (১৮৯৪-১৯৮০) গম্ভীরা গানের স্রষ্টা। তবে গম্ভীরা গানের সূচনালগ্নে মোহাম্মদ সোলায়মান মোক্তার, মোহসিন আলী মোক্তার, পশুপতি মোক্তার, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মনিমুল মাস্টার প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
২) আলকাপ	:	বনমালী শীল ওরফে বোনাকানা আলকাপের স্রষ্টা।
৩) কবিগান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে কবিগানের প্রচলনকারী নবরূপদানকারী আব্দুস সালাম ওরফে কেরামত সরকার ও সঞ্জয় কুমার (সঞ্জিত)।
৪) ঝাণ্ডির গান	:	মো: নুরুল ইসলাম ঝান্ডির গানের প্রচলনকারী।
৫) মর্শিয়া গান	:	মর্শিয়া গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
৬) মেয়লী গীত	:	মেয়েলী গীতের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
৭) যোগী গান	:	যোগী গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।

www.pathagar.com

৮) হাপু গান	:	হাপু গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
৯) জাগ গান	:	জাগ গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
১০) কাহানীর গান	:	কাহানীর গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
১১) মালসী গান	:	মালসী গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
১২) বারাশে বা বারমাসী গান	:	বারাশে বা বারমাসী গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
১৩) মনসার গান	:	মনসার গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
১৪) গোরক্ষনাথের গান	:	গোরক্ষনাথ গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
১৫) বাউল গান	:	বাউল গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।
১৬) সারির নৌকার গান	:	সতীশচন্দ্র পাল, ওসমান ডাক্তার, হোসেন সরকার।
১৭) সত্যপীরের গান	:	সত্যপীরের গানের একক স্রষ্টার নাম জানা যায় না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের তালিকা

১) গম্ভীরা	:	রকিবুদ্দীন-কুতুবুল আলমের দল, চাঁপাই গম্ভীরা (মাহবুবুল আলম-ফাইজুর রহমান মানি), সবুজ সংঘ (টাইগারের দল), জেলা গম্ভীরা দল (খাইরুল আলম-আব্দুর রাজ্জাক), লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র (সাইদুর রহমান-শংকর), প্রয়াস গম্ভীরা দল (মুনির-সঞ্জয়), খাবিরউদ্দীন-শীষ মোহাম্মদের দল।
২) আলকাপ	:	দবির সরকারের দল, কেরামত সরকারের দল (চাঁপাই পালশা) জয়চাঁদ সরকারের দল (বারোঘরিয়া)।
৩) কবিগান	:	আবদুস সালাম ও সঞ্চয় কুমারের দল (চাঁপাই পালশা)।
৪) ঝাণ্ডির গান	:	মো: নুরুল ইসলামের দল, সোহরাব আলীর দল, শাহজামাল-এর দল (ঘুঘুডিমা)।
৫) মার্শিয়া গান	:	আব্দুর রহমানের দল (নাচোল)।
৬) মেয়েলী গীত	:	প্রায় প্রত্যেক এলাকাতেই তরুণীদের সমন্বয়ে মেয়েলি গীতের দল রয়েছে।
৭) যোগীগান	:	বর্তমানে কোন দলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
৮) হাপু গান	:	বর্তমানে কোন দলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
৯) জাগ গান	:	বর্তমানে কোন দলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
১০) কাহানীর গান	:	মো: আবদুর রাজ্জাকের দল (গোহালবাড়ি)।
১১) মালসী গান	:	বর্তমানে কোন দলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
১২) বারাশে বা বারমাসি গান	:	বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ গেয়ে থাকেন।
১৩) মনসার গান	:	এলাকা ভিত্তিক এ গানের দল রয়েছে।
১৪) মানিক পীরের গান	:	এলাকা ভিত্তিক এ গানের দল রয়েছে।
১৫) গোরক্ষনাথের গান	:	এলাকা ভিত্তিক এ গানের দল রয়েছে।
১৬) বাউল গান	:	শিল্পীরা এককভাবেই এ গান গেয়ে থাকেন।
১৭) সারির নৌকার গান	:	বর্তমানে কোন দল নেই।
১৮) সত্যপীরের গান	:	বর্তমানে কোন দল নেই।

সামষ্টিক গানের তালিকা: গম্ভীরা, আলকাপ, ঝান্ডির গান, মর্শিয়া গান, মেয়েলিগীত, যোগীগান, হাপুগান, জাগগান, সারির নৌকার গান, মালসী গান, বারাশে বা বারমাসি গান, মাদারের গান, মনসার গান, মানিকপীরের গান, গোরক্ষনাথের গান, বাউল গান, সত্যপীরের গান।

www.pathagar.com

একক গানের তালিকা: বাউল গান ও বিভিন্ন গীতিকার কর্তৃক রচিত সঙ্গীত ছাড়া একক কোন সঙ্গীত এ অঞ্চলে প্রচলিত নেই।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা: গম্ভীরা গান।

বিপন্ন গানের তালিকা: আলকাপ, কাহানীর গান, কবিগান, মালসী, মাদারের গান, সত্যপীরের গান, মর্শিয়া গান, ঝাণ্ডির গান।

লুপ্তগানের তালিকা: সারির নৌকার গান, গোরক্ষনাথের গান, হাপু গান।

সনাক্তকৃত লোক বাদ্যযন্ত্রের তালিকা: একতারা, দোতরা, সারিন্দা, খমক, চাক, ডুগডুগি, মন্দিরা, খোল, খঞ্জরী, কাঁশি, করতাল, জুড়ি, খরতাল, বাঁশি ইত্যাদি। স্থানীয় লোকশিল্পীদের দ্বারা দেশীয় উপকরণে বাদ্যযন্ত্রগুলো তৈরী করা হয়।

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা: শিল্পীরাই এসব লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্ত্বের মালিক। তবে বিভিন্ন সংস্থা (যেমন- বেসকারি সংস্থা (NGO), জেলা তথ্য অফিস, ডেমিয়েন ফাউন্ডেশন, সচেতন নাগরিক কমিটি প্রভৃতি) তাদের কর্মকান্ড প্রচারের জন্য শিল্পীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করে পারিশ্রমিক প্রদান করে থাকে।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যমান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬)

শুধুমাত্র গম্ভীরা গানের ৪/৫টি দল সম্মানীর বিনিময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। ২০০৬ সালে এ বৃহত্তর জেলার দলগুলো প্রায় ৫/৬ লক্ষ টাকা আয় করেছিল।

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ সম্পর্কিত: এলাকায় প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলো সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে বেশকিছু সঙ্গীত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এসব গান আর কোনোভাবেই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। যেমন- সারির নৌকার গান। তাই বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতগুলো অডিও ও ভিডিওতে ধারণ করে সংগ্রহ করা উচিত। তাছাড়া এসব সঙ্গীতের স্রষ্টা ও শিল্পীদের ব্যবহৃত লোকবাদ্যযন্ত্রসমূহ এবং সঙ্গীত পরিবেশনকালে পরিধানকৃত পোষাক, মাথল, লাঠিসহ অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ. সংরক্ষণ সংক্রান্ত: স্থানীয়ভাবে লোকসঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে সেই একাডেমীতে সংগৃহীত লোকসঙ্গীতের সিডি (ভিডিও এবং অডিও), খ্যাতিমান শিল্পী ও লোকসঙ্গীতের স্রষ্টাদের আলোকচিত্র ও জীবনী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকাশনা মাধ্যমে লোককবি ও শিল্পীদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য লাইব্রেরি'র প্রতিষ্ঠা করাও একান্ত প্রয়োজন।

গ. উপস্থাপন সংক্রান্ত: ধারণকৃত ভিডিও লোকসঙ্গীত মাঝে মাঝে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লোকসঙ্গীত উৎসব, ১লা বৈশাখ, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানমালায় লোকসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে এর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বিনিময়ের মাধ্যমে এক জেলার লোকসঙ্গীত অন্য জেলায় উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ঘ. মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীতগুলো নিতান্তই শিল্পীদের সাধনার ফসল। তাই এর মেধাস্বত্ব যাতে শিল্পীরা ভোগ করতে পারেন সেদিকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের পর বিভিন্ন সুবিধাবাদী সংস্থা শিল্পীদের নামমাত্র সম্মানী প্রদান করে থাকে। এ ব্যাপারে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনগুলোকে অগ্রণী হয়ে তাদের যথাযথ মূল্যায়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার লোকসঙ্গীতের প্রধান প্রধান ধারার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের পাশাপাশি সঙ্গীতগুলোর বর্তমান অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হলো। এসব সঙ্গীত এ অঞ্চলের লোকমানসের

www.pathagar.com

বিচিত্র পরিচয় ফুটে উঠেছে। লোকসংস্কৃতি একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর মানস প্রকর্ষ। তাই এসব লোকসঙ্গীতের মূল্য অপরিসীম।

রাজশাহী অঞ্চলবাসীর একান্ত চিন্তা-চেতনার ফসল হিসেবে বাঙালি সত্তার আবেগ লোকসঙ্গীতসমূহে সুদীর্ঘকাল ধরে লালিত হয়ে আসলেও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে তাদের ক্রমবিলুপ্তি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতগুলোকে চিরতরে হারিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে এখনই এগুলোকে সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি: গম্ভীরা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৮৯
ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংস্কৃতি, বা/এ, ঢাকা, ১৯৭৪
মাযহারুল ইসলাম তরু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি, বা/এ, ১৯৯৯
মাযহারুল ইসলাম তরু, বরেন্দ্র লোকসংস্কৃতি, বা/এ, ২০০২
মুহম্মদ আবদুল জলিল, উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০১
সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭০), ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩
হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, বা/এ, ঢাকা, ১৯৮২
বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৮
স্মরণিকা, শতবর্ষপূতি উৎসব, নবাবগঞ্জ পৌরসভা (১৯০৩-২০০৪), চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২০০৪
স্মরণিকা, লোকসংস্কৃতি উৎসব, রাজশাহী বেতার, রাজশাহী, ২০০৪
বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩
শিল্পকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫

সাক্ষাৎকার:

মাহবুবুল আলম, গম্ভীরা নানা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
ফাইজুর রহমান মানি, গম্ভীরা নাতী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
মহবুবু ইলিয়াস, আলকাপ শিল্পী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
মোহিত কুমার দাঁ, সাংস্কৃতিক সংগঠক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
সিরাজুল ইসলাম সাংস্কৃতিক সংগঠক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
শামসুল আলম, সাংস্কৃতিক সংগঠক (নওগাঁ)
নূর হামীম রিজভী সাংস্কৃতিক সংগঠক (রাজশাহী)
আমানুল্লাহ মাসুদ হাসান, বেতার কর্মকর্তা (রাজশাহী)
মো: শামসুদ্দীন, সাংস্কৃতিক সংগঠক (নওগাঁ)
সমর চন্দ্র পাল, সাংস্কৃতিক সংগঠক (নাটোর)
ড. ফজলুল হক সৈকত, সাংস্কৃতিক সংগঠক (নাটোর)
মো: শাহজামাল, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও শিল্পী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
কেরামত সরকার, আলকাপ শিল্পী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
ড. শহীদ সারওয়ার, গবেষক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
সঞ্জয় কুমার, কবিগানের শিল্পী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
কনকরঞ্জন দাস, গবেষক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
মো: হাবিবুর রহমান, গবেষক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
মো: আমানুল হক, বাউল গবেষক (রাজশাহী)
ফজলুল হক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠক (রাজশাহী)
শাহ নাওয়াজ গামা, সাংস্কৃতিক সংগঠক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
ড. ইসমাত হোসেন, সাংস্কৃতিক সংগঠক (নাটোর)
মো: মাসাদুজ্জামান, সাংস্কৃতিক সংগঠক (রাজশাহী)
খন্দকার মো: আব্দুস সামাদ, বেতার শিল্পী (রাজশাহী)
অসিত কুমার সরকার, বাউল শিল্পী (নাটোর)
অরবিন্দ ঘোষ, গবেষক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

www.pathagar.com

৮.৪ ওরাওঁ ও সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর লোকসঙ্গীত

মাযহারুল ইসলাম তরু

ভূমিকা: উপজাতি বা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কিংবা আদিবাসী যে অভিধায় অভিহিত করা হোক না কেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৫টির মতো আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। এসব জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উত্তবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুরে বসবাস করে সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, মাহালী, মুণ্ডারী, মালপাহাড়ি, মাহাতো, শিং, রাজোয়ার, লাহার, তুরি, মুরারী, ভূমিজ, কোচ, পাহান, বোনা, কৈবর্ত প্রভৃতি প্রায় ১৯/২০টি সম্প্রদায়। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে সাঁওতাল ও ওরাওঁ নৃ-গোষ্ঠী। এরা ভেড্ডিড, দ্রাবিড়ীয় বা ভেড্ডিড-নিষাদ রক্তধারার মানুষ। এই দুই নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এদের লোকসঙ্গীতগুলো বিষয়-বৈচিত্র্য অসাধারণ। আলোচ্য প্রবন্ধে উত্তরাঞ্চলের দুই প্রাচীন অধিবাসী ওরাওঁ ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করবো।

ওরাওঁ নৃ-গোষ্ঠী পরিচিতি: বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চল তথা উত্তরাঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য জনজাতি হচ্ছে ওরাওঁ। ওরাওঁদের জাতিসত্তার পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক সূত্রে তারা অস্ট্রিক, ভাষাতাত্ত্বিক সূত্রে দ্রাবিড়। এ কারণে অধিকাংশ গবেষক মনে করেন ওরাওঁরা দ্রাবিড় ভাষী কুড়ুক জাতির উত্তরপুরুষ।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে ওরাওঁরা বহুকাল যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। বিগত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওরাওঁ বসবাস না করলেও বর্তমানে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক। আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যে তারা উজ্জ্বল।

উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই সবচাইতে বেশি। তারপরই ওরাওঁদের স্থান। ওরাওঁদের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। এছাড়া কিছুসংখ্যক ওরাওঁ বাস করছে গাজীপুর, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায়। কৃষিকাজ ওরাওঁদের মূল পেশা হলেও শেষোক্ত দুটি জেলায় চা বাগানগুলিতেই মূলত তারা দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত। তবে বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু সংখ্যক ওরাওঁ বাংলার অন্যান্য জেলাতেও বসবাস করতো এর প্রমাণ মেলে ১৮৭২ ও ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি থেকে। তবে উত্তরবঙ্গ ব্যতীত অপরাপর জেলাসমূহে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। পূর্বোক্ত দুটি আদমশুমারির উল্লেখ থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জেলা	১৮৭২ খ্রি.	১৮৮১ খ্রি.
রাজশাহী	৬,৬১৯	২,৮২৫
রংপুর	২৪২	৭৯
বগুড়া	১৬৭	৪২২
পাবনা	২০০	১৮৫
ঢাকা	২	-
ফরিদপুর	১১	-
ময়মনসিংহ	৫	৬০
চট্টগ্রাম	৫	৪৩
নোয়াখালী	-	২৫

www.pathagar.com

বর্তমানে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে আর কোনো ওরাওঁ বসতি নেই।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আমলে ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের আদমশুমারিগুলোতে ওরাওঁদের স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হয় নি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে বাংলাদেশে ওরাওঁদের জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে মাত্র ১১,২৯৬ জন। অথচ ওরাওঁদের মতে বাংলাদেশে তাদের জনসংখ্যা লক্ষাধিক।

সম্প্রতি হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (HRDF) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা ওরাওঁদের উপর একটি জরিপ সম্পন্ন করেছে। এ জরিপটি অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য। কারণ এটি সম্পন্ন হয়েছে ওরাওঁ সমাজেরই শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা। এ প্রসঙ্গে জরিপের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো:

জেলা	পরিবারের সংখ্যা	পুরুষ	নারী	মোট
পঞ্চগড়	৪১	১০২	১০০	২০২
ঠাকুরগাঁও	৩২৬	৬৬৩	৫৮২	১,২৪৫
দিনাজপুর	১,৫৭৪	৩,২৩৯	৩,০২০	৬,২৫৯
রংপুর	২,৯৩২	৫,৯৩০	৪,৭৩৫	১১,৬৬৫
সিরাজগঞ্জ	১,৩১২	২,৪৫০	২,৩৬৪	৪,৮১৪
নাটোর	৮২৫	১,৩১৬	১,৪৭৫	৩,০৯৯
বগুড়া	১০১	১৮৭	১৮৫	৩৭১
জয়পুরহাট	১,৩৪৭	২,৮১৪	২,৭০৪	৫,৫১৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১,৩৪৮	২,৪৭৩	২,৬৩১	৫,৪০৪
রাজশাহী	২,৬৪৭	৫,৯৯৫	৪,২২৩	১১,২১৮
নওগাঁ	৮,২৮৯	১৬,১৯৯	১৫,৬৩৫	৩১,৮৩৪
গাইবান্ধা	১৪	২৭	২৯	৫৬
গাজীপুর	২৯	৬৪	৩৯	১০৩
হবিগঞ্জ	৪১৫	৯৪৩	৮৮৮	১,৮৩১
মৌলভী বাজার	৩০৫	৭৬৪	৬৬৬	১,৪৩০
মোট =	২১,৫০৫	৪৩,৭৬৫	৪১,২৭৬	৮৫,০৪১

এ প্রতিবেদন থেকে লক্ষ করা যায় যে, সবচেয়ে বেশি ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর বাস নওগাঁ জেলায়, থানার দিক থেকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী, রংপুরের মিঠাপুকুর, নওগাঁর পত্নীতলা, নিয়ামতপুর ও পোরশার স্থান শীর্ষে। উক্ত থানাসমূহে ওরাওঁদের জনসংখ্যা নিম্নরূপ:

থানার নাম	জনসংখ্যা
গোদাগাড়ী	৬,৬৩৮
মিঠাপুকুর	৬,৬১৬
পত্নীতলা	৬,৫১১
নিয়ামতপুর	৬,২৬২
পোরশা	৬,২৬০

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি)

ওরাওঁ সমাজ জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন লোকসঙ্গীত। তাদের লোকসঙ্গীত তাদের লোকজীবনের সার্বিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রেম-প্রকৃতি, জীবন-জীবিকা, ধর্ম-কর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু এমন দিক নেই যা ওরাওঁ লোকসঙ্গীতের বিষয় ভাবনায় স্থান লাভ করে নি। এখানে কয়েকটি ওরাওঁ লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্তসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত করা হলো।

www.pathagar.com

কারাম উৎসবের লোকসঙ্গীত ঃ কারাম ওরাওঁদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ভাদ্রমাসে সাধারণত এ উৎসব পালন করা হয়। কারাম উৎসব পালনের সঙ্গে ওরাওঁদের একটি কাহিনী জড়িত আছে। তাদের মতে, কারাম বৃক্ষ রক্ষাকর্তা। ইতিহাসের কোনো এক সময় ওরাওঁ জাতি অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় গভীর জঙ্গলে পালিয়ে কারাম বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। কারাম বৃক্ষ যেন তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য কারাম উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ উৎসবে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ সব সঙ্গীতকে কারাম উৎসবের লোকসঙ্গীত বলা হয়। দৃষ্টান্ত:

কারামের বন্দনা

আখেড়া বন্দনা কবি সরস্বতী মহালী
তবে রে বন্দনা মেঝুনারে
মদনে ঝুমুর লাগাল বারে।
আখেড়া হে গুছে লাল মগাহরি
মন্দনে পু-জ্বালায় মৌ গায়
মদনে ঝুমের লাগাল বারে।
আখেড়া ছাড়িয়া গীত গাওয়ালা পর দেশী ভাই
গুরুবান্ধি সরস্বতী বিনিয়া ঢুলাইরে।
আগে আগে রাম চন্দ্র সেকের পিছে
লোঝুমের সীতা সুন্দর সীতা কারাবই সাঁয়রে।
ভাদর কের একাদশে কারাম গাড়ায়রে
সুন্দর ধুঁতি আঁহি রামকে চালায়রে।

কারাম উৎসব

www.pathagar.com

ভাবার্থঃ প্রথমে জানাই সরস্বতী, মদন, রামচন্দ্র, দেব-দেবীদের প্রণাম। তারপর গুরুকে প্রণাম, সীতাকে প্রণাম। কারাম পুজা হয় ভাদ্র মাসের একাদশীর দিনে। সেদিন রাম চলে আগে, আমরা চলি তাঁর পিছে পিছে।

কারামের গান

বারো মাস হিংসে নালেরে কারাম (২)
হায় কারাম বের দাগা দেলরে
ও ভাই হায় কারাম বের দেগা দেখরে।
কেমরা আফসালায় কেমরা পিয়াসালায় (২)
কেমরা কারমা গাড়ায়রে (২)
ও ভাই কেমরা কারাম গাড়ায় রে
ভাই মরা আফসালায় বোহিন মরা পিয়াসালা (২)
কেমরা কারমা গাড়ায় রে
ও ভাই কেমরা মরা কারমা গাড়ায়রে
কামরা গাড়াইতে ভেল সামরে তুলরে (২)
চেল যাহো আখরা ছলাইতে (২)
ও ভাই চেল যাহো আযরা ছসাইতে

ভাবার্থঃ বার মাস পর একবার মাসে তাই আনন্দে নাচ-গান করি। ভাই বোনের মধ্যে কথোপথন হয়, কে কারাম গাড়ায়। ভাই বলে আমি কারাম পূজা করবো। তার কথায় প্রত্যেক কাজ করতে বার মাস সময় লাগবে।

সোহরাই উৎসবের লোকসঙ্গীত ঃ কারাম উৎসবের আমেজ শেষ হতে না হতেই সোহরাইয়ের আগমনী বার্তা ধ্বনিত হতে শুরু করে। কার্তিক মাসের অমাবশ্যার সময় ওরাওঁরা সোহরাই উৎসব পালন করে থাকে। এই উৎসব চলে তিনদিন যাবত। এই উৎসবে পরিবেশিত লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হলোঃ

আরে ও ওরে
রেহি রে রে রে রে রে রে রে রে রে
দিয়া যে রায়ঝ দিয়ারা রে দিয়ারা
কা করে উরোজনা বাড়ীরে
আরে-আগে যে জাগাওয়ে গজোমতি গাহা হো
তোকোর পিছে জাগারো কৃষানোরে।

ভাবার্থঃ বাড়িওয়ালা তুমি বাতি জ্বালিয়ে কি করো, কিসের জন্য বাতি জ্বালাও, বাতি জ্বালিয়ে গোয়ালে গরুগুলোকে জাগিয়ে তুলছি এবং পরে কৃষককে জাগিয়ে তুলবো পূজার জন্য।

বড়কি চুমায়ো ভালা, ঝিলিমিলি খেচুয়া হো
মঝলি চুমায়ো দুর্বা ঘাসোরে
সাঝলি চুমায়ো দুয়ো কানের সোনা হো
টোছকি চুমায়ে বাথানো রে।

ভাবার্থঃ বড় বউ গরুকে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। পরে মেজো বউ ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। একই রূপে সেজো বউ ও ছোট বউ সব গরুকে আশীর্বাদ করে।

ফাগুয়া উৎসবের লোকসঙ্গীতঃ ওরাওঁ সমাজের নববর্ষের নাম 'ফাগুয়া'। ফাগের অর্থ আবীর। এই উৎসবে ব্যবহৃত হয় প্রচুর 'ফাগ' বা আবীর। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এ উৎসব উদযাপিত হয়। ফাগুয়া উৎসবের লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্তঃ

www.pathagar.com

সাঁওতাল নৃত্যগীত

লালে ঠট সুগা হারিয়ারা প্যাখরে
এ .... সুগা রঞ্জনি .... রঞ্জনি দুই আখরে
মারবোউ রে সুগা ধনুকা চাড়ায় যে
এরে সুগা।
গিরি যাবে .... যমুনা .... কিনার যে
হায় .... সুগা সুন্দর ভায় (২) ঐ
মাস তোরা গলি গলি ভূয়া পরি যাতও
.... রে .... এর সুগা .... হাড় তোরা
দিয়া চরি যাতোও (২) সুগা সুন্দর ভায়।।

এগানে একটি পাখির মাধ্যমে মানুষের জীবন ও মরণের কথা বলা হয়েছে। সুগা একটি পাখির নাম। বায়লায় সুগা পাখির লাল ও ঠোঁট ও সবুজ পাখা রঙিন চোখে। মারবো আমি সুগা ধনুক নিয়ে যে পড়ে যাবে। যমুনার ধারে। মাংস তোমার গলে গলে যাবে। হাড় তোমার উই পোকা খাবে, সুন্দর সুগা।

সারহুল উৎসবের গান: ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সারহুল উৎসবে বিশেষ ধরনের লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত -

কেতেয়নু তিখিল টাট্টিঃনু বিল্লি
একা দেওড়াস্ গুড়ঁমা লাগদাস
জোঁখ্ দেওরাস্ তেলা বিসাহী
বলবারী জিয়া কালঃই
বলবারী কারা কালঃই
কিচরিন চাঁড়ঃ অনঃ ভাণ্ডান সাজঃ অন্ঃ

www.pathagar.com

ভোঙ্গায় পেল্লো পারেতা মাঁইয়া
আনারি বাঃ আতনার তেঙ্গা চিরঃ অবঃ।

ভাবার্থ: কুলোতে চাল বেড়াতে এলো, কোন্ পুরাহিতে সোচ্চার আর্তি, যুবক পুরোহিতের হৃদয় কায় অকল্যাণে মুক্তি চায়। বলতে চলতে বলে যায় বলতে বলতে বিদায় নেয়। যুবতী তুমি পালিয়ে যাও অন্য পারে চলে যাও। তোমরা যা গোপন করছো অন্যরা তা প্রকাশ করছে।

প্রেম-বিষয়ক লোকসঙ্গীত: প্রেম মানব হৃদয়ের শাশ্বত চেতনার অন্যতম দিক প্রেম নিয়ে ওঁরাও সমাজে অসংখ্য লোকসঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে। প্রেমের আকুলতা কখনও প্রেমিকার কথা আবার কখনও প্রেমিকের কথা এসব গানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নিম্নে প্রেম বিরহ সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হলো:

না ছোড় যাবে পিয়া
না ছোড় যাবে
তো সাঙ্গে যাবে বেরী
ইয়া তোরে পিয়া
ঝিরগা ডাম ডোলে বাধে
ঝিরগা ডাম ডোলে পানি
ভিতরে ব্যাঙ হারমোনি বাজায়ে
ঝিরগা ডাম ডোলে।।

ভাবার্থ: প্রিয়তম তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি তোমার সঙ্গে চলে যাবো। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। বর্ষার বারিধারায় প্রকৃতি যেভাবে প্লাবিত হয়। ব্যাঙ আনন্দে গান গায়। আমি তেমনি তোমার সঙ্গে চলে যাবো। আনন্দে জীবন অতিবাহিত করবো।

ওরাওঁ নৃত্যগীত

www.pathagar.com

বিরহ সঙ্গীত

ক্ষুদিয়া চুরিয়া পোষালা
ভেইয়ারে ভেইয়া
ভেইয়া মোর গেলই
পরদেশ যাহা হো
ভেইয়া মোর গেলই
পরদেশ।

ভাবার্থ: ক্ষুদের দানা দিয়ে যে ভাইকে লালন করেছিলাম। সে ভাই আজ মারা গেল। সে পরপারে চলে গেল।

বিয়ের গীত: ওরাওঁ লোকসঙ্গীতের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে বিবাহাচারকে ঘিরে রচিত লোকসঙ্গীত। বিয়ের কথাবার্তা থেকে শুরু করে কনে বিদায় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এসব গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে।

একে গোটা বেটি
কা কারে দিয়ালো
মায়ো বেটি সুকে কান্দয়
দো আড়েনি লুগা
পনেকে টাকা
কেইসে ঘুরায়ো দেবোও।

ভাবার্থ: একমাত্র কন্যাকে বিয়ে দিতে হচ্ছে। স্নেহের কন্যার কান্নায় হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু (বর পক্ষের নিকট থেকে) দুখানি কাপড় পণ দেয়া হয়েছে; কেমন করে এগুলো ফিরিয়ে দেবো?

ঋতুর গান: ওরাওঁ সম্প্রদায়ে ঋতুর গান প্রচলিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত-

হায়রে হায়রে হায়
সারি সারি ছুড়ি তোমায় পরাব লাল শাড়ি
ফুল ফোটে শারি শারি।
ফলে গেল শ্রাবণ মাস পড়লো ভাদ্র মাস
ফুল ফোটে শারি শারি।
ছুড়ি (জ্ঞানী) তোমার পরাব লাল শাড়ি।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল: সঠিকভাবে জানা যায় না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী উৎপত্তিস্থল বা ব্যবহারিক এলাকা: রাজশাহী বিভাগের কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা: জানা যায় না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের দলের তালিকা: দলের/ শিল্পীদের তালিকা:

কৃষ্ণ লাকড়া, পিতা-সোমরা লাকড়া, গ্রাম-ধাপউদয়পুর, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর, বয়স-৩৫

বাসন্তী খাঁখাঁ, স্বামী-স্বপণ কুজুর, গ্রাম-হিলি, জেলা-জয়পুর হাট, বয়স-৩৫

মারমী কিসপট্টা, গ্রাম-মোমিনপুর, জেলা-নাটোর, বয়স-৫০

সুরমী বালা লাকড়া, স্বামী-বুধুরাম লাকড়া, গ্রাম-মোমিনপুর, জেলা-নাটোর, বয়স-৪০

ময়না এক্কা, পিতা-কেষ্ট এক্কা, গ্রাম-চন্ডিপুর, জেলা-ঠাকুরগাঁও, বয়স-২৫

মিনতি লাকড়া, পিতা-বুধু লাকড়া, গ্রাম-ধোকড়াকুল, উপজেলা-পুঠিয়া, জেলা-রাজশাহী, বয়স-২৬

www.pathagar.com

সত্যমুনী টপ্য, স্বামী-বোহিন তিরকী, গ্রাম-মোমিনপুর, জেলা-নাটোর, বয়স-৪০

ময়না রানী, স্বামী-মধু মিনজি, গ্রাম-কদমপুকুর, উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুরহাট, বয়স-৪৭

রমেশ তিগগা, পিতা-মৃত রামলাল তিগগা, গ্রাম-কদমপুকুর, উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুরহাট, বয়স-৪৭

আব্রাহাম এক্কা, পিতা-মিখায়েল এক্কা, গ্রাম-চৈতন্যপুর, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৪০

তারা কুজুর, স্বামী-জীবন কুজুর, গ্রাম-পাঁচ গাড়িয়া, উপজেলা-সিংড়া, জেলা-নাটোর, বয়স-৪৫

কল্পনা কিসপট্টা, পিতা-পাত্রাশ কিসপট্টা, গ্রাম-কাশিয়াবাড়ি, উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুর হাট, বয়স-৩০

নির্মলা কিসপট্টা, পিতা-পাত্রাশ কিসপট্টা, গ্রাম-কাশিয়াবাড়ি, উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুর হাট, বয়স-২৫

শ্যামল কুজুর, গ্রাম-নিমগাছি, উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ, বয়স-৪০

যুগোল কুমার ওরাওঁ, গ্রাম-নিমগাছি, উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ, বয়স-৩৮

সামষ্টিক গানের তালিকা: কারাম, সোহরাই, ফাগুয়া, সারহুল উৎসবের লোকসঙ্গীত, ঋতুর গান, বিয়ের গান।

এককগানের তালিকা: প্রেম বিষয়ক গান ও বিরত সঙ্গীত।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

বিপন্নগানের তালিকা: প্রায় সকল গানই বিপন্ন।

লুপ্তগানের তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

সনাক্তকৃত লোক বাদ্যযন্ত্রের তালিকা: ঢোল, মাদল, বাঁশী, তাল, নাগারা, খঞ্জনী, ঘুঙুর। সম্প্রতিককালে হারমনিয়মের ব্যবহার লক্ষণীয়।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত

সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠী পরিচিতি: সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ নৃগোষ্ঠী। তাদের বাসস্থান মূলত উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে সাঁওতালরা বহুকাল যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে।

সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলিয় (প্রোটো অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর। এদের গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি, চুল কালো ও কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু। এই দীর্ঘমুন্ড প্রশস্তনাসা সাঁওতালদের সঙ্গে মুন্ডা, ওরাওঁ, মালপাহাড়ি ও অনুরূপ আদিবাসীদের দেহ বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও সংস্কৃতিগত যথেষ্ট মিল রয়েছে। মিল রয়েছে তাদের গ্রামীণ পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এবং সেইসঙ্গে তাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য অনুরাগের ক্ষেত্রেও। সাঁওতালগণ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আদিবাসিন্দা, এরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষি সংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে স্বীকৃত।

উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। তবে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, পাবনা, যশোর, খুলনা এমনকি চট্টগ্রাম জেলাতেও অল্পসংখ্যক সাঁওতালদের বসতি ছিল।

বাংলাদেশে বর্তমানে সাঁওতালদের সংখ্যা কত তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে যে সব আদম শুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে স্বতন্ত্রভাবে সাঁওতালদের গণনা করা হয়নি। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) যে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় তাতে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের গণনা করা হয় একই সঙ্গে। এ থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হলো

www.pathagar.com

দিনাজপুর	৪১, ২৪২ জন
রংপুর	৪,২৯২ জন
রাজশাহী	১৯,৩৭৬ জন।
বগুড়া	১,৮৬১ জন।
পাবনা	১৭০ জন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৩ সালে। কিন্তু উক্ত আদমশুমারিতেও সাঁওতালদের স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হয়নি। এ কাজে বরং অগ্রণী ভূমিকা পালন করে খ্রিস্টান মিশনারিরা। ১৯৭৬ সালে দিনাজপুরের মিশনারি কর্মকর্তা মিঃ পিটার মেকনিক সাঁওতালদের সংখ্যা ৮০ হাজার বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই হিসাব যথার্থ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কেননা তাঁর গণনার তিন বছর পর দিনাজপুরের লুথেরান মিশনের রেফারেন্ড মিঃ বোর্ন রোরবি থানাভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে সাঁওতালদের যে সংখ্যা নিরূপণ করেন তা অনেকটা ভিন্ন। মিঃ বোর্নের প্রতিবেদনে দিনাজপুরের ১৯টি থানায় সাঁওতালদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩,১৯৬ জন। এক্ষেত্রে মিঃ বোর্নের রিপোর্ট অনেকাংশে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে ১৯৮৫ সালের জুন মাসে প্রকাশিত আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহীর এক প্রতিবেদনে এই জেলার সাঁওতালের সংখ্যা ৪১,০০২ জন বলে উল্লেখিত হয়। রংপুর ও বগুড়া জেলার সাঁওতালদের সংখ্যা এরূপ সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। তবে ১৯৭৬ সালে মিঃ মেকনিক এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সাঁওতালের সংখ্যা ২ লক্ষ বলে উল্লেখ করেন।

অস্ট্রিক ভাষী এই জনগোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে কখন কিভাবে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয় এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর আছে। Skrefsred এর মতে, সাঁওতাল কথাটির উদ্ভব ঘটেছে সুতার (Soontar) থেকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন তারা সুদীর্ঘ 'ষাঁওত' বা সমভূমিতে বাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয়ে পড়ে সাঁওতাল। আবার অনেকে সাঁওতালদের পূর্ব জাতিগত পরিচয় 'খেরওয়ার' বলেও অভিহিত করে থাকেন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সাঁওতালের পরিবর্তে 'সানতাল' বলতে পছন্দ করে। আর নিজেদের মধ্যে যখন তারা আলোচনা করে তখন, নিজেদের 'হড়' বলে সম্বোধন করে থাকে। হড় শব্দের অর্থ মানুষ।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি)

সাঁওতাল সমাজ জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন লোকসঙ্গীত। তাদের সঙ্গীত তাদের লোকজীবনের সার্বিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রেম, প্রকৃতি, জীবন-জীবিকা, ধর্ম-কর্ম, উৎসব অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু এমন দিক নেই যা সাঁওতাল লোকসঙ্গীতের বিষয় ভাবনায় স্থান লাভ করেনি। এখানে কয়েকটি সাঁওতালী লোকসঙ্গীতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে

প্রেম বিষয়ক লোকসঙ্গীতঃ প্রেম মানব হৃদয়ের শাশ্বত চেতনার অন্যতম দিক প্রেম নিয়ে সাঁওতাল সমাজে অসংখ্য লোকসঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে। প্রেমের আকুলতা কখনও প্রেমিকার কথা আবার কখনও প্রেমিকের কথা এসব গানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নিম্নে প্রেম বিরহ সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হলো।

প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত

দায়া দুলোড় এ্ঞেলতে
কুলি মেঘে সানাঞাঁ
মনেরঃ ভাবনা বাচোম লৌহওঞঁ
মন তিংমা চুটচ্‌ট কোড়াম তিংমা ধাক্‌ধাক
আম তুলুচ বড় গেচো বাচঞ দিলা।

www.pathagar.com

ভাবার্থঃ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমার মনের কথা বলতে পারছিনে আমার বুক কাঁপছে। আমি সাহস হারিয়ে ফেলছি।

বিরহসঙ্গীত

চেতইং মেতাঃ মেয়াম হিড়িং কেদা
এম কাতিংমে তি-রেয়াঃ বাজুমুদোম
রূতনড় বাড়িংমে মারুখা রুমোল।

ভাবার্থঃ নদীর তীরে ভেণ্ডা গাছ। সেগাছের নিচে তারা বসেছিল। প্রেমিক-প্রেমিকাকে বলছে, তুমি কথা রাখলে না, কাজেই আমার রুমাল ফিরিয়ে দাও।

বাহা উৎসবের লোকসঙ্গীতঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আরেকটি অন্যতম প্রধান উৎসব হলো বাহা উৎসব। সাঁওতালি ভাষায় 'বাহা' শব্দের অর্থ ফুল। ফাল্গুন মাসে এ উৎসব পালিত হয়। তাই কেউ কেউ একে বসন্ত উৎসব বলেও অভিহিত করে থাকেন। আবার কেউ বলেন 'পুষ্প উৎসব'। এই উৎসবে সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। পরিবেশিত হয় বিভিন্ন ধারার লোকসঙ্গীত। এখানে একটি বাহা উৎসবের দুটি লোকসঙ্গীতের কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলো -

তোয়ক কোকো চিয়ে লেদা বীর দিসমাদঃ
তোকয় কোকো টাণ্ডি লেদা বীর দিসাম দঃ
মোড়ে কোকো চিয়ে লেদা বীর দিসাম দঃ
তরুই কোকো কুটাম লেদা নাতো মা ময়ুর দঃ।

ভাবার্থঃ কে কে ঐ জংগলে গিয়েছিল, কে কে ঐ জংগলটা পরিস্কার করেছিল? ঐ জংগলে গিয়েছিল পাঁচজন লোক, ঐ জংগলে পরিষ্কার করেছিল ছয়জন লোক।

সেঁন্দ্রা কোকো ওড়োং এনা
ছাতু সাম্বার তায়য়োম মেনা
এহো হাপে হো তাঙ্গি লেপে
ইদি আপে-লে বাড়ি বুটো।

ভাবার্থঃ শিকারের জন্য যুবকেরা চলে যাচ্ছিল, পশ্চাৎ থেকে মেয়েরা তাদের ডেকে বলছিল, তোমরা বট গাছের তলায় অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের জন্য চিড়া-মুড়ি নিয়ে আসছি।

বিয়ের গীতঃ সাঁওতাল লোকসঙ্গীতের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে বিবাহাচারকে ঘিরে রচিত লোকসঙ্গীত। বিয়ের কথাবার্তা থেকে শুরু করে কনে বিদায় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এসব গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে।

হেন্দা বাবা রায় বারিচ
তিমিন মারাং তালে জাঁওয়াই কোড়া
নাড়ি হঁ বায় মারাং নাড়ি হঁ বায় হুডিঞ
সিয়োঃ পাঁয়ড়াঁরে ঝুন্‌কো
কাডায় লাগা কিনোঃ ঝুমুর ঝুমুর।।

ভাবার্থঃ এ বাবা ঘটকদার, আমাদের জামাইটা কতবড়ো। (উত্তরে ঘটক বলছে), বেশি বড়োও নয়, বেশি ছোটও নয়। তার লাঠির পেছনে ঝুমকো লাগানো আছে, মহিষ পেটার সময় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হয়।

হেন্দা বাবা রায়বারিচ
তিমিন মারাং তালে
বাহু কুড়ি?
অডি হঁ বায় মারাং
আডি হঁ বায় হুডিং

www.pathagar.com

জনঃ মুটিরে ঝুনকো
রাচায় জঃ জঃ কানা
ঝুমার ঝুমুর।।

ভাবার্থঃ এ বাবা ঘটকদার, আমাদের বউটা কত বড়ো? (ঘটক উত্তর দিচ্ছে), বেশি বড়োও নয়, বেশি ছোটও নয়; মেয়েটি বাড়ুন দিয়ে ঝাঁড়ু দিচ্ছে, তার পেছনে ঝুমকোগুলো ঝনঝন করছে।

দাঁসাই গানঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের নাম দাঁসাই গান। দাঁসায় গানের নমুনা

তকয় গুরুয়া বাচারে তুমদাঃ টামাক সাডিকানা
য়হায় তকয় চেলায়া রাচারে তুমদাঃ টাকাক সাডিকানা
কামর গুরুয়া রাচারে তুমদাঃ টামাক সাডিকানা
সহরায় কামরু চেলায়া বাচারে তুমদাঃ টামাক সাডিকানা
তকারেদ হো গুরুহো বোঙ্গায় জানাম লেন
যহায় তকরেদ হো চেলাহো গৌই জানাম লেন
বিরি ড়াডুরে গুরুহো বোদ্ধায় গৌই জানাম লেন
কাশি বেডারে বেলা হো গৌইকু জানাম লেন।

দং গানঃ সাঁওতালদের জনপ্রিয় সঙ্গীত দং গান। দং গানের লাইন বা স্তবক ছোট হয়। এ গানের কথাগুলোয় টানাভাব কম থাকে এবং একটু তাড়াতাড়ি বলতে হয়। দং গানের নমুনা

ছাম লাতার ছামডা লাতার, কুডুকুডু, মান্দাডিয়েই
বলয়েনা, আলে দলে মেন ইদা লহক তিগিয়
কুতু আকাশ, জনম কুডু ভালায় কুডু গেয়া।।

লাগড়েঁ গানঃ লাগড়েঁ গান সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। এ গানের প্রথম কথাগুলো স্বাভাবিক গতিতেই বলতে হয়, কিন্তু শেষের লাইনগুলো একটু তাড়াতাড়ি বলতে হয়। একটু সুর দিতে হয়। কোন কোন লাগড়েঁ গানে দু-একটি করে বাংলা শব্দ থাকে। এখানে একটি লাগড়েঁ গানের উদাহরণ দেয়া হলো

লেরে বাবু ধুতি, লেরে বাবু দাহিড়ি, লেরে বাবু মান্দাল বাজায়
আমি দিদি লেখাপড়া লোক গো, মান্দাল বাজায় জানিনা
আমি দিদি লিখনে গড় হল দিদি লিখনে গড় হগ।

ডান্টা গানঃ ডান্টা গানের প্রথম কথাগুলো কথা বলার মতো, তবে তাড়াতাড়ি বলতে হয়। এ গানে লম্বা সুর থাকে না। উদাহরণ

মর ডান্টা, মর ডান্টা লায় গেল হে
হে, হে, হা, হা মর ডান্টা মর ডান্টা
লায় গেল হে।

গাম গানঃ গাম গানের কথাগুলো টানাভাবে হয় এবং গলাটা হয় করুণ। যেমন

সাতশ হনুমান একটি বুড়া হনুমান
খেলেক ও খেলেক
দিদি মুখে দিদি জল দিলি না।

জান গানঃ জান গানের কথাগুলো স্বাভাবিক কথার মত কিন্তু শেষে লাইনের কথাটা টানাভাবে হয়। এই গানের উদাহরণ

লৌড়ি কিদেঞ্চ ঘৌড়ি কিদোঞ্চ
খান্দ খুন্দইঞ্চ পাঞ্জা কেৎ
জ-বাহা-সময় নাইগ পারম এনাবে।

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি স্থল: সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতি স্থল বা ব্যবহার এলাকা: উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চল।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের স্রষ্টাদের তালিকা: সাঁওতালী লোকসঙ্গীতের স্রষ্টাদের নাম জানা যায় না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের/ শিল্পীর তালিকা:

মহানমার্ডি, পিতা-জ্যাঠা মার্ডি, গ্রাম-মহানইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫০

দুরবিন মার্ডি, পিতা-জটলা মার্ডি, গ্রাম-মহানইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০

মিনতী মুর্মু, স্বামী-নরেন মার্ডি, গ্রাম-ঝিকড়া, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০

অজিত সরেন, পিতা-সুফল সরেন, গ্রাম-মহানইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০

নগেন টুডু, পিতা-লক্ষন টুডু, গ্রাম-গয়েশপুর, উপজেলা-বদলগাছী, জেলা-নওগাঁ, বয়স-৪৫

হাকিম মুর্মু, পিতা-বাজো মুর্মু, গ্রাম-জামালগঞ্জ, উপজেলা ও জেলা-জয়পুরহাট, বয়স-৪৫

গণেশ টুডু, পিতা-চান্দরাই টুডু, গ্রাম-নাচোল, উপজেলা ও জেলা-নাচোল, বয়স-৪০

স্যামুয়ল মুর্মু, পিতা-বাজো মুর্মু, গ্রাম-জামালগঞ্জ, উপজেলা ও জেলা-জয়পুরহাট, বয়স-৪০

সীতা হেমব্রম, স্বামী-সেমচান মুর্মু, গ্রাম-গোদাগাড়ী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫০

ডোমান টুডু, পিতা-রামটুডু, গ্রাম-কাহারোল, জেলা-দিনাজপুর, বয়স-৪৫

গোপিন মুর্মু, গ্রাম-চাপড়া, বিনোদপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৪

যতীন মারাণ্ডী, পিতা-রাম মারাণ্ডি, গ্রাম-ঋষিকুল, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৩৫

ছোটে মুর্মু, পিতা-শ্যাম মুর্মু, গ্রাম-ঋষিকুল, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৪০

শ্রীমতি মুর্মু, গ্রাম-মহলানপাড়া, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৩৭

দেবীলাল টুডু, পিতা-তিরু টুডু, গ্রাম-দেলবাড়ি, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৫

কর্ণেলুইস মুর্মু, গ্রাম-দেলবাড়ি, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০

শিমুল মারাণ্ডি, গ্রাম-দেলবাড়ি, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৩৮

সামষ্টিক গানের তালিকা: বাহা উৎসবের গান, দাঁসাই গান, দং গান, লাগিড়েঁ গান, ডান্টা গান, গাম গান, জান গান, বিয়ের গান ইত্যাদি।

এককগানের তালিকা: ডান্টা গান, প্রেম বিষয়ক গান ও বিরহ সঙ্গীত।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

বিপন্নগানের তালিকা: গাম গান, ডান্টা গান, লাগড়েঁ গান।

লুপ্তগানের তালিকা: জান গান।

সনাক্তকৃত লোক বাদ্যযন্ত্রের তালিকা: ঢাক ঢোল, বাঁশি, সিংগা, মাদল, তুমদা, তামাক, ডানটা ইত্যাদি।

ওরাওঁ ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত সংক্রান্ত সুপারিশ

সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা

শিল্পীরাই এসব লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক। তবে বিভিন্ন সংস্থা তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য শিল্পীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করে পারিশ্রমিক প্রদান করে থাকে।

www.pathagar.com

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যমান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬): বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আদিবাসী শিল্পীরা ২০/২৫ হাজার টাকা উপার্জন করেছেন।

সুপারিশমালা

ক. সংগ্রহ সম্পর্কিত: সাঁওতাল ও ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলো সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে বেশকিছু সঙ্গীত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এসব গান আর কোনোভাবেই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতগুলো অডিও ও ভিডিওতে ধারণ করে সংগ্রহ করা উচিত। তাছাড়া এসব সঙ্গীতের শিল্পীদের ব্যবহৃত লোকবাদ্যযন্ত্রসমূহ এবং সঙ্গীত পরিবেশনকালে পরিধানকৃত পোষাক, অলংকার ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ. সংরক্ষণ সংক্রান্ত: স্থানীয়ভাবে (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে) আদিবাসী লোকসঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে সেই একাডেমীতে সংগৃহীত লোকসঙ্গীতের সিডি (ভিডিও এবং অডিও), খ্যাতিমান শিল্পীদের আলোকচিত্র ও জীবনী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকাশনা মাধ্যমে সাঁওতাল ও ওরাওঁ শিল্পীদের স্মৃতিকে অমর করে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

গ. উপস্থাপন সংক্রান্ত: ভিডিওতে ধারণকৃত লোকসঙ্গীত মাঝে মাঝে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লোকসঙ্গীত উৎসব, ১লা বৈশাখ, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানমালায় লোকসঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে এর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বিনিময়ের মাধ্যমে এক জেলার আদিবাসী লোকসঙ্গীত অন্য জেলায় উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ঘ. মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: লোকসঙ্গীতগুলো আদিবাসী শিল্পীদের একান্তই সাধনার ফসল। তাই এর মেধাস্বত্ব যাতে শিল্পীরা ভোগ করতে পারেন সেদিকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের পর বিভিন্ন সুবিধাবাদী সংস্থা শিল্পীদের নামমাত্র সম্মানী প্রদান করে থাকে। এ ব্যাপারে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনগুলোকে অগ্রণী হয়ে তাদের যথাযথ মূল্যায়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজের সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩
ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য: ওরাওঁ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯
ওঙ্কার প্রসাদ, সাঁওতাল গান: শ্রেণী বিভাজন, লৌকিক, কলকাতা, ২০০৭
উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, দীপশিখা, অনগ্রসর (আদিবাসী), গণ উচ্চয়ন প্রকল্প, ঢাকা, ২০০৬
আদমশুমারী রিপোর্ট, ১৮৭২, ১৮৮১, ১৯৯১
ওরাওঁ ইয়োথ ফরমেশন প্রোগ্রাম কর্তৃক সম্পাদিত ওরাওঁদের শিক্ষা সংক্রান্ত জরিপ, ১৯৯৭
স্বপন এক্কা, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী/ বিস্তৃত বৌদ্ধ: ওরাওঁ, দীপঙ্কর, ২৫৫০ বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, ঢাকা, ২০০৬
মাইকেল সরেন সম্পাদিত, আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিসংখ্যান, আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী, ১৯৮৫
ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, আদিবাসী লোকজীবন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭
মহানমার্ডি, পিতা-জ্যাঠা মার্ডি, গ্রাম-মহানইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫০
দুরবিন মার্ডি, পিতা-জটলা মার্ডি, গ্রাম-মহানইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০
মিনতী মুর্মু, স্বামী-নরেন মার্ডি, গ্রাম-ঝিকড়া, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০
অজিত সরেন, পিতা-সুফল সরেন, গ্রাম-মহানইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০
নগেন টুডু, পিতা-লক্ষন টুডু, গ্রাম-গয়েশপুর, উপজেলা-বদলগাছী, জেলা-নওগাঁ, বয়স-৪৫
দেবীলাল টুডু, পিতা-তিরু টুডু, গ্রাম-দেলবাড়ি, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৫
কর্ণেলুইস মুর্মু, গ্রাম-দেলবাড়ি, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০
শিমুল মারাণ্ডি, গ্রাম-দেলবাড়ি, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৩৮

www.pathagar.com

কৃষ্ণ লাকড়া, পিতা-সোমরা লাকড়া, গ্রাম-ধাপউদয়পুর, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর, বয়স-৩৫
বাসন্তী খাঁখাঁ, স্বামী-স্বপণ কুজুর, গ্রাম-হিলি, জেলা-জয়পুর হাট, বয়স-৩৫
মারমী কিসপট্টা, গ্রাম-মোমিনপুর, জেলা-নাটোর, বয়স-৫০
সুরমী বালা লাকড়া, স্বামী-বুধুরাম লাকড়া, গ্রাম-মোমিনপুর, জেলা-নাটোর, বয়স-৪০
ময়না এক্কা, পিতা-কেষ্ট এক্কা, গ্রাম-চন্ডিপুর, জেলা-ঠাকুরগাঁও, বয়স-২৫
মিনতি লাকড়া, পিতা-বুধু লাকড়া, গ্রাম-ধোকড়াকুল, উপজেলা-পুঠিয়া, জেলা-রাজশাহী, বয়স-২৬
সত্যমুনী টপ্য, স্বামী-বোহিন তিরকী, গ্রাম-মোমিনপুর, জেলা-নাটোর, বয়স-৪০
ময়না রানী, স্বামী-মধু মিনজি, গ্রাম-কদমপুকুর, উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুরহাট, বয়স-৪৭
রমেশ তিগগা, পিতা-মৃত রামলাল তিগগা, গ্রাম-কদমপুকুর, উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুরহাট, বয়স-৪৭

www.pathagar.com

৯

সিলেট অঞ্চল

৯.১ সিলেট বিভাগের লোকসঙ্গীত

মাহফুজুর রহমান

ভূমিকা: বাংলার লোকসঙ্গীতের উন্মেষ পর্বের ইতিহাস সঠিকভাবে জানা না গেলেও ঐতিহাসিক মালমশলাকে যাচাই-বাছাই করলে দেখা যায় বাংলাদেশে লোকসঙ্গীত আবহমানকাল ধরে বহুমাত্রিক অভিব্যক্তিতে প্রচারিত প্রসারিত হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতির ভেতরে জাতির প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য নৃতত্ত্ব প্রভৃতি গভীরভাবে প্রোথিত থাকে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে লোকসংস্কৃতির ভেতর দিয়ে একটি জাতির পরম্পরা বা মৌলিকত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকে। শুরু থেকে বাংলা লোকসংস্কৃতির মূর্ত ও বিমূর্ত দুটি ধারাই গড়ে উঠেছে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ও উপকরণকে ঘিরে। প্রত্যেক লোকসঙ্গীত আকারে ও গভীরতায় সমান না হলেও এর স্রষ্টারা স্থানীয় অঞ্চলভিত্তিক উপকরণের দ্বারা তাদের সৃষ্টিকর্ম রচনা করেছেন। যার ফলে আমাদের লোকসম্পদের অঞ্চলভেদে আলাদা পরিচিতি রয়েছে। এ সকল লোকসম্পদ আমরা কতটুকু সনাক্ত ও সংগ্রহ করতে পেরেছি এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সত্য সত্যই বাংলাদেশে এক বিশাল লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। লোকসংস্কৃতির অনাবিস্কৃত অভিব্যক্তির অন্যতম দিক হলো লোকসঙ্গীত। এই লোকসঙ্গীতের তৃণমূলীয় প্রাচীন জনপদের একটি হচ্ছে সিলেট বিভাগ। সিলেটের লোকসঙ্গীতের তথ্য নিম্নপরিসরে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বিভাগ পরিচিতি: সিলেট বিভাগ পাহাড়-টিলা, বন-বনানী, হাওর-বাঁওড়, তেল-গ্যাস, ধান-পান, ফসল ফুলে-ফলে ভরা একটি উর্বরতম সমৃদ্ধ অঞ্চল। এককালীন শ্রীহট্ট বর্তমানে সিলেট বা জালালাবাদ নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে এ জনপদ কামরূপ হরিকেল কিরাত রাজ্যের অংশ ছিল। পরবর্তীতে লাউড়, গৌড়, জৈন্তা এই তিন ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা শোনা যায়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ইটা তরফ সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। শুরু থেকে প্রাক-দাবিড়, অস্ট্রিক তারপর মঙ্গোলয়েডদের বসবাসের কথা জানা যায়। পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের বসতি গড়ে ওঠে। এ সময় রাঢ় অঞ্চল থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আসতে শুরু করে। প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলে অস্ট্রিক ও মঙ্গোলয়েডদের একটি অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে বৃহত্তর সিলেটের পাহাড় পর্বত ঘেরা অরণ্য জনপদে স্থায়ীভাবে আবাস গড়ে তোলে। এভাবে একটি মিশ্র মানব গোষ্ঠীর বসবাস ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল ও সেন আমলে এ অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের প্রভাব বেশি থাকলেও হযরত শাহজালাল (রঃ) সিলেট আগমনের সময় থেকে সিলেট অঞ্চল মুসলমান শাসনধীন চলে আসে। আউল-বাউলের দেশ এই সিলেট বিভাগে জন্মেছিলেন বাউল সাধক হাছন রাজা, সাধক শীতালং শাহ, সাধক ভাবুক রাধারমন, ভাবুক সৈয়দ শাহনূর, সাধক দুরবীন শাহ, মরমী সাধক শেখ ভানু, ভাবুক দীনহীন, সাধক শাহ মোঃ কিস্মত আলী,

www.pathagar.com

মৌলানা ইয়াছিন, আরকুম শাহ, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম, গণ শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, লোকবিদ দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা, লোকসাহিত্যের আরেক সংগ্রাহক চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ, ফোকলোরবিদ অধ্যাপক আসাদ্দর আলীসহ বহু সাধক লোকমনীষী গুণীজনেরা। সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণে শ্রী চৈতন্যের পিতৃভূমি। বাংলা ভাষার দ্বিতীয় হরফ সিলেটী নাগরী আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বহু লড়াই সংগ্রামের ঐতিহ্য-াহী এক জনপদের নাম সিলেট। বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামন্ত জমিদার বিরোধী সংগ্রাম, নানকার বিদ্রোহ, চা শ্রমিকদের আন্দোলন, চাষী মজুরদের বিভিন্ন সংগ্রাম, কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের গণভোটসহ বহু সংগ্রামে সিলেট অঞ্চলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই, গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয় সিলেট বিভাগ। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব বাংলার প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে সিলেটবাসীর ভূমিকা বা অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে ভৌগোলিকভাবে সিলেট বিভাগ উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা দ্বারা বেষ্টিত। সিলেট মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা নিয়ে সিলেট বিভাগ গঠিত।

জেলা পরিচিতি সিলেট: সিলেট বিভাগের অন্যতম জেলা সিলেট। এ জেলা সদরে বিভাগীয় সদর অবস্থিত। সিলেট জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও সুনামগঞ্জ অবস্থিত। পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য,পশ্চিমে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা। ভৌগোলিকভাবে সিলেট জেলার একদিকে পাহাড়, টিলা, চা বাগান অন্যদিকে হাওর ও বিল অবস্থিত।

জেলা পরিচিতি মৌলভীবাজার: সিলেট বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য জেলা মৌলভীবাজার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান এ জেলায় অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে মৌলভীবাজার জেলার একদিকে পাহাড়, টিলা, চা ও রাবার বাগান, অন্যদিকে হাওর ও বিল অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে সিলেট জেলা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে হবিগঞ্জ জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য।

জেলা পরিচিতি হবিগঞ্জ: সিলেট বিভাগের আরেকটি অন্যতম জেলা হবিগঞ্জ। পাহাড়, টিলা, রাবার বাগান, চা বাগান, হাওর ও বিল বেষ্টিত এ জেলার উত্তরে সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা, দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে মৌলভীবাজার জেলা, পশ্চিমে বাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ জেলা অবস্থিত। ১৮৮৯ সালে হবিগঞ্জ সিলেট জেলার একটি মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ হবিগঞ্জ জেলায় উন্নীত হয়।

জেলার পরিচিতি সুনামগঞ্জ: সুনামগঞ্জ সিলেট বিভাগের অন্যতম জেলা। সাধক হাছন রাজা, রাধারমণ, দুরবীন শাহ, শাহ আব্দুল করিমের স্মৃতি ধন্য এ জেলা ভৌগোলিকভাবে উত্তরে ভারতের খাসিয়া ও জৈন্তি য়া পাহাড়, দক্ষিণে হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলা পুর্বে সিলেট জেলা, পশ্চিমে নেত্রকোনা জেলা দ্বারা বেষ্টিত। হাওর, বিল, নদী, ভাটি অঞ্চলের এই মহকুমা ১৯৮৪ সালে জেলায় উন্নীত হয়। মৎস্য সম্পদে ভরপুর সুনামগঞ্জ জেলার মোট আয়তন ৩,৬৬,৯৫৮ বর্গ কিঃ মিঃ।

লোকসঙ্গীতের তালিকা: বহু গায়েন ভাবুক, সাধকের চারণভূমি সিলেটকে বানের আর গানের দেশ বলা হয়ে থাকে। এই সিলেটে প্রাচীনকাল থেকে রচিত হয়েছে বহু লোকসঙ্গীত। এই লোকসঙ্গীতে সহজ সরল আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এই গানগুলো তত্ত্বকথা দর্শননিষ্ঠতা ও মরমিবাদ মানবতাবাদের অনুভূমিতে রচিত হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের তালিকা দেওয়া হলো।

কীর্তন গান: সনাতন ধর্মের অনুসারীরা কীর্তন গান গেয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে কীর্তনে দার্শনিকতা, ভাবুকতার ভিতর দিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণে ধর্মবোধ জাগ্রত করার কথা বলা

www.pathagar.com

ধামাইল গান (রমজান বয়াতি ও তার দল)

হয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত কীর্তনের রচয়িতারা হলেন দীনশরৎ উমাচরণ, দ্বিজদাস, কামিনী, শ্রীদাস, বংশীদাস প্রমুখ গুণীজন। এই গানগুলো আমাদের প্রাচীন লোকসঙ্গীতের অংশ। কীর্তনে একজন মূল গায়েন থাকেন। দলগতভাবে ছন্দায়িত অঙ্গভঙ্গিতে এই গান গুলো উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কীর্তনে ঢোল, করতাল সহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

জারিগান: মহরম মাসে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে এই গানগুলো দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। জারি গানের দলে একজন প্রধান গায়েন থাকেন। সিলেট অঞ্চলে স্থানীয় গায়েনরা এই জারির রচয়িতা। জারিগানে হালকা কিছু বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে।

সারিগান: সারি গান সিলেট অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। প্রাচীনকাল থেকে সারি গানের প্রচলন ছিল বলে অনেক গবেষক অনুমান করে থাকেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা এই গানগুলো পরিবেশন করে থাকেন। সিলেট অঞ্চলে ভাদ্র মাসে আমন ফসল লাগানোর মৌসুমে ফসলী মাঠে ধানের চারা লাগানোর সময় কৃষকরা সারি গান গেয়ে থাকেন। সারি গান শুরু করা হয় বন্দনা গীতের মাধ্যমে। সারি গানে করতাল মন্দিরা সহ হালকা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ঘাটুগান: বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এক সময়ে ঘাটু গানের প্রচলন ছিল। মধ্যযুগে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জের আজমেরিগঞ্জ উপজেলায় এই গানের উদ্ভব হয়। ঘাটুগান বা ঘাটু নাচ হিসেবে পরিচিত। পল্লীগানের মূলস্রোতে ঘাটুগান প্রেম সঙ্গীতের একটি অন্যতম ধারা। ঘাটুগানে ঘাটু ছোকরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নেচে নেচে এই গান পরিবেশ করে। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ঘাটু ছেলেকে ছোকড়া নাচইয়া বলা হয়ে থাকে। ঘাটুগানের বিশেষ পোষাক পরে এই নাচ নাচতে হয়। ঘাটুগানের রচয়িতাদের মধ্যে হবিগঞ্জের তরফ নিবাসী তস্যরাম ও মুন্সি ভবানী প্রসাদের নাম জানা যায়। ঘাটুগানের নমুনা:

ও রূপ আমারই অন্তরে গো রইল,
আচানক রূপ সইগো যমুনার কিনারে।

www.pathagar.com

জল ভরিতে গেলাম সইগো যমুনার কিনারে,
ঘাগুরী ভাসাইয়া গো জলে, চাইয়া রহিলাম রূপ পানে।

[তথ্যসূত্র: ঘাটুসঙ্গীত সংগ্রাহক মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।]

মালজোড়া: মালজোড়া গান আমাদের লোকসঙ্গীতের বাউল ধারার একটি শাখা। এই গানগুলো বাউল ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের ভাবুক লোক সাধকদের মধ্যে এ গানগুলো প্রচলিত। বাউল শিল্পীদের মধ্যে দু'জন দুই পক্ষে অবস্থান করেন। পাল্টা পাল্টি গান পরিবেশন ও উপস্থাপনার মাধ্যমে এ গানগুলোতে বাউল দর্শনের নানা তাত্ত্বিক বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়। বৃহত্তর সিলেটে এক সময় শাহ আব্দুল করিম, দুরবীন শাহ সহ অন্যান্য বাউল শিল্পীগণ গানের মাধ্যমে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। বর্তমানে সিলেট অঞ্চলে বাউলদের মধ্যে মালজোড়ার প্রচলন আছে।

হোলি গান: ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার সময় সনাতন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণদের মধ্যে হোলি গানের আসর বসে। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে চা বাগানের আদিবাসী চা শ্রমিকরা গান গেয়ে আবীর ছিটানোর মাধ্যমে হোলি উৎসব পালন করেন। হোলি গানের নমুনা নিম্নরূপ-

১। বসন্ত সময়ে কৃষ্ণ কোথায় গো ললিতে
যৌবন রাখিব রাধার কেমনে।
২। বসন্ত কাল যায় গো ফুরাইয়া
কৃষ্ণ আমার আজও আইল না।

[সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষিত]

মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, মরমী ও বৈষ্ণব ধারার সঙ্গীত ঃ বৈশিষ্ট্যগত কারণে বাংলার ভাব আন্দোলনে একটা নাড়ির সম্পর্ক প্রাচীন সিলেটের সাথে গড়ে উঠেছিল। এখানে বহু ভাবুক, সাধক, ফকির সাধুর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের শিষ্যশাবক অনুরাগী সব মিলে হাজার হাজার গান রচনা করেছেন। এই গানগুলো এখন

ফকিরী গান

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পাওয়া যায়। এছাড়া পীর আউলিয়ার মাজার আখড়াতে মেলা উৎসব ওরসে পরিবেশন করা এই গানগুলোকে ভক্ত অনুরাগীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গেয়ে থাকেন।

নৌকা বাইচের গান: বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেট বিভাগে বর্ষার মৌসুমে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়ে থাকে। নৌকায় বৈঠা হাতে উন্মুক্ত প্রান্তরে নদীর বুকে একযোগে এই গান গাওয়া হয়। এই গান লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত।

অজ্ঞাত রচয়িতার গান: সিলেট অঞ্চলে বহু অজানা অজ্ঞাত চারণ কবি সুফি-সাধক তাদের প্রাণের কথা গানে লিখে গেছেন। সাধকদের সাধনার ফসল এই গানগুলো মুখে মুখে বেঁচে থাকলেও এর রচয়িতাদের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। সিলেট বিভাগে অজ্ঞাত গানের নমুনা নিম্নরূপ:

অকূল সাগরে রে কেমনে পাড়ি দিবরে,
দিবা নিশি কান্দি আমি নদীর কুলে বইয়া।
যারা ছিল চতুর মাঝি তারা গেল বাইয়া (?)
আমি অধম রইলাম বসি ভাঙ্গা তরী লইয়ারে।
এ দেহ মাটির পিঞ্জিরা থাক কিরে পড়িয়া
জানি পাখি যাইবায় রে ছাড়িয়া।

[সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষিত]

মণিপুরী মৈতৈ লোকসংগীত: সিলেট বিভাগে বসবাসকারী মণিপুরী মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুই সম্প্রদায়ের লোক সঙ্গীতের ভাণ্ডার বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ, এ সকল গানের গীতিকার বা রচয়িতার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। মণিপুরী মৈতৈ সমাজের প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীত নিচে উদ্ধৃত হলো।

চীংদা শাৎপা উঙৈল্লে
চিন্নদনা কেনখিবা
কল্লকই দে।
ঐনা কেনগে কেনদেদা
মালংবনা হুম্বগী
কেনবদি দে।
মালংবা ঐসু কৈদৌদে
লৈবাংনা লৈখোক লোইবগী
কেনবদিদে (৪)

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশে মণিপুরী, ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেনী সংগমে, এ,কে,শেরাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬ পৃ ৮০]

খাসিয়া লোকসঙ্গীত: বৃহত্তর সিলেটে বসবাসরত খাসিয়াদের সাংস্কৃতিক জীবন ধারা সুপ্রাচীন ও বিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত। খাসিয়া সমাজে প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীত নিচে উদ্ধৃত হলো-

ঘুঙুরোয়া (ঘুঙ্গুর) ঝন ঝন বাজে
দঁহু ঝোলনা ঝোলে
রঙ্গে রঙ্গিনী গোপীয়ানা (গোপীগণ) বিছে (মধ্যে)
কেবলি আচানক ছাজে (সাজে)
ছোওয়া (ফুল বিশেষ) বেলি কুন্দন কেওয়ালী
জাই জুইদল বেল চাম্বেলি।

[তথ্যসূত্র: ব্যক্তিগত সংগ্রহ মাহফুজুর রহমান, দক্ষিণ কলিমাবাদ, মৌলভীবাজার।]

www.pathagar.com

গারো লোকসঙ্গীত: সিলেট বিভাগে বসবাসরত গারোদের প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীতের কয়েকটি লাইন নিচে উদ্ধৃত হলো-

গিতেল সিং ঘাচ্ছিও কেরা-এর সদেংব অ
ইয়া ওলাকি অ কো না ঃ খা রং থালা বর অ।
রং থাল গিপ্পা গিলিক খাতং ও অন্ব অ
খেজনা আরও দুকখ খাসা- এ চেলাতব অ।

[তথ্যসূত্র: ব্যক্তিগত সংগ্রহ মাহফুজুর রহমান, দক্ষিণ কলিমাবাদ, মৌলভীবাজার।]

হাজংদের লেওয়াতানা গান (লোকসংগীত): সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত হাজংদের প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীতের দু'টি লাইন উদ্ধৃত হলো:

প্রথমে বন্দনা করি দিবি সরস্বতি দ্বিতীয় প্রাণ হরি।
কি রাম ওই রাম দ্বিতীয় হরি।

[তথ্যসূত্র: ব্যক্তিগত সংগ্রহ মাহফুজুর রহমান, দক্ষিণ কলিমাবাদ, মৌলভীবাজার।]

গণসঙ্গীত ঃ গণসঙ্গীত মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে গণমানুষকে উদ্দীপ্ত করার গান। সিলেট অঞ্চলে এ গানের প্রচলন ছিল মধ্যযুগ থেকে। এই গান সিলেট অঞ্চলে নতুন সম্ভাবনা সঞ্চারিত করে বিগত শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশের দশকে। নতুন আঙ্গিকে গণসঙ্গীতের যাত্রা শুরু হয় গণশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কণ্ঠে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বহু গণসংঙ্গীত রচনা করেছেন। এছাড়া সিলেট অঞ্চলের বাউল শাহ আব্দুল করিমসহ অনেক শিল্পী গণসঙ্গীত রচনা করেছেন। এদের মধ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাস জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন সবচেয়ে বেশি। ইতিহাসের পাতায় লক্ষ করলে দেখা যায় চল্লিশের দশকে বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জের বানিয়াচঙে এক সময় ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এতে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। এ সময় বানিয়াচঙের মানুষকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। সে সময় তিনি বচনা করেন এমন একটি গান নিম্নরূপ:

বাইনাৎচঙে প্রাণবিদরী ম্যালেরিয়া মহামারী
হাজার হাজার নরনারী মরচে অসহায়,
শান্তি ভরা সুখের দেহ
শূন্য আজি নাইরে কেহ।
মৃত সন্তান বুকে লইয়া কান্দে বাপ-মায়

[তথ্যসূত্র: নানা প্রসঙ্গ নানা ভাবনা, লেখক মাহফুজুর রহমান, বাংলা গণসংঙ্গীত আন্দোলন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পৃ. ৪০, মুক্তধারা ঢাকা ২০০৭]

বিয়ের গান: সিলেট অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে বিয়ের গানের প্রচলন রয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে, গায়ে হলুদে, বর কনের বাড়িতে দল বেঁধে মহিলারা এ গান পরিবেশন করে থাকেন। এই গানে নতুন বৌ, নতুন জামাই, বেয়াই-বেয়াইনকে ঠাট্টা মশকরা করে গান গুলো গাওয়া হয়। সিলেটি বিয়ের গানের নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

দেখছি কইন্যার মাথা ভালা ডাব নারিকেল জুড়ারে
দেখছি কইন্যার দাঁতা ভালা আনারের দানা রে ॥
দামান্দের ও সাত ভাই সাত ঘোড়া ছুয়ারী
একেলা দামান রাজা চৌদল চুয়ারী।
চৌদলের কিনারে পড়ে হীরা লাল মতিরে
চল যাই চল যাই দামান দেখি বারে।।

[তথ্যসূত্র: জেলা পরিক্রমা সিলেট, এ,টি,এম জিল্লুর রহমান খান, সিলেটের লোকসাহিত্য, জেলা তথ্য অফিস সিলেট, পৃ. ২৩২, ১৯৯১-৯২।]

ব্রতগান: হিন্দু সমাজে নানা ব্রতচারের ঐতিহ্য বিদ্যমান। পৌরাণিক ও বৈদিক পাল-পার্বণের সংখ্যা অনেক। ব্রত অনুষ্ঠানে আল্পনা চিত্র আঁকা হয়। মন্ত্রপাঠ ও গান পরিবেশন করা হয়। ব্রত গানের দুটি লাইন নিম্নরূপ-

www.pathagar.com

ষোল ষোল বার্তির হাতে ষোল সরা দিয়া
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

[তথ্য সূত্রঃ লোকায়ত পাল পার্বণ দেওয়ান গোলাম মোর্তজা, ফারযানা প্রকাশনী সুরবিতান সড়ক হবিগঞ্জ ১৯৮৫ পৃ. ৯০]

ছাদপেটানোর গানঃ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত সিলেটেও ছাদ পেটানোর সময় গান গাওয়া হয়। ছাদ পেটানোর গান সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় সারি গানের মতো করে পরিবেশন করা হয়। এই গানগুলোতে আঞ্চলিক শ্লোক ও কিংবদন্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

বারমাসীঃ একসময় বারমাসী সিলেট অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই গানগুলো গ্রামে গৃহস্থ বাড়ির উঠানে অথবা বড় বটগাছের নিচে খোলা মাঠে আসর জমিয়ে পরিবেশন করতেন গায়েনরা। বারমাসী গানগুলোতে আমাদের লোক সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, শাসন-শোষণ, দ্রোহ, প্রেম-বিরহের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সিলেটি বারমাসী শান্তি কন্যা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল-

কালা কালা কালা দো শান্তি কালা মাথার কেশ
তোরই লাগি ছাড়ি আইলাম বাপ ভাইয়ের দেশ ওরে কি ॥
এইত পৌষরে মাস দ্বিতীয়ার উঠে চান্দ
কেমনে রাখিমু আমি নাগরের পরান। ওরে কি ॥

[তথ্যসূত্রঃ শান্তিকন্যার বারমাসী, সংগ্রাহক মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন কাব্যবিনোদ, গ্রাম রহিমপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩৭, পৃ. ২]

প্রতিটি লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থলঃ সিলেট বিভাগের ভৌগোলিক পরিসরে কেন্দ্রীভূত লোকসসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল নিম্নে বর্ণিত হলঃ

ক্রমিক		**লোকসঙ্গীতের নাম**	**উৎপত্তিস্থল**
১	কীর্তন গান	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার ভাবুক, সাধক ও ভক্ত সমাজে।	
২	জারি গান	সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার প্রান্তিক জনপদে	
৩	সারি গান	সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার প্রান্তিক জনপদে	
৪	ঘাটু গান	হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার তরফে	
৫	মালজোড়া	সুনামগঞ্জ, সিলেটের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে	
৬	হোলি গান	সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায়	
৭	মুর্শিদি, মারফতি, বাউল মরমী ও বৈষ্ণব ধারার সঙ্গীত	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার সাধক, ভাবুক, সুফী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে।	
৮	নৌকা বাইচের গান	সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, জেলায় কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের মাঝে	
৯	অজ্ঞাত রচয়িতার গান	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার প্রান্তিক জনপদে।	
১০	মণিপুরী (মৈতৈ)	প্রাচীন মণিপুর রাজ্য পরবর্তীতে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে।	
১১	খাসিয়া লোকসঙ্গীত	প্রাচীন খাসিয়া রাজ্যে পরবর্তীতে সিলেট অঞ্চলের খাসিয়া সমাজে।	
১২	গারো লোকসঙ্গীত	গারো পাহাড় অঞ্চলে পরবর্তীতে সিলেটের গারো সমাজে।	
১৩	গণসঙ্গীত	সিলেট শহর, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের রাজনৈতিক সংগঠক শিল্পীদের মধ্যে।	
১৪	বিয়ের গান	সিলেট বিভাগের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে	
১৫	ব্রত গান	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে।	
১৬	ছাদ পেটানো গান	মৌলভীবাজার, সিলেট জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে।	
১৭	হাজংদের লোকসঙ্গীত	অজ্ঞাত	

[তথ্যসূত্রঃ লেখকের ব্যক্তিগত অনুসন্ধান]

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতি স্থান: লোকসঙ্গীত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে এগুলো অনেক সময় মুখে মুখে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিলেটের লোকসাহিত্যের একটা অংশ এক সময় ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয় বলে গবেষকরা অনুমান করেন। এজন্য দেখা যায় সিলেটের অনেক বাউল সাধকের গান দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে সাধক হাছন রাজা, রাধারমন শাহ আব্দুল করিম, গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গাওয়া গান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলায় বিস্তৃত হয়েছে।

লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা: প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে সিলেট অঞ্চলে বহু সাধক গায়েন লোকস্রষ্টার জন্ম হয়েছে। এই লোকস্রষ্টাদের রচনাসমূহে ধর্মীয়, সামাজিক, নান্দনিক, জাগতিক, পারলৌকিক, নানা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমাদের বিদ্যমান রাষ্ট্র সমাজের অসচেতনতায় এই লোক স্রষ্টারা কালের গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছেন। তার পরও নানা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে লোকসঙ্গীত স্রষ্টার নিম্নরূপ তালিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

১। গোলাম হোসেন (১৪৬৮-১৫৫৬)	: লস্করপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
২। সৈয়দ সুলতান (ষোড়শ শতাব্দী)	: লস্করপুর, সদর হবিগঞ্জ।
৩। সৈয়দ শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৫)	: জালালসাপ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
৪। দীন ভবানন্দ (সতের শতক)	: নর্তন, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
৫। শেখ চান্দ (১৭২০-১৮২০)	: ভাগার হাট, রাজনগর, মৌলভীবাজার।
৬। শাহ আব্দুল ওয়াহাব (১৭৬০-১৮৮৮)	: ফুলবাড়ি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
৭। সৈয়দা ছামিনা ভানু (১৭৩০-?)	: জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
৮। ইলিয়াস কুদ্দুস (ষোড়শ শতাব্দী)	: খর গাও, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
৯। শাহ হুছন আলম (১৫০০-১৬৫০)	: পীরেরগাও, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
১০। ভোলা শাহ	: বালাগঞ্জ, সিলেট।
১১। শিতালং শাহ (১৮০০-১৮৮৯)	: করিমগঞ্জ, সিলেট।
১২। রাধারমণ দত্ত (১৮৩৩-১৯০৭)	: কেশবপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
১৩। হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২)	: সুনামগঞ্জ, সদর সুনামগঞ্জ। .
১৪। ছহিফা বানু (১৮৫৮-১৯১৭)	: বিশ্বনাথ, সিলেট।
১৫। আফজাল শাহ (১৮০৭-১৯২৭)	: কৃষ্ণনগর, ছাতক,সুনামগঞ্জ
১৬। সৈয়দ মুসা	: তরফ, লস্করপুর, হবিগঞ্জ।
১৭। শাহ আছদ আলী (১২২৩-১৩১২ বাং)	: ষোলঘর সদর, সুনামগঞ্জ।
১৮। নাছিম আলী (১৮১৩-১৯২০)	: মোল্লারগাও, সিলেট।
১৯। মৌলানা মোহাম্মদ ইয়াছিন (১৮০০-?)	: লক্ষ্মীপুর
২০। নূর মোহাম্মদ (১৮১৫-১৮৯৫)	: গহরপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
২১। দিলবরশা পীর (১৮২০-১৯২০)	: ঘোড়াডুম্বর, ছাতক,সুনামগঞ্জ।
২২। মুন্সী মশাহেদ আলী(১৮৪০-১৯৪০)	: লুদরপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
২৩। শেখ ভানু (১৮৪৯-১৯১৯)	: ভাদিকারা, লাখাই, হবিগঞ্জ।
২৪। মুনশী শাহ জহিরউদ্দিন পীর ওরফে দীনহীন	: স্নানঘাট, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

www.pathagar.com

২৫। শাহ মোঃ কিস্মত আলী (১২৮৬-১৩৫১বাং)	: বামাকান্দি, হবিগঞ্জ।
২৬। সৈয়দ মোকাম্মেল হোসেন (১৮৭৮-?)	: লস্করপুর, হবিগঞ্জ।
২৭। সৈয়দ শাহ আছি উল্লাহ	: চন্ডচড়ী,বাহুবল, হবিগঞ্জ।
২৮। সৈয়দ ইজহার আলী (?-১৩৪০)	: চন্ডচড়ী,বাহুবল, হবিগঞ্জ।
২৯। মোঃ কলমদর ফকীর (১২৯৪-১৩৬৯)	: পুড়াসুন্দা, হবিগঞ্জ।
৩০। সৈয়দ গোলাম মোস্তফা হোসেনী	: সুলতানশী, হবিগঞ্জ।
৩১। ধাম আলী শাহ	: ফতেপুর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
৩২। আবুল হাসিম (১৩০০-?)	: মুড়াকরি, লাখাই, হবিগঞ্জ।
৩৩। নবীন দাস	: ভাদিকারা, লাখাই, হবিগঞ্জ।
৩৪। বিপিন সাধু	: লামাতাউসী, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৩৫। তারিনী সরকার (১৩২১-১৩৯১)	: সুবিদপুর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
৩৬। এলাহী বক্স	: লামাপাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
৩৭। সাঈদ আহমদ (১৯২০-?)	: মুড়ারবন্দ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
৩৮। সৈয়দ শাহ আব্দুল্লাহ (১৯১৮-১৯৭৮)	: মোল্লারাই, নবীগঞ্জ,হবিগঞ্জ।
৩৯। মৌলা শাহ (১২৭৫-১৩৬৫বাং)	: তেঘরিয়া, হবিগঞ্জ।
৪০। সৈয়দ আলী ফকির (?-১৩৭৫)	: নগয়ানগর, আজমেরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
৪১। মোহাম্মদ আব্দুল হুছন (১৮৬০-১৯৪০)	: রঙ্গারচর, পাগলা, সুনামগঞ্জ।
৪২। মুন্সী রহমত উল্লাহ	: আলীপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
৪৩। দীনহীন সৈয়দ আব্দুন নূর হোসেনী (১২৬১-১৩২৫)	: সুলতানসী, হবিগঞ্জ।
৪৪। মজির উদ্দিন আহমদ (১২৭০-১৩৪০ বাং)	: সৈয়দপুর,জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
৪৫। আব্দুর রাজ্জাক (১৮৪৮-১৯৫৮)	: ধাইপুর, সুনামগঞ্জ।
৪৬। নওশের আলী (১২৭০-১৩৬১ বাং)	: তেঘরিয়া, সুনামগঞ্জ।
৪৭। বাছির শাহ মওলা	: সুনামগঞ্জ
৪৮। জোবেদ আলী	: সুনামগঞ্জ
৪৯। আছাদ উল্লাহ (১২৬৭-১৩৫২ বাং)	: তরফ, হবিগঞ্জ।
৫০। শেখ কারী আব্দুল ওয়াহিদ (১২৭৫-১৩৬০ বাং)	: ঢাকা দক্ষিন, সিলেট।
৫১। ইব্রাহীম আলী তশনা (১৮৭০-১৯৩০)	: কানাইঘাট, সিলেট,
৫২। ছাবাল আফবর আলী	: সিলেট
৫৩। সৈয়দ জহুরুল হোসেন (১২৮৩-১৩৪৯ বাং)	: মাধবপুর,বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৫৪। দেওয়ান গনিউর রাজা (১২৮৩ -? বাং)	: সুনামগঞ্জ শহর।
৫৫। দেওয়ান একলিমুর রাজা (১৮৮৬-১৯৬৪)	: রামপাশা, বিশ্বনাথ, সিলেট।
৫৬। সৈয়দ রফাছত আলী	: বালিকান্দি, মৌলভীবাজার।
৫৭। সৈয়দ আব্দুল লতিফ জালাবাদী (১৮৭৬-১৯৩৯)	: সিলেট।
৫৮। আরকুম শাহ (১৮৭৭-১৯৪১)	: ধরাধরপুর সিলেট।
৫৯। দব্বীর্ণ শাহ (১৯২০-১৯৭৭)	: ছাতক, সুনামগঞ্জ।

www.pathagar.com

৬০। শাহ আব্দুল করিম (১৩২২-)	: উজান ধল, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
৬১। উছমান আলী	: সুনামপুর, গোপালগঞ্জ, সিলেট।
৬২। মোঃ মতাহির আলী	: সিলেট।
৬৩। মনাওর আলী (১৮৮৬-১৯৫১)	: সুনামগঞ্জ শহর।
৬৪। আসাদ উল্লাহ (১৩০৯-১৪০১)	: ছাতক, সুনামগঞ্জ।
৬৫। মিয়াধন মিয়া	: জাবেদা,কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
৬৬। আব্দুল আজিজ (১৮৯৩-১৯৬০)	: ছোটদেশ, কানাইঘাট, সিলেট।
৬৭। মুন্সী হুছন আলী	: বিড়াখাই, জৈন্তা, সিলেট।
৬৮। মনির উদ্দিন ওরফে দৈখোরা	: অজ্ঞাত
৬৯। নাসিবুর রহমান (১৯০৫-১৯৮৯)	: বীরদল, কানাইঘাট, সিলেট।
৭০। মুন্সীভবানী	: তরফ, হবিগঞ্জ।
৭১। গণকবি দিলওয়ার (১৯৩৬-)	: ভার্থখলা, সিলেট।
৭২। ক্বারী আমির উদ্দিন	: ছাতক, সুনামগঞ্জ
৭৩। সত্যরাম	: তরফ হবিগঞ্জ।
৭৪। সুন্দর আলী	: শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

লোকশিল্পীদের তালিকা: সিলেট বিভাগে শিল্পী গায়েনদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। সিলেটে, আউল, বাউল, ভাবুক ও সাধক প্রত্যেকেই ছিলেন গণশিল্পী। তাদের সৃষ্ট সুর লোকচিত্তে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। নিম্নে এ সকল লোকসংগীত রচয়িতাদের তালিকা দেওয়া হলো।

১। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মিরাসী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
২। নির্মলেন্দু চৌধুরী লবনীদা বেহেলী, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
৩। রাম কানাই দাশ, গরুয়া, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
৪। বিদিত লাল দাশ, শেখ ঘাট, সিলেট।
৫। আরতী ধর, সিলেট শহর।
৬। সেলিম চৌধুরী, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার।
৭। ভবতোষ চৌধুরী, মাধবপুর, হবিগঞ্জ, বর্তমান সিলেট শহর।
৮। ক্বারী আমির উদ্দিন, ছাতক, সুনামগঞ্জ।
৯। শফিকুর নুর দিরাই,সুনামগঞ্জ।
১০। এ কে আনাম,শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১১। শাহ আব্দুল করিম, দিরাই,সুনামগঞ্জ।
১২। জামাল উদ্দিন, হাসান বান্না, সিলেট।
১৩। আকরামুল ইসলাম, লামা বাজার, সিলেট, বর্তমানে ঢাকা।
১৪। সুবীর নন্দী, হবিগঞ্জ, বর্তমানে ঢাকা।
১৫। ইয়ারুন নেছা খানম, সিলেট।
১৬। আব্দুল হান্নান, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার।
১৭। রণধীর রায়, আমবাড়ী, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
১৮। মোঃ ইউসুফ, রঘুনাথপুর শমসেরনগর, মৌলভীবাজার।

www.pathagar.com

১৯। মরিয়ম বেগম, কাজিটুলা, সিলেট শহর।
২০। বাউল বিরহী কালা মিয়া, সিলেট শহর।
২১। বাউল উদাসী মুজিব, সিলেট শহর।
২২। হামিদ জালালী, সিলেট শহর।
২৩। মালতী পাল, সিলেট শহর।
২৪। হিমাংশু বিশ্বাস, সিলেট শহর।
২৫। হিমাংশু গোস্বামী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
২৬। নোমান আজিজ খান, রামপাশা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
২৭। লাভলী দেব, সিলেট শহর।
২৮। তুলিকা ঘোষ, সুনামগঞ্জ।
২৯। মলয় চক্রবর্তী রাজা, সুনামগঞ্জ।
৩০। শাহিন বখত, সুনামগঞ্জ।
৩১। সিদ্ধার্থ বখত, হবিগঞ্জ।
৩২। আকবর আলী, হবিগঞ্জ।
৩৩। সুমনা দত্ত, মৌলভীবাজার।
৩৪। তমাল চক্রবর্তী, সিলেট।
৩৫। পংকজ, সিলেট।
৩৬। বাবুল বৈদ্য।

লোকসঙ্গীত দলের তালিকা: সিলেট বিভাগের লোকসঙ্গীত দলগুলো স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও গোষ্ঠীর, ঐতিহ্য ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। এই দলগুলো নিজস্ব কর্মপন্থায় পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লোকসঙ্গীত দলের তালিকা তুলে ধরা হলো:

* সিলেট জেলা বাউল কল্যাণ সমিতি, তালতলা, সিলেট।
* জগন্নাথপুর, বিশ্বনাথ, ফেঞ্চুগঞ্জ, কালচারাল এসোসিয়েশন, সিলেট।
* লোক শিল্পী দল, শ্রীনাথপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
* একতারা শিল্পীগোষ্ঠী, সুনামগঞ্জ।
* সুরবিতান, সুরবিতান সড়ক, হবিগঞ্জ।
* ত্রিমাত্রা শিল্পীগোষ্ঠী, সিলেট।
* লোকজ শিল্পীগোষ্ঠী, সুনামগঞ্জ।
* লোকদল শিল্পীগোষ্ঠী, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
* হবিগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ, হবিগঞ্জ।
* ছাতক, প্রবাহ সাংস্কৃতিক সংগঠন, ছাতক, সুনামগঞ্জ।
* উদীচী, শিল্পীগোষ্ঠী, সিলেট জেলা সংসদ
* উদীচী, শিল্পীগোষ্ঠী, মৌলভীবাজার জেলা সংসদ
* উদীচী, শিল্পীগোষ্ঠী, হবিগঞ্জ জেলা সংসদ
* উদীচী, শিল্পীগোষ্ঠী, সুনামগঞ্জ জেলা সংসদ
* রিদম শিল্পীগোষ্ঠী, মৌলভীবাজার।
* কৃষ্টি, মৌলভীবাজার।

www.pathagar.com

* সুরাসর শিল্পীগোষ্ঠী, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার
* মুক্তপ্রাণ, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার।

সামষ্টিক সঙ্গীতের তালিকা: সিলেট বিভাগে সামষ্টিক লোকসঙ্গীতের তালিকায় গাজীর গান, ঘাটুগান, বাউল গান, গণসঙ্গীত, ধামাইল, কীর্তন, জারি, সারি, নৌকাবাইচ, বিয়ের গান, মালজোড়া প্রভৃতির নমুনা পাওয়া যায়।

একক সঙ্গীতের তালিকা: সিলেট বিভাগে একক সঙ্গীতের তালিকা বেশ দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সিলেটের আউল-বাউল-মরমী-সাধক প্রচুর একক সঙ্গীত রচনা করেছেন। এখানে একক সঙ্গীতের তালিকা তুলে ধরা হলো:

* লোকে বলে লোকে বলেরে, ঘরবাড়ি ভাল নয় আমার। হাছন রাজা, সুনামগঞ্জ।
* লোকে বলে আগে ভালা মৌলানা। মৌলানা শাহ ইয়াছিন, লক্ষিপুর।
* ও নাইয়া, ধবাইয়া ধবাইয়া নাও বাইও। গুলাম হুছন।
* রসিক চিনিয়া প্রেম করতে। সৈয়দ মুছা।
* আমার কি হইল প্রাণ সখিগো জলের ঘাটে গিয়া। রাধারমন দত্ত, কেশবপুর, সুনামগঞ্জ।
* লাইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মদ রসুল। শেখ ভানু, ভাদিকারা,লাখাই, হবিগঞ্জ।
* তুমি সত্য আমি মিথ্যা, আমি আমি কিছু নয়। সৈয়দ জহুরুল হুসেন, হবিগঞ্জ।
* না যাইব ভবে বুঝি আমার দুঃখের দশাগো, মনেরৈই আশা। শেখ চান্দ, ভাগার হাট, রাজনগর, মৌলভীবাজার।
* আমার আল্লা পাঞ্জাতন। দীনহীন, হবিগঞ্জ।
* বন্ধু কই যাওরে দেখি লই তোমারে। সৈয়দ শাহনুর, হবিগঞ্জ।
* কোথাহে দয়াল মুর্শিদ বে-নিশানের নিশানা। কিস্মত আলি, হবিগঞ্জ।
* লীলাময় বিশ্বনাথ করুণা-নিধান। সৈয়দ মোকাম্মেল হোসেন, হবিগঞ্জ।
* সোনা বন্ধু আওরে চান্দরে আবে শিরীল তরে, কলিমার কলদিয়া লামাইমু তোমারে। শাহডুমন, হবিগঞ্জ।
* আমার এই প্রার্থনা, দীনহীনের দিন দয়াময়, যেন তোমার অধীন হই চিরদিন, কারো অধীনে নাই হই দিনদয়াময়। সৈয়দ শাহ ইজাহার আলি।
* কে যেন বিরাজে আসিয়া এ সভায়। কলমদর ফকীর।
* সেতারে সে তার বাজে তার। সৈয়দ গোলাম মোস্তফা।
* নামাজ পড়ছে মমিনগন, নামাজ বিনে গতি নাই। হোসেন আলী শাহ।
* আমার বিয়ার কদিন আছে বাকি গো সখী। আবুল হাসিম।
* মুই অধমেরে দেও শ্রীচরণ, দুরে যাউক শমন। নবীন সাঁহাজি।
* আমার অচল তরী টেনে দিও বাইয়া। বিপিন সাধু।
* মুখের জুরে সাধু হলে, গুরু যে নাম দিল। তারিনী সরকার।
* আমারে নি করবায় দয়া ভীষন হাসরের দিনে। বাউল শাহ।
* বাবা কুতুবুল আউলিয়া ধন। সাঈদ আহমদ চিশতী।
* শুধু ভক্তিতে মুক্তি পাবে ভাবিস কেন বল। সৈয়দ শাহ আব্দুল্লাহ।
* দয়াল মুরশিদ আমার দু কুলের কান্ডার। মৌলাশাহ।
* এভাবে মন তুমি কার আশা কর। সৈয়দ আলী ফকির।
* আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। শাহ আব্দুল করিম, ধল, ধিরাই, সুনামগঞ্জ।
* যে ভাইয়ে মুর্শিদ ভেজে হইয়া হীনের হীন। মৌলভী আব্দুর রশিদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

www.pathagar.com

* কই ওগো প্রাণের বান্ধব সুবলরে। শহীদ সাগ্নিক, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার।
* জিউবায় না মানে সখী প্রিয়া পরদেশীরে। হরগোবিন্দ, উচাইল, হবিগঞ্জ।
* নবীর চরণ তরণী দিয়া হইতায় পার। শাহ হাজির আলী, মাধবপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
* তুমি রহমতের নদীয়া দোয়া কর মোরে শাহ জালাল আউলিয়া। দিলওয়ার, ভার্থখলা, সিলেট।
* পাগল করে কাছে ডাকো তুমি। মীর লিয়াকত আলী, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার।
* কহে বিবি ছামিনা ভানু শাহনূরের তিরি। মোছাম্মত ছামিনাভানু, নবীগঞ্জ।
* সৈয়দ রহমানে কয় ভাইভাবে আইলাম সাচ্চা। শাহ সৈয়দ অব্দুর রহমান তরফ, হবিগঞ্জ।
* ইদ্রিছবলে মন ভোলা তোর দুঃখের কপাল। শাহ ইদ্রিছ আলী, বাম্ভ্রাকোনা, মৌলভীবাজার।
* কুলচান্দ বলেরে। কুলচান্দ দাস, করিমগঞ্জ, সিলেট।
* পিরীতি নয় গো সামান্য যে করা। সাধকনয়ান চান্দ দাস, ইন্দেশ্বর, রাজনগর, মৌলভীবাজার।
* পাছে পাছে আইল যারা। পুলিন গোস্বামী, মৌলভীবাজার।
* হায় বন্ধু হায় বন্ধু বলে। মহেন্দ্র গোস্বামী, সুনামগঞ্জ।
* দীনহীন মুছায় বলে - প্রেমানলে অঙ্গ জলে। শাহমুছা, করিমগঞ্জ।
* রসিক চান্দের আছে জানা। রশিদচান্দ,মৌলভীবাজার।
* কালের নৌকা পালে গো চলে। গোবিন্দ গোস্বামী, সাতগাও, মৌলভীবাজার।
* ইন্দ্রমোহন বলে বাঁশী কেন ভাসাইবে জলে। ইন্দমোনে দাস, চৌয়াল্লিশ, মৌলভীবাজার।
* হীন কিস্কর কুমতি-ছাড়ি কর প্রেমের গতি। শ্রী কিস্কর দাস, সুনামগঞ্জ।
* নিমাই চান্দ কৈলাসেরে বলে। নিমাই চান্দ, কৈলাস, সুনামগঞ্জ।
* নরেন্দ্র কহে আত্ম কাহিনী। নরেন্দ্র, ইটা, মৌলভীবাজার।
* গোপাল বলেরে বন্ধু-গোপাল বলে। গোপাল চন্দ্র দাস, সুনামগঞ্জ।
* ঠাকুর বদন শাহে কয় শুন সাধু ভাই। মদন শাহ ঠাকুর, করিমগঞ্জ।
* বৈষ্ণব চরণদাসে গো বলে। বৈষ্ণব চরণদাস, চৌয়াল্লিশ, মৌলভীবাজার।
* কহে দাস নরোত্তম মায়াতে হইয়া মত্ত। নরোত্তম দাস, ভানুগাছ, মৌলভীবাজার।

লোক বাদ্যযন্ত্র: সিলেট অঞ্চলে লোকসঙ্গীত শিল্পীদের ব্যবহৃত লোক বাদ্যযন্ত্র তালিকায় রয়েছে ঢোল, মন্দিরা, দোতারা, একতারা, সারিন্দা, বেহালা, মৃদঙ্গ, ডপকি, বাঁশি, বগলী, চটি, কেমটা, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

সিলেট অঞ্চলে লোকগানে নিজস্ব রোমান্টিক ভাব-কল্পনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকায় এর ব্যাপক বাণিজ্যিক সাফল্য লক্ষ করা যায়। তবে এই গান নিয়ে কোনো গবেষণা বা এর বাণিজ্যিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়টি আমাদের নজরে পড়েনি। স্থানীয় তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হলো।

* জ্বালাইল কে পিরীতের আগুন মম মনে রে।
  মানে না মানে না মনে প্রাণ বন্ধু বিহনে রে। -হাছন রাজা
* ছাড়িলাম হাছনের নাও রে
  হাছন রাজার নাও রে।। - হাছন রাজা
* লাগলরে পিরীতির নেশা, হাছন রাজা হইল বেদিশা॥ - হাছন রাজা
* লোকে বলে লোকে বলে রে, ঘর বাড়ী ভালা নয় আমার॥ - হাছন রাজা
* কারে দেখাব মনের দুঃখগো আমি বুক চিরিয়া অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া। - রাধারমন দত্ত
* কালায় প্রাণটি নিল বাঁশিটি বাজাইয়া আমারে যে থৈয়া গেল উদাসী বানাইয়া॥ রাধারমন দত্ত।

www.pathagar.com

* কি অপরূপ দেইখে আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া॥ রাধারমন দত্ত
* কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে॥ আরকুম শাহ।
* তোমার রাঙ্গা চরণ পাইমুনি ওবা গুরুজী॥ আরকুম শাহ।
* তুমি রহমতের নদীয়া দোয়া কর মরে হযরত শাহাজালাল আউলিয়া॥ দিলওয়ার।
* মুরশিদ আমি খুজবনা গো বনজঙ্গলে যাইয়া
আমার মাঝে আমার মুরশিদ আছে রে পথ চাইয়া॥ দিলওয়ার।
* সিলেট প্রথম আজানধ্বনি বাবায় দিয়াছে॥ গিয়াস উদ্দিন।
* নিশিতে যাইও ফুল বনেরে ভ্রমরা
নিশিতে যাইও ফুল বনে॥ শেখ ভানু।
* মন ঢেঁকি বাওরে, না করিলা হুশ॥ শেখ ভানু।
* পার কর আমারে আসিয়া রাছুল॥ শেখ ভানু।
* বন্ধুরে কাঙ্গালে কি পাইবে তোমারে॥ শাহ আব্দুল করিম।
* আইলায় না আইলায় নারে বন্ধু করলায় রে দেওয়ানা॥ শাহ আব্দুল করিম।
* আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান, হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউল গান, ঘাটু গান গাইতাম॥ শাহ আব্দুল করিম।
* বন্ধু কই যাওরে দেখিয়া লই তোমারে ॥ সৈয়দ শাহনূর
* উদাসিনী কইলে মোরে পাগলিনী॥ সৈয়দ শাহনূর।
* তুমি আমার কলিজার জিগররে বন্ধু
তুমি আমার কলিজার জিগর॥ সৈয়দ শাহনূর।
* ওমন জিকির কররে, জিকির হইল সার॥ মৌলানা ইয়াছিন।
* বিনয় কাতরে, ডাক মন মৌলারে॥ মৌলানা ইয়াছিন।
* পাগল করিলাগো
বন্ধের রূপে কিরণে গো॥ মৌলানা ইয়াছিন।
* মারিয়া ভূজঙ্গতীর কলিজা করিল চৌচির॥ দুব্বীন শাহ।
* সুজন বন্ধুরে ও বন্ধু কোন বা দেশে থাক ও ॥ সফিকুর নূর।
* খেজুর গাছে হাড়ি বাধ মন॥ শিতালং শাহ।
* পাইলাম না সই প্রাণ বন্ধুরে রজনী হইল ভোর ॥ রাধা রমন দত্ত।
* যার লাগি কান্দরে মন তারে জান না॥ হাছন রাজা।
* সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল॥ হাছন রাজা।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোক সঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান ২০০৬:
সিলেট বিভাগে লোকসঙ্গীতের বাণিজ্যক মূল্যমান স্থানীয় ভাবে সিডি, ভিসিডি, অডিও ক্যাসেট বিক্রেতাদের কাছ থেকে তাদের মাসিক ও বার্ষিক মূল্যমানের তথ্য সংগ্রহ করে এখানে তুলে ধরা হলো।

মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, কীর্তন ও অন্যান্য লোকগানের অডিও, সিডি, ভিসিডির ক্যাসেট বিক্রির জরিপে দেখা গেছে সিলেট বিভাগে গত ১ বৎসরে ক্যাসেট বিক্রির পরিমাণ মোট ১২,০০,০০০ (বার লক্ষ) কপি। বিক্রিত টাকার পরিমাণ প্রতি বৎসর ৩,৮৪,০০০,০০/- (তিন কোটি চুরাশি লক্ষ টাকা মাত্র)।

বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা: বাংলাদেশে জনসংখ্যার আশি ভাগেরও অধিক জনগোষ্ঠীর মূল সঙ্গীতের ধারা হলো লোকসঙ্গীত অথচ আমাদের রাষ্ট্র সমাজের ঔদাসীন্যে ও অবহেলায় লোকসঙ্গীতকে হেয়, নগণ্য এমনকি বিপন্ন করে তুলেছে। সিলেট বিভাগে বিপন্ন লোকসঙ্গীতের তালিকা নিম্নরূপ-

www.pathagar.com

সাপে কাটায় উজার গান:- সাপে কাটা ও প্যারালাইসিস (উধুঙ্গি) রোগীর চিকিৎসায় ঝাড় ফুকে সঙ্গীতের ব্যবহার হয়। এই গান গুলো বর্তমানে বিপন্ন।

জারি গান: লোক বাংলার নানা রোমান্টিক কিংবদন্তী দ্বারা জারি গান রচিত হয়। জারির এখনও প্রচলন থাকলেও এই গান গুলোও বিপন্ন।

পালাগান: লোকগীতিকা পালাগানের কাহিনী রূপে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। গীতিকা প্রচলিত লোককাহিনীর বর্ণনা সুর ও গানের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। বর্তমানে এই গানও বিপন্ন।

বিয়ের গান: বৃহত্তর সিলেটে গ্রাম গুলোতে বিয়ের কয়েক দিন আগে থেকে মহিলারা দল বেঁধে এই গান গেয়ে থাকেন। বিয়ের গানে বাণী ও সুরের সমন্বিত রূপ ফুটে ওঠে। বর্তমানে এই গানগুলো বিপন্ন।

বারমাসী: লোককাহিনী ভিত্তিক বারমাসীগুলোতে ঋতুর প্রভাব রয়েছে। প্রতিটি বারমাসীতে বাণী ও সুরের সমন্বিত রূপ ফুটে উঠে। বর্তমানে বারমাসী গানও বিপন্ন।

চা বাগানে আদিবাসী লোকসঙ্গীত: সিলেট বিভাগের চা বাগান গুলোতে বসবাসরত আদিবাসী চা শ্রমিকদের নানা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে লোকগানের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই লোকগান সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

গাজীর গান: গাজীর গান বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত একজন খলিফা গাজীর **আশা** হাতে ভিন্ন ধরনের পোষাক পরে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। বর্তমানে এই গানগুলো বিপন্ন।

সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা: সিলেট বিভাগে বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সঙ্গীতের তালিকা দেওয়া হলো:

ঘাটুগান: একটি বালককে বিশেষ সাজে সাজিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে ঘাটুসঙ্গীত পরিবেশনের নিয়ম প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এই গান লুপ্ত।

হিরালের গান: হিরাল গান গেয়ে ঝড়, তুফান, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠেকানোর চেষ্টা করতেন। বর্তমানে হিরালের গানের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

হাজিরাতের গান: গ্রাম অঞ্চলে জিন ভূতের আছর ছাড়াতে হাজিরাতের আয়োজন করা হত। বর্তমানে হাজিরাতের গান লুপ্ত।

ভট্টসঙ্গীত: সিলেট অঞ্চলে ভট্ট গানের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই গান আর দেখা যায় না।

সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিকানা: লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল বিস্তৃতির স্বরূপ সন্ধানে দেখা যায়, যে সকল লোকসঙ্গীত একক ব্যক্তির সৃষ্টি; সে গুলোর মেধাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, স্রষ্টা ও তার উত্তরাধিকারীগণের আর যে সকল লোকসঙ্গীত নির্দিষ্ট গোত্র, সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি সে গুলোর মেধাস্বত্তের অধিকারী সংশ্লিষ্ট সমাজ, গোত্র বা জনগোষ্ঠী। এভাবে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে মেধা স্বত্বের মালিকানা বিবেচ্য।

সুপারিশ মালা:

ক. সংগ্রহ সম্পর্কিত: তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যক্তি সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে সংগ্রাহক সৃষ্টির মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

খ. সংরক্ষণ সম্পর্কিত: যৌথভাবে সরকারি বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এ বিষয়ে মেধাস্বত্ব সুরক্ষার আইনি ব্যবস্থা সুস্পষ্ট ভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

গ. উপস্থাপন সম্পর্কিত: সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বেতার, টিভি, গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রচার করা এবং উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্য সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা এবং সাথে সাথে বছরে কয়েকবার স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে লোকসঙ্গীতের উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন ও উপস্থাপনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

উপসংহার: মানবজাতির, মানবতার সামগ্রিক পরিচয় বহন করে আছে তার ঐতিহ্যিক লোকসম্পদ। এই লোক সংস্কৃতি সমাজের জীবনধারা, ভাষা, সাহিত্য, গান এমনকি তার বেঁচে থাকার বস্তুগত সম্পদ। এগুলো ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায় দেশে দেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও মৌলিকভাবে অভিভাজ্য। লোক-সংস্কৃতির এমন বৈচিত্র্য ও ভিন্ন্যতার ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের দেশের লোক-সংস্কৃতির লুপ্ত-বিলুপ্ত-বিপন্ন, বিকশিত ও অবিকশিত বিষয় সমূহকে চিহ্নিত করতে পারি। লোক-সংস্কৃতি জাতীয় ও বৈশ্বিক ধারা থেকে আমাদের লোক-সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। তাই এখানে এই সংস্কৃতির অন্তরগত স্বরূপ তুলে ধরার যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আমাদের তৃণমূলীয় মানুষের বহমান লোক-সংস্কৃতির বিস্তৃত ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের অতীত বতর্মান ও ভবিষ্যতের সূচক রেখা নির্মাণের জন্য এ সংস্কৃতির যেমন চেনা-জানার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি একে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতীয়ভাবে মূল্যবান করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

ময়মনসিংহ গীতিকা বনাম সিলেট গীতিকা, লেখক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, প্রকাশক জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, প্রকাশকাল- ১৯৯৭।

বাঁশির সুরে অঙ্গ জ্বলে, নন্দলাল শর্মা, প্রকাশক মোছাম্মত সমিরুন বিবি, সিলেট, প্রকাশকাল- ২০০৭

হবিগঞ্জের মরমী সাধক, তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল, প্রকাশক আশরাফ উদ্দিন তরফদার, রাজনগর, হবিগঞ্জ, প্রকাশকাল-১৯৮৯।

হাছন রাজা সমগ্র, সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক পাঠক সমাবেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, প্রকাশকাল-২০০০।

রাধারমন দত্ত, নির্বাচিত গীতিকবিতা, সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মাননান, প্রকাশক খান মাহবুব, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৪১২।

আধ্যাত্মিক সাধক ও মরমী কবি সৈয়দ শাহনূর (রঃ) লেখক অধ্যাপক মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান, মৌলভীবাজার, প্রকাশকাল-২০০১।

সিলেটের জনপদ ও লোকমানস, নন্দলাল শর্মা, প্রকাশক মোঃ বশির মিয়া, প্রকাশকাল-২০০৬।

ফকির ইয়াছিন শাহ ও তার সাধনতত্ত্ব, লেখক আহমদ সিরাজ, প্রকাশক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, প্রকাশকাল-১৪০৭।

সিলেট জেলা পরিক্রমা, সম্পাদক ও এ টি এম জিল্লুর রহমান খান, জেলা তথ্য অফিস সিলেট, প্রকাশকাল-১৯৯১-৯২।

বাংলাদেশে মণিপুরী, ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেনী সংঙ্গমে, এ কে শেরাম আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৬।

হবিগঞ্জের মরমী সাধক তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল, তরফদার ভিলা, রাজনগর, হবিগঞ্জ, প্রকাশকাল- সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯।

সাক্ষাৎকার

রণধীর রায়, আমবাড়ী, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।

আহমদ সিরাজ, শ্রীনাথপুর,কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

পল্লব তালুকদার, চৌমুহনা, মৌলভীবাজার।

কামাল উদ্দিন, ধরাধরপুর, সিলেট।

শিউলী চৌধুরী, হবিগঞ্জ।

www.pathagar.com

৯.২ সিলেট জেলার লোকসঙ্গীত

দীপংকর মোহান্ত

ভূমিকা: সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা চিন্তাভাবনা আবহমান কাল থেকে গান বা সঙ্গীতের মাধ্যমেই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত সিলেটীদের জীবনাচরণ, খাদ্যাভ্যাস, দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদি লোকায়ত চেতনায় আজো উদ্ভাসিত। প্রকৃতিই যেন এ জেলার বাউলী সত্তাকে উজ্জ্বলতর করেছে; আহবান করেছে আউল-বাউল-সাধু-সন্তকে।

পরিচিতি: প্রাচীন 'শ্রীহট্ট' শব্দ থেকে আজকের 'সিলেট' নামকরণ। শ্রীহট্ট এককালে কামরূপ রাজ্যের অধীনে থাকলেও রাজনৈতিক পালাবদলে মধ্যযুগে লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায়। পরে আরো ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ১৩০৩ খ্রি: হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে। বাংলার সাথে সিলেটও কোম্পানীর শাসনে চলে যায় এবং ১৭৭১ সালে প্রথম এ জেলায় ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১২ সেপ্টেম্বর সিলেটকে আসাম প্রদেশভূক্ত করা হয়। ১৮৭৬ খ্রী: সিলেটকে চারটি সাব ডিভিশনে ভাগ করার ঘোষণা আসে। ১৯৪৭ খ্রী: সিলেট গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৮৪ সালে সিলেটের চারটি মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৯২ সালে সিলেটকে বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করা হলে তার প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সিলেট বিভাগের পূর্ব উত্তরে রয়েছে আসাম ও মেঘালয়, দক্ষিণ পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ। এ বিভাগের জেলা ভিত্তিক পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল:

ঐতিহাসিককালে সিলেট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সুনামগঞ্জের ভগদত্ত রাজার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মোগল-পাঠানের শেষ যুদ্ধের স্মৃতি রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। মুসলিম আমলের প্রথম দিকের বহু মসজিদ এখনো অক্ষত রয়েছে।

পূর্বের জৈন্তা রাজ্যকে ঘিরে ছিল অসংখ্য কিংবদন্তী। যেমন খাসিয়ারা এককালে নরবলি দিত এবং নরমুণ্ড সংগ্রহ করত। শাহজালাল সম্পর্কে রয়েছে যে, তিনি জায়নামাজ বিছিয়ে খরস্রোতা সুরমা নদী পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁর আজানের ধ্বনিতে গৌড় গোবিন্দের সাততলা ভবন ধ্বসে পড়েছিল। শাহপরান মৃত কবুতরকে জীবিত করেছিলেন। শাহ মোস্তফা বাঘের পিঠে করে ঘুরে বেড়াতেন। অজ্ঞান ঠাকুরের নৌকা নাকি শুকনো পথে চলেছিল; ঠাকুরবাণী মারা যাবার পরও শিষ্যদের মধ্যে আসতেন। সুনামগঞ্জের শারপিন শাহ হলেন 'জিন্দাপীর'।

সিলেটের পাহাড়ে খাসিয়ারা বহুকাল থেকে বসবাস করছেন। মণিপুরীদের আগমনও তিনশত বছর অতিক্রম করেছে। চা বাগানে রয়েছে বিচিত্র জনজাতি। স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে সিলেটের উপকণ্ঠে আছে 'পাত্র জাতি'। তাছাড়া মৌলভীবাজার জেলার সর্বাধিক অনার্য সভ্যতার অংশীদার হিসেবে 'শব্দকর' সম্প্রদায় বসবাস করছেন। তাদের সকলের কৃষ্টি সংস্কৃতি আলাদা। হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে নানা সম্প্রদায় ও মতাদর্শী লোকজন বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত।

পূর্বে সিলেটে নানা লোকাচার ও লোকধর্মের প্রচলন ছিল। মহাভারত রচয়িতা কবি সঞ্জয়ের নিবাস সুনামগঞ্জ ছিল বলে গবেষকদের ধারনা। অদ্বৈতাচার্যের বাড়িও সুনামগঞ্জে। ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সিলেটে

www.pathagar.com

হাছন রাজা

তিনটি লোক ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। হবিগঞ্জে জগন্মোহী সম্প্রদায়, সিলেটে তিলকরামকে কেন্দ্র করে সহজিয়া ধর্ম এবং নবীগঞ্জে ঘটে ঠাকুরবাণীর লোকধর্মের বিকাশ। এই উপধর্ম মতগুলোর সাধন-ভজনও চলত সঙ্গীতের মাধ্যমে। সিলেটে নাগরী হরফের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু ফকির গান লিখেছেন।

সিলেটে একসময় তান্ত্রিকচর্চার উর্বরক্ষেত্র ছিল। পরবর্তীকালে মনসাপূজার আধিক্যের সাথে যুক্ত হয় পাঁচালী, বারমাসী ও নানারকম ব্রতাচারের গান। সিলেটে ফকির-দরবেশ, পীর বা গুরুদের কবরকে কেন্দ্র করে আজো গান-বাজনা চলে।

লোকসঙ্গীতের তালিকা:

সিলেটে লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কেউ কেউ সিলেটকে বলেন লোকগানের চারণভূমি; যা চর্যাপদের সুর থেকে অনেকটা শুরু এবং আজও প্রবাহমান। নিম্নে সিলেটে প্রচলিত কিছু লোকসঙ্গীতের তালিকা দেয়া হলো:

১. **আউল-বাউল-পীর মুর্শিদী গান:** সিলেট আউল-বাউল-পীর মুর্শিদ সাধু সন্ত ও মাজারের সংখ্যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক থাকায় তাদের উদ্দেশ্যে বহুগান রচিত হয়েছিল-

অকূল সাগরে রে কেমনে পাড়ি দিব রে
দিবা নিশি-কান্দি আমি নদীর কূলে বইয়া- (অজ্ঞাত, সংগ্রহ: হবিগঞ্জ অঞ্চল)
সখী আও-আও রে রসের কালাচান্দ
তোমারে না পাইলে বন্ধু হারাইব পরান ॥ (অজ্ঞাত, সংগ্রহ: মৌলভীবাজার অঞ্চল)
আর হবে না মানব জীবন ভাঙলে মাথা পাষাণে
ওরে মন ভজনা গুরুর চরণ। (অজ্ঞাত, সংগ্রহ: মৌলভীবাজার অঞ্চল)
এ দেহ মাটির পিঞ্জর থাকবে পড়িয়া
জানি পাখি যাইবায়রে ছাড়িয়া। (অজ্ঞাত, সংগ্রহ: সুনামগঞ্জ অঞ্চল)
পাখি তরে আদর করে ঠাঁই দিয়াছি হৃদপিঞ্জরে
জানি পাখি যাইবায়রে ছাড়িয়া। (অজ্ঞাত, সংগ্রহ: মৌলভীবাজার অঞ্চল)
পাখি যারায় গিনি রে পিঞ্জিরা ছাড়িয়া... (অজ্ঞাত, সংগ্রহ: হবিগঞ্জ অঞ্চল)
কালো মেঘে সাজ কইর‌্যাছে / পরান তো মানে না।
সাবধানে চালাও মাঝি তরী যেন ডুবে না। (অজ্ঞাত, সংগ্রহ: হবিগঞ্জ অঞ্চল)
আর কতকাল করবি রে মন
করবি দোকনদারী
আর বেশি দিন নয়'ক বাকি
দিতে হবে পাড়ি।

www.pathagar.com

(ইসহাক রেজা, সিলেট অঞ্চল)
ও দয়াল নিতাই নিতাই রে
তোর ঠাঁই কেবল তোরে চাই।
(ইয়াছিন শাহ, মৌলভীবাজার)
ওহে আমার মন মোহিনী বিরাজকর কথায় থাকি-
(ইয়াছিন শাহ, মৌলভীবাজার)

২. **প্রাচীন বৈষ্ণব গান:** মুরারি গুপ্ত থেকে শুরু করে বঞ্চিত ঘোষ, বাসুঘোষ, সেন শিবানন্দের বৈষ্ণব গান এক সময় সিলেটের ভাবসম্পদকে পুলকিত করেছিল। যেমন:

মিছা মায়া, মায়া বশে ভবে রইলু বান্ধা
....
মানুষ জনম পাইয়া হেলে গোয়াইনু
গুরুদত্ত নাম ধন তাহে না চিনিনু ॥
(বঞ্চিত ঘোষ)

৩. **কীর্তন:** সিলেটে আজো সন্ধ্যের পর গ্রামেগঞ্জে কীর্তন বসে। গোবিন্দকীর্তন সিলেটের নিজস্ব বলে ড. রাণী দত্ত মনে করেন।

হরি তোমার অপার লীলা জানেনা যোগী ঋষি
কেহ রাজরাণী কেহ ভিখারিনী।
(সংগ্রহ: সত্যেন্দ্রমোহন দেব)
জীবের আনন্দ উদয় হইল, নিতাই বুঝি ঐ দেশে আইল
দেশে আইলোরে নিতাই, ও তার গুণের সীমা নাই।
(সংগ্রহ: সত্যেন্দ্রমোহন দেব)
হরি লুট নিবিকে লুটে নে
নিতাই চাঁন্দের প্রেমের বাজারে...।
(সংগ্রহ: ড. রীতা দত্ত)

৪. **সূর্যব্রতের গান:** সিলেট একমাত্র সূর্যব্রতের সময়ই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক নাগাড়ে গান চলে। একটি গানের নমুনা:

রাধে সূর্য্য পূজার বেলা হইল কর আয়োজন
দিবাকর পূজিতে আজি যত দেবগণ
বড়াই আসিয়া বলে জটিলার
ঠাঁই/আজ্ঞা কর বধু লইয়া যমুনাতে যাই। (সংগ্রহ)

৫. **ইসলামি সঙ্গীত:** সিলেটে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে বা শাহজালালকে কেন্দ্র করে বহু ইসলামী গান পরিবেশিত হয়।

আখেরী জমানার নবী রছুল পেগাম্বর
আরশের মাঝারে তোমার
তিনশ ষাইট মিম্বর।
(ছাবাল আকবর আলী)
তুমি রহমতের নদীয়া দয়া কর মোরে হযরত শাহজালাল আউলিয়া ... (দিলওয়ার)

www.pathagar.com

০৬. মঙ্গলাগান: ভোলা সংক্রান্তি থেকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত অর্থাৎ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে মঙ্গলাগান হয়ে থাকে। এটাও সিলেটের
নিজস্ব সঙ্গীত। যেমন:

প্রভাত সময় কালে শচীনও আঙ্গিনার মাঝে
গৌরচন্দ নাচিয়া বেড়ায় রে।
(সংগ্রহ: রামকানাই দাশ)

০৭. হোলী গান: বসন্তকালে গ্রামাঞ্চলে এসব গান হয় নেচে-নেচে। যেমন:

বসন্ত সময়ে কৃষ্ণ কোথায় গো ললিতে
যৌবন রাখিব বাধার কেমনে।
(সংগ্রহ: বিদিতলাল দাস)

০৮. নৌকাবাইচ বা হাইড় গান: সিলেটে নদ-নদী হাওর-বাওরের সংখ্যা বেশি। সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে এখনো নৌকা প্রধান অঞ্চল। তাই এ অঞ্চলে নৌকা বাইচে হাইড় গান গাওয়া হয়। নমুনা:

লাল বালী চক্কর-মক্কর দেখিতে সুন্দর/ অল্প বয়সে বালী না যাইও নাইওর।
(দেওয়ান মহসিন রাজা)

০৯. ধামাইল গান: সিলেটে বিয়ের উৎসবে ধামাইল গানের প্রচলন অতি প্রাচীন কাল থেকে। ধামাইলে রাধারমণ দত্তের গান বেশি গাওয়া হয়। ধামাইলের বহুস্তর রয়েছে যেমন: উদয়, বাঁশি, বাসর ইত্যাদি। নমুনা:

প্রিয় সখী গো ও মোর প্রিয় সখী বন্ধু করাও দরশন। (সংগ্রহ: মৌলভীবাজার অঞ্চল)
ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়ারে
(রাধারমণ দত্ত)

১০. দুর্গাপূজার গীত: দুর্গা দেবীর আগমন উপলক্ষে সিলেটী মহিলারা যেন নিজেদের দুঃখ-সুখের গান করে থাকেন। অসম বয়সী শিব ঠাকুরের ভাঙ্গাঘরে দুর্গার বসবাস ও নানা পীড়নের কথা প্রকাশ ঘটে এই গানে। নমুনা:

গৌরী যায় দেশে, যাইতে কান্দে
গৌরীর মায়। দেশে যাইতে
বড় শোক রৌদ্রে ঘামে চান্দ মুখ।
দ্বিগুণ হইয়া জ্বলছে মায়ের বুক॥
(অজ্ঞাত)

লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি স্থল: সিলেটে প্রচলিত বেশিরভাগ লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল স্রষ্টাদের ভনিতা সূত্র ধরে খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য কিছু গানের ভনিতায় নামপদ পাওয়া গেলেও নামপদ বিহীন লোকগানের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। লোকগান ভাবুকরা যখন-তখন গেয়েছেন কখনোবা আখড়া, খানকা, মুর্শিদের বাড়িতে বা পীরের

দূর্বীণ শাহ

www.pathagar.com

আউলিয়াতে রচিত হয়েছে। পরে নানা স্থানে শিষ্য বা সুহৃদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নিম্নে কিছু গান দিয়ে উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হল (যে এলাকা বা অঞ্চল থেকে গান সংগ্রহ করা হয়েছে সেই জনপদকে উৎপত্তিস্থল হিসাবে অনুমান করা হয়েছে):

মনা তুমি কার পানে চাও
পিরিত সত্য পিরিত মিত্র
পিরিতে যে হইয়া মত্ত
সাচ্চা পিরিত বিষম লেটা
বুইঝ্যা সুইঝ্যা খেইড় খেলাও
মনা তুমি কার পানে চাও। (অজ্ঞাত: হবিগঞ্জ, বানিয়াচং অঞ্চল)
বিয়ানিবালা আছিল লাউ পূবের ঘরের চালও
বিয়ালী অক্ত কেমনে কেমনে বাইতে বাইতে
লাউ গেলগি পশ্চিম ঘরের চালও
সাধের লাউরে জীবন থাকতে ছাড়মুনা তুমারে। (অজ্ঞাত: হবিগঞ্জ, বানিয়াচং অঞ্চল)
মাগো চিনলায় না আমারে যশোদা মতি মা
ওমাগো রজনী প্রভাত কালে কার বা মায়ে কারে বান্ধে গো,
মা উদয় বেলা বন্দিছ আমারে।
(সংগ্রহ: রামকানাই দাশ; সুনামগঞ্জ অঞ্চল)
বসন্ত কাল যায় গো ফুরাইয়া
কৃষ্ণ আমার আজও আইলা না
(সংগ্রহ: বিদিতলাল দাস, সিলেট অঞ্চল)
শ্যাম কালিয়া সোনাবন্ধুরে সময়েনি পাইমু তোমারে
হায়রে আমি তোর পিরিতের পাগল জন্ম জন্মান্তর॥
(শাহ সুন্দর আলী: সুনামগঞ্জ অঞ্চল)
ভজোরে মন গুরুর পায়, পার হবে গুরুর কৃপায়,
গুরুবিনে ত্রিজগতে না দেখি উপায়।
(ছাবাল আলী: সুনামগঞ্জ)
শ্যাম এনে দেখাও আমার প্রাণ ললিতে
সুখের নিশি হল গত বন্ধু রইল কার কুঞ্জেতে, ওগো ললিতে।
(সংগ্রহ: তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল: হবিগঞ্জ অঞ্চল)
কি অপরাধ কইলাম চরণে/ মান কইরা বসিয়া আছ কেনে
তোমার কারণে যাই গোচারণে/ধেনু চরাই বনে বনে ॥
(মহেন্দ্র, উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
যুগল মিলন হইল দেখ/দেখ সখি শ্যামের বামে রাই দাঁড়াইল।
(উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
কালারে কর গো মানা সে যেন আর কুঞ্জে আসে না।
রাধার নয়ন জলে বুক ভেসে যায় তবু শ্যামের দয়া হইল না॥
(অজ্ঞাত)
প্রাণ কান্দে গো রাত্র দিনে গৌর বিনে নালয় মনে।
ও সখি গো যেদিকে ফিরাই গো আঁকি - সেদিকে গৌরঙ্গ দেখি (পিতাম্বর: উৎপত্তি অজ্ঞাত)

www.pathagar.com

আইজ কেনরে ভাইরে সুবল রাই আসল না যমুনাতে।
(উৎপত্তি: অজ্ঞাত: নামপদ নাই।)
গোপাল আন যাইয়া, নন্দ গোপাল আন যাইয়া
জুড়াইব তাপিত প্রাণ চান্দ মুখ চাইয়া।
(বলরাম দাম; উৎপত্তি: হবিগঞ্জ)
তোর লাগি মোর প্রাণ কান্দেরে, বিদেশী বন্ধু
তোর লাগি মোর প্রাণ কান্দেরে ॥
(গুল মাসুদ; উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
হায়রে কাঙালের বন্ধু সময়েনি পাইমু তোমারে
আমি কেমনে রহিমু একা ঘরেরে।
(কবীর: উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
সোনাপুর বন্ধুয়ার বাড়ি দিলাল পুরে থানা
একদিনও বন্ধুয়ার সনে দেখা হইল না।
(পাগল কছির; উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
আওনা কেনে রসবৃন্দাবনে, আনন্দেরই স্থানে
ও বন্ধু আওনা কেনেরে।
(পরান শাহ: উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
ওসখি ধরি তোদের পায়
পরান নাত বন্ধুরে আনি দেখাও গো আমায়।
(আব্দুল আলিম: উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
আংখি ফিরাও রূপ দেখি বা নাইওর বন্ধু
ও বন্ধু নয়ান ফিরাও রূপ দেখি ॥
(ফইড়ং শাহ: উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
হারে কাম নদীতে ভাসিয়া ফিরি, বাচি আমি কি পরকারে;
নিলো, নিলোরে যৌবন জোয়ারে ॥
(পাগল ইছাক; উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
সখি চলগো মোরে লৈয়া মাথুরাতে প্রাণ বন্ধুয়ার চরণ দেখি গিয়ে
(আম্বর আলী: উৎপত্তি: অজ্ঞাত)
ডাকরে কোকিল তমালে কৃষ্ণ বলে বসন্ত কালে
আমার স্থাপিত অঙ্গ শীতল করলে কোকিল প্রেম জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে ॥ (অজ্ঞাত)
বংশী বাজে গো ধনি কোন বনে
হরিয়া নিল রাধার তনুমন। (অজ্ঞাত)

পরবর্তী বিস্তৃতি স্থল: সিলেটের অনেক গান নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ অঞ্চলে গাওয়া হয়। নেত্রকোনার দ্বীজদাশ, দীনশরৎ ও ময়মনসিংহের জালাল খাঁর গান সিলেটে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মনোমনোহনের গানও মাঝে মধ্যে শোনা যায়।

লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা: সিলেটের লোকসঙ্গীত শিল্পীদের তালিকা তৈরি করা কঠিন। বিভিন্ন গানের পাণ্ডুলিপি, প্রকাশিত গানের বই দেখে অনুমান করা যায় এ জেলায় লোককবির সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। আবার ভনিতা ছাড়াও অনেকে গান লিখেছেন। এতদসংক্রান্ত গবেষণাও অপ্রতুল। নিম্নে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা দেয়া হল:

www.pathagar.com

গোলাম হোসেন (১৪৬৮-১৫৫৬): মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার লস্করপুর
সৈয়দ সুলতান (ষোড়শ শতাব্দী): হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার লস্করপুর গ্রামে জন্ম
শাহ হুছন আলম (১৫০০-১৬৫০): সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর গ্রামের পীরের গাঁও
সৈয়দ মুসা (?-১৬৭০): হবিগঞ্জ তরক লস্করপুর।
দীন ভবানন্দ (সতর শতক): মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার নর্তন
সৈয়দ শাহ নূর (১৭৩০-১৮৫৫): মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার কদমহাটা
শাহ আব্দুল ওয়াহহাব (১৭৬০-১৮৮৮): সিলেট জেলা গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি
শেখ চান্দ (১৭২০-১৮২০): মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ভাগারহাট
সৈয়দা ছমিনা ভানু (১৭৩০ আনুমানিক): সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলা
শিতালং শাহ (১৮০০-১৮৮৯): সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমায় জন্ম
ভোলা শাহ (ঊনবিংশ শতাব্দী): সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলা
রাধারমণ দত্ত (১৮৩৩-১৯২২): সুনামগঞ্জ জেলা জগন্নাথপুর
হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২): জেলা সুনামগঞ্জ, উপজেলা সুনামগঞ্জ সদর
ছহিফা বানু (১৮৫৮-১৯১৭): সিলেটের বিশ্বনাথ
ইলিয়াস কুদ্দুস (ষোড়শ শতাব্দী): হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার ঘরগাঁও (ফারসী ভাষায় লিখেন)
আফজাল শাহ (১৮০৭-১৯২৭): সুনামগঞ্জ জেলা ছাতক উপজেলার কৃষ্ণনগর
নছিম আলী (১৮১৩-১৯২০): সিলেট জেলার কৌড়িয়া পরগনার মোল্লারগাঁও
শাহ আছদ আলী (১২২৩-১৩১২ বাংলা): সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ষোলঘর
নূর মোহাম্মদ (১৮১৫-১৮৯৫): হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার গহরপুর
দিলবরশা পীর (১৮২০-১৯২০): সুনামগঞ্জ জিলা, ছাতক উপজেলা ঘোড়াডুম্বুর
মুন্সী মশাহেদ আলী (১৮৪০-১৯৪০): সুনামগঞ্জ জিলা, জগন্নাথপুর উপজেলা লুদরপুর
শেখ ভানু (১৮৪৯-১৯১৯): হবিগঞ্জ বামৈ এলাকার ভাদিকারা
ইয়াছিন শাহ (১২৫৬-১৩৪১ বাংলা): হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট উপজেলা: কাইছনাজুরী
মোহাম্মদ আব্দুল হুছন (১৮৬০-১৯৪০): সুনামগঞ্জ, পাগলার নিকটবর্তী রঙ্গারচর
মুন্সী রহমত উলা: সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর উপজেলা আলীপুর
দীনহীন সৈয়দ আব্দুন নূর হোসেনী (১২৬১-১৩২৫ বাংলা): হবিগঞ্জ, সুলতানসী
মজির উদ্দিন আহমদ (১২৭০-১৩৪০): সুনামগঞ্জ, জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর
কালাশা (আব্দুর রাজ্জাক) (১৮৪৮-১৯৫৮): সুনামগঞ্জ, পাইলাগাঁও এর ধাইপুর
নওশের আলী (১২৭০-১৩৬১ বাংলা): সুনামগঞ্জ শহর তেঘরিয়া
বাছির শাহ মওলা: সুনামগঞ্জ
জোবেদ আলী: সুনামগঞ্জ
আছাদ উলাহ (১২৬৭-১৩৫২ বাংলা): হবিগঞ্জ জেলার তরফ
শেখ কারী আব্দুল ওয়াহিদ (১২৭৫-১৩৬০): ঢাকাদক্ষিণ, সিলেট
ইবরাহিম তশ্না (১৮৭০-১৯৩০): সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলা
ছাবাল আকবর আলী: আসল নাম সরপ উদ্দিন সিলেট

www.pathagar.com

সৈয়দ জহুরুল হেসেন (১২৮৩-১৩৪৯ বাংলা): হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার মধুপুর
দেওয়ান গনিউর রাজা (১২৮৩-?): সুনামগঞ্জ শহরের তেঘরিয়া
দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৬৪): সিলেট জেলা বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা
সৈয়দ আব্দুল লতিফ জালালাবাদী (১৮৭৬-১৯৩৯): সিলেট
আরকুম শাহ (১৮৭৭-১৯৪১): সিলেট শহর নিকটবর্তী ধরাধরপুর
উছমান আলী: সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার সুনামপুর
মো. মতাহির আলী: সিলেট
মনাওর আলী (১৮৮৬-১৯৫১): সুনামগঞ্জ শহর
আসদ উল্লা (১৩০৯-১৪০১): সুনামগঞ্জ, ছাতক
দুর্ব্বীণ শাহ (১৯২০-১৯৭৭): সুনামগঞ্জ, ছাতক
মিয়াধন: মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় জাবেদা
আব্দুল আজিজ (১৮৯৩-১৯৬০): সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ছোটদেশ
আশ্রাফ আলী: সিলেট শহর আখালিয়া
মুন্সী হুছন আলী: সিলেট জেলার জৈন্তা উপজেলার বিড়াখাই
মুনির উদ্দিন ওরফে দৈখোরা: সঠিক পরিচয় অজ্ঞাত
নসিবুর রহমান (১৯০৫-১৯৮৯): সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার বীরদল
রিয়াছত আলী (১৯৩২-১৯৭১): সুনামগঞ্জ, ছাতক উপজেলা মইনপুর
কলন্দর ফকির উরফে দীনহীন (১২৯৪-১৩৬৯): হবিগঞ্জ, শাহজীবাজার

বাউল সঙ্গীতের বিশেষ মুহূর্ত

www.pathagar.com

বাউলা শাহ (১২৬৯-১৩৪১): হবিগঞ্জের বানিয়াচঙ্গ
সৈয়দ শাহ আব্দুলাহ (১৯১৮-১৯৭৮): জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বসতি নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
কাছিম আলী (১৮৬৫-১৯৫৫): সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার দক্ষিণ কুপিয়া
মুন্সী ইরফান আলী (১২৫৩-১৩৩৩ বাংলা): সিলেট জেলার পঞ্চখণ্ড
হাফিজ মোহাম্মদ হাতিম চৌধুরী (১৮৫৫-১৯২৫): সিলেট শহরের নিকটবর্তী দর্শা গ্রাম
আব্দুস সামাদ চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৫৫): সিলেট
আব্দুর রউফ (১৮৭০-১৯৪২): সুনামগঞ্জ, দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া
কামাল উদ্দিন (১৯১০-১৯৮৫): দিরাই ভাটিপাড়া, সুনামগঞ্জ
বদল শাহ: অজ্ঞাত
মো. আদিল বালক শাহ: হবিগঞ্জ জেলা, নবীগঞ্জ উপজেলা, গ্রাম-গহরপুর
আব্দুল মজিদ ওরফে খতিশা: অজ্ঞাত
ছিদ্দেকুর রহমান: সিলেট শহর সংলগ্ন বরইকান্দি
সেলিম আহমদ: সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘাসুর
মোস্তাকীম আলী: সিলেট শহর ঝেরঝেরি পাড়া
শেখ ওয়াহিদুর রহমান: সিলেট, বিয়ানীবাজার
ফণীভূষণ দাস: জামতলা, সিলেট শহর
শাহ আব্দুল করিম: ধল, দিরাই, সুনামগঞ্জ
শাহ নূর জালাল: ধল, দিরাই, সুনামগঞ্জ
উস্তাদ উদ্দিন আহমদ (১৯১৯-?): নবীগঞ্জ, কায়স্থগ্রাম, হবিগঞ্জ
আপ্তব আলী আখঞ্জি (১৩০০-১৩৮৩ বাংলা): হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট
মো. গোলাম হুসাইন (১৩১৭-?): হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলা
সৈয়দ গোলাম রাব্বানী (১৯১৯-১৯৭০): হবিগঞ্জ, সুলতানশী
উম্মর পাগল (ঊনবিংশ শতাব্দী): সিলেট
কিম্মত আলী (১২৮৬-১৩৫১ বাংলা): সদর হবিগঞ্জ, বামকান্দিগ্রাম
বৌলাশা (১২৭৫-১৩৬৫): হবিগঞ্জ, কাকিয়াকান্দা গ্রাম
আব্দুল হাসিম (১৩০০-?): লাখাই মুড়াকরি গ্রাম
সৈয়দ আলী ফকির (১৩০৫-১৩৭৫ বাংলা): হবিগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ,
শেখ করিম বক্স (ঊনবিংশ শতাব্দী): সুনামগঞ্জ
সৈয়দ নিয়ামত আলী: মৌলভীবাজার জেলা কমলগঞ্জ উপজেলা, রঘুনাথপুর গ্রাম
ফিরোজ আলী: কমলগঞ্জ উপজেলার সোনাপুর গ্রাম
শফিকুল হক (১৩২২-১৩৫৭ বাংলা): সিলেট জেলা কানাইঘাট
অধম খলিল (ঊনবিংশ শতাব্দী): পরিচয় অজ্ঞাত
আসকর আলী বাউল: সুনামগঞ্জ, দোয়ারাবাজার
পীর সরকুম আলী (১৮৯৯-১৯৯২): সুনামগঞ্জ শহর আপিননগর
ইদন শাহ: বালাগঞ্জ উপজেলার পাঁচপাড়া গ্রাম

www.pathagar.com

সদাই শাহ: সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলা
অরিজা খাতুন (১৯১২-?): সিলেট, বিয়ানীবাজার
শাহ ছাবাল আলী: ছাতক
মধুসূদন: সুনামগঞ্জ উপজেলার কাঠইর গ্রাম
ব্রজকিশোর গুপ্ত: মৌলভীবাজার জেলার লংলা
ইন্দ্রমোহন দাস: মৌলভীবাজার
নরোত্তম দাস: মৌলভীবাজার, কমলগঞ্জ
নয়ন চান্দ: মৌলভীবাজার, ইন্দেশ্বর অঞ্চল
রসিক চান্দ: মৌলভীবাজার
নরেন্দ্র মোহন: মৌলভীবাজার
রমণীমোহন গোসাই: মৌলভীবাজার ঢেউপাশা
বৈষ্ণবচরণ দাস: মৌলভীবাজার
রকিব শাহ: সিলেট শহর, সিলেট
ইসহাক রেজা চৌধুরী (মহাকবি): দেওকলস, বিশ্বনাথ, সিলেট
তারিনী সরকার (১৩২১-১৩৯১): হবিগঞ্জ মাধবপুর
বিপিন সাধু: হবিগঞ্জ বাহুবল উপজেলার বড়িকান্দি গ্রাম
রামকুমার নন্দী মজুমদার (১৮৩১-১৯০৪): হবিগঞ্জ বেজুড়া
পাবর্তী: হবিগঞ্জ
নিধিরাম দাস: হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ
রসিকলাল: দিরাই, পেরুয়া সুনামগঞ্জ জেলা
বিদ্যাময়ী: দিরাই, পেরুয়া,
মথুরানাথ ভট্টাচার্য: সদর হবিগঞ্জের বাজুকা গ্রাম
শ্রীরামদুলাল: হবিগঞ্জ
মহানন্দ: হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ
নবীন দাস: হবিগঞ্জ লাখাই উপজেলার ভাদিকারা গ্রাম
কুলচান্দ দাস: হবিগঞ্জ
প্যারীমোহন দাস: হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ
ধীরেশচন্দ্র দাস: হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রাম
মহেন্দ্র গোসাই: (১৮৬০-১৯৩৫): চুনারুঘাট উপজেলা, একডালা গ্রাম
গোবিন্দ গোসাই: হবিগঞ্জের মাছুলিয়া
রামলোচন দাস: হবিগঞ্জ, বিথঙ্গল
নিমাইচন্দ্র কৈলাস: সুনামগঞ্জ
মহেন্দ্র গোস্বামী: সুনামগঞ্জ
গোপালচন্দ্র দাস: সুনামগঞ্জ
গোবর্ধন চৌধুরী: সুনামগঞ্জ জগন্নাথপুর

www.pathagar.com

দীন শরৎ (১৩১০-১৩৭০ বাংলা): নেত্রকোনা
মনোমোহন: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
তারানাথ ভট্টাচার্য: জগন্নাথপুর উপজেলার সাচায়নী গ্রাম
শ্রীকিঙ্কর দাস: সুনামগঞ্জ
যদুনাথ: সিলেট ঢাকাদক্ষিণ
রাধানাথ চৌধুরী: সিলেট
পাগল শঙ্কর: সিলেট
চন্দ্রকুমার পালচৌধুরী: মৌলভীবাজার কমলগঞ্জ, ছয়ছিরি
দীননাথ দাস: সুনামগঞ্জ
মুরারি গুপ্ত: সিলেট
ভবানীপ্রসাদ: হবিগঞ্জ তরফ
অন্নদারঞ্জন দাস: সিলেট সালুটিকর
রুহি ঠাকুর: সুনামগঞ্জের দিরাই ধলগ্রাম
রমেশ ঠাকুর: সুনামগঞ্জের দিরাই ধলগ্রাম
কালা চন্দ: অজ্ঞাত
গোলক চান গোস্বাই: অজ্ঞাত
চিকনকালা: অজ্ঞাত
জ্ঞানচন্দ্র: অজ্ঞাত
সদানন্দ: অজ্ঞাত
বানেশ্বর: অজ্ঞাত
কৃষ্ণ দাস: অজ্ঞাত
দ্বিজহরির: অজ্ঞাত
দীন হরি দাস: অজ্ঞাত
রিবহী কালা মিয়া: সুনামগঞ্জ জামলাবাদ গ্রাম
মিনারা বেগম: সিলেট কোম্পানীগঞ্জ
কামিনী হোড়: জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ
ছিদ্দেক আলী: সদর উপজেলা সুনামগঞ্জ
আব্দুল মতলিব: সুনামগঞ্জ শহর
আব্দুল গনি: সুনামগঞ্জ সদর
উমাচরণ ধর: রেঙ্গা ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
রামচন্দ্র দাস: নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
জালাল খা: নেত্রকোনা
আশ্রাফ উদ্দিন (আঠার শতক): সুনামগঞ্জ
আজিম ফকির: দিরাই
মো. আজম আলী: সিলেট, বিশ্বনাথের টেংরাগ্রাম

www.pathagar.com

মো. আব্দুস সোবহান: সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ
মো. নবীন সিদ্দেক আলী: সিলেট বিশ্বনাথের টুকেরকান্দি গ্রাম
মুসলিম আলী: সিলেট বিশ্বনাথ গরমাগুল গ্রাম
মো. খালেদ মিয়া: বিশ্বনাথ সিঙ্গেরকাছ
সোলাইমান আহমদ: সিলেট কানাইঘাটের বড়দেশ গ্রাম
সালাহউদ্দীন মো. ইলিয়াস: সিলেট কামালবাজার
শাহ মোহাম্মদ খোয়াজ মিয়া: সিলেট বিশ্বনাথ
আজিজুল হক: সিলেট শহর সাপাই
শাহ মদরিছ আলী: সিলেট
মো. আফরোজ বখত: সিলেট
আব্দুল ওয়াহিদ: সুনামগঞ্জ ছাতক
মো. শেখুল ইসলাম শেখ: সিলেট শহরতলীর টুকেরবাজার
সৈয়দ তাহির আলম: সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর, পীরেরগাঁও
মাহমুদ আলী খান: সুনামগঞ্জ জগন্নাথপুর আটঘর গ্রাম
রমিজ আলী: সুনামগঞ্জ, ছাতক উপজেলার ছনখাইড়
মাধবচন্দ্র হোড়: মোলারগাঁও, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
গিয়াস উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০০৪): সুনামগঞ্জ, ছাতক শিবনগর গ্রাম
মো. জামাল উদ্দিন: সুনামগঞ্জ, ছাতক, গ্রাম সামননগর
ক্বারী আমির উদ্দিন: সুনামগঞ্জ, ছাতক গ্রাম আলমপুর
কমদ্দছ আলম উদাসী: সুনামগঞ্জ,ছাতক গ্রাম চরবাড়া
মুসলিম আলী: সুনামগঞ্জ,ছাতক গ্রাম নোয়ারাই
আব্দুল খালিক: সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর, পীরের গাঁও
উস্তার উদ্দিন আহমদ (১৯১৯-?) নবীগঞ্জ, কায়স্থগ্রাম
শাহ ঈমান আলী: হবিগঞ্জ নবীগঞ্জের দেওপাড়া
মোঃ আরজান আলী: হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পাঁচ পাড়িয়াগ্রাম
জামাল উদ্দিন আহমদ: হবিগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ উপজেলার আজিমনগর গ্রাম
মো. ইস্কন্দর মিয়া: জগন্নাথপুর উপজেলা পাইলগাঁও
শাহ আব্দুস ছালিক: জগন্নাথপুর উপজেলা কুবাজপুর
আছিম শাহ (১২৫০-১৩৫৩ বাংলা): জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
মো. আব্দুল মন্নান: ছাতক সুনামগঞ্জ
ফজর উদ্দিন আহমদ: সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর
আব্দুল জব্বার ওরফে কলু শাহ: সুনামগঞ্জ জগন্নাথপুর
মো. আনিছ উদ্দিন: সুনামগঞ্জ ধর্মপাশা
কপিল উদ্দিন সরকার (১৩৪৮-? বাংলা): দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ
ছইদ আলী: ছাতক উপজেলার করগোপী

www.pathagar.com

মকরম শাহ: কামারগাঁও, বালাগঞ্জ, সিলেট
তামুদ আলী পীর: সুনামগঞ্জ শহর
দেওয়ান মহসীন রাজা: সুনামগঞ্জ শহর
শফিকুন নূর: দিরাই জগদল, সুনামগঞ্জ
কাশীনাথ দাশ: জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
মহানন্দ: হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ
বিরহী কালা মিয়া: সুনামগঞ্জ জামলাবাদ গ্রাম
বশির উদ্দিন সরকার: দিরাই, সুনামগঞ্জ
ওয়ারিছ আলী: বালাগঞ্জ, সিলেট
আব্দুল জলিল ওরফে পাগল কালা: সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ
উদাসী মুজিব: কোম্পানীগঞ্জ সিলেট
আতাউর রহমান: গোলাপগঞ্জ, সিলেট
বাবুল সরকার: সালুটিকর সদর, সিলেট
হেপী রাণী দাস: সিলেট
পাখি মিয়া: জৈন্তাপুর সিলেট
সূর্যলাল দাস: সুনামগঞ্জ
সেবুল মিয়া: সদর উপজেলা সুনামগঞ্জ
মো. আব্দুর রাজ্জাক: সুনামগঞ্জ শহর
এ কে আনাম: শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
কামাল পাশা: দিরাই, ভাটিপাড়া, সুনামগঞ্জ
মনির উদ্দিন: মৌলভীবাজারের কুলাউড়া
পীর তাজুদ আলী: সুনামগঞ্জ
পাগল তৈমুছ শাহ্: সিলেট
উমেদ শাহ: সিলেট
আমান উল্যাহ শাহ: সিলেট
যতীন্দ্রমোহন রায়: সুনামগঞ্জ
ঠাকুরবাণী: শতক, হবিগঞ্জ
রঘুনাথ ভট্টাচার্য: মৌলভীবাজার
বাউল কমর উদ্দিন(শহিদ): মাথিউরা, বিয়ানীবাজার, সিলেট
শেখ ওয়াহিদুর রহমান: কাছাড়িপাড়া, বিয়ানীবাজার, সিলেট
আজিজ ইবনে গণি: বৈরাগী বাজার, বিয়ানীবাজার, সিলেট
লোকমান আহমদ: শ্রীধরা, বিয়ানীবাজার, সিলেট
ফকির বাবর চৌধুরী: আটগাঁও, জকিগঞ্জ, সিলেট
নওয়াব আলী: দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

www.pathagar.com

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

লোকশিল্পীদের তালিকাঃ

সিলেটের লোকশিল্পীদের সংখ্যাও কম নয়। মূলত গানের স্রষ্টারাই শিল্পী ছিলেন। সামান্য সংখ্যক বেতার টি.ভি শিল্পীর বাহিরে চারণ লোক শিল্পীদের সঠিক সংখ্যা জানাও অসম্ভব। নিম্নে বর্তমানে লোকগানের সাথে জড়িত সিলেট বিভাগের লোকশিল্পীদের নামের তালিকা দেওয়া হলঃ

রামকানাই দাশঃ করেরপাড়া, সিলেট
বিদিতলাল দাশঃ শেখঘাট, সিলেট
মনিরুজ্জামান মনিরঃ সুনামগঞ্জ
সুবীর নন্দীঃ হবিগঞ্জ
আরতি ধরঃ সিলেট শহর
হিমাংশু বিশ্বাসঃ মিরাবাজার, সিলেট
হিমাংশু গোস্বামীঃ শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (প্রবাসী)
চন্দ্রাবতী বর্মনঃ তোপখানা, সিলেট
ভবতোষ চৌধুরীঃ সিলেট শহর
জামাল উদ্দিন হাসান বান্নাঃ দরগা মহলা, সিলেট
মালতী পালঃ তাঁতীপাড়া, সিলেট
হেলাল উদ্দিন আহমদঃ কামারগাঁও, সদর, সিলেট
মুজিবুর রহমান সরকারঃ বরইকান্দি, সিলেট
মরিয়ম বেগমঃ ৮২, কাজিটুলা, সিলেট
লাভলী দেবঃ পুরাতন মেডিকেল কলোনী, সিলেট
ইস্রাইল মিয়াঃ সিলেট
শাহাব উদ্দিনঃ রংধনু-৮, লাকড়ীপাড়া, সিলেট
পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী (যিশু): সিলেট
পঙ্কজ দেবঃ ব্রাহ্মণগঞ্জ, ওসমানীনগর, সিলেট
বিপব নন্দীঃ সিলেট
শরদিন্দু ভট্টাচার্যঃ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়
আব্দুল হামিদঃ গোয়াইপাড়া, সিলেট
সিরাজ আনোয়ারঃ লালাবাজার, সিলেট
মুহিব আলীঃ ৫৯, রাজার গলি, সিলেট
মুজিবুর রহমান সরকারঃ বরইকান্দি, সিলেট
জুয়েল আহমদঃ সিংগের কাছ, বিশ্বনাথ, সিলেট
শিউলী আক্তারঃ বিশ্বনাথ, সিলেট
গৌতম চক্রবর্তীঃ সিলেট
মিজানুর রহমানঃ বিশ্বনাথ, সিলেট
মরিয়মঃ সিলেট
শামীম আহমদঃ সিলেট শহর
ছন্দা পুরকায়স্থঃ চালিবন্দর, সিলেট

www.pathagar.com

জয়ন্তকুমার দেবঃ ওসমানীনগর, সিলেট
মনোজ দাশঃ দত্ত গ্রাম, ওসমানীনগর, সিলেট
বাবুল বৈদ্যঃ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট
সোনাচাঁন দাশঃ দত্তগ্রাম, ওসমানীনগর
প্রভাত দেবঃ ব্রাহ্মণগ্রাম, গোয়ালাবাজার, সিলেট
মনীন্দ্র দেবঃ দত্তগ্রাম, গোয়ালাবাজার, সিলেট
গোপেন্দ্র আচার্যঃ গ্রাম রবিদাস, তাজপুর, সিলেট
রাধাপদ দাশঃ দত্তগ্রাম, ওসমানীনগর, সিলেট
আলী নূরঃ সদর, সিলেট
উদাসী মুজিবঃ সদর, সিলেট
সাজ্জাদ নূরঃ সদর, সিলেট
হাজী আব্দুল মছাব্বিরঃ সিলেট
আলীম উদ্দিনঃ সিলেট
নূর জাহানঃ সিলেট
ওয়ারিছ মিয়াঃ বালাগঞ্জ, সিলেট
আতাউর রহমানঃ গোলাপগঞ্জ, সিলেট
আব্দুল খালিকঃ গোলাপগঞ্জ, সিলেট
আলী মিয়াঃ গোলাপগঞ্জ, সিলেট
হবিশাহঃ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা খাগাইল গ্রাম
আব্দুল জলিলঃ পাগল কালা; ফেঞ্চুগঞ্জ
আফসানাঃ দক্ষিণসুরমা, সিলেট
সেলিম চৌধুরীঃ শমসেরনগর, মৌলভীবাজার
শান্তনা চক্রবর্তীঃ শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
শোভারাণী ভৌমিকঃ মৌলভীবাজার
রাজীব রায়ঃ মৌলভীবাজার
জয়তুন নাহার শাদতঃ মৌলভীবাজার
মৌরিন সোমাঃ মৌলভীবাজার
এ.কে. আনামঃ শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
আক্রম আলীঃ হবিগঞ্জ
তন্বী দেব, হবিগঞ্জ
সিদ্ধার্থ বিশ্বাসঃ হবিগঞ্জ
সৈয়দ আশিকুর রহমানঃ লাখাই, হবিগঞ্জ
শাহ আলম চৌধুরী মিন্টুঃ হবিগঞ্জ
আব্দুর রহমানঃ জলসুখা, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
মালেকা ভানুঃ পুরাসুন্দা, হবিগঞ্জ

শাহ আবদুল করিম

www.pathagar.com

সাহানা আক্তার আনমুন: নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
শাহ আব্দুল করিম: ধল, সুনামগঞ্জ
সুবাস উদ্দিন: কলেজ রোড, সুনামগঞ্জ
আব্দুল লতিফ: আরপিন নগর, সুনামগঞ্জ
কালা মিয়া: নোয়াখালী বাজার, সুনামগঞ্জ
আফতাব মিয়া: সুনামগঞ্জ
শাহীন বক্ত: সুনামগঞ্জ
আকমল বখত বাবু: সুনামগঞ্জ
দিলওয়ার হোসেন: সুনামগঞ্জ
জোবায়ের আহমদ সেবুল: সুনামগঞ্জ
বিজন রায়: সুনামগঞ্জ
স্বপ্না দে: সুনামগঞ্জ
তুলিকা ঘোষচৌধুরী: সুনামগঞ্জ
আব্দুল বশর: ছাতক, সুনামগঞ্জ
সুষমা দাশ: দিরাই, সুনামগঞ্জ
গৌরাঙ্গ বণিক: জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জুয়েল আহমদ: জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
কবির উদ্দিন: দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ
রূপালী রায়: দিরাই, সুনামগঞ্জ
কুহিনূর আক্তার বেবি: জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
শিউলী রানী শর্ম্মা: শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
তারিণী সরকার: শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
সুনন্দা সিংহা: পুরানলেন, সিলেট
মো. আব্দুল গণি: ফতেপুর, বিয়ানীবাজার, সিলেট
আব্দুল ওয়াদুদ: দাসউরা, বিয়ানীবাজার, সিলেট
আব্দুন নূর: নয়াগ্রাম, বিয়ানীবাজার, সিলেট
কটন আলী: নয়াগ্রাম, বিয়ানীবাজার, সিলেট
বেলাল আছকরী: কাছাড়ীপাড়া, বিয়ানীবাজার, সিলেট
মড়াই মিয়া: কাদীমলীক, রামদা, বিয়ানীবাজার, সিলেট
প্রতিভা বৈদ্য: পশ্চিম ব্রাহ্মণগ্রাম, গোয়ালাবাজার, সিলেট
হাওয়ারুন বেগম: দত্তগ্রাম, গোয়ালাবাজার, সিলেট
নেওয়া বেগম: গোপকানু, বালাগঞ্জ, সিলেট

লোকসঙ্গীত দলের তালিকা: লোকশিল্পীদের মধ্যে কাঠামোগত বিন্যস্ত দলের সংখ্যা খুবই কম। দেখা যায় একজন বাউল সাধক বা কীর্তনীয়াকে ঘিরে কয়েকজন যন্ত্রশিল্পী ও দোহারী থাকেন। তাদের লিখিত দল বা

www.pathagar.com

পদ থাকে না। শিষ্যরা গান করেন। সম্প্রতি সিলেটে কয়েকটি লোকসঙ্গীত দলের সৃষ্টি হয়েছে। এসব দলের মধ্যে থেকে কয়েকটির নাম ঠিকানা জানা গেছে।

আরকুম শাহ্ শিল্পী গোষ্ঠী

(স্থাপিত-১৯৭৮)

ধরাধরপুর, আরকুমনগর, সিলেট

সভাপতি: বিদিতলাল দাস

সম্পাদক: মুহিব আলী

উজান

(প্রতিষ্ঠা: ১৯৯০)

প্রতিষ্ঠাতা: হ্যারল্ড রশীদ, হিমাংশু বিশ্বাস, আম্বরখানা, সিলেট

জালালী শিল্পী গোষ্ঠী

(প্রতিষ্ঠা: ১৯৯১)

প্রতিষ্ঠাতা: শাহ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ জালালী, সিলেট

নীলম লোক সঙ্গীতালয়

(প্রতিষ্ঠা: ২০০৩)

প্রতিষ্ঠাতা: বিদিত লাল দাস

স্থান: শেখঘাট, সিলেট।

বাউল কল্যাণ সমিতি (সিলেট বিভাগ)

প্রতিষ্ঠা: ২০০৬

সভাপতি: রোহিতাশ্বর চক্রবর্তী

সম্পাদক: বিরহী কালা মিয়া

সমন্বয়কারী: মো. কামাল উদ্দিন রাসেল

অফিস: তালতলা, সিলেট

ভাটি বাংলা অগ্রদূত যুব সংঘ

সংগঠক: দেবেশ তালুকদার

হাওলাদারপাড়া, সিলেট

রসিকলাল সঙ্গীত একাডেমী

শালা, সুনামগঞ্জ

পরিচালক: রামকানাই দাশ

গিয়াস উদ্দিন স্মৃতি সংসদ

ছাতক

সম্পাদক: শামীম আহমদ

সামষ্টিক সঙ্গীতের তালিকা: সিলেটে সামষ্টিক সঙ্গীতের তালিকার মধ্যে পড়ে ধামাইল, জারি, সারি, নৌকা বাইচ, ঘাটু গান, ঢপযাত্রা, মালজোড়া, কীর্তন, গোপনী গান ইত্যাদি।

একক সঙ্গীতের তালিকা: সিলেটে লোকসঙ্গীতের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। ধারণা করা যায়,

www.pathagar.com

সিলেটে লোকসঙ্গীতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যাবে। নিম্নে একক সঙ্গীতের কিছু নমুনা দেয়া হল:

ও নাইয়া, ধরাইয়া, ধরাইয়া নাও বাইও॥
দু দাড়ুয়া নাও খিনি গলইয়ে দুইটি ফুল,
সাগরে ভাসাইয়া নউকা, সাধুয়ে না পায় কূল।

গুলাম হুছন (১৪৬৮-১৫৬৮)

রসিক চিনিয়া প্রেম করতে হয়,
এগো অরসিকে প্রাণ দিলে আয়ু থাকতে মরতে হয় ॥

সৈয়দ মুছা

সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার।
ভরিয়া সুবর্ণের ভরা তুলি নৈলুম নায়ের পারা
আগা পাছা তুলি দিলুম খাট্টা;

সৈয়দ সুলতান

রূপেতে মিশাইয়া রূপ, দেখ স্বরূপ,
পাবে যদি রং রাজারের মনের মানুষ ...।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য

মন, তুমি কারে চাওরে, ভরষা কাহার?
নয়ন মুদিলে দেখ, দুনিয়া আন্ধার ॥

রমণীমোহন গোস্বামী

পন্থছাড় ঘরে যাইরে নিলাজ কানাই।
মাথায় পসরা করি চলিছে গোপালের নারী কোথায় তোর ঘরবাড়ী?

শেখচন্দ (১৭২০-১৮২০)

আইস আইস আরে বন্ধু করি নিবেদন
অবলা রাধারে বন্ধু দেও দরশন।

সৈয়দ শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৪)

দীননাথ অনাথ জানিয়া প্রভূ ত্বরাও আমারে।
বেভুলেতে গেলা দিন না চিনি তোমারে ॥

আব্দুল ওয়াহ্হাব চৌধুরী

যমুনার কিনারে নাথ, নাথ হে পার করো মোরে,
সঙ্কটে পড়িয়া আমি ডাকি এ তোমারে ॥

আরমান আলী

নিদারুন পরাণের বন্ধুরে, বড়ো নিদারুণ
হায়রে ইদরেতে জ্বালাইয়া দিলায় পিরিতের আগুইন রে।

শাহ হুছন আলম

আমি ভাবছিলাম কি ঐ রঙ্গে দিন যাবেরে সুজন নাইয়া
ও নাইয়া পারকর দুঃখিনী রাধারে ॥

দীন ভবানন্দ

www.pathagar.com

নিশিথে যাইও ফুল বনে রে ভমরা, নিশিথে যাইও ফুল বনে।
নয় দরজা কৈরা বন্ধ লৈও ফুলের গন্ধ।

শেখ ভানু

আমায় বধিল পরাণে, আমায় বধিল পরাণে গো
শ্যাম কালিয়ায় প্রেমাগুণে।

মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াছিন

ঝুরে মোর পরাণী বন্ধু ঝুরে মোর পরাণী;
সহিতে না পারি জ্বালা বিষম আগুনীরে।

(অজ্ঞাত)

তুমি বন্ধু দয়াময় আমিত কাঙ্গালীরে
বাঁশিটি দিয়ারে বন্ধু বাঁশির দিলায় স্বর

সৈয়দ রাগিব আলী

সোনার ময়না ঘরে থৈয়া বাইরে তালা লাগাইছে
রসিক আমার মন বান্ধিয়া পিঞ্জর বানাইছে ॥

হরিদাস

তোমরা কেলা যাওরে পুবের বন্দে দিয়া
কাচার মামারে কইও নাইওর নিত আইয়া।

দিব্যময়ী দাস

আমি কৃষ্ণ কোথায় পাই গো
বল গো সখি কোন দেশেতে যাই।

রাধারমণ দত্ত

প্রেমের আগুন লাগল রে হাছন রাজার অঙ্গে
নিভে না আগুন, ডুবলে সুরমা গাঙ্গে।

হাছন রাজা

মন আমার যৌবন জোয়ারে দিল ভাটি।
ভাসাইয়া নিল আমার দেহার পলিমাটিরে।

দেওয়ান একলিমুর রাজা

নির্জন যমুনার কূলে বসিয়া কদম্বতলে,
বাজায় বাঁশি বন্ধু শ্যামরায় ॥

দুর্ব্বীণ শাহ

কালা আয়রে আয়, আয় আয়
তোর জন্যে মোর প্রাণী হৈল কণ্ঠাগত প্রায়

দেওয়ান গণিউর রাজা চৌধুরী

আজ নিশা কালেরে সাম আজ নিশা কালে
আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে।

আরকুম শাহ

www.pathagar.com

আমর মন মনরে
ওরে রঙিয়ার চরণে আমার মন মঝরে।

আজিম ফকির (সংগ্রহ: রামকানাই দাশ)

পশ্চিমেতে যাওরে বাইয়া
সুরমা নদীর পানি
সঙ্গে লইয়া যাওরে বন্ধু
আমার সালামখানি

(ইসহাক রেজা, সিলেট অঞ্চল)

আমি ফুল বন্ধু ফুলের ভ্রমরা।
কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া ॥

শাহ আব্দুল করিম

লোক বাদ্যযন্ত্র:

সিলেটের বাউলরা নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্র বেশী ব্যবহার করেন। ঢোলক, মৃদঙ্গ, সারিন্দা, বেহালা, একতারা, দোতরা, ঢপকী, করতাল, বাঁশি, ঝান, বগলী, খেমটা, খঞ্জনী, চটি মন্দিরা ইত্যাদি।

বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা:

সিলেটে মূল্যবান বাণিজ্যিক গানগুলো পৃথক করা কঠিন। বিভিন্ন লোকশিল্পীদের মতামতের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

আমি ভাবছিলাম কি ঐ রঙ্গে দিন যাবেরে সুজন নাইয়া	-দীন ভবানন্দ
গৌর তোরে ঘরের বাহির কে কৈল কে	- দীন ভবানন্দ
মাথায় পশরা লৈয়া হাটে চলে রাধা	-দীন ভবানন্দ
আইস বন্ধু প্রাণ কালিয়ারে	- শিতালং শাহ
খেজুর গাছে হাড়ি বাধ মন	– শিতালং শাহ
আমার রসিয়া বিরস হইলা কিসে	- শিতালং শাহ
বিরহেতে ডাকিরে বন্ধু নব গুণমণি	- শিতালং শাহ
নিশিথে যাইও ফুল বনে রে ভমরা	-শেখ ভানু
শ্যামকে এনে দেখাও আমারে প্রাণ ললিতে	- আব্দুল মান্নান
ফাল্গুনও বসন্তকালে যৌবনে দিল উঁকি	- গেদু মিয়া সরকার
ও মাঝি বিনয় করি, পায়ে ধরি, ভিড়াই দে মোর ভাঙ্গাতরী	-মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াছিন
আসবে শ্যামকালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া	- রাধারমণ দত্ত
আমি কৃষ্ণ কোথায় পাই গো	- রাধারমণ দত্ত
শ্যামলও বরণও রূপে মন নিল গো হরিয়া	- রাধারমণ দত্ত
জলের ঘাটে দেইখ্যা আইলাম কী সুন্দর গো শ্যামরায়	– রাধারমণ দত্ত
আর দাঁড়াব কতরে শ্যাম আর দাঁড়াব কত	– রাধারমণ দত্ত
কই গেলে পাই তারে কই গেলে পাই	– রাধারমণ দত্ত
সুবল যারে বৃন্দাবন দেখে আয়রে রাধারাণী আছেরে কেমন	-ছহিফা খাতুন
সুজন মন মনরে যাইও না তরী বাইয়া	– দীননাথ বাউল

www.pathagar.com

লোকে বলে বলে রে ঘরবাড়ী ভালা না আমার	– হাছন রাজা
নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে	–হাছন রাজা
মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে	– হাছনরাজা
হাছন রাজার কয় আমি কিছু নয়রে আমি কিছু নয়	– হাছন রাজা
বাউলা কে বানাইলরে হাছন রাজারে বাউলা কে বানাইলরে	– হাছন রাজা
আমি করিরে মানা অপ্রেমিকে গান আমার গুনবে না	– হাছন রাজা
বন্ধু তোর লাগিয়ারে আমার তনু ঝর ঝর	– সৈয়দ শাহ নূর
কী সন্ধানে মওলা ধনে বসাইলা প্রেমেরবাজার	– কালা শাহ
কেন বাস ভিন রে বন্ধু গোকোলে বইল হাসি	–আছিম শাহ
নির্জন যমুনার কূলে বসিয়া কদম্বতলে, বাজায় বাঁশী বন্ধু শ্যামরায়	– দূর্ব্বীণ শাহ
জন্মে জন্মে অপরাধী তোমারই চরণে রে	–দূর্ব্বীণ শাহ
আর কত রাখব যৌবন লোকের বৈরী হইয়া	–দূর্ব্বীণ শাহ
আমি কূলহারা কলঙ্কিনী	– শাহ আব্দুল করিম
মহাজনে বানাইয়াছে ময়ূর পঙ্খী নাও	– শাহ আব্দুল করিম
সখী কুঞ্জ সাজাও গো	– শাহ আব্দুল করিম
গ্রামের নও-জোয়ান হিন্দু-মুসলমান	– শাহ আব্দুল করিম
বসন্ত বাতাসে সইগো বসন্ত বাতাসে	– শাহ আব্দুল করিম
কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে	– আরকুম শাহ
আজি দরশন মিলন এখন	– আরকুম শাহ
অকারণে তুলসীর মূলে জল ঢালিলাম	– বিরহী মো. কালা মিয়া
দুই পাহাড়ের মাঝে মওলা মসজিদ বানাইছে	– ক্বারী আমির উদ্দিন
আমি তোমার প্রেমের পাগল তুমি কিতা বুঝ না	– বিরহী মো. কালা মিয়া
ও মোর প্রাণের বন্ধুরে তুমি কোথায় রইলায় রে	– হেপী রাণী দাশ
বল গো সখি আর আসবে কি চিত্ত চোরা মোর	– উদাসী মুজিব
কই যাওরে সুজনও নাইয়া ভাটির গাং বাইয়া	– রুহি ঠাকুর
মন পাখিতুই আমার কথা শুনলে না একবার	– অন্নদারঞ্জন দাস
মন তোর গেল গনার দিন, মনের ঘোড়া লাগাম ছাড়া দৌড়াইয়া যায় দিন	– সূর্যলাল দাস
আমার মন মঝরে রঙিয়ার চরণে আমার মন মঝরে	– আজিম ফকির
আইলারে নোয়া জামাই আসমানের তেরা	– দিব্যময়ী
আমার কপালে সব করে	– রসিক লাল
মরিলে কান্দিস না আমার দায় রে যাদু ধন	– গিয়াস উদ্দিন আহমদ
দয়াল গুরুজী, জগৎ উদ্ধারিলায় আমার উপায় কি	– রাধানাথ
বাঁশি বাজিল রে, ভরা গাঙ্গের কোলে	– একলিমুর রাজা
দয়াল গুরু গো ঘোর অন্ধকার দেখি	– অজ্ঞাত
সব সখি মিলি ঘসো গো চন্দন	– গোপাল কামার
নন্দের নন্দন হরি বাঁশরী বাজাইয়া বনে যায় রে	– রায় শেখর

www.pathagar.com

বাণিজ্যিকভাবে লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান ২০০৬

সিলেটের লোক শিল্পীদের প্রচুর ক্যাসেট ও সিডি সিলেট ও ঢাকা থেকে বের হচ্ছে। কখনো পুরাতনগুলো আবারও পুনপ্রকাশ ঘটেছে। সিলেটের আরতী ধর, রামকানাই দাশ, বিদিতলাল দাস, শফিকুন নূর, পাগল কালা মিয়া, বিরহী কালা, পঙ্কজ দে, বিপব নন্দী, শরদিন্দু ভট্টাচার্য, কারী আমীর উদ্দিন, তুলিকাঘোষ চৌধুরী, শিউলীরাণী শর্মা প্রমুখের গাওয়া গানের ক্যাসেট, ভিসিডি, সিডি খুবই জনপ্রিয়। ক্যাসেট বিক্রেতাদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, সিলেট বিভাগের প্রতিটি জনপদের বাজারে এখন ক্যাসেট ও ভিসিডির দোকান রয়েছে; যার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। তাদের মতে মারিফতী গান, মুর্শিদী গান, ভাটিয়ালী গান, ধামাইল, কিচ্ছা, বারোমাসী, বিচ্ছেদ, কীর্তন, শোকগাঁথার ক্যাসেট ও সিডি বেশি বিক্রি হয়। সিলেটের বহু ক্যাসেট এখন বিদেশ রপ্তানী হচ্ছে। ধারণা করা যায় ২০০৬ সালে এ বিভাগে প্রায় ১০ কোটি টাকার লোকগানের ক্যাসেট বিক্রি হয়েছে।

বিপন্ন গান

সিলেটে বহুলোক গানের বিষয় আজ বিপন্ন হয়ে পড়ছে তার মধ্যে উলেখযোগ্যগুলো নিম্নে দেয়া হল:

১. বান্ধা গীত: সিলেটে সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে রঙ্গিলাকে ঢং করে যে ব্যঙ্গাত্বক গান করা হয়ে থাকে সেগুলোকে বান্ধা গান বলা হয়। কখনো ধামাইলের মাধ্যমে, কখনো বা বসে এ গান গাওয়া হয়। বান্ধা ধামাইল এর নমুনা:

তোমরা শুনছনি গো রাই
কাইল যে আইছে নোয়া জামাই, বলদ নাকি গাই (গাভী)।
এক বলদ নোয়া জামাই এক বলদ তার ভাই
এগো আরেক বলদ সঙ্গে আইছে তার বইনের জামাই।

(সংগ্রহ: রামকানাই দাশ)

সিলেটের মালজোড়া গান (জালালী ও তার দল)

www.pathagar.com

২. চড়ক পূজার গান: সিলেটে চড়ক পূজার সময় শিব-গৌরী ও কালীর নাচকে কেন্দ্র করে নানা গান পরিবেশিত হয়। চড়ক পূজা সংকুচিত হয়ে আসার ফলে এই গানগুলো বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

৩. মুসলিম বিয়ের গান: গ্রামীণ মুসলিম পরিবারে আগে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'মেন্দির গান' (মেহেদী) গাওয়ার অনেকটা রেওয়াজ ছিল। এ গান বাধ্য যন্ত্র ছাড়াই হয়। যেমন-

আলিয়া পড়ইন গো লিলা ঢলিয়া পড়ইন গো লিলা
যেদিন মাইজির কোলে লিলা গামিলারে (ঘামিলা)।

৪. নির্ব্বাণ সঙ্গীত বা জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের গান: জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সঙ্গীতকে নির্ব্বাণ সঙ্গীত বলা হয়। প্রায় সাড়ে চারশত বছর ধরে নির্ব্বাণ সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের প্রার্থনা চলছে। যেমন:

ভজহে পরব্রহ্ম থাকিবা আনন্দে। কিসের কারণে ভাই লাগি বৈলা ধন্ধে। পূর্ব্বে না ছিল কেহনা থাকিবা পাছে। মিছা মায়া সংসারে ভ্রমেতে ভূলিয়াছে ॥ গোবিন্দ দাস

৫. পাঁচালী গান: পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মহাত্ম্য কথা পাঁচালীর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। মহিলারা ধীর লয়ে যেগুলো গান করেন। গ্রামে এক সময় প্রায় প্রতিদিনই পাঁচালী গান হত। যেমন: মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, বাবাহরের পাঁচালী ইত্যাদি।

৬. মনসার গান বা ভাসান গান: পূর্ব বাংলায় মনসা পূজার প্রচলন যে বেশি তা সর্বজন বিদিত; কিন্তু সিলেটে মনসা পূজা হয় অন্যরকম এবং ঘরে ঘরে। মহিলারা আগের দিন সন্ধ্যা বেলা 'খাটনির' মাধ্যমে দেবীকে গানের মাধ্যমে আহবান করেন। মনসা দেবীকে কেন্দ্র করে মহিলারা গান গেয়ে থাকেন।

৭. গাজীর গীত: পূর্বে সিলেটের গ্রামে একশ্রেণীর গায়ক গাজীর এশা নিয়ে 'বড়ঘরের' সামনে পুঁতে রাখত। ঘরের গৃহিণী এসে এক লোটা বা এক মগ পানি দিলে গাজী তাঁর এশার গোড়ায় সামান্য পানি ঢেলে দিত। গান শেষ হলে গাজী তার এশা দিয়ে মগের পানি পুনরায় ছুঁয়ে দিত। সেই পানি গৃহস্তের গরুর ঘরে ছিটানো হতো।

৮. গোবিন্দভোগের গান: এক সময় গোবিন্দভোগের গান গ্রামাঞ্চল খুব প্রচলিত থাকলেও এখন সে গান চোখে পড়ে না। নমুনা:

তোর সুখর কালেরে প্রভাত সুখের কালে
কোকিলে কুহরে বসি তমালের ডালে।
কাকে করে কলবর গুঞ্জন অলিকূল
ফুটিল কমল বনে, ভ্রমরায় করে রোল- মাধবচন্দ্র হোড় (?-১৮৮০)

৯. লাছাড়ী গান: সিলেটে কোনো কোনো ঘটনা বা উপখ্যানকে ঘিরে বা কেচ্ছাকে কেন্দ্র করে লাছাড়ী গানের প্রচলন ছিল। অনেক পুরাতন ঘটনার সুনির্দিষ্ট স্থান কাল পাত্র না থাকলে সেগুলোর বিয়োগাত্মক দিক করুন রসে সিক্ত করে গান গাওয়ার প্রচলন ছিল; কখনো কখনো কিচ্ছার মধ্যেও গান চলত। যেমন: কটু মিয়ার গান (ঘটনা: স্ত্রী ও তার উপপতি কর্তৃক নির্মমভাবে নিতে হন কটু মিয়া), বিনন্দ রাজার গান (কুড়া শিকার করতে গিয়ে সর্প দংশনে মৃত্যু)।

১০. মালজোড়া: মালজোড়া এক ধরনের পালাগান বিশেষ। বিশেষত দু'জন নায়ক গানে গানে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। একজন প্রশ্ন করেন আরেকজন উত্তর দিয়ে থাকেন; তদ্রুপ পাল্টাপাল্টি হয়ে থাকে।

বিলুপ্ত গান: নিম্নলিখিত গান সিলেটে এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১. কবিগান: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সিলেট কবি গান ছিল জমজমাট। বর্তমানে কবিয়াল বা সরকার যেমন নেই; কবিগানও শেষ। সেকালের কয়েকজন কবিয়ালের নাম দেওয়া হল- প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

(মান্নারগাঁও, সিলেট); ফণীভূষন দাস (জামতলা, সিলেট শহর); হরিচরণ সরকার (দূর্গাপুর, দিরাই), অধর ঠাকুর (বাউসী, দিরাই); সতীশ চক্রবর্তী (কাটখাল, আজমিরী, হবিগঞ্জ), এই কয়েকজন ছিলেন সিলেটের কবিয়াল। কবি গানের সাথে যুক্ত ছিলেন রসিকলাল (পেরুয়া, দিরাই); যামিনী সাধু (শিবারচর, দিরাই), মঙ্গলচণ্ড দাশ (পুটকা, শালা), সুকলাল দাস (আবদা শালা); মুকুন্দ শীল (সুনামগঞ্জ শহর), প্রাণনাথ দাস (শ্রীনারায়ণপুর, দিরাই), শ্রীধর সরকার (কাকাইলছেও, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ); মনীন্দ্র দাস (উচাইল, হবিগঞ্জ), উমেশ রায় (ইকরাম, হবিগঞ্জ); গোবিন্দ সাহা (ফান্দাক, হবিগঞ্জ)।

২. **মালসী গানঃ** চলিশ দশকের পর থেকে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণে হিন্দু সমাজের দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে সিলেটে মালসী গানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সিলেটে এখন আর গায়ক নাই বললে চলে। অনিল দাশ পুরকায়স্থ সিলেটের বারোটি মালসি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিত রামকানাই দাশ কয়েকটি মালসী গান জানেন। তাঁর সংগ্রহ থেকে একটি মালসী গানের নমুনা দেয়া হলঃ

মায়ার বন্দন কেটে দে মা মহামায়া
ভজব মনানন্দে প্রেমানন্দে গৌর বিষ্ণু প্রিয়া
ভজব তীল তুলসি দলে নদীয়া যুগলে
মাগো জাহ্ন বীরও কুলে গিয়ে।
(সংগ্রহঃ রামকানাই দাশ)

৩. **গাজন বা ত্রিনাথের গানঃ** ত্রিনাথের সেবা বা শিব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তার প্রিয় গাঞ্জা বা ভাং নিবেদনের উদ্দেশ্যে সিলেটে বহু গান রচিত হয়ে ছিল সেসব গান বিলুপ্ত। যেমনঃ গাইনজার চিরল চিরল পাত/গাইনজা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ভোলানাথ।

৪. **ঝুলন সঙ্গীতঃ** ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে রাধা-কৃষ্ণের বিরহ খেদ মিলন নিয়ে বৈষ্ণব ভাবাশ্রয়ী গান এক সময়ে খুব প্রচলন ছিল। বৈরাগী বৈষ্ণবীদের আখড়ায় এগুলো এ সবের প্রচলন ছিল। আখড়া কমে যাওয়ায় আজকাল এগুলোর প্রচলন দেখা যায় না। যেমনঃ

ঝুলে কানাইয়ারে কমলিনী কোলে।
বুলে গিরিধারীরে হিন্দোলে রে।
(রমণীমোহন গোস্বামী)

৫. **গোপনী কীর্তন বা গোপী গানঃ** রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক রসাত্মক তত্ত্বীয় গান। হাস্যরসের সাথে অনেক গূঢ় কথাকে হালকাভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এখন গোপনী কীর্তন দেখা যায় না বললেই চলে। যেমন-হরি বলতে আনন্দ বাড়ে, বল হরি বল। একবার বল হরি বল হরি বল হরি বল।

৬. **বন দুর্গার গানঃ** দুর্গা পূজার প্রচলন থাকলেও বন দুর্গার পূজার প্রচলন খুবই কম। বনদুর্গার পূজার মহিলারা এক ধরনের গান করে থাকেন। এই গান এখন পাওয়া দুস্কর।

৭. **গুরমার গানঃ** বিশেষ পোষাক পরেও হাতে চামর দুলিয়ে গুর্মা মনসা পূজার গান গেয়ে ভিক্ষা করত। দুরমাদের আজ আর দেখা যায় না।

৮. **হাজিরাত বা ওঝাদের গানঃ** জীন/ভূত/দেও/প্রেত/উপরী ও বিশেষ ধরনের অসুখ ছাড়ানোর জন্য হাজিরাত করার সময় গুণীনরা বিভিন্ন গান গেয়ে থাকেন। হাজিরাত গানের চেয়ে বিষ লামানোর গান অশীল। বিষ লামানোর গানে মনসার দোহাই দেয়া হয়। হাজিরাত গানের নমুনাঃ

খেলগো পরী খেল
শাহ পরী এ পাইছে তোরে
উঠিয়া ধামাইল খেল ॥

www.pathagar.com

৯. ছাদ পেটানোর গান: শ্রম থেকেই বহু সঙ্গীতের জন্ম। আগে চুন-চুরকী মিহি করে জলছাদ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একদল লোক একত্রিত হয়ে হাতে মুগুড় নিয়ে গানের তালে তালে সবাই এক সাথে 'দুরমুছ' করত। গানগুলো হাস্যকর, হালকা মেজাজ বা প্রেমমূলক হয়ে থাকে। সর্দার গানের সূত্রপাত ঘটাত। যেমন:

ভালা ভাল নাতিন আমার বোয়াল মাছের পেটী
তারে দেখিয়া সবে মারে উঁকি ঝুকি। হেই হেই হেই।

১০. আরী গান: আলী হচ্ছে করুণ সুরের গান। গভীর রাতে এ গানগুলো ভাবুকরা গেয়ে আহাজারী করতেন বলে জানা যায়। যেমন:

জমিতে জন্মিছিলায় মনরে লইতায় আলার নাম
হায়রে খন্নাছো হইল বৌ পাসরিলায় নামরে
আমি তোরে ডাকি বন্ধুরে ॥
ভাই বন্ধু তিরি-পুত্রু ঐ ঘরের বসতি,
মৈর‍্যা গেলে তিরি পুত্রু কেউ না ঐ বা সাথীরে
আমি তোরে ডাকি বন্ধুরে।
(সৈয়দ জলীল)

১১. ভট্টসঙ্গীত: ভট্ট সম্প্রদায়ের রচিত কবিতা বা গানই ভট্টসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা জন্মগত লোক কবি ছিলেন, কবিতা বা গান উপস্থিত সময়ে রচনা করতে ভট্টরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নিম্নে একটি নমুনা দেয়া হইল:

গুণ জ্ঞানীগণ করও শ্রবণ
ব্রহ্ম নিরূপন কথা।
এক ব্রহ্মবিনে এ তিন ভূবনে
দ্বিতীয় নাহিক সর্বথা ॥

১২. বারোমাসী গীতি: বারোমাসী গীত এখন আর সিলেট অঞ্চলে হয় না; বারোমাসী লোক সঙ্গীতের একটি শাখা বিশেষত মহিলারা গানের সুরে সুরে সেগুলো বলতো। প্রকৃতির ঋতু বদলের সাথে নারী মনের চাওয়া পাওয়া, বেদনা হতাশার সমাজ চিত্র ফুটে উঠত।

১৩. বিনালা গান: ভাগ্য পরীক্ষা নির্ধারণের জন্য এক ধরনের গান মহিলারা বলত। নিম্নে গানের নমুনা দেয়া হলো:

কালাচান্দে ঘুরিয়া দৌড়াইন গাঙ্গের চরে
চরেরে ও কালাচান ভিনদেশীরে।
রমজান কন্যা ছিনান করই সানের বান্দাইল ঘাটেরে ॥

(নেওয়া বেগম, পিতা- মৃত তেরাব আলী: গ্রাম- গোপকানু, বালাগঞ্জ, সিলেট; নূরুল ইসলাম কর্তৃক সংগ্রহ)

১৪. ঘাটু গান: উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মত রাগে তালে ভরপুর একদম ধ্রুপদী গান রাধা কৃষ্ণের লীলাময় গান। বড় বড় নৌকার আসর বসিয়ে ঘাটে ঘটে গিয়ে গান হত বলেই ঘাটু গান বা ঘাটু সঙ্গীত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। গানের তালে তালে একজন তরুণ ছেলেকে মেয়ে সেজে নাচত। ঘাটু গানের নমুনা:

ভকত জীবনও/প্রেমেতে মগনও/
রে নব কিশোরা/রাধা নাম মন্ত্রে যপে গৌরা।
নবীনও নীরদও জলদী বরণও রে মোহন চোরা
রমনী মনকে বাউরা (জাত: গৌর রূপ; রামচরণ)
(সংগ্রহ: রামকানাই দাশ)

www.pathagar.com

১৫. ঘাটুর গান বা বটখিলা গান:

ঘাটু গান থেকে অপেক্ষাকৃত হালকা গান (কথাও কম) যখন ঘাটুর ছুকড়া বা ছেলে নিজে অঙ্গভঙ্গি করে নেচে নিজেই গান গায় তখন বলা হয় ঘাটুর গান। এই ঘাটু ছেলে মেয়ের মতই পোশাক পরে ও নাচতে থাকে। ঘাটুর নমুনা:

একা প্রাণ হয়রে যাদু কয় জনরে বিলাইয়া দিমু।
শশা কলা কুমড়া নয়রে কেটে কেটে ভাগ বিলাব।
(রচয়িতা রসিক লাল)

১৬. শিব ঠাকুরের গান: গণ ও মাটির দ্রোহী দেবতা শিবঠাকুরের শক্তি মাহাত্ম নিয়ে রচয়িত গান বর্তমানে বিলুপ্ত।

১৭. ডরাই পুজার গান: এই গান একেবারেই বিলুপ্ত। নিশি রাতে ডরাই পূজার গান গাওয়া হত।

সনাক্তকৃত মেধা সত্ত্বের মালিক: যারা গান লিখেছেন তারা কিন্তু সাধনার অংশ হিসেবে গান করেছেন বা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের গান দিয়ে ক্যাসেট বের করা বা অনুষ্ঠান আয়োজন বা বিনোদনের মত বাণিজ্যিক ভাবে যাত্রা শুরু হয়। ফলে মূল গান রচয়িতা সম্মানী হিসেবে কিছুই পাননি। বেশির ভাগ মধ্যসত্ত্বের মালিক হলেন ক্যাসেট তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিদেশে এসব গানের বাণিজ্যিকভাবে কনসার্ট হচ্ছে। আবার সঙ্গীতের ওপর বই প্রকাশ করছেন নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। তারাও লেখককে কোন সম্মানী দিচ্ছে না, ফলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানই মধ্যস্বত্ত্বের মালিক হচ্ছে।

সুপারিশমালা:

ক. সংগ্রহ সম্পর্কিত: ১. সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংগ্রাহক সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ নিয়ে সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রাহকদের যাতায়াত, উপকরণ ক্রয় ও বেতন পর্যাপ্ত থাকবে। ২. বিভিন্ন সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ছাত্রদেরকে বাংলা ব্যবহারিক কাজ দিয়ে মাঠ থেকে লোক উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। ৩. গ্রামীণ লোক সংগঠন, সমাজদার ব্যক্তি, শিল্পী বাউল, সাধকদের সম্মানী দিয়ে তাদের জানা গান সংগ্রহ করা যায়।

৪. বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোক বিভাগ বিশেষ প্রকল্প নিতে পারে।

খ. সংরক্ষন: ১. আলাদাভাবে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে লোক সংস্কৃতি সংগ্রহশালা গঠনপূর্বক জেলা বা অঞ্চল বা বিভাগওয়ারী সেগুলো সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ লোক আর্কাইভস গঠন করা।

২. প্রতিটি পাণ্ডুলিপি বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ। যেসব মাজারে বা ব্যক্তির কাছে বংশানুক্রমিক পাণ্ডুলিপি রয়েছে সেখান থেকে ডুপিয়েট কপি নিয়ে আসা। অথবা তাদেরকে টাকা দিয়ে স্ক্যান করে নেয়া।

৩. শিল্পীদের গানের সিডি ও ক্যাসেট বের করার ব্যবস্থা নেয়া।

গ. মেধা স্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত: স্রষ্টাদের কোনো গানের ক্যাসেট, সিডি, বই-সংকলন বের হলে সেই ব্যক্তিকে বা তার উত্তরাধিকারীকে বা তার মাজার আখড়া বা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে মেধাস্বত্ব আইন মত সম্মানী প্রদান। যাদেরকে কোনভাবে পাওয়া যাবে না তাদের ক্ষেত্রে সরকারি ফোক একাডেমী গঠন করে সেই প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার জন্য সম্মানী দেয়া।

উপসংহার: এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, সিলেটে লোক সাহিত্য, সংস্কৃতির এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। যথাযথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার শেষটুকু রক্ষা পেতে পারে বলে বিশ্বাস। দ্রুত নগরায়ণ ও বিদেশমুখী প্রবণতায় সিলেটের লোক শিল্প বিপন্ন হয়ে পড়ছে; তেমনি বাড়ছে লোক সাংস্কৃতিক চেতনা বিরোধী মৌলবাদের ক্রমাগত আক্রমণ। আজ জাতীয় স্বার্থে সংস্কৃতি বিরোধী মৌলবাদী বা ধর্মীয় অপব্যাখ্যাকারীদের প্রতিরোধ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। তেমনি প্রয়োজন হারিয়ে যাওয়া লোকসম্পদ উদ্ধারের জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
প্রফেসর নন্দলাল শর্মা, উপাধ্যক্ষ এম.সি কলেজ, সিলেট
রামকানাই দাশ, করেরপাড়া, সিলেট
বিদিতলাল দাস, শেখঘাট, সিলেট
সাজেদা খাতুন, আঞ্চলিক পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ বেতার, সিলেট
শওকত আলী, (প্রাক্তন ইন্সট্রাক্টর, সিলেট পিটিআই), মল্লিকা, নির্ঝর-২১, পঃ সুবিদবাজার, সিলেট
শরদিন্দু ভট্টাচার্য, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ আব্দুল হক, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার
বাউল বিরহী কালা মিয়া, সিলেট
বশির উদ্দিন সরকার, সুনামগঞ্জ
সুবাস উদ্দিন, সুনামগঞ্জ
অপূর্ব শর্মা, দৈনিক যুগভেরী, আম্বরখানা, সিলেট
মধু খান (ওস্তাদ), বাংলাদেশ বেতার, সিলেট
সঞ্জু, সাগর দিঘীরপার, সিলেট
মুহিব আলী, ধরাধরপুর, সিলেট
কবি লাভলী চৌধুরী, লাভলী রোড, পঃ সুবিদবাজার, সিলেট
এন.সি. মাধব, ৩১/এ মেঘনা দাড়িয়াপাড়া, সিলেট
সৈয়দ মোহাম্মদ আলী (কবির), যুধিষ্টিপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
মনোজ দাশ (শিল্পী), দত্তগ্রাম (মাস্টারবাড়ী), গোয়ালাবাজার, সিলেট
নূরুল ইসলাম (শিক্ষক) গোপকানু (তিলকচানপুর), বালাগঞ্জ, সিলেট
ফয়সল আহমদ চৌধুরী (শিক্ষক) রণকেলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট
নিলুফা ইয়াছমিন ইতি কাজিটুলা, বিহঙ্গ, বনছায়া ৪৪/১.এ, সিলেট
সাবিনা ইয়াছমিন স্মৃতি, কাজিটুলা, বিহঙ্গ, বনছায়া ৪৪/১.এ, সিলেট
মো. কামাল উদ্দিন রাসেল, সমন্বয়কারী, বাউল কল্যাণ সমিতি, তালতলা, সিলেট
মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, নোয়াগাঁও, সঃ প্রাঃ বিঃ সদর, সিলেট
তাহির উদ্দিন, শ্রীধরা, বিয়ানীবাজার, সিলেট

বই/গ্রন্থপঞ্জিঃ

কামিনী সঙ্গীত (১ম খণ্ড) উমাচরণ ধর, রেঙ্গা, শ্রীহট্ট, ১৩৪৬
বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, ২য় সংস্করণ, শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২
শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত, গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬
আছদ্দর আলী, রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, সিলেট, ২০০৬
হেমাঙ্গ বিশ্বাস, গানের বহিরানা, সম্পাদনাঃ মৈনাক বিশ্বাস, কলিকাতা, ১৯৯৮
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, পূণঃপ্রকাশ, ২০০৫
হাছন রাজার তিন পুরুষ, সম্পাদনাঃ দেওয়ান শমসের রাজা চৌধুরী, ২য় সংস্করণ, ২০০৫
চৌধুরী গোলাম আকবর রচনা ও সংগ্রহসম্ভার, সম্পাদনাঃ নন্দলাল শর্মা, সিলেট, ২০০৭
বাঙলার কীর্তন ও লোক সঙ্গীত, ড. রীনা দত্ত, কলিকাতা, ১৯৯৬
শ্রীহট্টের মালসি সংগীত ও ধুরা, অনিল দাশ পুরকায়স্থ, কলিকাতা, ২০০০
সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, সিলেট, ১৯৯৬
হকিকতে সিতারা, শাহ আরকুম আলী, প্রকাশক: মো. মুহিব আলী, ধরাধরপুর, সিলেট
সিলেটের সংক্ষিপ্ত ফোকলোর পরিচিতি, মনীর উদ্দিন আহমদ, ১৯৮৬
মরমী কবি শিতালং শাহ, সম্পাদনা, নন্দলাল শর্মা, বাংলা একাডেমী, ২০০৫
সিলেটের জনপদ ও লোকমানস, নন্দলাল শর্মা, সিলেট, ২০০৬
বৈষ্ণব কবি, রাধারমণ দত্ত ও তাঁর ধামাইল গান, মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন, ২০০২
সূর্যব্রত সঙ্গীত, প্রকাশের উলেখ নেই
সুরমা পারের গান, বিদিতলাল দাস, ২০০৬
শেষ বিয়ার সানাই, গিয়াস উদ্দিন আহমদ, ২০০৫
এস্কে খোদা ও হুবেব রসুল, মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াছিন, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪
বাঁশির সুরে অঙ্গ জ্বলে, সম্পাদনাঃ নন্দলাল শর্মা, সিলেট, ২০০৭
সিলেটের বাউল সঙ্গীতে শাহজালাল ও চৈতন্যের প্রভাব, শরদিন্দু ভট্টাচার্য, ২০০৪
কালনীর ঢেউ, শাহ আব্দুল করিম, ১৯৯৯
মরমী গানে সুনামগঞ্জ, অফিসার্স ক্লাব, সুনামগঞ্জ, ২০০২
ফিরোজ আলীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি
বাউল কল্যাণ সমিতির অফিস ফাইল

www.pathagar.com

৯.৩ মণিপুরী লোকসঙ্গীত (মীতৈ)

হামোম তনুবাবু

ভূমিকা: বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরীরা এদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। তাদের আদি নিবাস যেহেতু ব্রহ্মদেশ বা বর্তমান মায়ানমার ও আসাম রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত বর্তমান মণিপুর রাজ্য, সেহেতু বাংলাদেশের মণিপুরীদের সর্ম্পকে অনুপুঙ্খ আলোচনা করতে হলে সংগত কারণে আমাদেরকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় উল্লেখ্য মণিপুর রাজ্য ও তার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি। আমরা যতটুকু জানি যে "মণিপুরী" একটি সম্প্রদায়ের পরিচায়ক শব্দ। মূলত মণিপুরী শব্দটি এসেছে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের নামানুসারে। এ রাজ্য বা প্রদেশের নাম স্বরণাতীত বা প্রাগঐতিহাসিক কাল থেকে কংলৈপাক, মীতৈ-লৈপাক, মৈত্রাবাক, মেখলী, কংলৈপুং প্রভৃতি বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট পরিচিত ছিল। আর এ দেশের অধিবাসীরা মীতৈ বা কংলৈচা নামে পরিচিত ছিল। এ দেশবাসী মীতৈরা ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেশের নাম মীতৈলৈপাক কে মণিপুর নামকরণ করা হয়। দেশের নাম পরিবর্তনের ফলে দেশবাসী মীতৈদের মণিপুরী বলে পরিচিতি ও ব্যবহার শুরু করে। মণিপুরী বা মীতৈ সম্প্রদায়ের লোকেরা তারা তাদের নিজেদের মধ্যে মীতৈ বলে ব্যবহার করেন। সুতরাং মণিপুরী বা মীতৈ শব্দ দুটি একই সম্প্রদায় বা একই ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠির পরিচায়ক শব্দ।

প্রথম বার্মা মণিপুর যুদ্ধের (১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে) সময় মণিপুরীরা প্রথম বাংলাদেশে এসে বসতি শুরু করেছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মণিপুরীরা এদেশে এসেছে। মণিপুরী ভাষায় – চহি তরেৎ খুন্তাক্পা ইংরেজীতে "Seven Years Devastation" নামে পরিচিত বার্মা মণিপুরের সংঘটিত সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের সময় (১৮১৯-১৮২৬ খ্রী:) অজস্র মণিপুরী জনগণ প্রাণ বাচাঁনোর তাগিদে মণিপুর ছেড়ে কাছাড়, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এসে বসতি স্থাপন করে।

এভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসে বসবাসকারী মণিপুরীরাই আজকের বাংলাদেশের মণিপুরীদের পূর্বপুরুষ।

অঞ্চল পরিচিত: সিলেট বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। সিলেটের আদি নাম শ্রীহট্ট। সিলেটের ইতিহাস ঐতিহ্য বৈচিত্রময় এবং প্রকৃতির লীলানিকেতন পূণ্যভূমি। সিলেট বিভাগ গঠিত হয়েছে ৪টি জেলা নিয়ে। এ ৪টি জেলা সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট সদর ও হবিগঞ্জ। উক্ত ৪টি জেলার বিভিন্ন উপজেলার, বিভিন্ন ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে মণিপুরীরা বর্তমানে বসবাস করছে। মৌলিভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা এলাকায় বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বাধিক মণিপুরীদের বসবাস। আর সিলেট সদর উপজেলার শহরাঞ্চলে মণিপুরীদের বসবাস উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলা, শ্রীমঙ্গল উপজেলা, জুরি উপজেলা, বড়লেখা উপজেলা ও হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার মণিপুরী বসতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইতিহাস: মীতৈ বা মণিপুরীদের ইতিহাস পর্যালোচনা সত্যিকার অর্থে এক বিশাল বিষয়। তদুপরি আমরা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করতে পারি। মণিপুরী ইহিহাসকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। (১) পৌরাণিক যুগ বা ৩৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব কাল, (২) প্রাচীন যুগ বা ৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক এবং (৩) বর্তমান যুগ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। ৩৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বকালকে আমরা পৌরাণিক যুগ বলে চিহ্নিত করেছি কারণ ঐ সময়কালের কোন লিখিত ইতিহাসের প্রমাণা পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ প্রাচীন যুগ ৩৩ খ্রীস্টব্দ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ৩য়

www.pathagar.com

দশক। ৩৩ খ্রীস্টাব্দে মনিপুর বা মীতৈ লৈপাক রাজত্ব করছিলেন পাখাংবা। তিনি একটি রাজকীয় ঘটনাপঞ্জী "চৈথারোল কুম্বাবা" লিপিবদ্ধ করার প্রথা চালু করেন। এ প্রথা এখনও প্রচলিত। এ ছাড়া এ প্রাচীন যুগে বা এসময়কালে আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে রাজা গরীব নিওয়াজ পামহৈবা কর্তৃক অনেক মণিপুরী গ্রন্থাদি; ধর্ম গ্রন্থ সহ পুয়া ভস্মীভুত করেন। ফলে ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্যাদি বিনষ্ট হয়েছে। এ সময়ের ইতিহাস রচনা কষ্ট সাধ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ৪র্থ দশক থেকে পরবর্তী সময়ে ইতিহাস লিখিত হয়েছে তথ্যনির্ভর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ। তাই এ যুগ মণিপুরী ইতিহাসের বর্তমান বা আধুনিক যুগ।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে প্রাচীনকালে বর্তমান মণিপুর রাজ্য বিভিন্ন জাতি ও দেশের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ পামহৈবা গরীবনেওয়াজের শাসনামলে শ্রীহট্ট থেকে আগত হিন্দু ধর্ম প্রচারক শান্তদাস গোস্বামী মহাভারতোক্ত কাহিনীর সূত্র ধরে দেশের নামকরণ করেন 'মণিপুর'। কোন জনগোষ্ঠীর কাছে এদেশটি মণিপুর বলে পরিচিতি ছিল না। আসলে বর্তমান মণিপুর রাজ্যেকে "মণিপুর" নামকরণের কথা খুব একটা প্রাচীন নয়। কেউ কেউ উক্ত "মণিপুর" রাজ্য মহাভারতোক্ত মণিপুর এবং মণিপুরীরা অর্জুনের বংশধর বলে দাবী করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্তমান মণিপুর মাহভারতোক্ত মণিপুর নয় এবং মণিপুরীরা অর্জুনের বংশধর নয়। এ কথার সত্যতা মহাভারতের শ্লোকেই প্রমাণ নিহিত। কাশীরামদাস বিরচিত এবং শ্রী সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত মহাভারতের আদি পর্বে উল্লেখ আছে।

অঙ্গ বঙ্গ মধ্যেতে তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ প্রদেশে॥

কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়
ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যত তীর্থচয়॥
সমুদ্র তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী॥

উক্ত শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অর্জুন কলিঙ্গ নগরে প্রবেশ করেছিলেন। কলিঙ্গ নগরের রাজধানী মণিপুরের নিকটেই মহেন্দ্র পর্বতের অবস্থান। অর্জুন এই মণিপুরে গিয়েছিলেন। আমরা জানি বর্তমান ভারতের উড়িষ্যায় কথিত কলিঙ্গ নগর ও মহেন্দ্র পর্বতের অবস্থান যেখান থেকে তৎকালীন মীতৈলৈপাক বা বর্তমান মণিপুর রাজ্যের দূরত্ব সহস্রাধিক কিলোমিটার।

মীতৈ বা মণিপুরীরা অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির। মণিপুরীরা কোন কালে কোন সময়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নয়। বাংলাদেশে মণিপুরীরা যে সকল জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে, সেখানে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি হয়েই অবস্থান করছে। তারা সর্বদা এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পাশাপাশি অবস্থানরত সকল জনগোষ্ঠীর সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে সহাবস্থান করছে। তারই একটি নিদর্শন হিসেবে "ভানুবিল কৃষক আন্দোলন"-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এটি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুরে ভানুবিল অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে জমিদারের ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত একটি কৃষক আন্দোলনের কথা। সহজ সরল মণিপুরী কৃষকরা জমিদার আলী আমজাদ খাঁ'র নায়েব রাসবিহারীকে কোনপ্রকার রসিদ-এর কথা না ভেবে খাজনা পরিশোধ করতেন। কিন্তু সুচতুর নায়েব জমিদার কোষাগারে টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করতেন। ফলে জমিদার বকেয়া খাজনার জন্য মামলা করেন মণিপুরী কৃষক প্রজাদের উপর। জমিদার খাজনা আদায়ের জন্য জোর করে বাড়িঘর ভেঙ্গে দিয়ে সম্পত্তি দখল করতে থাকে। কু-প্রকৃতির নায়েব রাসবিহারী দাসের মাধ্যমে মণিপুরী কৃষক প্রজাদের নীপিড়ন নির্যাতন চালায় জমিদার। তাই কৃষক

www.pathagar.com

এবং জমিদারের বিরোধ ঘটে হিংসাত্মকভাবে। বিরোধ চরম পর্যায়ে গেলে মণিপুরী কৃষকদের হাতে নিহত হন নির্যাতনকারী রাসবিহারী দাস। এ মণিপুরী কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন ভানুবিল মাঝের গাঁও নিবাসী পঞ্চানন শর্ম্মা। পঞ্চানন শর্ম্মার সাথে যে সব নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা, চাউমাচা, রমানন্দ সরদার, গীরিন্দ্র, কাসেম আলীর নাম উল্লেখ করা যায়। জমিদারের অত্যাচার যখন আরও বাড়ালো তখন আন্দোলনের ধারা আর এক পর্যায়ে, পঞ্চানন শর্ম্মার ছেলে বৈকুণ্ঠ শর্ম্মার নেতৃত্বে এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পূর্ণেন্দ সেন, নিকুঞ্জ বিহারী প্রমুখ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে আন্দোলন চরম পর্যায়ে ওঠে। এ আন্দোলন দেশের সীমানা পেরিয়ে বৃটিশ সরকারের কর্ণগোচর হলে বিলেটের হাউজ অব পার্লামেন্টে আলোচিত হয় এবং ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিন তদন্তের জন্য ভানুবিলে আসেন। তদন্ত কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মিস উইলকিনসন, ভারতীয় সদস্য কৃষ্ণমেনন এবং একজন মহিলা। আন্দোলনের একপর্যায়ে নেতৃবৃন্দ যখন আটক হয়ে কারাগারে আবদ্ধ তখন আন্দোলন প্রায় স্তিমিত হলে বৈকুণ্ঠ শর্ম্মার যুবতী কন্যা লীলাবতী দেবী (লৈহাও) আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। লীলাবতী দেবী লৈহাও সেদিন হয়ে উঠেছিলেন সংগ্রামী জনতার অবিসম্বাদিত নেত্রী, কিংবদন্তীর নায়িকা। কিংবদন্তী এ নেত্রী পরিচিতি পান মণিপুরী কৃষকের "জোয়ান অব আর্ক" নামে। শেষ পর্যন্ত জমিদার নতি স্বীকার করেছিল। মণিপুরী প্রজা কৃষকদের সকল দাবী দাওয়াই মেনে নিতে হয়েছিল শাসক শক্তিকে এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট প্রজাতন্ত্র আইন পাশের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের ফসল পেয়েছিল আইনী স্বীকৃত। এ কৃষক আন্দোলন আমরা দেখেছি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একে অন্যের সহযোগী হয়ে সংগ্রাম করেছে। মণিপুরীরা যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নয় তার স্বাক্ষী বহন করছে এ আন্দোলন।

সমাজিক: মণিপুরীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাদের সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার বিহিত ব্যবস্থাপনার জন্য আছে একটি পঞ্চায়েত কমিটি। এধরনের একটি উল্লেখযোগ্য পঞ্চায়েত কমিটির নাম হচ্ছে "ভানুগাছ মীতৈ লৈপাক ফালু"। ফালূ অর্থাৎ কমিটির প্রধান হচ্ছে নিংথৌ। নিংথৌ অর্থ রাজা। একসময় রাজা শাসিত ছিল বলে গণতান্ত্রিক প্রথা চালু হওয়ায় তারা রাজার সম্মানার্থে সমাজ পরিচালনায়

মণিপুরী নৃত্যগীত

www.pathagar.com

রাজার উত্তরাধিকারী একজনকে সমাজপ্রধান পদে নিযুক্ত করেন। তাই ফালু প্রধান 'নিংথৌ' আর ফালুর দ্বিতীয় প্রধান হলো হঞ্জবা, যাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পদবীধারী অন্যান্য সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন। ফালুর অন্যান্য পদবী হলো- কীর্তন মপু (কীর্তনাধিপতি), মাইচৌ (পন্ডিত), মোইবুং খোংবা (শঙ্খবাদক), পালাহঞ্জবা, পুংহঞ্জবা, অরাংভম, সাম্বাসা, খোংহামফম, সেবারী। মণিপুরীরা পিতৃতান্ত্রিক হলেও মেয়েরা আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। তারা অন্য বংশ বা গোত্র থেকে বিবাহ করে থাকে। মণিপুরী সমাজে ভিক্ষাবৃত্তিকে লজ্জা ও ঘৃণা করে থাকে। তাই তাদের মধ্যে কোন ভিক্ষুক নেই। মণিপুরীদের আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য হলো পরিবার পরিকল্পনায় তারা যথেষ্ট সচেতন থাকায় এ সম্প্রদায়ের জন্ম হারও খুবই ধীর। আর একটি বিষয় হলো মণিপুরীদের উপজাতি অভিহিত করায় এ সম্প্দ্রায়ের নেতৃত্বকারীরা সংক্ষুদ্ধ। তারা উপজাতি নয় বলে তাদের অভিযোগ এবং তারা সংখ্যালঘু একটি জাতিগোষ্ঠী বলে দাবী করেন।

নৃতাত্ত্বিক: নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে মণিপুরীরা মঙ্গলীয় মহাজাতির তিব্বত ব্রহ্মশাখার কুকি চীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ভাষাও সাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন। মণিপুরী ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। মণিপুরী বা মীতৈ ভাষায় লিখিত মণিপুরী সাহিত্যের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা উরা কোন্থৌবা'র কালে (৫৬৮-৬৫৮ খ্রী) ব্রোঞ্জ মুদ্রায় খোদাই করা বিভিন্ন বর্ণমালায় তার প্রমাণ। কিন্তু মণিপুরী কথ্য ভাষার বয়স অনেক প্রাচীন।

মীতৈ লোল বা মণিপুরী ভাষা শত সহস্র বছর কাল ধরে মীতৈ লৈপাক বা বর্তমান মণিপুর রাজ্যের রাজ্য ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। মণিপুরী বা মীতৈ ভাষা মণিপুর ইউনিভার্সিটি, গেহাটি ইউনিভার্সিটি, কলকাতা ইউনিভার্সিটিসহ মণিপুর, আসাম, দিল্লী ইত্যাদি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। মণিপুরী ভাষা ভারতের সংবিধানের অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্তকৃত ১৮টি ভাষার মধ্যে অন্যতম সরকারী স্বীকৃত ভাষা। বাংলাদেশে মণিপুরী ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় অর্ধ লক্ষ। ইসলামধর্মাবলম্বী মণিপুরী অর্থাৎ 'পাঙাল'দের মাতৃভাষাও এই মীতৈ লোল বা মণিপুরী ভাষা। মণিপুরী ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা বা অক্ষর আছে। তাদের বর্ণমালাকে "মীতৈ ময়েক" বলে পরিচিত। ২৭ অক্ষর বিশিষ্ট তাদের বর্ণমালা 'মীতৈ ময়েক'-এর প্রত্যেকটির নামকরণ আমাদের মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামানুসারে হয়েছে।

বংশ/গোষ্ঠি: মণিপুরী জনগোষ্ঠীকে সাতটি য়েক বা শালাইয়ে বিভক্ত। যেমন: (১) মঙাং (২) লুওয়াং (৩) খুমন (৪) অঙোম (৫) মোইরাং (৬) খা-ঙানবা ও (৭) চেংলৈ। উপরোক্ত ৭টি য়েক বা শালাই-এর প্রত্যেকটিকে আবার অনেকগুলো শাগৈ বা য়ুমনাক (গোষ্ঠী)-এ বিভক্ত করা হয়। উক্ত ৭টি য়েক বা শালাই এর অধীনস্থ প্রায় সাত শতাধিক শাগৈ রয়েছে। মণিপুরীদের বিভিন্ন শাগৈ এর মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ কৈশাম, মাইবম, লোংজম, সালাম, নিংথৌজম, থৌদাম, হামোম, তখেলম্বম, মোইরাংথেম, নিঙোম্বম, ঙাংবম, ঙাঙোম, নামৈরকপম, হৈগ্রুজম, হাওবম, শেরাম, খোইরম ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মণিপুরী ভাষাভাষী 'পাঙল' সম্প্রদ্রায়ের মধ্যেও এইভাবে বিভিন্ন শাগৈ বা য়ুম্নাক (গোষ্ঠী) রয়েছে। যেমন:- সাজবম, মোইনাম, কৈনৌ, কোন্থা, ইফম ইত্যাদি।

পেশাগত: মণিপুরীরা প্রধানত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। যদিও ধারণা করা হয়ে থাকে মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁতের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু মণিপুরী পল্লীতে প্রায় সব বাড়ীতেই তাঁত দেখা যায়। তবে কৃষিকাজ বা অন্যান্য গৃহস্থালী কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মণিপুরী তরুণী ও বৌঝিরা তাঁত বোনে। কেউ নিজেদের ব্যবহারের জন্য আর কেউ বাজারে বিক্রির জন্য শাড়ী, ওড়না গামছা, চাঁদর, ফানেক ইত্যাদি বুনন করে। যে মণিপুরীদের উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র দেশে এবং বিদেশে বর্তমানে প্রচুর চাহিদা বেড়েছে লক্ষ্য করা যায়। কৃষিকাজে মণিপুরী নারী পুরুষ এক সাথেই কাজ করে থাকে। শস্য বোনা, শস্য কাটা, মাড়াইসহ যাবতীয় কৃষিকাজেই নারী পুরুষের সহাবস্থান লক্ষণীয়। তবে কিছু কিছু কাজ শুধু মহিলারাই করে থাকে

www.pathagar.com

যেমনঃ রান্না, ঘরবাড়ী মুছা, ঘরলেপন ইত্যাদি। কৃষিকাজ ও তাঁতবুনা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী, ব্যবসা ও শিক্ষকতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মণিপুরী লোকজন রয়েছে।

ধর্মীয়ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মণিপুরীরা ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়। তবে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে মণিপুরীদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও ঐতিহাসিকদের মতে তারা "সানামাহি" বা অপোকপা ধর্মবলাম্বী ছিল।

সৃষ্টির আদিকালে মণিপুরীরা "য়াইবিরেল শিদবা" এবং অতিয়া গুরু শিদবা "Universal Lord" এর পূজা করতো। তখন থেকেই মণিপুরীদের মধ্যে সানামাহি ও পাখংবা পূজার প্রচলন হয় এবং এখন পর্যন্ত পূজিত হচ্ছে। অপোকপা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পিতৃপুরুষ বা Ancestors. অনেক ঐতিহাসিকদের মতে মণিপুরীরা শক্তিমান ও দেবসুলভ গুণের অধিকারী। তাদের পূর্ব পুরুষদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো বলে এই ধর্মের নাম হয় 'অপোকপা'। এখনও বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের গোত্রের আদিপুরুষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে থাকেন।

মণিপুরীদের প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মহারাসলীলা। প্রতি বছর কার্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে এ রাসলীলা উদযাপিত হয়। মণিপুরীরা রাসপূর্ণিমা ছাড়াও দূর্গাপূজা, স্বরস্বতীপুজা ইত্যাদি পালন করে থাকে। মণিপুরীদরে অন্যতম সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব হলো লাই-হারাওবা। লাই-হারাওবা উৎসব সাধারণত ৫/৭/১১ দিনব্যাপী হয়ে থাকে। এ উৎসব মণিপুরীদের হিন্দুধর্মে দিক্ষীত হওয়ার আগে তারা যে ধর্ম পালন করত সেই ধর্মের অন্যতম উৎসব। এ উৎসবে পৃথিবী, মানব, জীব জন্তু গাছ পালা ইত্যাদি সৃষ্টির আনন্দের বহিঃপ্রকাশ সহ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করে উদযাপন করা হয়।

বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরীদের অধিকাংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী। মণিপুরী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবই সুন্নী। সানামহী বা আপোকপা ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য অনুমানিক প্রায় ১০০ পরিবার। আর বাংলাদেশের মণিপুরীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক খৃষ্ট ধর্ম পালন করতে শুরু করেছে।

সংস্কৃতিঃ মণিপুরীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মণিপুরীরা যখন বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন তখন তারা তাদের আদি নিবাস মীতৈ লৈপাক বা মণিপুর রাজ্য থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। সঙ্গীত ও বিভিন্ন নৃত্য যেহেতু এদের ধর্মীয় জীবনের সাথে সম্পৃক্ত তাই মণিপুরী সংস্কৃতি স্বকীয়গুণে সমৃদ্ধ। আর বিচিত্র সংস্কৃতির পরিচয়বাহী নানা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসা মণিপুরী সংস্কৃতি এর নিজস্ব নিয়মেই নানা গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের মণিপুরী সংস্কৃতি।

মণিপুরীরা সাংস্কৃতিক উৎসবের জন্য সমৃদ্ধ। সাধারণত দুই ধারায় মণিপুরী সাংস্কৃতিক উৎসব পালিত হয়।

১। প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব এবং

২। হিন্দু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক চর্চা

১। প্রাচীন ধর্মীয় উৎসবঃ চৈরাওবা (মণিপুরী নববর্ষ,) লাই-হারাওবা উৎসব, য়াওশং উৎসব, পানথোইবী ইরাৎপা উৎসব ইত্যাদি। লাই হারাওবা উৎস রাস উৎসব

২। হিন্দু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক চর্চাঃ দোলযাত্রা উৎসব, রাসপূর্ণিমা উৎসব, দূর্গাপূজা উৎসব, রথযাত্রা উৎসব, স্বরস্বতী পূজা উৎসব ইত্যাদি।

নৃত্যকলার উদ্ভব কাহিনী বিচার করলে দেখা যায়, যে কোন নৃত্যকলার জন্ম সৃষ্টির উষালগ্নে জীবন এবং জীবিকার সাথে গভীর সম্পৃক্তি থেকেই। মণিপুরী নৃত্যকলাও তাই। মণিপুরী পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী মণিপুরী নৃত্যের শুরু পৃথিবী ও মানব সৃষ্টির সেই আদিকালে। পরম পুরুষ "আতিয়া গুরু শিদবা" যখন পৃথিবী ও মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন, তখন প্রথমেই তিনি সৃষ্টি করলেন ৯ জন "লাইবুংথৌ" বা দেবতা

www.pathagar.com

মণিপুরী নৃত্যগীত

এবং ৭ জন লাইনুরা বা দেবীর। সমগ্র বিশ্ব ছিল তখন জলমগ্ন। গুরু শিদবার ৯ জন লাইবুংথৌ স্বর্গ থেকে মুঠো মুঠো মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করতে থাকেন। আর ৭ জন লাইনুরা সৃষ্টির অপার আনন্দে সেই বিশাল জলরাশির উপর শুরু করলেন আনন্দময় নৃত্য এবং তালে তালে স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত মাটির ঢেলা সমতল হয়ে সৃষ্টি হলো পৃথিবীর এবিশাল ভূ-খণ্ড।

মণিপুরী ভাষায় নৃত্যের প্রতি শব্দ হলো "জগোয়"। বিশেষজ্ঞদের মতে "চৎনা চৎনা কোয়বা" বা হেঁটে হেঁটে বৃত্ত সৃষ্টি করা থেকে "চৎকোয়" যা পরিবর্তিত হয়ে এই "জগোই" শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। মণিপুরী নৃত্যের জন্য প্রস্তুতকৃত "রাসমণ্ডল" যেমন বৃত্তাকার তেমনি মণিপুরী নৃত্যের যে কোন দৈহিক গতির বৃত্ত বা অর্ধ বৃত্ত রচনা করে থাকে। এই বৃত্তাকৃতির নৃত্য ভঙ্গিমায় গোলাকার মণিপুর উপত্যকা বৃহত্তর অর্থে পৃথিবীর বা বিশ্ব সৃষ্টিরই প্রতীক।

মণিপুরী নৃত্যের অনেক প্রকার ভেদ আছে। তবে এ নৃত্য ধারাকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) লোকনৃত্য এবং (২) শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদ নৃত্য। লোক নৃত্যের পর্যায়ে পড়ে খাম্বা-থোইবী, মাইবী, লৈমা জগোই, লৈতা জগোই, লৌখাউ জগোই, লাই-হারাউবা জগোই, লৈশেম জগোই, থোইবী জগোই, থাবল চোংবী, খুবাক ঈশৈ ইত্যাদি। আবার রাসনৃত্য, গোষ্ঠ লীলা, উদূখল, মৃদঙ্গ নৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদ নৃত্যের পর্যায়ে। নৃত্যের প্রকৃতি অনুযায়ী আবার মণিপুরী নৃত্যধারাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- লাস্য নৃত্য ও তান্ডভ নৃত্য।

কাহিনী কিংবদন্তি: গুরু শিদবা কর্তৃক তার দুই পুত্র সানামহী ও পাখংবার মধ্যে উত্তরসুরি নির্বাচন নিয়ে আয়োজিত একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ আছে। এখানে বর্ণিত আছে যে, আতিয়া গুরু শিদবা একদিন মনস্থির করলেন যে, তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে যিনি যোগ্যতর তাকে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। তাই তিনি তার দুই পুত্র সানামহী ও পাখংবাকে ডেকে বললেন যে সমগ্র পৃথিবী সাতবার প্রদক্ষিণ

www.pathagar.com

করে যে আগে ফিরে আসতে পারবে সে হবে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। শক্তিমান এবং জৈষ্ঠ্য পুত্র সানামহী উৎফুল্ল চিত্তে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবী প্রদক্ষিণে। কিন্তু অনুজ পাখংবা তার নিজের শারিরিক দুর্বলতার কারণে এ প্রতিযোগিতায় পরাজয় নিশ্চিত জেনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ থেকে বিরত থেকে বিষণ্নচিত্তে ঘরের কোণে বসে রইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বিষণ্নচিত্তের কথা জেনে দুঃখিত মাতা লৈমরেল পাখংবাকে পরামর্শ দিলেন যে তার পিতার সিংহাসনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে বলো "পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়েছে। কারণ পিতাইতো পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং পিতার আসনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা মানেই পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।" মাতার পরামর্শ অনুযায়ী তাই করলেন পাখংবা। গুরু শিদবাকে জয়ী ঘোষনা করে সিংহাসনে আসীন করেন। সানামাহী ক্ষুব্ধ হয়ে পাখংবাকে হত্যা করতে চাইলে গুরু শিদবা তাকে নিবৃত্ত করে সান্তনা দেন যে পাখংবা মণিপুরের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেও সানামহি হবে সকল মণিপুরীদের রাজা এবং তার অধিস্থান হবে প্রতিটি মণিপুরী গৃহে। তদবধি প্রতিটি মণিপুরী গৃহে যুমলাই যা গৃহ দেবতা হিসেবে পূজিত হচ্ছে।

সনাক্তকৃত লোকসংগীতের তালিকা

সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি

মণিপুরী লোকসঙ্গীতের ইতিহাস ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে। বিভিন্ন মণিপুরী লোক সংগীতের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলো হচ্ছে খুনুংঈশৈ,খুলংঈশৈ, পেনা ঈশৈ, খোংজোম ঈশৈ, নাউশুম ঈশৈ প্রভৃতি।

খুনুং ঈশৈ: অতি প্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে গান হিসেবে সঙ্গীতের যে ধারা তাকেই মণিপুরী ভাষার খুনুং ঈশৈ নামে পরিচিত। মণিপুরী ভাষায় গ্রামকে খুন বলা হয়। অজ পাড়া গ্রামের গভীরে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব সঙ্গীতের জন্ম বলেই এ ধরনের সঙ্গীতকে খুনুংঈশৈ বলা হয়।

খুলং ঈশৈ: মণিপুরী সমাজে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে ক্ষেতে খামারে কাজ করা প্রচলিত। আমন ধান যখন পেকে ওঠে তখন পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও ধান কাটার কাজে মেতে ওঠে। সাধারণত মণিপুরী যুবক যুবতীরা দলবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ধানকাটার সময় যুবকেরা যুবতীদের প্রতি, যুবতীরা যুবকদের প্রতি এক ধরনের সঙ্গীতের সুরে গীত পরিবেশন করা হয়। এ ধারার সুরের সঙ্গীতকে বলা হয় খুলংঈশৈ।

খোংজোম ঈশৈ

মনিপুরের খোংজোম নদীর তীরে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে মণিপুর ও বৃটিশ বাহিনীর ভয়াবহতম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধেও শহীদদের দেশপ্রেম আর বীরত্ব গাঁথা সংগীত চারণ গায়কেরা পুংজাও (ঢোলক) বাজিয়ে পরিবেশন করেন। খোংজোম যুদ্ধ নিয়ে রচিত বলেই এ সংগীত ধারার নাম খোংজোম ঈশৈ।

নাওশুম ঈশৈ

ইহা সাধারণত শিশুদেরকে ঘুম পাড়াবার উদ্দ্যেশে শিশুকে পিঠে নিয়ে ছড়া গান পরিবেশিত হয় অত্যন্ত আদুরে এবং সুমধুর সুরে। মণিপুরী ভাষায় ঘুমপাড়ানোকে নাওশুম বলা হয়।

পেনা ঈশৈ

পেনা এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। এ বাদ্যযন্ত্র খুবই প্রাচীন। নারকেলের খোল এবং কাঠ দিয়ে তৈরী এবং ছড় দিয়ে বাজানো হয়। পেনা বাদ্যযন্ত্রটি সাধারণত মনিপুরীদের লাইহারাওবা উৎসবে ব্যবহৃত হয়। মণিপুরী লোক সংস্কৃতির সব নৃত্য সঙ্গীত যেমন লাইহারাওবা জগোই, লৈশেম জগোই, খম্বা-থোইবী জগোই, মাইবী জগোই ইত্যাদিতে পেনা বাদন হয়ে থাকে।

খাম্বা থোইবী জগোই: খাম্বা থোইবী মনিপুরীদের অত্যন্ত জনপ্রিয় লোক কাহিনী এবং খাম্বা থোইবী মহাকাব্যের নায়ক ও নায়িকার নাম। খাম্বা এবং থোইবী মোইরাং থাংজিং মন্দিরে থাংজিং দেবতার তুষ্টি সাধনের জন্য ফুল স্তবক অর্পণ করে যে নৃত্য পরিবেশন করা হয়েছিল সে নৃত্যকেই খাম্বা থোইবী জগোই নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

মাইবী জগোই: মনিপুরীদের আদি ধর্ম সানামহি বা অপোকপা ধর্মের লাই হারাওবা ধর্মীয় উৎসবে মাইবা ও মাইবীর ভূমিকা প্রাধান্য থাকে। মাইবা বা মাইবী পুরুষ ও মহিলা ধর্মজাযক বা দেবদাস- দাসীর মত। মাইবী মহিলা, তিনি তাদের ধর্মীয় বিধিনুযায়ী নৃত্যের মাধ্যমে দেব-দেবীর পুজা অর্চনায় নিবেদিত। ধর্মীয় লাই-হারাওবা উৎসবে মাইবী যে নৃত্য সাধারণত পরিবেশন করে থাকে তাই মাইবী জগোই।

থোইবী জগোই: থোইবী মোইরাং অঞ্চলের দ্বাদশ শতাব্দীর জনপ্রিয় লোককাহিনী এবং খাম্বা থোইবী মহাকাব্যের নায়িকার নাম। থোইবী নানা প্রতিকুলতার পর্যায় পেরিয়ে আনন্দঘন এক মহূর্তে দেব মন্দিরে কৃতজ্ঞ চিত্তে পুষ্পার্ঘ নিবেদনের বিনম্র প্রকাশই পরিস্ফুট হয়ে থাকে এ নৃত্যে। থোইবী বান্ধবীদের নিয়ে পরিবেশিত এ ধরনের নৃত্যকেই সাধারণত থোইবী জগোই বলে পরিচিত।

থাবল চোংবী: ফাল্গুন/চৈত্র মাসের পূর্ণিমা রাত্রে মণিপুরী সম্প্রদায়ের যুবক যুবতীরা হাতে হাত ধরে থাবল চোংবী নৃত্য রাত ব্যাপী পরিবেশন করে ইবুধৌ পাখংবা'র জন্ম তীথি উদযাপন করা হয়।

লৈশেম জগোই **পুং জগোই**

থাং-তা: থাং অর্থ তলোয়ার, আর তা অর্থ বল্লম। তলোয়ার বল্লম দিয়ে আত্মরক্ষামূলক এক ধরনের নৃত্যের ভঙ্গি যা মণিপুরী ভাষায় থাং-তা বলে পরিচিত।

সনাক্তকৃত প্রত্যেক মণিপুরী লোক সংগীতের উৎপত্তিস্থল

যেহেতু বাংলাদেশে মণিপুরীদের বসতিকাল মাত্র কয়েক শতাব্দীর তাই তাদের সনাক্তকৃত প্রতিটি লোক সংগীতের উৎপত্তিস্থল তাদের মূল বাসভুমি মণিপুর রাজ্য।

সনাক্তকৃত লোক সংগীতের পরবর্তী বিস্তৃতিস্থল বা ব্যবহার এলাকা

সনাক্তকৃত মনিপুরী লোক সংগীতের পরবর্তী বিস্তৃতিস্থল উপমহাদেশের মণিপুরী বসতি দেশ সমূহ অর্থাৎ আসাম, ত্রিপুরা ও মনিপুর রাজ্যে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন মণিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চল।

সনাক্তকৃত মণিপুরী শিল্পীদের তালিকা

হামোম ইবুঙোমাচা, হামোম অজিৎ, কলাবতী দেবী, মাইবম নিঙোল খাম্বী দেবী, খোইরোম নিঙোল কুঞ্জে, কৈশাম নির্মলা, অঞ্জতা, থোঙাম রীতা, য়েনশম্বম উষারাণী, হামোম চনু মেমচা, হামোম প্রবিতা, সোরেনশাম্বম নিতু, মালেম পিংকিচনু, সুবর্ণা চনু, মিনি চনু, সাধনী চনু, স্বপ্না, সারদা, রমনী, রুমানা চনু, শান্তনা, শানারৈ,চন্দ্রা (কলা), মাধবী দেবী প্রভৃতি।

সনাক্তকৃত মণিপুরী একক সংগীতের তালিকা

লৈমা জগোই, খোংজোম, খুবাক ঈশৈ, ওয়ারী লীবা এবং পেনা ঈশৈ।

সনাক্তকৃত মণিপুরী লোক বাদ্যযন্ত্রের তালিকা

১। পেনা ২। পুংজাউ ৩। মাংগং ৪। শেল ৫। মোইবুং ৬। মন্দিলা ৭। পুং ৮। শেমবুং।

সনাক্তকৃত মণিপুরী লোকসঙ্গীতের বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

১। খাম্বা-থোইবী জগোই ২। লৈশেম জগোই ৩। লৈমা জগোই ৪। লৌখাও জগোই ৫। মরি থোকপি ৬। খুবাক ঈশৈ ৭। থাং-তা জগোই।

এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান মণিপুরী লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬):

ক্রমিক নং	লোকসঙ্গীত	উৎপাদন ব্যয়	আয়	বাৎসরিক প্রদর্শন	বাৎসরিক মোট আয়	মন্তব্য
০১	লোকনৃত্য ও থাং-তা	২৫,০০০/-	৩৫,০০০/-	১২	৪,২০,০০০/-	

www.pathagar.com

সনাক্তকৃত মণিপুরী বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

১। পেনা ২। খোংজোম ৩। খুবাক ঈশৈ।

সনাক্তকৃত মণিপুরী লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা

১। খুলং ঈশৈ।

সনাক্তকৃত মণিপুরী সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক:

মণিপুরী সমাজের সনাক্তকৃত মেধাস্বত্বের মালিক বলতে যারা (১) এ সকল সঙ্গীত নৃত্য যারা চর্চা করছেন (২) যে সব প্রতিষ্ঠান লোক সঙ্গীতের মেধাস্বত্ব নিয়ে নিবেদিত ভাবে কাজ করছেন এবং (৩) মণিপুরী সমাজের জনগণ।

সুপারিশ মালা:

ক. **সংগ্রহ সম্পর্কিত:** মণিপুরী বসতি এলাকা সমূহে বিপন্ন সঙ্গীতগুলো পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সাংগঠনিকভাবে অথবা ব্যাক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্য দান।

খ. **সংরক্ষণ সম্পর্কিত:** বিভিন্ন ধরনের মণিপুরী লোকসঙ্গীত প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা অতিব প্রয়োজন। "চাউবা মেমোরিয়্যাল মণিপুরী ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মিউজিয়াম" ২০০৬ সালে ভিত্তি প্রস্তর করে ২০০৭ সালে শুভ উদ্বোধন হয়েছে। এ মিউজিয়াম মণিপুরী লোকসঙ্গীত সংরক্ষণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সচেষ্ট রয়েছে।

গ. **উপস্থাপন সম্পর্কিত:** মণিপুরীদের সকল লোকসঙ্গীতের ধারা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে কোন লোকসঙ্গীত কখন কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে, গবেষণার মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশনা করা আবশ্যক।

উপসংহার: মণিপুরী লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রয়োজন মণিপুরী লোকসঙ্গীত কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মণিপুরী জনগণকে লোকসঙ্গীত চর্চায় আগ্রহ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষিত হলে মণিপুরী সমাজ তথা দেশের লোকসঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি লাভে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র:

এ.কে শেরাম/ বাংলাদেশের মণিপুরী ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে- ১৯৯৬।
Manipur Past & Present. Volume- 2: Editor: Naorem Sanajaoba. 1991.
কৈলাশ চন্দ্র সিংহ/ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ২য়, ৩য় খন্ড- ১৮৯৭।
Dr. G.A. Grierson: Linguistic Survey of India. Vol (III) Part- (III) 1904.
Prof . Jyotirmoy Roy; History of Manipur Imphal- 1973.
রাজকুমার সানাহাল/মণিপুরের ইতিহাস।
শ্রী কাশীরাম দাস/মহাভারত; শ্রী সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। আদিপর্ব/ পৃ: ১৯৯।
প্রো: কাংজীয়া গোপাল/অদুঙৈগী কংলৈপাক মণিপুর নত্তে।
T.C. Hodson/The Meitheis/London- 1908.
গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়/ ভারতের নৃত্যকলা/১৯৮৯।
W. Ibohal Singha/The History of Manipur/Imphal- 1986.
সত্যেন সেন/গ্রামবাংলার পথে পথে; সত্যেন সেন রচনা সমগ্র- ১৯৮৭.

www.pathagar.com

৯.৪ মণিপুরী লোকসঙ্গীত (বিষ্ণুপ্রিয়া)

শুভাশিস সিনহা

মণিপুরী জাতিসত্তার আদি ভূমি ভারতের মণিপুর। মণিপুর একটি নৈসর্গিক শোভাঋদ্ধ রাজ্য। মণিপুরের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাষার মানুষ এসে বসতি গড়েছে। ভৌগোলিকভাবে তারা সবাই মণিপুরী পরিচয় লাভ করলেও সাংস্কৃতিকভাবে একটি একক মণিপুরী জাতিসত্তা হিসেবে বিকশিত হয়েছে কেবল মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রিয়ারা। ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক, আচারকৃত্য, ঘরবসতি, উৎপাদনরীতি সবকিছু নিয়ে এ দুই নৃতাত্ত্বিক সত্তা তাদের ভিন্ন দুই ভাষা নিয়েই মণিপুরী হিসেবে ঐক্য গড়ে তুলেছে।

ভাষার ভিন্নতাই যে জাতিগত ঐক্যের বাধা নয়, তার প্রধান উদাহরণ সম্ভবত মণিপুরীরা। সেখানে ইতিহাসের নানা বাঁক, ঘাত-প্রত্যাঘাত রয়েছে, ধর্মভাবনায় প্রতিবিপ্লবের ধারা চলেছে, আগন্তুক বৈষ্ণবধর্মের বিপরীতে রিভাইভেলিস্টদের আদি প্রাকৃত ধর্ম নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা আছে। কিন্তু সত্য যে, মণিপুরী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা তার যে বিশাল লীলা, পালা, নৃত্য, বাদ্য, গীতিকাব্য, রস নিয়ে বিশ্বমাঝারে অভিপ্রকাশিত, প্রতিষ্ঠিত, তার দার্শনিক ভিত্তি বৈষ্ণববিজম। তবে এ বৈষ্ণববিজম মণিপুরের মাটিতে মণিপুরী চিন্তক ও সাধারণ্যের কৃত্য-আচার চর্চার নিজস্বতার মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। সেটার রূপ-কাঠামো এখন অন্যরকম, নতুন, বিনির্মিত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে মণিপুর একটি সংঘাতময় রাজ্যে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনেক মণিপুরী রাজনৈতিক নানা কোন্দলে জর্জরিত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নেয় ভারতেরই আসাম-ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে, মিয়ানমারে এবং বাংলাদেশে। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্মিবাহিনীর আক্রমণে দ্বিতীয় দফায় মণিপুরীরা, বিশেস করে মোইরাং গোত্রের লোকজন মণিপুর ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটে এসে তারা পাহাড় জঙ্গল কেটে আবাদ করে নিজেদের বসতি নিশ্চিত করে এবং নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু মণিপুরীরা এখানেও শান্তিতে থাকতে পারে না, ক্রমশ শিকার হতে থাকে নিষ্ঠুর শোষকবর্গের, চিনে নেয় শত্রুর মূল মুখ। ভানুবিলের মণিপুরী কৃষকরা বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ মদদপুষ্ট জমিদার ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে, রক্তের মধ্য দিয়ে অর্জন করে ঐতিহাসিক ভূমিস্বত্ব। পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মণিপুরীরা সক্রিয় ও সশস্ত্র অংশগ্রহণ করে। প্রাণ দেয় বীর মুক্তিযোদ্ধা গিরীন্দ্র সিংহ।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা

বাংলাদেশের মণিপুরী জাতিসত্তা ভাষার দিক দিয়ে দুভাগে অন্তর্বিভক্ত। মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রিয়া। মেইতেই মণিপুরী ভাষা তিব্বতী-বর্মি শাখার ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুর ভাষা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ড. কালী প্রসাদ সিংহ প্রমুখ গবেষক এ ভাষাকে মাগধী-প্রাকৃত ভাষার সীমানায় নিদিষ্ট করেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় লিঙ্গ আর বচনভেদে ক্রিয়াপদেরও হেরফের হয়। যেমন:

লিঙ্গভেদে ভিন্নতা

থৈবা যাচ্ছে। [থৈবা যারগা]

থৈবী যাচ্ছে। [থৈবী যেইরিগা]

বচনভেদে ভিন্নতা

আমি যাচ্ছি। [মি যাউরিগা]

আমরা যাচ্ছি। [আমি যারাংগা]

www.pathagar.com

নঞর্থকতা তৈরিতে সাধারণত ক্রিয়াপদের আগে না বসে।
যেমন: আমি যাব না। [মি না যিমগা]

উচ্চারণের শুদ্ধতায় বলতে গেলে এ ভাষায় শ্বাসাঘাতের ধ্বনি নেই। মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার নেই বললেই চলে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা তার সমাজের নানা অনুষঙ্গের সাথে মিলে মুখোমুখি হয়েছে প্রবল আঘাত ও নিপীড়নের। গত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে অন্তিম পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ ভাষাটি ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। হাজারো ছাত্র-তরুণের কারাবরণ ও ভাষাবীরাঙ্গনা সুদেষ্ণা সিংহের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে ভাষাটি আসাম ও ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

ধর্ম: মণিপুরীরা প্রধানত বৈষ্ণব ধর্মানুসারী। এদের মধ্যে অনেকেই আছে প্রাচীন 'আপোকপা'-পন্থী (আদিধর্ম), যারা রাজা গরীব নওয়াজের আমলে শান্তদাস গোস্বামী প্রচারিত রামান্দী বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেনি। তবে মেইতেইদের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও বিষ্ণুপ্রিয়ারা সকলেই ধর্মত-বৈষ্ণব। লোকপুরাণ বলে, একদা বিষ্ণুভক্তরা মণিপুরের বিশেষ অঞ্চলে একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রতিস্থাপন করে, তারপর থেকে জায়গাটি 'বিষ্ণুপুর' হিসেবে আখ্যায়িত হয়। কথিত যে, বিষ্ণুপুরের অধিবাসীরাই 'বিষ্ণুপুরিয়া' এবং পরবর্তীকালে শাব্দিক বির্তনে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' বলে পরিচিতি লাভ করে। তবে ভিন্ন মতাবলম্বীরা স্থানিক সঙ্গতির বিপরীতে বিষ্ণুভক্ত অর্থে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পরিচয়ের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে থাকেন। মণিপুরীদের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ বা মতাদর্শ স্পষ্ট না হলেও ১৮শ অষ্টাদশ শুরুতে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। আদিধর্ম 'আপোকপা', বৈষ্ণবধর্ম ও হিন্দু সনাতন ধর্মের সমন্বিত ত্রিমাত্রিক রূপ দৃশ্যমান হয়। মণ্ডপভিত্তিক ধর্মীয় কৃত্যাদি হয়ে থাকে। প্রতি গ্রামে একাধিক মণ্ডপ থাকে, প্রতিটি মণ্ডপে একজন পুরোহিত থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে নামকীর্তন ও যাগ-যজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ।

মণিপুরী মৃদঙ্গ বাদন

www.pathagar.com

সমাজ ও শ্রেণী ব্যবস্থা: বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের আগে অন্যান্য হিন্দুর মতো মণিপুরীদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-চার বর্ণের বিভাজন ছিল বলে খানিকটা তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তা সংকুচিত হয়ে কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অ-ব্রাহ্মণেরা সকলেই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হয়। তাদের মধ্যে ছিল কৃষিজীবী, কামার, স্বর্ণকার এবং আরও অন্যান্য। তাঁতিদের সংখ্যা কম নয়। তবে শ্রেণীভেদ মণিপুরীদের মধ্যে বর্তমানে নেই বললেই চলে। বর্ণপ্রথার কোনো প্রভাব এখন এ সংস্কৃতিতে ও সামাজিক সম্পর্কায়নে অনুপস্থিত। সমাজ ব্যবস্থায় পর্ব-পার্বণে, খাদ্যাচারে, আত্মীয়তার সেক্যুলারিটি লক্ষ করার মতো।

বিভিন্ন গোত্রের ভাগ আছে। যেমন- ক্ষুমল, কাশ্যপ, আঙ্গেস্য, মধুকল্য ইত্যাদি। তবে সেগুলো বৈবাহিক বিধিনিষেধের গণ্ডী ছাড়া মেলামমা ও অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণের জন্য কোন স্তরে প্রভাববিস্তারী নয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোকসঙ্গীত: মণিপুরীদের নৃত্য ও গান সবই শাস্ত্রী ঘরানার। কঠিন সাধনা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রীয় রীতিতে এসব চর্চা করতে হয়। মণিপুরী গান বা সঙ্গীত বৈষ্ণব পদকর্তাদের বিভিন্ন পদ থেকে অধিকাংশ সংগৃহীত এবং তার গায়কী শাস্ত্রীয় ঘরানার হলেও, তাতে সংশ্লেষ করা হয়েছে মণিপুরী জনজীবনের আদি বা প্রাকৃত সুর। শাত্রীয় চেহারা নিয়েও তার গায়কীতে প্রায়শ মিশে থাকে লোকসঙ্গীতের স্বাধীন সঞ্চরণ ও কণ্ঠ প্রক্ষেপণ। সেটা এক অর্থে লোকসঙ্গীতই হয়ে যায়। নগর যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে সব শিল্পকলাই প্রাণের দিক দিয়ে লৌকিক হতে বাধ্য।

এখানে মণিপুরী লোকসঙ্গীত ও তার সংশ্লিষ্ট কিছু আঙ্গিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো:

বরন ডাহানির এলা বা বৃষ্টি ডাকার গান: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের এক প্রাচীন বিশ্বাস - খরার সময় দল বেঁধে এ গানটি করলে দেবতা সরালের বৃষ্টি ঝরিয়ে দেন। মণিপুরের খুমোল বংশের রাজা মৈরাং বংশীয় রাজার

মণিপুরী নৃত্যগীত

www.pathagar.com

কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েও আরেকবার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তাব রাখলে খুমোল রাজার ছোট ভাই চমেই তাতে আপত্তি জানায়। তখন খুমোল-রাজা রাগান্বিত হয়ে তাকে সভার মাঝখান থেকে পদাঘাত দিয়ে বের করে দেন। দুঃখে অপমানে চমেই রাজ্য ছেড়ে বের হয়ে যায়। চমেই এভাবে চলে যাচ্ছে দেখে বেটি [চাকরানী] তার সাথে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। অনেক দূর গিয়ে চমেই যখন বেটিকে দেখতে পেল, তখন সেই নির্জন জায়গায় তাকে আর ফিরিয়ে দিতে না পেরে সাথে করেই নিয়ে গেল। এক সময় বেটির গর্ভে চমেইর এক সন্তান জন্ম নিল। এভাবে কেটে গেল তিনটি বছর। এ তিন বছরে খুমোল রাজ্যে বৃষ্টিবাদল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, চারদিক নেমে এল দুর্ভিক্ষ। জ্যোতিষীরা বললেন, চমেইর অপমানে দেবতা পাহাংপা ক্রোধান্বিত হয়ে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন। চমেই ও বেটিকে সন্তুষ্ট করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারলে আবার বৃষ্টি হবে। জ্যোতিষীর কথা শুনে প্রজারা গিয়ে চমেই ও বেটিকে সন্তুষ্ট করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনল। পাহাংপা খুব খুশী হলেন। শুরু হলো ঝুমঝুম বৃষ্টি। সবাই ক্ষেতের কাজে নেমে পড়ল আর অনেকে লুসু নিয়ে মাছ ধরতেও শুরু করল।

নিঃসন্দেহে যে, মণিপুরীদের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের আগে এ গানটি প্রচলিত হয়েছে।

গানের কিছু অংশের বাংলা-অনুবাদ

ওহে সরালেল দেবতার রাজা, খুমোলের মাটি আজ
খরায় শুকিয়ে ফেট ফেটে যায়, এ কী ভয়ানক সাজ!
খইমু যে তাই ঘাসে আর নানা জিনিষে মিলিয়ে
তৈয়ার করছে বাঁধ
ওহে দেবরাজ খা খা করে আজ খুমোলের ভূমি
দাও বৃষ্টিপ্রপাত।

মাদই-সরালের এলা বা মাদই-সরালেলের গান: অলকগো পাড়ার একটি মেয়ে ও সরালেল [সূত্রমতে, মণিপুরীদের আদিদেব পাহাংপার অধীনে বৃষ্টির দেবতা]-এই দুজনের বিয়ে এবং গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে লোকগীতিটি প্রচলিত হয়েছে। গানটি সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে অনুপ্রবেশের সময়কার রচনা। কারণ, গানটিতে মদ্যপন আর শুয়োরের মাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে মদ-মাংস সম্বন্ধীয় এ ধরনের রচনা অসম্ভব। তবে মদ-মাংস যে মণিপুরী সমাজে ঘৃণ্য বস্তু হয়ে দেখা দিতে শুরু করল, তার নিদর্শনও গানটিতে আছে। সেজন্য দেখা যায়, মদ-মাংস খেয়ে ফেলবে এই সন্দেহে সরালেল মাদইকে বাপের বাড়িতে যেতে দেয়নি।

গানের কিছু অংশের অনুবাদ:

মাদই গিদেই যাত্রা করল
আহা
পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে গেল
আহা
দু'হাত তুলে দেখো রে তার
আহা

যত্নে সবাই বিদায় দিল
গেল কত দূরে
কউ তো নাহি দেখতে পেল
গেল কত দূরে
মা মা বলে কী চিৎকার
দূরেই চলে গেল!

সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত-যুক্ত শিল্পআঙ্গিক

হোলী: ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এ উৎসব হয়। বৈষ্ণব মতানুসারী চৈতন্যের জন্মতিথি বলে একে 'গৌরপূর্ণিমা' ও বলে থাকে। এ দিন সকলে উপবাস করে ব্রত পালন করে এবং সন্ধ্যায় নানা দাহ্যোপকরণ দিয়ে তৈরী 'জঞ্জাল'-রূপকের একটি ঝুপড়িতে অগ্নি সংযোগে 'অশুভবিনাশ' করে বেরিয়ে পড়ে ঝুঠি হাতে। গ্রামে গ্রামে ৫ দিন চলে বৈষ্ণব অনুসরণে ভিক্ষাবৃত্তি এবং সংকীর্তন। এখানে লোকগানের সাথে লোকগানের সাথে নৃত্যভঙ্গিমা থাকে। যেমন একটি গানের স্থায়ীটা এরকম: খেলব খেলব শ্যাম তোমার সনে/একেলা পাইয়াছি রে শ্যাম এ নিঠুর বনে... একেলা পাইয়াছি হেথা, পলাইয়া যাবে কোথা/ছাড়িয়া না দিব নাগর এ নিধুবনে...

www.pathagar.com

রাসলীলা: রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এক নৃত্যগীতাভিনয় অনুষ্ঠান হচ্ছে রাসলীলা। 'রাস' শব্দটি 'রস' শব্দের বিবর্তিত রূপ বলে অনুমান করা হয়। মণিপুরীদের প্রথম রাসলীলা বা রাসলীলানুসরণ অনুষ্ঠান হয় মণিপুরে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহের আয়োজনে। মৈথিলী ও ব্রজবুলি ভাষার বিভিন্ন পদের মণিপুরী সঙ্গীতের নিজস্ব গায়কী ও মুদ্রা-পদবিক্ষেপে জটিল এই গীতিনৃত্যধারা মণিপুরীদের সর্বপ্রধান আঙ্গিক। রাসলীলায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদের সাথে মণিপুরী পালাকারদের রচিত গানও যুক্ত হয়। শাস্ত্রীয় হলেও দীর্ঘকালের লোকজৈবনিক চর্চার কারণে রাসলীলার অনেক গানের সুরে-গায়কীতে চলে এসেছে লোকসঙ্গীতের নানা ঢঙ।

রাখালরাস/গোপরাস/রাখুয়াল: এই রাস পুরুষদের। শ্রীকৃষ্ণ, সখা বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকদের গোষ্ঠে গরু চরাতে গিয়ে সম্মুখীন নানা ঘটনার চিত্র এই রাসে রূপায়িত হয়। কৃষ্ণের নানা অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার স্বরূপ ফুটে ওঠে এর কাহিনীতে। মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যের বৈষ্ণব ভক্তিভাবাপন্ন নরম কোমল ভাবের বিপরীতে এখানে তাণ্ডব ধারার নৃত্যই প্রধান। লোকনাট্য ও লোকনৃত্যের নানা বৈশিষ্ট্য অধুনা সংযোজিত হয়, তার সাথে থাকে লোকজ গানের ব্যবহার।

লাইহারাওবা: 'লাই' শব্দের অর্থ 'দেবতা', 'হারাওবা' অর্থ আনন্দদান। এ পূজার উদ্দেশ্য দেবতাকে তুষ্ট করা। মণিপুরের সর্বপ্রাচীন এই নৃত্য (উৎসবও) এখনও কদাচিৎ মণিপুরীদের মাঝে দেখা যায়। নারী ও পুরুষ দু'সারিতে ভাগ হয়ে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে নৃত্যের শুরু করে। হস্তমুদ্রা, বাঁশের দণ্ড দিয়ে বিশেষ যাদু, বলখেলা ইত্যাদি ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নৃত্য ধারা সম্পন্ন হয়। আদিম উল্লাস ও হর্ষধ্বনি, অঙ্গ-ভঙ্গি এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। নেপথ্যে লোকসঙ্গীতের নিজস্ব প্রয়োগ থাকে।

'খুবাকঈশৈ' বা 'খুবাকুশি': 'খুবাক' অর্থ করতালি আর 'ঈশৈ' মানে নৃত্য। করতালি সহযোগে নৃত্যগীতের আসরকে 'খুবাক ঈশে' বলে। রথযাত্রার দিন থেকে হরিশয়ন তিথি পর্যন্ত এই আসর হয়। 'গীতগোবিন্দ' থেকে গান গাওয়া হয় এই গীতিনৃত্যে। বৃত্তাকারে মেয়েরা বিশেষ পদক্ষেপের সাথে 'খুবাকুশি' পরিবেশন করে। এর মাধ্যমে পাপখণ্ডন হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

নুপীপালা: মহিলাদের এক ধরনের পটপালাকে নুপীপালা বলা হয়। নুপী শব্দের অর্থ মহিলা। এতে রাধা-কৃষ্ণের নানা প্রণয়লীলা ও নৌকাবিলাস লীলাগীত হয়। মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাদ্যে হিসেবে বাজানো হয়।

ধ্রুমেল: নটপালার অন্তর্ভুক্ত। তবে আলাদাভাবেও হয়। মৃদঙ্গ বাদনের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। জোড়সংখ্যক বাদক হতে হয়। ধ্রুমেলের মধ্য দিয়ে উদ্দিষ্ট দেবতাকে আবাহন করা হয়।

জাতীয় লোকসঙ্গীত উৎসবের পরিবেশনা

১. পুং চোলম: পুং অর্থ মুদঙ্গ। পুংচোলম মানে মৃদঙ্গের চলন বা তালভঙ্গি। বিভিন্ন তালের উপর এ বাদ্য বাজে। তবে এখানে মূলত থাকবে একতাল। এছাড়াও অন্যান্য তালের মিশ্রণ থাকবে। নটপালা বা নটমংকীর্তন পালায় ইশালপা বা গায়েন ও দোহারদের গানের ফাঁকে ফাঁকে এ তালের বাদন হয়।

পরিবেশনা: বিধান চন্দ্র সিংহ ও নীলমণি সিংহ।

২. বৃন্দানর্তন: রাসনৃত্যের একটি অংশ। রাসলীলায় রাগালাপের পরে কৃষ্ণ অনুরাগিণী বৃন্দাদেবী নেপথ্য গানের সাথে নৃত্যের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ-রাধার লীলাবিলাসের জন্য বৃন্দাবন সজ্জিত করে।

নেপথ্য গান:

আমি কৃষ্ণের প্রেমে কাঙ্গালিনী
বৃন্দাবনে বৃন্দাদুর্ভাগিনী...
এ সুখনিশীথে যমুনা পুলিনে
শ্রীরাসমণ্ডলে
যুগল চরণ সেবা করিব
যুগল রূপ নেহারিব

www.pathagar.com

জীবন সফল করিব...
জনমে জনমে জীবনে মরণে
তনু মন-প্রাণ সঁপিনু চরণে
অন্তে দিও নাথ ঐ রাঙা চরণ
এ দাসিনী ভিক্ষা মাগি শ্রীচরণ।।

৩. গোপীনৃত্যঃ (এটিও রাসলীলার অংশ। রাধার সখিরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমভাব নিয়ে এ গীতিনর্তন করে।

পরিবেশনাঃ জ্যোতি সিংহা, শুক্লা সিনহা ও শর্মিলা সিনহা।

নেপথ্য গানঃ

রুনুঝুনু রুনুঝুনু রুনুঝুনু বাজত
কঙ্কন কিঙ্কিনী বাদ
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি তা তা থৈ তা তা থৈ
থমকি থমকি চললিনী-
তালিনী তালিনী সুললিত তাল
সখিগণ দেওত তালি...
পদের চলনী হস্তের কঙ্কন
সোনার নূপুর মণি-অলঙ্কৃত
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেমতরঙ্গিনী
খঞ্জন গতি জিনি চললি নিকুঞ্জে...
মকরণ লোভে মধুপ আসি
মাধবী মালতী পুঞ্জে ভুঙ্গে
অলিরাজ মত্ত হয়ে
গুনগুন গুনগুন গুনগুন স্বরে
তা দেখিয়া বিনোদিনী ভয় পাইয়া মন
আপনি অঞ্চলে ঢাকে
অলিরাজ মত্ত হয়ে
গুনগুন গুনগুন গুনগুন স্বরে...

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ১

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রকল্প
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
বিভাগ/জেলা ভিত্তিক লোকসঙ্গীত সংগ্রহের ছক

১. ভূমিকা

২. জেলা/বিভাগ পরিচিতি (ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক, জনসংখ্যাগত, বংশ/গোষ্ঠীগত, পেশাগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কাহিনী-কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য)।

৩. সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা (সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচিতি)

৪. সনাক্তকৃত প্রতিটি লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল

৫. সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতি-স্থল বা ব্যবহার এলাকা

৬. সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা (যেক্ষেত্রে একক স্রষ্টা আছেন)

৭. সনাক্তকৃত শিল্পীদের তালিকা

৮. সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত দলের তালিকা

৯. সনাক্তকৃত সামষ্টিক (দলীয়) সঙ্গীতের তালিকা

১০. সনাক্তকৃত একক সঙ্গীতের তালিকা

১১. সনাক্তকৃত লোকবাদ্য যন্ত্রের তালিকা

১২. সনাক্তকৃত বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা

১৩. এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬)

১৪. সনাক্তকৃত বিপন্ন সঙ্গীতের তালিকা

১৫. সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা

১৬. সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা

১৭. সুপারিশমালা:
   (ক) সংগ্রহ সম্পর্কিত
   (খ) সংরক্ষণ সম্পর্কিত
   (গ) উপস্থাপন সম্পর্কিত
   (ঘ) মেধাস্বত্ব প্রদান সম্পর্কিত

১৮. অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে)

১৯. উপসংহার

২০. যথাসম্ভব ছবি/আলোকচিত্র যুক্ত করুন।

২১. তথ্যসূত্র: ব্যক্তি/গ্রন্থ ইত্যাদি

বিশেষ নির্দেশনা: উপরোক্ত প্রতিবেদন ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

মুহম্মদ নূরুল হুদা
আহ্বায়ক
লোকসঙ্গীত সম্মেলন ২০০৮

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ২

বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮
উদ্বোধন ও সেমিনার প্রতিবেদন
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
২৭.২.২০০৮ বুধবারঃ উদ্বোধন

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব মিলনায়তনে ও প্রাঙ্গণে ২৭ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর আয়োজন করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর উদ্বোধন করেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দেশের প্রবীণতম লোকসাহিত্য গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাহফুজা খানম। সভাপতিত্ব করেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর প্রধান সমন্বয়কারী কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক মাহফুজা খানম বলেন, বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর তিনদিনব্যাপী এই কর্মশালায় তৃণমূলীয় গবেষকরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার গবেষণাপত্র ও আগত লোকশিল্পীরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, লোকসঙ্গীত বাংলার আবহমান সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। এটি তৃণমূলীয় স্তরে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সৃষ্টিশীলতার মূর্ত ও বিমূর্ত প্রতীকায়ন। বাংলার বিচিত্র লোকসঙ্গীত যথা ভাটিয়ালি, বাউল গান, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, ধামাইল, হঁঅলা, আলকাপ, গম্ভীরা ইত্যাদি কী পর্যায়ে রয়েছে তা সনাক্ত করা, বিপন্ন ও বিলুপ্ত অভিব্যক্তি পুনরুদ্ধার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই গান বিনোদনবিহীন নয়। এর মধ্যে বিনোদন সরাসরি যুক্ত রয়েছে। তবে সব ছাপিয়ে লোকসঙ্গীতের দলিলীকরণই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

তিনি আরো জানান, বিভিন্ন জেলার প্রায় ৪০০ জন লোকশিল্পী ও লোক গবেষককে আমরা পেয়েছি। আমরা তৃণমূলীয় মাঠ জরিপের মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছি তা এখানে উপস্থাপন করা হবে।

জরিপকৃত অঞ্চলগুলো হলো ঢাকা (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা বাদে ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলা), ময়মনসিংহ (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা), রংপুর (বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা), রাজশাহী (বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা বাদে বিভাগের অন্যান্য জেলা), খুলনা (বিভাগের সব জেলা), বরিশাল (বিভাগের সব জেলা), সিলেট (বিভাগের সব জেলা), চট্টগ্রাম (বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা), কুমিল্লা (বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলা), আদিবাসী অঞ্চল ১ (বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম), আদিবাসী অঞ্চল ২ (পা.চ.-এর বাইরে)। তিনি বলেন, যশোর অঞ্চল থেকে পটগান, হালুই গান হারিয়ে গেছে। তা খুঁজে বের করতে হবে। কুষ্টিয়ার বাউল সঙ্গীত বিশেষ অঞ্চলে উৎপণ্ন হলেও তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাউল সঙ্গীতের মতো লোকসঙ্গীতের অনেক অভিব্যক্তিই বিশেষ এলাকায় সৃষ্টি হয়ে অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত হওয়ার পরিবর্তে বরং লুপ্ত হয়ে গেছে। এই গানগুলো কোন সমাজের, কারা গাইতেন, এর রচয়িতা কে, সুরকার কে, মালিক কে

www.pathagar.com

ইত্যাদি নির্ণয় করে সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এর মালিক সমাজ, রাষ্ট্র না ব্যক্তি তা নির্ণয় করার পাশাপাশি উৎপত্তি স্থল ও বিস্তৃতি-স্থল সনাক্ত করাও অতি জরুরি।

প্রধান অতিথি ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, উত্তরবঙ্গ, রংপুর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকায় যেসব লোকসঙ্গীত ছিল, কিন্তু হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে, তা শনাক্ত করতে হবে। আমরা ১০২ রকমের লোকসঙ্গীত খুঁজে পেয়েছি। কবি জসীমউদ্দীন বাংলার লোকগীতি নিয়ে বহু গান, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

সাধারণ মানুষের কবি লালনের গানের কথাই যদি ধরি, সেখানেও দেখতে পাই, তিনি তাঁর গানে মানবতার কথা বলেছেন। তাঁর গানের ভেতর দিয়ে বিশ্বমানবতার কথা বেরিয়ে এসেছে। দর্শনবিদরা যা বলেন, চিন্তা করেন, মতবাদ দেন, লালনের গানে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যা মুখে মুখে প্রচারিত হয় তাই লোকসাহিত্য। আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ। গুরুসদয় দত্তের বাড়ি ছিল সিলেটে। দীনেশ চন্দ্র সেনের বাড়ি ছিল মানিকগঞ্জ। কিন্তু তাঁরা অন্য জেলার লোকসঙ্গীত নিয়েও কাজ করেছেন।

আঞ্চলিক গানকে রিজিওনাল সং বলি। উৎসবের গানকে বলি ফাংকশনাল সং। দুটিই লোকসঙ্গীত। উৎসব গান বলতে সাধারণত ধান কাটা, পাট কাটার গানকে বলতে পারি। নৌকা তোলার গান, প্রেমসঙ্গীত, বারোমাসী গান, স্বামী বৈদেশে কাজ করতে গেছে তার বিরহে স্ত্রীর গান, হাছন রাজা, লালন ফকিরের গান ইত্যাদির ভেতর আমি লোকসঙ্গীতের ভেতরের ইতিহাসও খুঁজে পাই।

'মহুয়া' পালা গান বিশ্বখ্যাতি পেয়েছে। 'জলভর সুন্দরি কইন্যা'এই গানের আবেদন সবসময় রয়েছে। বাংলার মাটিও গান গায়।

অতঃপর তিনি তিনদিনব্যাপী উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রধান অতিথি ড. আশরাফ সিদ্দিকীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আজ বাংলাদেশে কাউকে যদি জীবন্ত লোকগীতিকোষ বলতে হয়, তাহলে ড. আশরাফ সিদ্দিকীকে বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন, মাননীয় প্রধান অতিথি আপনি একটি মহীরূহ। দু'মিনিটের মধ্যে আপনি কথা বলে আমাদের মোহিত করেছেন। আমরা লোকসংস্কৃতির ব্যাপারে যে কাজ শুরু করেছি তা সিডির মাধ্যমে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেবো।

তিনি আরো বলেন, মাটি গান গায়, প্রকৃতি গতিময়, প্রকৃতি সঙ্গীতময়। যে দেশে মাটি, নদী, প্রকৃতি গান গায়, সেদেশের মানুষ তো গান গাইবেই। মানুষ নিজের অনুভূতিকে আত্মস্থ করেই কবিতা লেখে, সুর দেয় আর গান গায়।

পূর্বে অভিজাত শ্রেণীর যুবকরা ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বেড়াত। শিকার করার সময় হাটে মাঠে ঘাটে সুন্দরী যুবতী দেখে পছন্দ হলে তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে আসত। যে যুবতীকে তুলে আনা হতো সেই যুবতী নিজেকে সম্মানিত মনে করত। সমাজও ঐ যুবতীকে সম্মান দিত। অভিজাত শ্রেণীর ব্যাপার ছিল বলে এটি সমাজে স্বীকৃত ছিল। যুবতী তুলে আনার এই প্রথাটি এখন বিলুপ্ত। তবে পর্তুগিজরা যখন আমাদের মেয়েদের তুলে নিত তা ছিল আমাদের সমাজের এক কলংকিত অধ্যায়। এই ধরনের নানা বিষয়ে রচিত গানগুলো আমরা ডিভিডিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সংরক্ষণ করবো।

প্রকৃতি যেমন বদলায়, লোকগীতিও বদলায়। ৩০০ বছরের আগের গান আর এখনকার গান এক নয়। এরপরও এটা দলিলীকরণ করা সভ্যতার অঙ্গ।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতো মনীষীদের মাধ্যমে কিছু কিছু গান সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু লোকশিল্পীরা গানগুলো কিভাবে গেয়েছেন, গাইতে গিয়ে কিভাবে নাচতেন, এ-সব দৃশ্য ধারণ বা সংরক্ষণ করা হয়নি। এবার আমরা মাঠ পর্যায়ে এ গ্রুপগুলোর রিহার্সেল স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমরা পরিশীলিত লোকসঙ্গীত সংরক্ষণ করব না। সঠিক লোকশিল্পীদের শনাক্ত করে তাদের গান সংরক্ষণ করব। মুহম্মদ নূরুল হুদা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে ঘুরে এই দলগুলোকে শনাক্ত করেছেন। আমরা

www.pathagar.com

রেডিও টেলিভিশনে যে লোকগীতি পাই তা পরিশীলিত। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে আমরা প্রকৃত লোকগীতি সংগ্রহ করছি ও তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছি।

সভাপতির বক্তব্যের সূত্র ধরে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে সঞ্চালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মাটি গান গায়, প্রকৃতি গান গায়। আমরা বলি, বাংলার মাটি ও প্রকৃতি সমস্বরে গান গায়। লোকসঙ্গীত তাই মূলত প্রাকৃতিক ও সামষ্টিক সঙ্গীত।

সেমিনার
প্রথম অধিবেশন
তারিখঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
কক্ষ-১

বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর আওতায় অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আব্দুল খালেক। ড. মাযহারুল ইসলাম তরু 'রাজশাহী বিভাগের লোকসঙ্গীত', জনাব পরিতোষ কুণ্ডু 'বৃহত্তর পাবনা জেলার লোকসঙ্গীত' এবং ড. শহীদ সারোয়ার আলো 'বৃহত্তর বগুড়া জেলার লোকসঙ্গীত' বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু 'রাজশাহী বিভাগের লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন কালে বলেন, এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রবন্ধটি লেখার জন্য একটি কাঠামো দেয়া হয়েছিল। এতে ছিল ভূমিকা, জেলা পরিচিতি, সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকা, সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল, সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃতিস্থল বা ব্যবহার এলাকা, সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা, সামষ্টিক গানের তালিকা, একক গানের তালিকা, বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান গানের তালিকা, বিপন্ন গানের তালিকা, লুপ্তগানের তালিকা, শনাক্তকৃত লোকবাদ্যযন্ত্রের তালিকা, সনাক্তকৃত সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক কারা, এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান (২০০৬), সুপরিশমালা, উপসংহার ইত্যাদি ।

আমি আমার এলাকায় ১৯টি লোকসঙ্গীত শনাক্ত করতে পেরেছি। শিবের বন্দনা থেকে গম্ভীরা গানের উৎপত্তি হলেও এখন গম্ভীরা গান সমাজ-বাস্তবতার সাথে মিশে গিয়ে যুগোপযোগী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়। নানা-নাতির সংলাপে এ গানের দোহার, হারমোনিয়াম বাদক, জুড়িবাদক প্রমুখ অংশগ্রহণ করে। গম্ভীরা গানের প্রধান গায়ক নানা-নাতির পোশাকে ফুটে ওঠে বাংলার নিরাশাক্লিষ্ট কৃষকের ছাপ।

জনাব পরিতোষ কুমার কুণ্ডু 'বৃহত্তর পাবনা জেলার লোকসঙ্গীত' সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেয়েলী গীত, বরস্যা গান, মাঙ্গার গান ও হেঁয়ালী, জাগ গান, সারি গান, ধুয়া গান, যাত্রা গান, ভাসানযাত্রা গান, জারি গান, কবি ও হোলী গানের কথা উল্লেখ করেন। তিনিও নির্ধারিত ছকে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থপন করেন।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে প্রফেসর আবদুল খালেক প্রবন্ধের উপর বিশদ আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যের লিখিত রূপ নিম্নে প্রদান করা হল:

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বলতে মূলত রাজশাহী বিভাগকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। উত্তরাঞ্চলের লোকসঙ্গীত নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, তখন প্রসঙ্গক্রমে সামগ্রিক বাংলাদেশ এসে যায়। উত্তরাঞ্চলকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোন পথ নেই। বিভিন্ন অঞ্চলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বৃহৎ বাংলাদেশ। সাগর-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের সবুজ মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে ভাবুক করেছে, কবি করে তুলেছে। কবি হওয়ার জন্য, শিল্পী হওয়ার জন্য এ দেশের মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় নি। নদীর চর, চরের বালু, কাশের ফুল, মাঠে-ঘাটে সবুজ ফসল, গাছে গাছে নানা বর্ণের ফুল-ফল, প্রকৃতি জগতে ছয় ঋতুর নানা লীলা-খেলা,

www.pathagar.com

প্রচণ্ড স্রোতের আঘাতে নদীর এক পার ভাঙ্গা, অন্য পার গড়া, সাগরের উন্মত্ততা, গ্রীষ্মকালে মেঘ-রোদের লুকোচুরি খেলার মধ্যে রয়ে গেছে সঙ্গীতের নানা উপাদান, কবিতার নানা উপকরণ। মানব গোষ্ঠীর জন্ম এবং তার কর্ম অবিচ্ছিন্ন। কর্মের মধ্য দিয়েই তাকে জীবন এবং জীবিকার পরিচর্যা করতে হয়েছে।

ঐতিহাসিক কালের ঠিক কোন পর্যায়ে বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের জন্ম তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন, তবে নৃতত্ত্ববিদগণের মতে গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষ তার প্রাথমিক সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে। বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করতে গেলে এ কথা বলাই যায় বাংলাদেশের ভূখণ্ডের আদিম মানুষ যেমন প্রাচীন, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতও ততটাই প্রাচীন অর্থাৎ বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের জন্ম তার জাতিসত্তা বিকাশের সমান্তরালেই ঘটেছে। মানুষ এবং তার সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। যেখানে মানুষ আছে, মানুষের প্রেম-প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা আছে, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আছে, এ সব অনুভূতি মানুষ তার কথা-বার্তা, আচার-আচরণে, গল্পে-গানে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। জন্মের আদি লগ্নে সুর দিয়ে, সঙ্গীত দিয়ে তার মুখে কথা ফুটেছে, অক্ষরের জন্য বা বর্ণের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় নি। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ সে কথাই উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ নিরক্ষর মানুষদের মুখে মুখে রচিত এবং মুখে মুখে প্রচারিত সঙ্গীতগুলোই সাধারণভাবে লোকসঙ্গীত বলে বিবেচিত। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে বাংলাদেশে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের শাখা শতাধিক। তবে পরিচর্যার অভাবে বেশ কিছু শাখা অবলুপ্তির পথে। দেশ এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি সেই জরুরী কাজে হাত দিয়েছে। ২৭ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী 'বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত সম্মেলন-২০০৮ শীর্ষক' আলোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে ৩টি মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম তরু উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'বৃহত্তর রাজশাহী জেলার লোকসঙ্গীত', অধ্যাপক পরিতোষ কুমার কুণ্ডু উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'বৃহত্তর পাবনা জেলার লোকসঙ্গীত' এবং অধ্যাপক শহীদ সারওয়ার পরিবেশিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'বৃহত্তর বগুড়া জেলাব লোকসঙ্গীত'। প্রতিটি প্রবন্ধে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতগুলোর নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। এবার প্রবন্ধগুরোর দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু আমার তত্ত্বাবধানে এম.ফিল এবং পি-এইচ.ডি পর্যায়ের গবেষণা করেছে। তার গবেষণার ক্ষেত্র বাছাই করা হয়েছিল নবাবগঞ্জ এলাকার লোকসঙ্গীত এবং বরেন্দ্র এলাকার লোকসঙ্গীত, বিশেষ করে আলকাপ এবং গম্ভীরার দিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এসব বিষয়ে গবেষণার সুবাদে তরুকে বরেন্দ্র অঞ্চলের তৃণমূল পর্যন্ত বিচরণ করতে হয়েছিল তথ্য সংগ্রহের জন্য। বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় তার সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশেষ কাজে লেগেছে।

বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের শতাধিক শাখার কথা বলা হলেও রাজশাহী জেলার (বৃহত্তর) লোকসঙ্গীত নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে ড. মাযহারুল ইসলাম তরু মোটামুটি ১৯টি শাখার সন্ধান পেয়েছে। ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে পারলে হয়তো সংখ্যা আরও কিছু বাড়বে, তবে পঞ্চাশের অধিক পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। রাজশাহী জেরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে পদ্মা, মহানন্দার মত বিখ্যাত নদী, রাজশাহীর বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করছে চলন বিল। এ সমস্ত বিল এবং নদী বিধৌত এলাকায় ভাটিয়ালী গান থাকবে না এমনটি হবার কথা নয়। তরুর প্রবন্ধে ভাটিয়ালী শাখার নাম একেবারেই উচ্চারিত হয় নি। প্রবন্ধে এ রকম আরও কিছু অনুচ্চারিত শাখা থাকতে পারে। এ রকম ছোট-খাটো বিচ্যুতি ছাড়া প্রবন্ধটি তথ্যনির্ভর হয়েছে। গভীর আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথেই তরু প্রবন্ধটি রচনা করেছে। অনেক অজানা তথ্য প্রবন্ধটিতে আছে। রাজশাহী অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের জন্য ড. মাযহারুল ইসলাম তরুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন অধ্যাপক পরিতোষ কুমার কুণ্ডু। পাবনা জেলার মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে তিনি মোটামুটি ১৫ শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা অতি সহজেই চোখে পড়ে। বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত পর্যালোচনায় প্রবন্ধকার সিরাজগঞ্জ জেলার কথাও উল্লেখ করেছেন। পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে রয়েছে পদ্মা, ইছামতি, বড়াল, করতোয়া, যমুনার মত কয়েকটি বিখ্যাত নদী। বলা যেতে পারে পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে নদীবিধৌত এলাকা। এসব নদী বিধৌত এলাকায় ভাটিয়ালী গান গাওয়া হয় না বা ভাটিয়ালী গানের প্রচলন নেই, এমনটি হতে পারে না। অথচ অধ্যাপক পরিতোষ কুমার কুণ্ডু তাঁর প্রবন্ধে কোথাও ভাটিয়ালী গানের উল্লেখ করেন নি। প্রবন্ধে সারি গানের উল্লেখ আছে বটে, তবে অতি আকর্ষণীয় সারিগানগুলোকে তিনি উদাহরণ হিসেবে নিয়ে আসতে পারেন নি। তাছাড়া কবি পাগলা কানাইয়ের অসংখ্য ধুয়া গান এবং বাউল গান পাবনা ও সিরাজগঞ্জের মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধে এই বিখ্যাত লোক কবির নাম একবারও উচ্চারিত হয় নি।

বৃহত্তর বগুড়া জেলার লোকসঙ্গীত বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন ড. মোহাম্মদ শহীদ সারওয়ার। বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলে ড. সারওয়ার মোট ১৫ শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধে কবিগান, জারি, সারি, ভাটিয়ালী গানের কোন উল্লেখ নেই। লোকসঙ্গীতের এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বৃহত্তর বগুড়া জেলায় কবি, জারি, সারি, ভাটিয়ালী গানের প্রচলন নেই অথবা এই গানগুলো বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চল থেকে একেবারে হারিয়ে গেছে, এ কথা বলা যাবে না। গানগুলো পেতে হলে ড. সারওয়ারকে বগুড়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হবে। উপস্থাপিত তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে প্রবন্ধ তিনটি যথেষ্ট মূল্যবান ও তথ্য নির্ভর হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ।

উত্তরাঞ্চলের লোকসঙ্গীতসমূহ যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তিনটি প্রবন্ধে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙালির জাতিসত্তার প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে উত্তরাঞ্চল তথা বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের কাছে না গিয়ে উপায় নেই। বরেন্দ্র এলাকার লোকসঙ্গীত আসলে সমগ্র বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতেরই প্রতিচ্ছবি। লোকসঙ্গীতকে এখন আর শুধু অতীত ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা করলে চলবে না। আধুনিক কালে লোকসঙ্গীতের কদর কমে নি বরং বেড়ে গেছে। সমগ্র বিশ্বে লোকসঙ্গীত এখন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রী হিসেবে বিবেচিত। জাতিসংঘের একটি জরীপ থেকে জানা যায় সমগ্র বিশ্বে চা রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় মিউজিক ইন্ডাস্ট্রীর মাধ্যমে। কাজেই আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীত অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে পারলে শুধু লোকসঙ্গীতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না, দেশ এবং জাতি আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পাবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

কক্ষ-২

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর সকাল ১১:২০ টায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রশাসনিক ভবনের কক্ষ-২ এ সেমিনারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার লোকসঙ্গীত' এবং 'বৃহত্তর রংপুর জেলার লোকসঙ্গীত'। এই অধিবেশনে লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন যথাক্রমে ড. নাজমুল হক এবং অধ্যাপক মোতাহার হোসেন সূফী। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর সাইফউদ্দিন চৌধুরী।

দ্বিতীয় অধিবেশনে 'বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার লোকসঙ্গীত' প্রসঙ্গে ড. নাজমুল হক বলেন, আদিম সমাজে মানুষের জীবন চর্চায় সুরই ছিল প্রধান প্রকাশ মাধ্যম। সঙ্গীতের সূচনায় সঙ্গীত সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে লোকসমাজ। সুতরাং তাদের সৃষ্ট লোকসঙ্গীত আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে দিয়েছে মজবুত ভিত্তি। দিনাজপুর জেলার লোকসঙ্গীত যেমন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য স্বতন্ত্র, তেমনি লোকসঙ্গীতের মূল প্রবণতাটিও এর মধ্যে সংরক্ষিত। সনাক্তকৃত অধিকাংশ লোকসঙ্গীতের রয়েছে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীত সংগ্রহ প্রসঙ্গে গবেষক নাজমুল হক তার প্রবন্ধে বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসঙ্গীত সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে যে বিস্তৃত অনুসন্ধান প্রয়োজন, বাস্তবে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। সে কারণে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহকে তৃণমূল পর্যায়ে উপযুক্ত গবেষক প্রেরণ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লোকসঙ্গীত বা লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ করে আনতে হবে। মাঠ পর্যায়ে নিবিড় অনুসন্ধানের কোনো বিকল্প নেই।

তাঁর পরে 'বৃহত্তর রংপুর জেলার লোকসঙ্গীত' প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোতাহার হোসেন সূফী বলেন, লোকসঙ্গীতের সম্পদে সমৃদ্ধ রংপুর। রংপুরের গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রচয়িতা কে বা কারা কালের ব্যবধানে আজ তা সুস্পষ্টরূপে নির্নয় করা কঠিন। লোকসংস্কৃতি একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠির মানসচর্চার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এজন্য লোকসঙ্গীতের মূল্য অপরিসীম। লোকসঙ্গীতগুলি যাতে চিরতরে হারিয়ে না যায় সেজন্য সংরক্ষণ করার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহন করা একান্ত জরুরী। রংপুর নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলায় ইতোমধ্যে অনেক লোকসঙ্গীত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এসব গান সংগ্রহ করা আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যেমন মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের গান, মোনাইচন্দ্র প্রভৃতি। সনাক্তকৃত ১১টি লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা গবেষক তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তাছাড়া ৩৯টি লোকসঙ্গীতের তালিকা তিনি তাঁর প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন।

এই অধিবেশনে দু'টি তথ্যমূলক প্রবন্ধ পাঠ করার পর সভাপতি গবেষকদ্বয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে সরাসরি প্রশ্ন-উত্তর পর্বে চলে যান। পরে সভাপতি প্রফেসর সাইফউদ্দিন চৌধুরী প্রাণবন্ত প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তাঁর বক্তব্যের লিখিত রূপ নিম্নে প্রদান করা হল:

সুধীবৃন্দ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই একুশ শতকে উন্নত দেশগুলির কাছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সকল প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। পিছিয়ে পড়ার কারণ, উন্নত দেশগুলির মজবুত আর্থনীতিক ভিত, সঙ্গে রয়েছে অমিত শক্তিধর প্রযুক্তি। মূলত অর্থনীতির পরিকাঠামোর সঙ্গে নিজেকে লাগসই করে প্রস্তুত করে তুলতে না পারায় শেষোক্ত দেশগুলি ঐতিহ্য হারাচ্ছে। বিবর্তিত হচ্ছে আবহমানকাল ধরে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ ও সংস্কার।

আমরা ১৯৭১ সালে নতুন একটি ভূখণ্ডের প্রত্যাশায় মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেম। অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে তা অর্জিত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের ভাষা-শিল্প-সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অর্থনীতি -- সর্বোপরি এদেশের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের আত্ম-পরিচয় সংরক্ষিত হবে জনগণের রুচি, চাহিদা ও ইচ্ছে-মতো। এসব ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় অর্জন খুব একটা না হলেও একে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ কমই আছে। কিন্তু এখন সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্ব। বিশেষভাবে আমাদের ঐতিহ্য এখন হুমকির মুখে গিয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে যুগপৎ যুক্ত হয়েছে দেশে দ্রুত নগরায়ন প্রক্রিয়া, ভূতাত্ত্বিক পরিবেশের নানামাত্রিক পরিবর্তন। প্রযুক্তির অস্বাভাবিক বিস্তার ঘটছে গ্রামগুলোতেও। এতে করে কৃষি ও সংস্কৃতির উৎপাদক গ্রাম তার শ্রী হারাচ্ছে, হারাচ্ছে 'ইন্ডিজিনাস' চরিত্র। মেঠোপথগুলি রাজপথ হয়ে যাচ্ছে, চলছে যান্ত্রিক শকট। নদীগুলোয় চলে যন্ত্রচালিত জলযান। এভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ভূ-তাত্ত্বিক ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তির সংশ্লেষে চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন হচ্ছে। মেঠোপথ, বন্ধুর পথগুলোতে আর মৈষালবন্ধু কিংবা গাড়োয়ান বন্ধুর গান শোনা যায় না। প্রচণ্ড শব্দে চলা শ্যালো-চালিত ইঞ্জিন নৌকার মাঝির ভাটিয়ালি গান গাওয়ার সুযোগ কোথায়?

দেশের এমন একটি সময়ে, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি তিনদিনব্যাপী যে 'লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮'-এর আয়োজন করেছে, নানাকৌণিকেই তা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

এই অধিবেশনে ক্ষেত্র সমীক্ষা-ভিত্তিক দুটি প্রতিবেদন উপস্থিত হয়েছে: একটি বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা, অপরটি বৃহত্তর রংপুর জেলাকে নিয়ে।

প্রতিবেদন উপস্থাপক ড. নাজমুল হক ও অধ্যাপক মোতাহার হোসেন সুফী বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। নিজ নিজ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের

www.pathagar.com

বিবরণ, উৎপত্তিস্থল, সঙ্গীত সংগ্রাহক ও গায়নদের তালিকা, অবলুপ্ত সঙ্গীত সনাক্তকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাবন্ধিকগণ উভয়েই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সুপারিশমালা তুলে ধরেছেন। সুপারিশগুলি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা লোকসঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লোকসঙ্গীতের শৈল্পিক বাণিজ্যিকরণের বিষয়েও প্রস্তাব রেখেছেন। বিজ্ঞান-নির্ভরই এ সব প্রস্তাব। পেশার জন্য শিল্পীদের সংযুক্ত বলতে গেলে এ বিষয়টি অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে। অন্যথায়, রুজির অন্বেষায় ছুটলে লোকায়ত এ শিল্প আর রক্ষা করা যাবে না।

ধন্যবাদ জানাই প্রাবন্ধিকদ্বয়কে। ধন্যবাদ এশিয়াটিক সোসাইটির এই উৎসবের উদ্যোক্তাদের এবং আপনাদের সকলকে।

তৃতীয় অধিবেশন

তৃতীয় অধিবেশনটি শুরু হয় দুপুর ১২:৩২ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আনোয়ারুল করিম। আর গবেষক মিজানুর রহমান 'খুলনা বিভাগের লোকসঙ্গীত' এবং মাযহারুল ইসলাম তরু ও কর্নেলিউস মূর্মূ ওরাওঁ ও সাঁওতালী লোকসঙ্গীতের উপর নির্ধারিত ছকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

'খুলনা বিভাগের লোকসঙ্গীত' প্রসঙ্গে ড. মিজানুর রহমান বলেন, খুলনা বিভাগে বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। এর কিছু বর্তমানে টিকে আছে, কিছু লুপ্ত হয়েছে আর কিছু বিলুপ্তপ্রায়। কবির লড়াই এখানে এখনো বুদ্ধিবৃত্তিক বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। বৃহত্তর খুলনায় বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীতের যে পরিচয় মেলে তা হলো বাউল, পালা, প্যাঁচালী গান, ভাসান গান, আলোমতির গান, দুখের পালা, বেয়ারা গীত, পটগান ইত্যাদি। এসব লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের কিছু টিকে আছে বয়োবৃদ্ধদের মুখে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে লোকসঙ্গীত মেলা আয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপিত সঙ্গীত বিচার বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সঙ্গীত ও শিল্পী বাছাই করতে হবে।

অতঃপর বরিশাল বিভাগের লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে জনাব দেবাশীষ চক্রবর্তী বলেন, বরিশাল অঞ্চলের জনজীবনে বিভিন্ন যুগ পর্যায়ে বিচিত্রতর জনগোষ্ঠী ও ধর্মের প্রভাবে লোকসঙ্গীতকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সঙ্গীতগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তাই বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে ধর্মীয় প্রেরণার প্রেক্ষিতে গীত হওয়ার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। যেমন ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসঙ্গীতে রয়েছে ধর্মাচারমূলক, প্রার্থনামূলক, কৃষিব্রতমূলক প্রসঙ্গ। সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল, বিস্তৃতি এবং স্রষ্টা ও শিল্পীদের তালিকা সহ বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার। তিনি আরও বলেন বরিশাল অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল গুনাইবিবি যাত্রাপালার গান। যা আজ অবধি লোকবাংলার ঘরে ঘরে গীত হয়। বরিশাল অঞ্চলের গণ্ডি পেরিয়ে গুনাইবিবি যাত্রাপালার মতো গুনাই'র গানগুলোও পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর, খুলনা এবং ময়মনসিংহের কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে ছিল।

অধিবেশনের তৃতীয় প্রবন্ধে 'সাঁওতাল ও ওরাওঁ লোকসঙ্গীত' প্রসঙ্গে ড. মাযহারুল ইসলাম তরু ও জনাব কর্ণেলিউস মুর্মূ বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৫টির মতো আদিবাসী জনগোষ্ঠি রয়েছে। এসব জনগোষ্ঠি গুলোর মধ্যে উত্তরবঙ্গে বসবাস করে সাঁওতাল সম্প্রদায়। উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই সবচাইতে বেশি। সাঁওতাল সমাজ জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন লোকসঙ্গীত। তাদের সঙ্গীত তাদের লোকজীবনের সার্বিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব হলো বাহা উৎসব। আবার কেউ বলেন 'পুষ্প উৎসব' তাদের অন্যান্য লোকসঙ্গীতগুলো দাসাই গান, দং গান ইত্যাদি। এইসব সঙ্গীত আদিবাসী শিল্পীদের একান্তই সাধনার ফসল।

অতঃপর তথ্যসমৃদ্ধ এবং ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যের জন্যে গবেষকদেরক আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু করেন। এতে প্রায় ১৫টির মতো প্রশ্নের উত্তর দেন সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ।

www.pathagar.com

উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি প্রফেসর আনোয়ারুল করিম তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতির যথার্থ অবস্থা এবং বিষয় নির্ধারণে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্যে সমগ্র জাতি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তার বক্তব্যের লিখিত রূপ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল ইসলামকে এমন একটি মহৎ উদ্যেগ গ্রহণ করার জন্য। এই প্রথম সমগ্র বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি যথার্থ পরিচয় এর অতীত এবং বর্তমান অবস্থা নিরূপণ ও তা সংরক্ষণের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য মাঠ পর্যায়ের গবেষকদের কাছ থেকে সমীক্ষা ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা এই কর্মকাণ্ডের প্রধান সমন্বয়কারী। তিনি প্রতি জেলায় ভ্রমণ করে মাঠপর্যায়ের গবেষকদের নিয়ে লোকশিল্পীদের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম এই অধিবেশনে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি ইতোমধ্যে বাংলাপিডিয়ার মতো দুরূহ কাজকে সফলতার সাথে সম্পন্ন করে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতির যথার্থ অবস্থা নির্ধারণে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার জন্য সমগ্র জাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

চতুর্থ অধিবেশন
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
কক্ষ-১

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে সকাল সাড়ে নয়টায় ১ নং কক্ষে বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর আওতায় আয়োজিত সেমিনারের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের শুরুতে প্রধান সমন্বয়কারী কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, লোকসঙ্গীত বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান হয়ে উঠেছে। এর অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। লোকসঙ্গীতের প্রকৃত স্রষ্টা যেন এর মূল্য ভোগ করত পারে এই বিষয়টির প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, প্রকৃত স্রষ্টা বরাবরই অবহেলিত থেকে যাচ্ছেন।

অতঃপর চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক যতীন সরকার বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার লোকসঙ্গীতের প্রবন্ধকার ফরিদ আহমদ দুলালকে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করার অনুরোধ করেন।

প্রবন্ধকার জনাব ফরিদ আহমদ দুলাল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার লোকসঙ্গীত উপস্থাপন কালে বলেন, বাংলাদেশে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের প্রায় সবকটি ধারাই প্রচলিত আছে ময়মনসিংহ অঞ্চলে। প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে বাউলগান, ভাটিয়ালী, কিসসাপালা, কবিগান, কীর্তন, ঘাটুগান, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদি, ঢপযাত্রা, যাত্রা, বারমাসী, পুঁথিগান, পালকির গান, হাইট্টারা গান ইত্যাদি। লোকসঙ্গীতকে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে লোকসঙ্গীত উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে মেধাবী শিল্পীকে শনাক্ত করতে পারলেই এই শিল্প বাঁচবে।

অতঃপর জনাব শফিউদ্দিন তালুকদার, 'টাঙ্গাইল জেলার লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমি মূলত লোকসঙ্গীত সংগ্রহের মাঠ পর্যায়ের কর্মী। ৬ থেকে ৭ বছর ধরে লোকসঙ্গীতের ওপর কাজ করছি। ধুয়া গান কৃষকরা ধান, পাট ও অন্যান্য শস্য নিড়ানীর সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য গেয়ে থাকেন। বর্তমানে আসর করেও ধুয়া গান পরিবেশিত হয়। মূল গায়েন গানটি পরিবেশন করেন। তার সাথে তিন থেকে পাঁচজন 'দোহার' থাকে। ধুয়াগানে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

বৃষ্টি নামানি গান, মালসীগান, পালকির গান, বিচ্ছেদ গান, ধান ভানার গান, ভাটিয়ালী গান, মেয়েলি গান, চটকা গান, ভজন গান, জারি গান, সারি গান, ধামলী গান, ঘাটু গান, বারোমাসী গানও টাঙ্গাইল জেলায় প্রচলন রয়েছে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে পীর ফকিরের মাজারকে কেন্দ্র করে ধামালী গান গাওয়া হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমই ঘাটুগানের মূল উপজীব্য। অন্যান্য গানের মধ্যে আছে ঘাটু গান (দলগত), ভজন গান

www.pathagar.com

(একক), পালা গান (দলগত), জারি গান (দলগত), মালসী গান (দলগত), চটকা গান (একক), ধামালী গান (দলগত) ইত্যাদি লোকসঙ্গীত বিপন্ন হতে চলেছে। লুপ্ত হয়েছে মেয়েলী গীত (একক/দলগত), বারোমাসী গান (একক), ধানভানার গান (দলগত), চরকার গান (একক), পাল্কির গান (দলগত), ভাটিয়ালী গান (একক/দলগত)।

এই বিপন্ন, লুপ্ত লোকসঙ্গীতগুলো স্থানীয় গবেষকদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সঙ্গীতের উৎপত্তি, বিস্তৃতি এলাকা, উপস্থাপনা, পরিবেশন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণায় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

জনাব লুলু আবদুর রহমান 'জামালপুরের লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধে জারি, সারি, বারমাসী গান, মেয়েলী গীত, বিয়ের গীত, মুর্শিদি, বাউল, ঘাটুগান, মালসী, আনুষ্ঠানিক গান, ব্যাঙ্গ, বিয়ের গান, ছাদ পেটানো গান, পালা গান, মর্শিয়া, মঞ্চ গান, কেচ্ছা গান, আদিবাসী লোকসঙ্গীত ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, জামালপুরে মঞ্চ গানের দল রয়েছে। এই গানে নারীর ভূমিকা পুরুষ দিয়ে করানো হয়। হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল, করতাল বা জরি, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

গারো কবি ও গবেষক জনাব মতেন্দ্র মানখিন তাঁর *গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত* প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গারোদের লোকসঙ্গীতে লিখিত কোন স্বরলিপি নেই। গারো সম্প্রদায় নিজস্ব ভাষার এই গানগুলো গেয়ে থাকে। রে-রে গীত, রঙের খেলা: রে-রে, পীড়িতি: রে-রে, রামায়ণী: রে-রে, সিমাসা: রে-রে, গারো লোকগীতি: হাজিয়া, খাথাদকা: সেরনজিং: ইত্যাদি খ্রাম, দামা, নাগ্রা, নাদিক, রাঙল, রাং, চেংচাপ, দিমচ্রাং, গংগিনা, আদুরু, কাল, আস্তাংশী ইত্যাদি গারো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গাওয়া হয়। হাজংদের লোকগীতি জাখা মারা গীত, রোয়া লাগা গীত, বানাইগীত, ইত্যাদি। লোকগীতিতে খোল, করতাল, ঢাক, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

প্রিন্স রফিক খান অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁর রচিত 'কিশোরগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়নি।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে সভাপতি তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের লিখিত রূপ নিম্নরূপ:

আজকে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত লোকসঙ্গীত সম্মেলনের এই অধিবেশনে আমি যে সভাপতির আসনে বসার বিরল সম্মান লাভ করতে পেরেছি, তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই কবি মুহম্মদ নূরুল হুদাকে। এই অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসঙ্গীত। আমরা 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ' বলি বর্তমানে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর এই ছয়টি জেলার সম্মিলিত ভূখণ্ডকে। একালের এই ছয়টি জেলাই এক সময় ছিল ময়মনসিংহ জেলা। সে জেলার পতন ঘটেছিল ১৭৮৭ সনে। ফরিদ আহমদ দুলাল 'বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসঙ্গীত পরিচয়' প্রবন্ধটির ভূমিকায় এ অঞ্চলের ছয়টি জেলারই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছেন। এর পরই প্রবেশ করেছেন মূল বিষয়ে। প্রচুর দৃষ্টান্তসহ তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসঙ্গীতের সব শাখারই পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ফরিদ আহমদ দুলাল শুধু সার্থক কবিই নন, একজন পরিশ্রমী গবেষকও।

আলাদাভাবে টাঙ্গাইল, জামালপুর ও কিশোরগঞ্জের লোকসঙ্গীতের পরিচয় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন যথাক্রমে শফিউদ্দিন তালুকদার, লুলু আবদুর রহমান ও প্রিন্স রফিক খান। এঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই রয়েছে আন্তরিকতা, রসজ্ঞতা ও তথ্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর। এঁদের সকলকেই জানাই আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন।

মতেন্দ্র মানখিনের 'গারো-হাজংদের লোকগীতি' প্রবন্ধটির কথা একটু পৃথকভাবে উল্লেখ করতে চাই। কারণ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবদানের কথা প্রায়শই আমরা ভুলে থাকি। এ রকম ভুলে থাকা যে অন্যায়, তাও আমরা মনেই করি না। এবারের লোকসঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যে সেই ভুল ও অন্যায়টি করেন নি, সেজন্য তাঁদের প্রতি বাড়তি কৃতজ্ঞতা জানাই। মতেন্দ্র মানখিনকে অভিনন্দিত করি তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধটির জন্য।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়: ময়মনসিংহের আদিম অধিবাসীরা ছিল কৌম সমাজের লোক। তাদের সমাজব্যবস্থা ছিল আদিম সাম্যবাদী ধরনের। উৎপাদন শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ থেকে এদের

www.pathagar.com

কৌম জীবনব্যবস্থা তথা আদিম সাম্যবাদী সমাজে ভাঙন ধরে নি, বাইরে থেকে তথাকথিত 'সভ্য' মানুষের আক্রমণ ও পীড়নে তাদের উপর চেপে বসে শ্রেণীসমাজের কাঠামো। কোচ, গারো, হাজং বা রাজবংশীরা 'সভ্য' হিন্দু-মুসলমানের আক্রমণ ও আধিপত্যকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় নি অবশ্যই; শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিভূদের সঙ্গে আদিম শ্রেণীহীন সমাজের সংঘাতেই এ অঞ্চলের ইতিহাস রক্তাক্ত। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে শ্রেণীসমাজের চাঁইয়েরা যদিও পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ককে ভেঙে গুড়িয়ে দেয় তার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিপক্কতার সুযোগ না দিয়েই, তথাপি পুরনো সমাজ-কাঠামো পুরোপুরি নিঃশেষিত হয় না তার রেশ থেকেই যায়।

আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজের অবশেষগুলোই এ অঞ্চলের আধিবাসীদের মন-মানস গঠন করে, সংগ্রামী ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে, সাহিত্যে সঙ্গীতে কলায় এবং লৌকিক ধমচর্চা ও জীবনচর্যায় তার ছাপ রেখে যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাদের অধিকার বিস্তৃত হওয়ার দরুণ, সে অঞ্চলে সামন্ত শাসিত শ্রেণীসমাজের একটি স্পষ্ট কাঠামো অবশ্যই তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব ময়মনসিংহে ব্রাহ্মণ্য শাসন দৃঢ়মূল হতে না পারায় এ অঞ্চলে প্রথাগত বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দুধর্মের দৌরাত্ম্য প্রকট হতে পারে নি। মুসলিম শাসনামলেও শরিয়তি ইসলামের চেয়ে পীর সুলতান সাহেব (নেত্রকোনার মদনপুরে যাঁর মাজার অবস্থিত) প্রমুখ সুফি সাধকদের উদার জীবনভাবনার দ্বারাই এ অঞ্চলের মানুষ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, লোকায়ত মানবধর্মই যে ময়মনসিংহের জনতার ঐতিহ্য ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের বিস্তৃতি এবং পাগলপন্থীদের অভ্যুদয় ও গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের মধ্যেও এর সাক্ষ্য বিধৃত।

পাগলপন্থি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন টিপু। সুসঙ্গ পরগনার লেটিরকান্দা গ্রামে তাঁর জন্ম। হিন্দু-মুসলমানদের ধ্রুপদী ধর্ম থেকে তাঁর আচার-আচরণ ছিল আলাদা। 'সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্ট, সুতরাং কেউ কারও অধীন নয়' টিপুর এই মতবাদ জমিদারি শাসনে বিপর্যস্ত কৃষক সমাজের নিকট মুক্তিমন্ত্র বলে গণ্য হয়। সকল কৃষক টিপুর নেতৃত্বে সমবেত হয়ে ১৮২৫ সনে এক বিরাট কৃষক বিদ্রোহের জন্ম দেয়। ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য দেশীয় জমিদাররা টিপুর বিদ্রোহী দলকে নির্মমভাবে দমন করে ঠিকই, কিন্তু তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সৃষ্টি করে এক মহান প্রেরণাদায়ী ঐতিহ্যের। নির্যাতিত চাষিদের প্রকৃত বন্ধু টিপু সরদারকে শেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই আখ্যায়িত করেছেন 'পূর্ব বংলার লুই ব্লাঙ্ক' বলে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত আগে ও পরে জমিদার বংশেরই সন্তান মণিসিংহের নেতৃত্বে যে কৃষক সংগাম পরিচালিত হয়েছিল, তাতেও পাগলপন্থি বিদ্রোহী টিপুর সার্থক ও যুগোচিত উত্তরাধিকারত্বই প্রতিফলিত।

বিদ্রোহী উত্তরাধিকার তার সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' শুধু সাহিত্যিক মূল্যেই বিচার্য নয়, এর আসল মূল্য বলিষ্ঠ প্রতিবাদী জীবন চেতনার মধ্যে নিহিত। এই জীবন চেতনা নিয়েই মধ্যযুগের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও মুক্তির অভিসার জ্বলেছে চাঁদ সদাগরের ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রস্রষ্টা নারায়ণ দেব ও দ্বিজবংশীদাসের হাতে। বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী শুধু বাংলার প্রথম মহিলা কবিই নন, অভিজাত ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও লোকায়ত চৈতন্যের অধিকারী গণকবি তিনি। গণকাব্যের এই ধারাই প্রবাহিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের ধারিশ্বর-নিবাসী গঙ্গাবাসের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ। গলাচিপার মুন্সি আবদুর রহিম ভিন্নতর মাত্রা যোগ করেন 'গাজী কালু চম্পাবতী'র পুঁথিতে এবং মুন্সির অনুসারীর সংখ্যাও একেবারে কম দেখা যায় না।

এ ছাড়া আছেন 'কবির সরকার'-এর দল। 'রামু-রামগতি-রামকানাই, এই তিন কবির সানাই' ছাড়াও কানাই, বলাই, পরান, শম্ভু, বিজয়, সাধু, মধু, ক্ষেত্রমোহন, মদনসহ অসংখ্য গণকবিয়াল আবহমান বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্যকেই ময়মনসিংহের অনন্য বৈশিষ্ট্যসহ প্রকাশ করেন। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ঘাটু ইত্যাদি সঙ্গীত প্রকরণে যেমন, তেমনই সে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ এখানকার বাউল গানেও। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে বহুদূর পেছনে ফেলে বাউল দীন শরৎ রচনা করেন 'এসলাম সঙ্গীত'। জালাল উদ্দিন খাঁ বাউল গানের মধ্যে বহন করেন বৈষ্ণব পদাবলির ঐতিহ্য, রক্ষণশীল ধর্ম মুখের উপর প্রশ্ন ছুঁড়ে মারেন 'মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এ মন্ত্রণা কে দিয়াছে?'

www.pathagar.com

জালাল উদ্দিন খাঁর ধারা বাহিত হয় রসিদ উদ্দিন, মিরাজ আলী, মজিদ মিঞা, উকিল মুন্সি, চান মিঞাসহ আরও অনেক অনেক বাউল সাধকের কণ্ঠে। আবার অখিল ঠাকুর ও নিবারণ পণ্ডিত আরও অগ্রসর হয়ে বাউলের প্রকরণেই যুক্ত করে দেন আন্তর্জাতিক সাম্যচেতনার অন্তঃসার।

ময়মনসিংহের লোকায়ত সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে এ ধরনের অগ্রসর চেতনার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে এখানকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

পঞ্চম অধিবেশন

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

কক্ষ-২

লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর দ্বিতীয় দিনের সকালে ছিল ৩টি সেমিনার এবং বিকালে ১১টি দলের সঙ্গীতানুষ্ঠান। সেমিনার এশিয়াটিক সোসাইটির ২টি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ২নং কক্ষে সকাল ৯.৪৫ টায় সেমিনারের পঞ্চম অধিবেশন শুরু। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী। গবেষক হিসেবে ঢাকা বিভাগের লোকসঙ্গীতের উপর জনাব বিমান চন্দ্র বিশ্বাস, বৃহত্তর ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীতের উপর জনাব শাহিদা খাতুন এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার লোকসঙ্গীতের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ড. তপন বাগচী।

ঢাকা বিভাগের লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে জনাব বিমান চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, লোকসঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সঙ্গীতে আছে গণমনের অকপট অভিব্যক্তি। বাংলা লোকসংগীত বৈচিত্র্যময় এই জেলার লোকসঙ্গীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশিষ্ট লোকমানসের পরিচয়ে লোকসঙ্গীত গুলো ফুটে উঠেছে। শনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের স্রষ্টাদের এবং লোকসঙ্গীত দলের প্রতিবেদন উল্লেখ করে কিছু সুপারিশমালা দেন, মেধাস্বত্বের ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, যারা লোকসঙ্গীত স্রষ্টা তাদের সাধনার ফসল হল সঙ্গীত। তাই এর মেধাস্বত্ব যেন তারা ভোগ করতে পারে তার দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে জনাব শাহিদা খাতুন বলেন, বাংলাদেশ আবহমানকালের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এদেশের মানুষ ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিকে হাজার বছর ধরে ধারন ও লালন করে চলেছে। বাংলাদেশের আবেদন গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। প্রবন্ধে তিনি পালাগান, বিচার গান, কবিগান, মাজারগান, ভিক্ষুক সঙ্গীতসহ মোট ১৫টি শনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। প্রবন্ধের পরিশেষে একটি প্রস্তাবে তিনি বলেন, ঢাকার লোকসঙ্গীতের বর্তমান চালচিত্র অর্থাৎ এর ধরন-ধারণ বৈশিষ্ট্য ও চলমান ঐতিহ্য নিয়ে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণে এখনই বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা অত্যন্ত জরুরী। এই গবেষণার ভেতর দিয়ে একই সঙ্গে সারাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি সাধারণ চিত্র যেমন লক্ষ্য করা যাবে তেমনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকসঙ্গীত মহানগরের মানুষের চর্চায় কিরূপ লাভ করেছে বা করছে তাও নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে ড. তপন বাগচী বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার মতো ফরিদপুর অঞ্চলেও রয়েছে লোকসঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন। ভৌগোলিক কারণে এটি দেশের ঠিক মধ্যখানে হওয়ায় সকল অঞ্চলের সঙ্গে অধিকতর নৈকট্য লাভের সুযোগ পেয়েছে। ফলে গ্রহণ ও আত্মীকরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে এই অঞ্চলের নিজস্ব লোকসঙ্গীতের ধারা। প্রবন্ধে তিনি লোকসঙ্গীতের তালিকা, শনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল, লোকসঙ্গীতের স্রষ্টাদের তালিকা এমনকি ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুরের শনাক্তকৃত লোকশিল্পীদের একটি বড় তালিকার কথা উল্লেখ করেন। লোকসঙ্গীতের সংরক্ষণ সম্পর্কিত একটি সুপরিশমালায় তিনি লোকসঙ্গীতের লেখ্য রূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা বলেন এবং সুর ধরে রাখার জন্যে অডিও টেপ, ভিডিও টেপ এবং ডকুমেন্টারি তৈরি করে রাখার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, লোকসঙ্গীতের যে বিশাল রত্ন রয়েছে এই দেশ তাকে যথাযথ উপস্থাপন করতে পারলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারবে।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্বের পর সভাপতি জনাব আব্বাসী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তার যথাযথ দলিলীকরণ ও সংরক্ষণের কথা বলেন। তাঁর মতে, ভাটিয়ালিকে নদীবিধৌত বাংলার আদি ও মৌলিক লোকসঙ্গীত বলা যেতে পারে। তিনি মনে করেন ভাওয়াইয়ার উপর যত কাজ হয়েছে ভাটিয়ালির উপর তত হয়নি। ভাটিয়ালি গানের জন্য তিনি স্বতন্ত্র প্রকল্প গ্রহণের কথা বলেন। তাঁর মতে বর্তমানে লোকসঙ্গীতের মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত নেই। তাই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই স্বত্ব সংরক্ষিত হতে পারে।

ষষ্ঠ অধিবেশন
২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৮
কক্ষ-২

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের ষষ্ঠ অধিবেশন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রশাসনিক ভবনের সেমিনার কক্ষ-২এ শুরু হয় সকাল ১১:৩০ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আবুল আহসান চৌধুরী। সেমিনারে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রথমে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার লোকসঙ্গীত নিয়ে জনাব সাইমন জাকারিয়া এবং পরে বৃহত্তর যশোর জেলার লোকসঙ্গীত নিয়ে মহসিন হোসাইন লিখিত প্রবন্ধটি পড়ে শোনান।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে জনাব সাইমন জাকারিয়া বলেন, ঐতিহ্যিক তৎপরতার সঙ্গে কুষ্টিয়ার গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের আদি ও আসল ঐতিহ্যের প্রবাহ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। দেশবাসীর কাছে লালনসঙ্গীত ও বাউলগানের রাজধানী হিসেবে কুষ্টিয়া স্বীকৃত হলেও অন্যান্য বহু ধরনের লোকসঙ্গীত যেমন- পদ্মপুরাণ গান, কীর্তন গান, মানিকপীরের গান, অষ্টগান, নছিমন গান ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। এই জেলার লোকসঙ্গীত চর্চার বিশেষত্ব হচ্ছে এখানকার অধিকাংশ লোকসঙ্গীত সর্বধর্মীয় সমন্বয়ের চরিত্র ধারণ করে আছে। শুধু তাই নয়, সনাধর্মীয় অনেক আখ্যানগীত কুষ্টিয়া অঞ্চলের মুসলমানরা এখন চর্চা করে ফিরছে। যেমন, লোকায়ত সর্পদেবী পদ্মায় আখ্যানভিত্তিক পদ্মার নাচনের ধারণ বাহন এখন মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ সকল দিক বিবেচনায় এনে কুষ্টিয়ার লোকসঙ্গীত নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

বৃহত্তর যশোর জেলার লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে জনাব মহসিন হোসাইন বলেন, যশোর লোকসঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। আধুনিক ফোকলোর বিশ্লেষকেরা যশোরকে অভিহিত করেন চারণ কবিদের অঞ্চল বলে। যুগ যুগ ধরে এই জনপদের লোকসঙ্গীত রচয়িতাদের বাণী ও সুর একটি ভিন্ন স্বাদের আবহ নির্মাণে সহায়তা করেছে। শহরায়ন ও শিল্পায়নের থাবায় যশোরের গ্রামীণ লোকসঙ্গীতের কয়েকটি ধারা বিলুপ্ত হয়েছে, কয়েকটি আজো চলমান। প্রবন্ধকার সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীতের তালিকায় মোট ১৯টি এবং সনাক্তকৃত লোকসঙ্গীত সম্প্রদায়ের তালিকায় মোট ৩১টি নাম উল্লেখ করেন। তাছাড়া তিনি প্রবন্ধে ২১টি লোকবাদ্যের কথাসহ সুপারিশমালায় লোকসঙ্গীতের উপস্থাপন সম্পর্কিত মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, লোকসঙ্গীতকে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা চলবে না। একে দেশ গঠন ও নীতি নৈতিকতা সৃষ্টিতে নতুনভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

অতঃপর প্রবন্ধকাদ্বয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সভাপতি মুক্ত আলোচনার জন্যে উপস্থিত শ্রোতাদর্শকদের অংশগ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানান।

পরিশেষে সভাপতি প্রফেসর আবুল আহসান চৌধুরী বলেন, কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের একাধিক প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত হতে হয় বা একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় । পাশাপাশি ঐ বিষয়ে পূর্বসুরী কারা কাজ করেছেন বা কাদের সংগ্রহ আছে তাদের সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন। লোকগানে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন যেমন রয়েছে তেমনি ভাষাতাত্ত্বিক, রূপগত বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। আমাদের আসল পরিচয় শেকড়ের পরিচয়।

সভাপতির বক্তব্য প্রদানের শেষে বেলা ১:৩০ টায় ষষ্ঠ অধিবেশন সমাপ্তি হয়।

www.pathagar.com

সপ্তম অধিবেশন
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
কক্ষ-১

অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের সভাপতিত্বে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কক্ষে সকাল সাড়ে নয়টায় সেমিনারের সপ্তম অধিবেশন শুরু হয়।

এ অধিবেশনে জনাব মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরীর চট্টগ্রাম বিভাগের লোকসঙ্গীত ও জনাব মালিক সোবহান বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার লোকসঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অধিবেশনের শুরুতে লোকসঙ্গীত খণ্ডের সম্পাদক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, আমাদের মূল কাজ হচ্ছে লোকসঙ্গীতের যথার্থতা নির্ণয় করা। আমরা লোকসঙ্গীতের মর্মমূলে প্রবেশ করলে লোকসঙ্গীতের মধ্যে নান্দনিক দিকটি খুঁজে পাই। বরিশালের রয়ানি ছিল একটি ধর্মীয় বিষয়। বর্তমানে রয়ানি সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে গান গায়। লোকসঙ্গীতের প্রতিটি শাখায় কপিরাইটের দরকার। কেউ কেউ বলেন, লোকসঙ্গীতের কপিরাইট নেই। ইন্দোনেশিয়ার কপিরাইট আইনে ফোকলোরের কপিরাইটের বিধান রাখা হয়েছে। আমরা প্রথম বাংলাদেশে ফোকলোরের ওপর কপিরাইটের আইন ড্রাফট করে ওয়াইপো-তে পাঠিয়েছি। এটি বাস্তবায়ন হলে লোকমানুষ ও সমাজ উভয়েই উপকৃত হবে। গম্ভীরা চাঁপাইনবাবগঞ্জে উৎপত্তি হয়েছে। এখানে এসেছে মালদহ থেকে। মালদহে শিবের বন্দনা দিয়ে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়। চট্টগ্রামের হঁওলা গানের প্রচলন রয়েছে। এগুলো কপিরাইট আইনের আওতায় আনা যেতে পারে।

অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সেমিনারের মূল পর্ব শুরু করেন। তিনি জনাব মালিক সোবহানকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার লোকসঙ্গীত প্রবন্ধটি উপস্থাপন করার কথা বলেন।

জনাব মালিক সোবহান বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার লোকসঙ্গীত প্রবন্ধ পাঠ করতে গিয়ে বলেন, মুহম্মদ নূরুল হুদা ২০০৫ সালে 'আমার দেশ' পত্রিকায় মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের ওপর নিয়মিত একটি কলাম লিখে লোকসংস্কৃতির মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ সম্পর্কে এদেশে আলোচনার সূত্রপাত করেন। চট্টগ্রামবাসীরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। চট্টগ্রাম বিভাগ একটি বহুজাতিক সংস্কৃতির মিলনভূমি। একদিকে হিন্দুরা পেয়েছে সীতাকুণ্ডে শিবের চন্দ্রনাথ মন্দির। মুসলমানরা পেয়েছেন বায়েজিদ বোস্তামির মাজার। এসব দিক থেকে চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতের ওপর মানুষের আলাদা একটা টান রয়েছে। সদ্য প্রয়াত শেফালী ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে (২০০৫) বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ও আদিবাসী উপজাতি সবাই গায়ক ও বাদক। চলার পথে, কাজের ফাঁকে, ব্যস্ততা ও অবসরে যে কেউ মনের অজান্তেই গেয়ে ওঠেন তার প্রিয় গান। এসব লোকসঙ্গীত বিচিত্রভাব, সুর ও বাণীবিন্যাসে হৃদয়গ্রাহী।

তিনি আরো বলেন, এম এন আখতার রচিত ও সুরারোপিত দুটি অবিস্মরণীয় লোকসঙ্গীত 'কইলজার ভিতর গাঁথি রাইকখুম তোঁয়ারে' এবং 'যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম'। প্রথম গানটি প্রায় তিন দশক আগে দ্বৈতকণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ড করেন সাবিনা ইয়াসমিন ও এম এন আখতার। সম্প্রতি গানটি এনটিভির ক্লোজআপ ওয়ান শিল্পী সালমার একক কণ্ঠে অডিও প্রতিষ্ঠান 'গাঙচিল' তাদের 'বন্ধু আইও আইও' অ্যালবামে অন্তর্ভুক্ত করে বাজারে ছেড়েছে। তাঁরা মূল গানটির সুর বিকৃতিসহ দুটি অন্তরা বাদ দেন। উপরন্তু রচয়িতা বা মূল শিল্পীর অনুমতি নেননি বা কোথাও তাঁর নামও উল্লেখ করেননি। একই ঘটনা ঘটে অপর আরেকটি গানের ক্ষেত্রে। সত্তর দশকের সাম্পানওয়ালা চলচ্চিত্রে শিল্পী শেফালী ঘোষ গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি উক্ত গানটিও নতুন সাম্পানওয়ালা ছবিতে প্রচারিত হয়। কিন্তু তারা গীতিকার বা শিল্পীর কোন অনুমতি নেয়নি। এ ব্যাপারে এম এন আখতার এনটিভিতে ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চান যে, তাঁর গানটির গীতিকার ও সুরকারের নাম দেয়া হলো না কেন? এনটিভির পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয় যে, গানটি তাদের সংগ্রহের, সুতরাং নাম দেওয়ার দরকার নেই।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাও এখন হুমকির মুখে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য এলাকার লোকসংস্কৃতি না পড়িয়ে চট্টগ্রামের লোকসংস্কৃতির বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করাসহ একটি লোকসংস্কৃতি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

জনাব মালিক সোবহানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ জনাব মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরীকে 'চট্টগ্রাম বিভাগের লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধটি উপস্থাপন করার কথা বলেন।

মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী 'চট্টগ্রাম বিভাগের লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধে বলেন, চট্টগ্রামে পুঁথি পাঠ, বন্দনা গীতি, পালা গান, উল্টা বাউলের গান, হাতি খেদার গান, জারি গান, হাইল্যা সাইর (হালিয়া সারী), পাইন্যা সাইর, কীর্তন, বৃষ্টির গান, ঢাকিবাদ্য ও নাচ, বারমাসী গান, মেয়েলীগীত, বেদের গান, ঝাড়ফুঁকের গান, লোকসঙ্গীতে বদর পীর, মারফতী গান, বাউল গান রয়েছে।

হাতি খেদা নিয়ে চট্টগ্রামে গীতিকা, পথকবিতা ও গান রচিত হয়েছে। 'ওরে গোলবদন জমাদার মস্ত পালোয়ান/সকলের ছরদার মিঞা আকল ভালা তান।' উল্টা বাউলের গান বাউল গীতসমূহ বৈরাগ্যপূর্ণ এবং বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিকতা ঢঙে গঠিত: 'না মাথাৎ দি ড্যুইর বাইয়াম/গাঙে নাইরে পানি'।

ঢাকিবাদ্য ও নাচ: চট্টগ্রামের ডোম বা জেলে সম্প্রদায়ের জেলেরা চৈত্রমাসের শেষ পনের দিন থেকে ১ বৈশাখ পর্যন্ত ঢাকি নামে খ্যাত হত। এ দু'সপ্তাহে ঢাকিরা গ্রাম-চট্টলার হিন্দু মুসলমান পাড়ায় পাড়ায় 'ঢাকি বাদ্য' বাদন ও নাচ দেখিয়ে ধান, চাউল, পয়সা বখশিস আদায় করত।

এভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম কর্মশালার মাধ্যমে জাতীয় সুরকার, শিল্পীদের চিহ্নিতকরণ এবং তথ্য উপাত্ত আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে হবে।

সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক শাহেদ তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, দু'জন বক্তাই ভালো বলেছেন। এখানে চট্টগ্রামের কিছু আঞ্চলিক ও নিজস্ব গানের কথা এসেছে। যেমন মাইজভাণ্ডারী ইত্যাদি। কবিগানের ধারা এখানে কিভাবে আসল এটাও একটা চিন্তার বিষয়। কলকাতা মাঝখানে ঢুকে গেছে। রমেশ শীলের গান ফকির আলমগীর ও বেবী নাজনীন গেয়েছেন। তাঁদের যখন আমি জিজ্ঞেস করেছি গানটি কোথায় পেয়েছেন, এটি তো রমেশ শীলের গান, তখন তাঁরা জানান, তারা গানটির রচয়িতা, সুরকারের নাম জানতেন না। আমাদের কর্তব্য হতে পারে, যে গানগুলো বিকৃত হচ্ছে তা বন্ধ করা। প্রকৃত সুর ও কথায় গান গাওয়ার ব্যবস্থা করা। সিলেবাসের ব্যাপারে তিনি বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যদি পাঠ্য করে স্থানীয় লোকসংস্কৃতি পড়াতে পারে তাহলে প্রত্যেক এলাকার লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। এক অঞ্চলের লোকসাহিত্য যদি আমরা সব জায়গায় পড়াই তাহলে লোকসাহিত্য চর্চা হবে না।

প্রবন্ধে দ্বিতীয় যে কথাটি এসেছে তা হলো সঙ্গীত অসাম্প্রদায়িক। যিনি গান গাইছেন, কি গান গাইছেন, তার ধর্ম কি এটা আমাদের জানার বিষয় নয়। কোন গানের প্রচলন আছে, কোন গানের প্রচলন কমে গেছে। আমাদের এ ব্যাপারে উদার হওয়া দরকার। চট্টগ্রামের নিজস্ব কিছু গানের কথা এসেছে। মাইজভাণ্ডারী গানের কথা এসেছে। লোকসঙ্গীতের চর্চা বাড়াতে হবে আমাদের সবাইকে।

অতঃপর তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, বাংলা লোকসঙ্গীত নিয়ে সমীক্ষা করার যে উদ্যোগ এশিয়াটিক সোসাইটি নিয়েছে, তাকে আমি স্বাগত জানাই। আরও আনন্দের কথা, সোসাইটির এ প্রকল্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল পর্যায়ের লোকসঙ্গীত গায়কদের সম্মিলন ও গান পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে চলমান সেমিনার ও পরিবেশনা থেকে আমরা সমগ্র বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে সক্ষম হব।

বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে লোকসঙ্গীত তুলনামূলক বিচারে যতটা আঞ্চলিক, তার চেয়ে বেশি জাতীয়। তবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন জেলা বা তার চেয়েও ছোট অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকসঙ্গীতও কম নয়। এই লোকসঙ্গীত গড়ে উঠেছে বাংলার ভূগোল ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এর নদী, হাওর, বন-জঙ্গল, ধূসর ভূমি জন্ম দিয়েছে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার। অন্যদিকে বাংলার পার্বণ, উৎসব,

www.pathagar.com

মেলা এবং অন্যান্য কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে নানা লোকসঙ্গীত সৃষ্টিতে। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার ছবিও পাওয়া যায় বাংলার লোকসঙ্গীতে।

আঞ্চলিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক কারণে। চট্টগ্রামের অবস্থান বাংলাভাষী অঞ্চলের প্রান্তে এর পরই তিব্বতী-বর্মী অঞ্চলের শুরু। সুতরাং শংকর সংস্কৃতির পীঠস্থান বলা যেতে পারে এ অঞ্চলকে। চাটগাঁ শহর থেকে কর্ণফুলী পার হয়ে সাংখ নদী পার হলেই বদলে যেতে থাকে এ অঞ্চলের ভূগোল-ইতিহাস। ফলে বহু বিচিত্র গান পাওয়া যায় এ অঞ্চলে; জল, পর্বত আর সমতলভূমির সমন্বয় লোকগানের মধ্যেও তাই দুর্লভ নয়। ফলে গত হাজার বছর ধরে চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতির এক ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য। তাই প্রাচীন গান হাইল্লাসারি, পাইন্নাসারি বা ই-অ-লা চট্টগ্রামেই টিকে আছে। অন্যদিকে কবিগানের কিংবদন্তী রমেশ শীল অথবা আঞ্চলিক গানের কিংবদন্তী শেফালী ঘোষ অথবা ধ্রুপদ ও লোকনৃত্যের সমন্বয়ে নতুন নৃত্যশৈলীর স্রষ্টা বুলবুল চৌধুরী তাঁরা সকলেই চট্টগ্রামের।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের এসব বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপস্থাপিত হয়েছে এ অধিবেশনের দুটি প্রবন্ধ মালিক সোবহানের 'বৃহত্তর চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত' এবং মুহাম্মদ ইসহাক চৌধুরীর 'চট্গ্রাম বিভাগের লোকসঙ্গীত'। দুটি প্রবন্ধেই চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকসঙ্গীত সমীক্ষা করা হয়েছে; মূল্যায়নের চেষ্টাও রয়েছে সঙ্গে।

দুটি প্রবন্ধেই বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে মেধাস্বত্বের বিষয়। এ বিষয়ে দু'একটি কথা বলি।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বা মেধাস্বত্ব বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। গত শতকের শেষে বিশ্বব্যাপী ৩৭ লক্ষাধিক প্যাটেন্ট, ১১০ লক্ষ ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন এবং ১৩ লক্ষ শিল্প-ডিজাইন কার্যকর ছিল। বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ বই ছাপা ও ৫ হাজার কাহিনীচিত্র তৈরি হচ্ছে এবং বিক্রি হচ্ছে ৩০০ কোটি ডিস্ক ও টেপ। বর্তমান জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যেমন একদিকে ধনসম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ার; পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির উপকরণও।

বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের সুরক্ষার দায়িত্ব জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা (WIPO)-র ওপর ন্যস্ত; এটা করা হয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের বিধিগত ও প্রশাসনিক দিক বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের রয়েছে দুটি প্রধান ভাগ : শিল্পকারখানাগত সম্পদ প্রাথমিকভাবে যার মধ্যে রয়েছে উদ্ভাবন, ট্রেড মার্ক, শিল্প ডিজাইন ও উদ্ভবের সংজ্ঞা; এবং মেধাস্বত্বযা মূলত সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, আলোকচিত্র ও কাব্য-দর্শন কাজের।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে ওয়াইপো-র মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা; সরকার, সংগঠন ও বেসরকারি খাতকে সহায়তা; মাঠ পর্যায়ের ঘটনাবলী তদারক করা এবং নিয়ম অনুশীলনের সমন্বয় ও সরলীকরণ।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের বিবিধ নিয়ামক-দিক সম্বলিত ২১টি চুক্তি পরিচালনা করে ওয়াইপো, এর কয়েকটি ১৮৮০-র দশকে গৃহীত। এর দুটি মুখ্য চুক্তি হচ্ছে ১৮৮৩ সালের শিল্প কারখানাগত সম্পদ সুরক্ষার প্যারিস কনভেনশন এবং ১৮৮৬ সালের সাহিত্য ও শিল্পকলার সুরক্ষায় বার্ন কনভেনশন।

ওয়াইপোর কার্যক্রমের একটি মৌলিক অংশ হচ্ছে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথা ও মানের ক্রমবিকাশ ও প্রয়োগ। প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক প্রথায় অগ্রগতি এবং প্রথাগত জ্ঞান, ফোকলোর, জীববৈচিত্র্য ও জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্বেগের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ওয়াইপো অব্যাহতভাবে নতুন প্রথা ও মানদণ্ড গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ রয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়াইপো আন্তর্জাতিক প্যাটেন্ট আবেদন, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রিকরণ ও শিল্প কারখানার ডিজাইন আমানতের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেয়। দেশীয় সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের বিকাশ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবস্থার পূর্ব সদ্ব্যবহারের জন্যে সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উৎসাহিত করে।

www.pathagar.com

আইনগত ও কারিগরী সহায়তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে জাতীয় বিধিমালার খসড়া ও পুনর্লিখনে পরামর্শ ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে লাভবান হয় নীতি নির্ধারক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন দেশের জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কার্যালয়কে স্বয়ংক্রিয় করার জন্যেও সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতসহ মেধাস্বত্ব রক্ষায় ওয়াইপোর সাহায্য নিয়ে আমাদের আরও সক্রিয়ভাবে, আরও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া এখন সময়ের দাবি।

অষ্টম অধিবেশন
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
কক্ষ-২

সেমিনারের অষ্টম অধিবেশন ২৯ ফেব্রুয়ারি সকাল (৯:৩০ থেকে ১০:৩০ পর্যন্ত) ২নং কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী 'বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের লোকসঙ্গীত' এবং জনাব মহিবুর রহিম 'বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত' সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁরা তাঁদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর তাঁদের প্রবন্ধের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের লিখিত রূপ নিম্নে প্রদান করা হল:

বাংলাপিডিয়ার পর এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সমীক্ষার মত বিপুল জরিপ কর্মের আয়োজন করে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞের অপর এক মাইলস্টোন রচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে এত বড় কাজের পরিকল্পনা ইতোপূর্বে আর কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এই কাজের ফলাফলও যে সুদূরপ্রসারী হবে সন্দেহ কি!

সংস্কৃতির যেমন বাণিজ্যায়ন চলে, তেমনি বিলুপ্তায়ন বা বিপন্নায়নও ঘটে। সংস্কৃতির অতীত প্রবাহ ও বিদ্যমান ধারা তথা বর্তমান রূপ দুই না হলেও একও নয়। তবে সংস্কৃতির শক্তি ও সত্যরূপ খণ্ডিতভাবে জানা যায় না। তাকে পরিপূর্ণভাবেই আবিষ্কার করতে হয়। বর্তমান সংস্কৃতি-সমীক্ষার লক্ষ্য বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ধারা পরম্পরা ও শাখা-উপশাখার পরিপূর্ণ পরিচয় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা ও সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশব্যাপী অর্থাৎ সমভূমিই শুধু নয়, পার্বত্যভূমি নিয়েও, একটি জরিপ ভিত্তিক বিবরণ তৈরী করা। এ কাজে যাঁদের মাঠ-কর্মে লিপ্ত করা হয়েছে, তাঁরা যেমন তরুণ ও দেশপ্রেমী, তেমনি জন-সম্পৃক্ততায় আগ্রহী, স্বতোৎসাহী ও একনিষ্ঠ গবেষকও। তাঁদের কাজ, তথ্য-সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ প্রয়াসে সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। তরুণদের এই একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এবং এশিয়াটিক সোসাইটির আন্তরিক আগ্রহ ও পূর্ণ সহযোগিতা এখানে পারস্পরিক সম্পূরক হয়ে ওঠার কারণে বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে।

গবেষকদের ক্ষেত্রে যে জিনিষটা লক্ষ্য করা গেছে সে সম্পর্কে অন্তত একথা বলা যায় যে আঞ্চলিক সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি সন্ধানের ক্ষেত্রে পূর্বেকার গবেষকগণের দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে ছিল সনাতন, জ্ঞান-কুণ্ঠ ও বিষয়ের প্রতি আবেগগত পক্ষপাতদুষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রীতির প্রতি যেখানে কালেরও ছিল খানিকটা অনীহা ও ঔদাস্য আধুনিক কালে এসে গবেষকগণ সে ক্ষেত্রে খানিকটা হলেও প্রাগ্রসর চেতনা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে কালাগ্রসরতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে এই মহৎ আয়োজন ও মহিমা-সুবাসিত প্রয়াসের একটা মস্ত ইতিবাচক দিক। সময়ের চাহিদাপূরণে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টায় লক্ষ্য অর্জনের এই আয়োজনের মধ্যে যেন বাস্তবিক এক অসামান্য বৈপ্লবিক ঘটনাই ঘটে গেছে। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর মত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমন একটি ব্যাপৃত অনুসন্ধান কর্মে উৎসাহ যোগানো ও তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ আজ তাই আর বিস্ময়কর বলে মনে হয় নি। স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের আচরিক প্রাতিস্বিকতায় নেমে এসেছে তার এই উদ্যোগ প্রবাহ। যাই হোক, এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি ও তার আত্মোৎসর্গিত কর্মীবৃন্দ স্বতঃই সুধীজনের আন্তরিক অভিনন্দন ও সাধুবাদ অর্জন করে ধন্য হলো।

www.pathagar.com

আত্মার বিকাশের প্রয়োজনে ও সমাজগত প্রসারের কাররণেই সংস্কৃতি চর্চা এক আবশ্যকীয় বিনোদন। লোকসমাজেরও তো বহুমাত্রিক ও অতুলনীয় এক সৃষ্টি গৌরব! আমি ধন্য যে আজ আমার ওপর ভার পড়েছে এই লোকসংস্কৃতি-সন্ধান ক্ষেত্রে নোয়াখালি ও কুমিল্লা-পর্বের অনুসন্ধান-প্রতিবেদন উপস্থাপন সভার সভাপতিত্ব করার। আজকের উপস্থাপিত প্রবন্ধ দু'টি সত্যি মূল্যবান; এবং প্রশ্নকারী ও মন্তব্যকারীদের অংশগ্রহণও প্রবন্ধকারদের তথ্য ও বক্তব্যকে আরও ঋদ্ধ করেছে। উভয়পক্ষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অনেকের আলোচনা বিষয়কে যেমন বিস্তৃত করেছে। তেমনি সময়ের স্বল্পতার কারণে প্রবন্ধকারগণও সবিস্তারে ও সুস্পষ্টভাবে বিষয়কে শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করতে পারেন নি এবং সে ক্ষোভও তারা জানিয়ে রেখেছেন সবিনয়ে। তবে সমালোচকদের খননী মন্তব্যও অযৌক্তিক নয়। বিশেষত যাঁরা বলেছেন মাঠ-কর্মের কাজে অপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। এখনও বহু কাজ বাকী, বহু তথ্য অনুল্লিখিত (উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যেমন-বসুরহাট, হাতিয়া, প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কিছু লোকগান ও তার সুরগত বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখই হয় নি: দ্র. শিক্ষক জনাব মো. হাশেমের বক্তব্য। এ ছাড়া জনাব জলিল খানও তথ্য অবহেলার অনুযোগ করেছেন।) কিংবা যাঁরা বলতে চেয়েছেন একটা কেন্দ্রস্থান ঘিরে যে নিউক্লিয়াস গড়ে ওঠে এবং নির্দিষ্ট বা স্থানিক 'সংস্কৃতি-এলাকা' প্রতিষ্ঠিত হয় (অর্থাৎ যেমন ভাবে নৃ-ভাষাতাত্ত্বিক এম.কি. ইমেন্যু দেখিয়েছিলেন ভাষাগোষ্ঠী ও ধর্মগোষ্ঠী নির্বিশেষে একটা 'লিঙ্গুইস্টিক এরিয়া' সৃষ্টি সম্ভবএকইভাবে 'কালচারাল এরিয়া'ও গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক অন্তত 'কালচারাল সাব এরিয়া' সৃষ্টি হতেই পারে), তার বিস্তৃতির এলাকা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন; তার কেন্দ্র ও পরিধির সৃষ্টি স্বরূপ ও বৈচিত্র্য নির্ধারিত হওয়া উচিৎ কিংবা জনাব আবদুল মজিদ যেমন যথার্থই বলেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও বৃহত্তরভাবে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও প্রণোদনার অভাবে বহু গবেষণার ও সানুরাগী অন্বেষার ঐতিহ্যিক ধারায় এসেছে ক্ষয় কিংবা ধ্বস, সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব ধারা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে এখনও এব ক্ষেত্রে বহু কিছু করা সম্ভব সুধীবৃন্দের এ সব কথা, জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নাক্ত মন্তব্য বাস্তবিকই এড়িয়ে যাবারও নয়। আসলে যা সত্য তা অস্বীকার করে লাভ কি? আমিও তাঁদের কথার যৌক্তিকতা ও বাস্তব ভিত্তি স্বীকার করে নিয়েই দু'একটি কথা এখানে যোগ করতে চাই।

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিবেশ ও স্থানিক সম্ভাবের পাশাপাশি সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির সংযোগও অবশ্যই অনস্বীকার্য। যে কারণে একজন মন্তব্যকার জনাব জলিল খান আরও একটু এগিয়ে নদী-মাঠের অপরিকল্পিত হরণ ও পরিবেশ পরিবর্তনই শুধু নয়, দূষিতকরণের ও তজ্জনিত শঙ্কার প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন। নদী শুকিয়ে গেলে, নাব্যতা হারালে জীবনও সেখানে শুকিয়ে যায়। আর যেখানে মৌসুমী নদীর আকার ধারণ করে শীর্ণ কোনও স্রোতরেখা সেখানে ও অন্যত্রও মাঝিদের বৃত্তিতেও আসে সামগ্রিক পরিবর্তন। শ্যালো মেশিন চালনার জন্য তাকে অর্জন করতে হয় নৌ চালনার শক্তি ও শিক্ষার অতিরিক্ত কারিগরী জ্ঞান। মাঝির সেখানে উদাস হবার অবকাশ কই? এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'লোকসংস্কৃতি'-র সোনালী দিন যে শেষ হয়ে গেছে, তা বলাই যায়। গবেষকগণও সে সব তথ্য আর খুঁজে পান না বলে অভিযোগ করেন। শুধু তাই নয়। মাঠকর্মের কষ্ট ও বিপদের কথা বাদ দিলেও সোর্সম্যান (source man)-এর 'দেখা পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও উৎসাহ-অনুরাগ দেখার না' এবং অতিথিপরায়ণ গৃহী দূরে থাক। কোনও প্রতিষ্ঠানেরও যথার্থ সহযোগ আজ রীতিমত বিরল ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে লোকসংস্কৃতির কিইবা তার মাধুর্য, কিসেরই বা তার মূল্যায়ন? লোক-দল বা গোষ্ঠী-হারা গ্রাম, জনগোষ্ঠীর ভাষ্যতাড়িত অভিবাসনে লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণও হয়ে উঠেছে অসম্ভব। এসব কারণে কাউকে লোকগবেষণায় উৎসাহিত করাও বিড়ম্বনা বিশেষ।

তবু ঐতিহ্য সন্ধানে হতাশাটাই বড় কথা নয়। প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং প্রেম। তবে এ ক্ষেত্রে কি শুধুই গবেষণা সর্বস্ব লোকসাহিত্য সংস্কৃতির কথাই আমরা ভাববো, নাকি জীবন্ত ও সমাজ সত্য ধারক কোনও গুপ্ত ও অন্তর্সত্যের জন্যও আমরা আরও অধিক গুরুত্বসহকারে ও গুরু আয়োজনে এই প্রেম-অনুসন্ধানকে আরও আবশ্যিক করে তুলবো? এবং তার পন্থাই বা কি? যা সনাতন কেবলই কি তাই, নাকি

www.pathagar.com

চিন্তা চেতনা ও মানসিকতারও পরিবর্তন এসব ক্ষেত্রে খুবই জরুরী? এ নিয়ে কি আজ আমাদের ভাবা দরকার নয়? এই প্রশ্নেই আমরা এসে যাই লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির 'মেধাস্বত্ব'-র কাছে। এই 'মেধাস্বত্ব' বিষয়টি আজও স্বীকৃতি পায় নি, এ নিয়ে কারও মাথা ব্যথাও নেই। তাই এই অবহেলা কারও গায়েও লাগে না। কিন্তু তার জন্য কবে কোন কবি নূরুল হুদা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, নিজস্ব বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বা ছত্রচ্ছায়ায় (দেশীয় বা আন্তর্জাতিক অর্থানুকূল্যে?) একটা আন্দোলন গড়ে তুলবে তার জন্য কি আমাদের বসে থাকতে হবে? একজন আধুনিক শিক্ষা-বঞ্চিত অথচ ভূয়ো-দর্শনে দীক্ষিত জ্ঞান-সন্ত কোন অজ গ্রামবাসী বা প্রত্যন্তলোকের গেঁয়ো কবিজনের সাধারণ একটা স্বীকৃতির জন্য তাকে এত কাঠ খড় পোড়াত হবে কেন? এই স্বীকৃতিটুকু দিতে আমাদের এতটাই কেন কার্পণ্য ও কালক্ষেপের দুর্মূল্য বিলাসিতা?

এ প্রসঙ্গে গবেষকগণের দায়িত্বের কথাতেও আসতে হয়। গবেষণার বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে জানা ও যথাযথভাবে ও সবিস্তারে তাকে উপস্থাপিত করা গবেষকের কাজ। তাঁর গবেষণার মূল্য সেখানেই। আরও বিশেষভাবে বললে বলা যায়, যেমন যিনি নোয়াখালি বা কুমিল্লা যে অঞ্চলকেই তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় ও এলাকা নির্ধারণ করুন, সেই বিশেষ প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকসাধনার ও লোকজ সৃষ্টির ইতিহাস সন্ধান ক্ষেত্র যে বিষয়ে অন্তত মৌলিক কিছু বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ও মাঠভিত্তিক অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। অস্কার ওয়াইল্ডের প্রাবদী-উক্তি 'আমাদের ভুলের জন্য যাকে দোষারোপ করা চলে সে আমাদের অভিজ্ঞতা।' বাকীটা আহরিত তথ্য। সুতরাং নোয়াখালির সংস্কৃতি নিয়ে যিনি কাজ করবেন তাকে কেবল আজকের নোয়াখালিকে নিয়ে এবং শুধু তাৎক্ষণিক দেখার মনোভাব নিয়ে বিচার করলেই চলবে না; সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আরও গভীরতর বিষয় দাবী করে। একটা অঞ্চলের স্বকীয়তা একদিনে গড়ে ওঠে না। তার মধ্যে থাকে অনেক ভাঙ্গা-গড়া। যেমন ইদানীং 'বৃহত্তর জেলা' বলে একটা কথা সৃষ্টি হয়েছে। বৃহত্তর নোয়াখালি থেকে এখন যে অংশটা আলাদা হয়ে গেছে সেই প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক অংশটি সত্য বস্তু হিসাবে কোনও শূন্যতা সৃষ্টি করেছে কিনা বা স্থানীয় এই অংশ-সংস্কৃতিতে কোনও প্রভাব ফেলেছে কি না -- সে হিসাব, সে প্রতিতুলনার বিচার বিবেচনা এখানে জরুরী। রুখসাত পূরাতে কোনও কথা বাকী রাখা মানে তথ্য অপূর্ব রাখা। মনে রাখা দরকার ভূ-সীমা ও সংস্কৃতি সীমার মধ্যে সম্পর্কটা স্থায়ী কিছু নয়। একসময় নোয়াখালি-সংস্কৃতি আলোচনায় ফেনী-সংস্কৃতি বলে কিছু ছিল না। নোয়াখালিও তখন অন্য পরগণাভুক্ত অংশভূমি মাত্র ছিল। ঐতিহ্য বা পূর্ব ইতিহাস সাংস্কৃতিক বন্ধন ও সাংস্কৃতিক-সীমা নির্ধারণে অবিকল্প সহায়। সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পূর্ণতা সৃষ্টির জন্য প্রত্নরহস্য সন্ধানের গুরুত্ব তাই এত বেশি। ভুলুয়া বা রওশনাবাদ পরগণা এবং বরিশাল-সীমান্তিক কবি আলাউলের 'মলুক ফতেয়াবাদ', এমন কি সন্দ্বীপ পর্যন্ত এলাকা সবই মেঘনা নদীর অবিরাম 'একুল ভাঙ্গা ওকুল গড়ার' খেলা এবং ১৮শ শতক ও তার পূর্বেকার ভূকম্প প্রবাহের সাক্ষী। একসময় হাজীগঞ্জে আরব্য বাণিজ্যিপোত নিরাপদ আশ্রয় নিত হাজীগঞ্জের কাছে নিমগ্ন আরবীয় তরীতে উমাইয়া খলিফার মুদ্রাও পাওয়া গেছে (দ্রষ্টব্য: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর সংরক্ষণশালা)। ঠিক এমনই নদীভিত্তিক সংগ্রামী জীবন-চিত্র ও সংস্কৃতি সংলগ্ন ভূমি কুমিল্লারও (যেমন ময়মনসিংহেরও)। কিন্তু তবু আঞ্চলিক পার্থক্য থাকেই, যে পার্থক্য নদীখাত, স্রোতপ্রবাহগত শক্তি ও বাঁকসৃষ্টির ধর্ম নিয়ে গড়ে ওঠে ও যার প্রভাব জীবন-জীবিকার ধারাকে করে তোলে বিচিত্রমুখী। এ কারণেই ভাটিয়ালি ও সারি-জারি গানের ক্ষেত্রভূমি স্বতন্ত্র। আবার এও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, নোয়াখালির সংস্কৃতি জরিপের প্রথম সংবাদগুলিও অভিন্ন নয়। মোহাম্মদ মোর্তজা আলীর নোয়াখালি-কুমিল্লার একস্বরতার তত্ত্ব এবং পরে খালেদ মাসুক রসুলের নেয়াখালি-ফেনীর দ্বিস্বরতার তত্ত্ব নোয়াখালির লোকতাৎপর্যক সংস্কৃতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের উদাহরণ মাত্র। তথ্যের এই পার্থক্য ও বৈচিত্র্য শুধু নয়, অনুসন্ধানের লক্ষ্য, তাৎপর্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য বৃহত্তর। বর্তমান গবেষকগণের অবস্থান সেক্ষেত্রে কোথায় হবে অন্ধভাবে তা নির্ধারণ করতে গেলে ভুলই নয় শুধু, তা'হবে বিভ্রান্তিকর। এ ক্ষেত্রে তত্ত্বকে প্রাধান্য দিলে যেমন লোকসত্যই হারিয়ে যাবে, তেমনি মাঠতথ্যকে অপ্রধান ভাবলেও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হবে অসম্ভব।

www.pathagar.com

আমরা একটা কথা ভুলে যাই যে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একরৈখিক গবেষণাই মুখ্য বিষয় নয়। সেটা লক্ষ্যও নয়। মনে রাখতে হবে 'গবেষণা' যেমন সৃষ্টি নয়, তেমনি সৃষ্টির বিকল্পও নয়; মৌলিক সৃষ্টির বিকল্প হয় না কিছুই। তত্ত্বকে স্পষ্ট করার প্রয়োজনে হারানো (হারিয়ে যাওয়া বা লুপ্ত হওয়া) সত্যের অনুসন্ধান, পুনরর্বিচার, পুনর্গঠন ও পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক হয় মাত্র। সুতরাং তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তার ঐতিহাসিক দিক ও মূল্য রক্ষা করার সামগ্রিক উদ্যোগটাই প্রধান। আজ এটাই আমাদের সবচয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য কেবলমাত্র লেবরেটারী-জ্ঞান ও বিদেশী জ্ঞানানুশীলনই কি সব? তার থেকে আমরা কী লাভ করতে পারবো? আমরা 'গ্রন্থজ্ঞানে' শিখি 'চেইন-স্টোরিস', কিংবা 'কেচ্ছা' বা 'শুলুক'-এর মটিফ। নিজেরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না। প্রপিয়ান-তত্ত্ব বা লেভিস্ট্রস-এর তত্ত্ব দিয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চার জেনিথের পরিমাপ করি, তার বেশি কিছু নয়। মনে রাখতে হবে এটা প্রতিযোগিতা এবং উন্নতির জ্ঞানের ও কারিগরীবুদ্ধি প্রয়োগের যুগ। তাকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান। এই জ্ঞানের মহাসড়কে (ইনফরমেশন টেকনলজির হাইওয়ে-তে) আমাদের পৌঁছাতেই হবে। বিশ্বায়ন আমাদের যেখানেই ভাসিয়ে নিক, শিকড়ে পৌঁছাতে পারলে আমরাও দাঁড়াতে পারবো। আজকের শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বলেছেন মিডিয়ার কল্যাণে গ্রামগঞ্জের মানুষেরাও আজ সজাগ। তারা আজ একা নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, নিখোঁজও নয়। লাতিন আমেরিকার লোকউৎসব আমাদের গ্রামীণ সমাজকেও উজ্জীবিত করতে পারে মুহূর্তে, নিমিষে। আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্শক্তি জাগ্রত হলে আগ্রাসিত শক্তি প্রতিরোধ কোনও ব্যাপারই নয়। পাওয়ার মার্কেটকে ঠেকাতে অতীতহারা এই দেশের নিজস্বতার ওপর কোনও ভাবাবর্তনেরই অনুপ্রবেশ ও আঘাতকে সহ্য করা বা Passive ভাবে মেনে নেওয়া উচিত হবে না। আমাদের সাবধান হতে হবে। আধুনিকতাবাদ (যেমন দেরিদার তত্ত্ব), ঘোলাটে ধোয়াশা আদিবাসীবাদ ও এই জাতীয় যাবৎ নীতিবোধশূন্য ও অগণতান্ত্রিক একপেশে মুনাফালোভী দর্শন থেকে আজ আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে শক্তি শিকড়েই বর্ধিত হয় 'তোমারে বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে।' এ সত্য মধ্যযুগীয় মাত্র নয়, চিরন্তন। লোকসংস্কৃতি তার আধার, শক্তির ধারক। হয়ত আজ সে নিরুদ্ধ, বন্দী, কারাগারে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু লোককবি গাহেন "কৃষ্ণে কি আর কংস-কারায় বেঁধে রাখা যায়?" আমাদের প্রবাদ, আমাদের গাথা-গীতি, আমাদের লোকজ্ঞানের সমূদয় ভাণ্ডার আবার যে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবন জোয়ারে জাগরণের ঊর্মি-প্রবাহন ঘটাবে না কে বলবে? এ সবই তো আমাদের স্বাধীনতা-সত্তার অন্তর্প্রবাহে আজ সুপ্ত মাত্র।

এশিয়াটিক সোসাইটির আজকের এই উদ্যোগ তারই এক মহাআশাবাদের লোক (সঙ্গীত) উৎসব। এই আয়োজনের পেছনে যে দর্শনটি ক্রিয়াশীল তা হল যে, যা অর্জিত হয় নি, তাকে অর্জনের সময়ও বয়ে যায় নি। সেই দিন ঐ আগত। এখন আর সালাম-সেলামীর সংস্কৃতি নয়। চাই সুস্থ সজীব জীবনময় সংস্কৃতি ও প্রফুল্ল জীবন। আমার আছে ঐতিহ্যের পুঞ্জিত আধার – সেই প্রাচীন দার্শনিক মুনি কণাদ-কপিল-বাচস্পতি-অতীশ দীপঙ্কর ও শীলভদ্রের প্রীত উচ্চারণ, আছে চর্যাকারগণ, আছে চণ্ডীদাস থেকে চট্টগ্রাম-আরাকানের দরবারী ও মরমী কবিগণ এবং বৈষ্ণব চূড়াকুলমণি রূপগোস্বামী থেকে নারীমুক্তির স্বাপ্নিক বেগম রোকেয়ার অন্তর-উদ্ভাস, আছে বিশ্বকবি আছে বিদ্রোহী কবি আছে রূপসী বাংলার কবি আছে পল্লীকবি আর তাঁদের মর্মরিত আলোড়ন-বিলোড়ন; আমার ভয় কিসের, লজ্জা কিসের, সংকোচই বা কিসের? বিশ্বায়নের চাপ ও পশ্চিমী বিস্তারের বাইরে আমার রয়েছে নিজস্ব উত্থানের শক্তি, যে শক্তি আনে রেনেশীয় অভ্যুত্থান, শক্তিময় জাগরণ। যে ইতিহাস উপনিবেশবাদে ও পরে তাকে ছাড়িয়ে পুনঃ উত্তর-উপনিবেশবাদে এসে গড়িয়েছে, তার কালধর্ম ও বস্তুধর্ম যতই স্থায়িত্বশীল মনে হোক, আমাদের সব কিছুই তার করতলগত নয়। অন্তত একটা জায়গায় আমরা এখনও উচ্চশির সে আমাদের লোকসাহিত্য। এই সৃষ্টি এমন এক শক্তি যা একদিকে যেমন ঐক্যবিধায়ক ও মানবতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা ও চিরন্তন মূল্যবোধ সঞ্চালক, তেমনি অন্যদিকে অনন্তসৃজনশীল ও প্রবহমান এক অজস্র অফুরন্ত ভাবরাশির লোকভাণ্ডার। তাকে এক মহাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা ও তার জন্য রক্ষাগৃহ তৈরি করার জন্য ব্যক্তিই

www.pathagar.com

শুধু নয়, প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন; এই ত্রিপক্ষীয় আয়োজন ও প্রস্তুতির মধ্যে তার সফল উদ্ভাবন বা পুনঃসৃজন এবং পরিণতিযুক্ত এক অভাবিতপূর্ব ফলশ্রুতি লাভ সম্ভব। খণ্ডিত বা আংশিক আয়োজনের যজ্ঞ ও যুদ্ধ ব্যর্থ বা হতকাম হতে বাধ্য।

আজ আমাদের কাম্য শুধু একথা বলতে পারা, 'আমরা প্রস্তুত'।

নবম অধিবেশন
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
কক্ষ-১

অধ্যাপক নন্দলাল শর্মার সভাপতিত্বে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কক্ষে সেমিনারের নবম অধিবেশন শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটায়।

এতে সর্বপ্রথম জনাব মাহফুজুর রহমান নির্ধারিত ছকে 'সিলেট বিভাগের লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, কীর্তন গান, জারিগান, সারিগান, ঘাটু গান, মালজোড়া, হোলি গান, নৌকা বাইচের গান, মণিপুরী মৈতৈ লোকসঙ্গীত, গারো লোকসঙ্গীত, হাজংদের লেওয়াতানা গান, গণসঙ্গীত, বিয়ের গান, ব্রতগান, ছাদ পেটানোর গান, বারমাসী গান সিলেট বিভাগের লোকসঙ্গীত। মণিপুরী মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুই সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে এখানে। এসব গানে মন্দিরা, ঢোল, দোতারা, একতারা, সারিন্দা, বেহালা, মৃদঙ্গ. ডপকি, বাঁশি, বগলী চটি, কেমটা, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ২০০৬ সালে সিলেট বিভাগে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ক্ষেত্র মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, কীর্তন ও অন্যান্য লোকগানের অডিও, সিডি, ভিসিডির ক্যাসেট ১২ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। যার বিক্রিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। লোকসঙ্গীতের কিছু কিছু গান বিপন্ন হয়ে গেছে। যেমন, সাপে কাটায় ওঝার গান, জারি গান, পালা গান ইত্যাদি। জনাব মাহফুজুর রহমান এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীতগুলো ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সংগ্রহ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

অতঃপর 'বৃহত্তর সিলেট জেলার লোকসঙ্গীত' বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রবন্ধকার দীপংকর মোহান্ত বলেছেন, পূর্বে সিলেটে নানা লোকাচার ও লোকধর্মের প্রচলন ছিল। সিলেটে তিলকরামকে কেন্দ্র করে সহজিয়া ধর্ম এবং নবীগঞ্জে ঘাট ঠাকুরবাণীর লোকধর্মের বিকাশ। এই উপধর্ম মতগুলোর সাধন-ভজনও চলত সঙ্গীতের মাধ্যমে। সিলেটের নাগরী হরফের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু ফকির গান লিখেছেন। সিলেট আউল-বাউল-পীর-মুর্শিদ সাধু সন্ত ও মাজারের সংখ্যা দেশের মধ্যে বেশি থাকায় তাদের উদ্দেশে বহু গান রচনা হয়েছে। গোবিন্দ কীর্তন সিলেটের নিজস্ব বলে ড. রাণী দত্ত মনে করেন। সিলেটে আজো সন্ধ্যার পর গ্রামেগঞ্জে কীর্তন গাওয়া হয়। দুর্গাপূজার গীতে দুর্গা দেবীর আগমন উপলক্ষে সিলেটি নারীরা নিজেদের সুখ-দুঃখের গান করে থাকেন। এসব গানে শিব ঠাকুরের ভাঙ্গা ঘরে দুর্গার বসবাস ও নানা পীড়নের কথা প্রকাশ পায়। বর্তমানে বাঞ্ঝা গীত, চড়ক পূজার গান, মুসলিম বিয়ের গান, নির্বাণ সঙ্গীত বা জগমোহনী সম্প্রদায়ের গান, পাঁচালী গান, মনসার গান বা ভাসান গান, গাজীর গীত, গোবিন্দ ভোগের গান, লাছাড়ী গান, মালজোড়া ইত্যদি গান বিপণ্ন হয়ে পড়েছে। মালসী গান, কবিগান, গাজন বা ত্রিনাথের গান, ঝুলন সঙ্গীত, গোপানী কীর্তন বা গোপী গান, বনদুর্গার গান, খুরমার গান, হাজিরাত গান, ছাদ পেটানোর গান, আরী গান, ভট্টসঙ্গীত, বারোমাসী গীতি, বিনালা গান বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে লোকসঙ্গীত সংগ্রহশালা জেলা বা বিভাগ অনুযায়ী গঠন করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে পাঠ্যবিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষার্থীদের ৫/১০ নম্বরের এ্যাসাইমেন্ট দিয়ে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা দীপংকর মোহান্তকে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান। অতঃপর জনাব হামোম তনুবাবু এরপর 'মণিপুরী লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

www.pathagar.com

জনাব তনুবাবু 'মণিপুরী লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধে বলেন, মণিপুরী লোকসঙ্গীতের মধ্যে গুনুংঈশৈ, খুলরঈশৈ, পেনাঈশৈ, খোংজোম ঈশৈ, নাউগুম ঈশৈ ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত হচ্ছে। মণিপুরী নারী-পুরুষ ক্ষেত্রে কাজ করার সময় গুলংঈশৈ গীত পরিবেশন করে থাকে। থোইবী মোইরবং অঞ্চলে থোইবী জগোই লোককাহিনীর জনপ্রিয়তা রয়েছে। মাইবী জগোই, খাম্বা থোইবী জাগোই'র লোককাহিনীও মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মণিপুরী গানে পেনা ঈশৈঃ নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটি নারকেলের খোল এবং কাঠ দিয়ে তৈরি এবং ছড় দিয়ে বাজানো হয়। এটি মণিপুরাদের লাইহারাওবা উৎসবে ব্যবহৃত হয়। মণিপুরী সঙ্গীতের মেধাস্বত্বের মালিক মণিপুরী সমাজের জনগণ। মণিপুরী লোকসঙ্গীতের বার্ষিক মূল্যমান ২০০৬ সালে লোকনৃত্য ও থাংতা মোট আয় হয় ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা। মণিপুরী লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্যকে ধরে রাখতে মণিপুরী লোকসঙ্গীত কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিলে মণিপুরী সম্প্রদায় তাদের সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে পারবে।

অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা সভাপতির তাৎক্ষণিক বক্তব্যে বলেন, উপজাতি, আদিবাসী এই শব্দগুলো সবসময় বিরোধিতাপূর্ণ। মণিপুরী নামে ভারতের একটি রাজ্যও এখনও আছে। সেখান থেকে একটি অংশ রাজনৈতিক কারণে এখানে এসে বসবাস করছে। তাদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। তাদের সঙ্গীতগুলো খুবই জনপ্রিয়। এখানে সিলেট বিভাগের দুটো ও মণিপুরী লোকসঙ্গীতের একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারি গানের যেমন জনপ্রিয়তা রয়েছে, তেমনি সিলেটের মালজোড়া গান, পট্ট সঙ্গীত, ঘাটু গান, গোবিন্দ গোপের গানের জনপ্রিয়তা রয়েছে। এগুলো প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। এগুলো যেহেতু সিলেট অঞ্চলের কোন না কোন স্থানে দীর্ঘদিন চালু সেহেতু তা বিলুপ্ত হতে পারে না। গণসঙ্গীত, সারি গান, জারি গান সর্বত্রই আছে। যেগুলো যেই অঞ্চলের সৃষ্টি তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। মণিপুরী ছাড়াও মণিপুরীদের প্রায় কাছাকাছি বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের গানের কথা এই প্রবন্ধে আসা দরকার ছিল। গারো, খাসিয়া, হাজং সম্প্রদায়ের লোকগীতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা দরকার। এসব মিলিয়ে একটি প্রবন্ধ থাকা দরকার ছিল। চা বাগানের আদিবাসীরা উড়িষ্যার লোক, দক্ষিণ ভারতের লোক, বিভিন্ন এলাকার লোকের মিশ্রণ এখানে। এদের ওপর কাজ করা জটিল। তারা সহজে আমাদের বিশ্বাস করতে পারে না। ব্রিটিশ আমল থেকে তারা আমাদের অবিশ্বাস করে আসছে। চা বাগানের লোকসংস্কৃতির ওপর আলাদা একটি প্রবন্ধ হলে ভাল হতো। পরে সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যের লিখিত রূপ প্রদান করেন। সেটি নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত বাংলাদেশ লোকসঙ্গীত উৎসব ২০০৮-এর সমাপনী দিনে সেমিনারের নবম অধিবেশনের সম্মানিত প্রবন্ধকারগণ ও সুধীবৃন্দ, আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান উদ্যোগকে আমি অভিনন্দিত করি। ইতঃপূর্বে গত জুন মাসে সোসাইটি 'লোকজ্ঞানে প্রবাদ প্রবচনের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছে। সেই কর্মমালায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে লোকসঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে আমরা আনন্দিত। আশা করি সোসাইটির এই আয়োজন অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা অধিক বেগবান হবে।

বর্তমান অধিবেশনে সিলেট বিভাগের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে মাহফুজুর রহমান, বৃহত্তর সিলেট জেলার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে দীপংকর মোহান্ত এবং মণিপুরী লোকসঙ্গীত সম্পর্কে হামোম তনুবাবু প্রবন্ধ পাঠ করলেন।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি বা লোকসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল শাখা লোকসঙ্গীত। বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রাচীন জাতির লোকসঙ্গীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের কয়েকটি ধারা দেশের সকল অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। হয়তো কোথাও এই ধারা ক্ষীণ আবার কোথাও তীব্র। বারোমাসি, জারিগান, সারিগান

www.pathagar.com

ইত্যাদি দেশের সর্বত্রই প্রচলিত। কিন্তু লোকসঙ্গীতের বেশ কিছু অংশ একান্তভাবেই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের। যেমন রংপুরের ভাওয়াইয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জের গম্ভীরা, চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারী, সিলেটের ধামাইল ইত্যাদি। মাহফুজুর রহমান ও দীপংকর মোহান্ত সিলেটে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন ও উদাহরণ দিয়েছেন। পাহাড়-টিলা, হাওর-বাওর, চা বাগান অধ্যুষিত সিলেট বিভাগের প্রাকৃতিক রূপসুষমা এখানকার মানবচিত্তকে বিবাগী করে তুলেছে। এরই প্রতিফলন এখানকার মরমি গান। এখানে লোকসঙ্গীতের বহুল প্রচলিত ধারাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজস্ব লোকসঙ্গীতের ধারা, যেমন-ঘাটু গান, মালজোড়া গান, হোলি গান, ব্রত গান, আরি গান, হিরালের গান, হাজিরাতের গান, ভট্ট সঙ্গীত, সূর্যব্রতের গান, মঙ্গলা গান, হাইড় গান, ধামাইল গান ইত্যাদি। এছাড়া মণিপুরি (মৈতৈ), মণিপুরি (বিষ্ণুপ্রিয়া), খাসিয়া, গারো, হাজং, পাত্র সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত সিলেটের লোকসঙ্গীতের ধারায় নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে। চা বাগানে বসবাসরত চা শ্রমিকদের বিভিন্ন ভাষার লোকসঙ্গীতও এখানে প্রচলিত। চা শ্রমিকদের ভাষা এক নয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁরা এসেছেন। ভারতের বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাঞ্চল, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের নানা ভাষার লোক এখানে আছেন। তাদের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের পরিচয় নেই।

মাহফুজুর রহমান ও দীপংকর মোহান্ত উভয়েই নিজ নিজ প্রসঙ্গ, ভূমিকা, সিলেট বিভাগ পরিচিতি, চারটি জেলার পরিচিতি দানের পর এখানে প্রচলিত সঙ্গীতের নাম উল্লেখ করে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ক্ষেত্রে বিশেষে উদাহরণও দিয়েছেন। তাঁরা এখানকার লোকসঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল, লোকসঙ্গীতের পরবর্তী বিস্তৃত স্থান, লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকা, লোকশিল্পীদের তালিকা, লোকসঙ্গীত দলের তালিকা, সামষ্টিক সঙ্গীতের তালিকা, একক সঙ্গীতের তালিকা, লোকবাদ্যযন্ত্র, বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান সঙ্গীতের তালিকা, বিপণ্ন সঙ্গীতের তালিকা সনাক্তকৃত লুপ্ত সঙ্গীতের তালিকা প্রণয়ন করে পরিশেষে সুপারিশমালা করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট ছকে কোনো অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের সামগ্রিক পরিচিতি প্রদান করা সুকঠিন। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটাতে একটি নির্দিষ্ট ছক তৈরি করা অপরিহার্য ছিল। সিলেটের লোকসঙ্গীতের যে কোন একটি ধারা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর। কাজেই একটি প্রবন্ধে সকল ধারার পরিচিতি প্রদান করা দুরূহ কাজ। প্রবন্ধকারগণ অতিসংক্ষেপে তা উল্লেখ করেছেন মাত্র। প্রবন্ধের কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে সকল গানের উদাহরণও দেয়া সম্ভবপর হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গানের প্রথম এক বা দু'চরণ উল্লেখ করা হয়েছে। লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের তালিকাও আরও দীর্ঘ হতে পারত।

হামোম তনুবাবুর মণিপুরী লোকসঙ্গীত প্রবন্ধটিতে মণিপুরী সমাজে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের দশটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। প্রত্যেক ধারার সঙ্গীতের উদাহরণ বঙ্গানুবাদসহ উপস্থাপিত হলে বৃহত্তর পাঠক সমাজ লাভবান হতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত বিষয়ক একটি প্রবন্ধ এবং চা শ্রমিকদের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ দেশের অন্যান্য অঞ্চল তো দূরের কথা সিলেটের জনমানসেও লোকসঙ্গীতের এই ধারা বহুল শ্রুত বা প্রচারিত নয়।

লোকসঙ্গীত সম্মেলন ২০০৮ আয়োজন করে সঙ্গীত পরিবেশনের পাশাপাশি সেমিনারের আয়োজন করা এবং একটি অধিবেশনে আমাকে সভাপতিত্ব করার সুযোগদানের জন্য আমি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রবন্ধকার মাহফুজুর রহমান, দীপংকর মোহান্ত এবং হামোম তনু বাবু অভিনিবেশী দৃষ্টিতে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনাও পাঠ করেছেন। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। এ অনুষ্ঠানের শ্রোতৃমণ্ডলী, প্রতিবেদকবৃন্দসহ সেমিনারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নবম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

www.pathagar.com

দশম অধিবেশন
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
কক্ষ-২

দশম অধিবেশনে প্রথমে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদেও লোকসঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক জনাব সুগত বড়ুয়া। তিনি তঁরি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির নৃত্যগীত ও অন্যান্য সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁর প্রবন্ধে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির ইতিহাস ও ঐতিহ্য আভাসিত হয়েছে।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত' বিষয়ে দ্বিতীয় দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন চট্টগ্রামের তরুণ গবেষক শেখ গোলাম সরওয়ার জহিরউদ্দিন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত ছকে তাঁর প্রবন্ধটি বিন্যাস করায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীতের পরিচয় সংক্ষেপে উঠে আসে। তিনি বিভিন্ন আদিবাসী সঙ্গীতের শ্রেণীকরণ, মূল্যমান নির্ধারণ ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের উপর বিশ্লেষণমূলক তথ্য ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

অতঃপর উপস্থাপিত প্রবন্ধ দুটির ওপর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নোত্তর শেষে অধিবেশনের সভাপতি প্রফেসর আফসার আহমদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই অলোচনা যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি সময়োপযোগী। এই অঞ্চলের আদিবাসী জনগণ আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর অপরিহার্য অংশ। তাঁদের নিজ নিজ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে যা রক্ষা করা জরুরী। উপরন্তু তারা আমাদের বৃহত্তর জাতিসত্তার অবিভাজ্য অংশ। তাঁদের নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির পরিচয় ছাড়া আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনি বাংলাদেশের পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলের সকল আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ ও সংরক্ষণের উপরেও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

উপস্থাপিত প্রবন্ধ দুটির নানা দিক আলোচনা করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আরো পরিকল্পিত ও তথ্যানুসন্ধানী কাজ প্রয়োজন। বাংলরাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি প্রস্তাব করেন, সোসাইটি আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামূলক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প হাতে নিতে পারে।

অতঃপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক: রীতা ভৌমিক ও আইউব সৈয়দ

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অ

অওশন কইন্যা ২৮৮
অংখেচ্ছা ৭৫
অন্ধ্রাদেশ ১২২
অজয় ভট্টাচার্য ১৮
অজিত ঘোষ ৬৯
অতুল চন্দ্র নাথ ২৬
অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৯
অনন্তপুরের বাবু ২৬
অনাথ চক্রবর্তী ২৬
অন্ধের চক্ষু ২১
অভয় আশ্রম ১৫০
অমরকৃষ্ণনাথ ২৬
অমিয়ভূষণ ঠাকুর ১৮
অশ্বিনী কুমার দত্ত ২০৩
অষ্টগান ৪৭, ৪৯, ১৫৬
অসহযোগ আন্দোলন ২৫
অস্ট্রালয়েড ২২৪
অস্ট্রিক ৩৪০, ৩৪৬

আ

আইন-ই-আকবরী ৭৮, ১৯২
আইরির গান ২৯০
আউল-বাউল-পীর মুর্শিদী গান ৩৬৩
আকিকার গান ২৯০
আখাউড়া ১০, ১৬, ১৮, ২০
আজিমুদ্দিন ২০৫
আঞ্চলিক গান ১০৪
আড়ং ২৫৪
আদি নরডিক ২৩৪
আদি-অস্ট্রালয়েড ২৭৪
আদিবাসী লোকসঙ্গীত ১০৯, ২৩১
আনন্দমোহন কলেজ ২৪৪
আনুষ্ঠানিক গীত ৮০, ২২৭
আফয়ে ১২৮
আফ্রিকা ১২৫
আবদুল আলী ১১২
আবদুল ওদুদ ৮৬
আবদুল ওয়াহেদ ৭, ১০, ১৮, ৮৬
আবদুল কাদের বয়াতী ২০৫
আবদুল গণি বয়াতি ২০৪
আবদুল গফুর হালী ৭৬
আবদুল বারী শাহ ৭
আবদুল মান্নান সরকার ৩১
আবদুল হালিম বয়াতী ১৫১
আবদুল্লাহপুর জামে মসজিদ ২৭
আবদুস সাত্তার চৌধুরী ৭৪
আব্বাস উদ্দীন ২২
আবু কাওয়াল ৮৫
আবু জাফর ৮৬
আবুল হাশেম ৬৯
আব্দুল আলীম ২২
আব্দুল কাইয়ুম মাস্টার ১৮
আরকান প্রদেশ ৭৬
আরব ৯৭
আরবি ৭৩
আরাকান ১২২
আলকাপ ৩২২
আলোমতির পালা ৫৬
আশুতোষ ভট্টাচার্য ২১৬, ৩১৯
আশুরা ১০
আসকর আলী পণ্ডিত ৮৯
আহকামুছ ছালাত ২০৭

ই

ইউসুফ জোলেখা ৭৭
ইসলাম খান চিশতী ১৩৯
ইসলামাবাদ ৭৩
ইসলামি সঙ্গীত ৮৫, ৩৬৪
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ৪, ২১৩, ২৩৪

ঈ

ঈদু বিশ্বাস ৬৮
ঈদুল আজহা ৭৪
ঈদুল ফিতর ৭৪
ঈশা খাঁ ২১৫

উ

উকিল কাওয়াল ৮৫
উদাসিনী গান ২৩২
উবাগীত ১২৯, ১৩১
উল্টা গান ৭৮, ১০১

ঊ

ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ২৫

এ

এ.এন. আখতার ৮৯
একতারা ২০, ৩১, ৩৮

www.pathagar.com

একদিল পীরের গান ৪৯, ২৩০, ৩১১
একুশে বইমেলা ১৫১
এ.কে.এম হারুনুর রশীদ ১৮
এগারসিন্দু ২১৩, ২৪৬
এম এস আখতার ৮২
এয়াকুব আলী ৮৫

ঐ

ঐতিহ্যপ্রীতি ১০৬
ঐদারা দীঘি ২৭

ও

ওয়ারিশ পণ্ডিত ৯৮
ওরাওঁ ৩৩২
ওলিদাগোনি গীত ১২২
ওসমান শাহ ৭

ক

কইন্যা আনোয়ারের কলি ২৮৭
কক্সবাজার ৭৫, ৭৬, ৯১-৯২, ১১৮
কক্সবাজারের ভাইট্টাল গীত ৯৯
কচুয়া দরগাহ ২৭
কনে বিদায়ের গান ১৭১, ১৭৬
কনে সাজানোর গীত ১৭১, ১৭৫
কবি আজিজুর রহমান ৩৬
কবি জয়দুল হোসেন ২১
কবি দাদ আলী ৩৬
কবিগান ২৪, ২৬, ৬৪, ৭০, ৭১, ৮২, ১০৮, ১৪৪, ১৫২, ১৮২, ৩০২, ৩২৬
কবিতা ৩১৫
কবিয়াল কুমুদ চন্দ্র শীল ২৪
কবিয়াল রমেশ শীল ২৩
কবির লড়াই ৪৬
কমর আলী ৯৮
কমলাসুন্দরী দীঘি ২৭
করতাল ২০, ৩১, ৩৮
কর্মসঙ্গীত ১০০
কলিকালে গান ৩০
কলিরাজা ২৮৭
কাইলেক ১২৯
কাওয়ালি ১৯, ১৪৫
কাঙ্গাল হরিনাথ ৩৬
কাজী মিয়াজান ৩৬
কাঞ্চনপুর দরগাহ ২৭
কাদেয়ানি ২১৫
কাপাসিয়া ১৭৭
কাপ্তাই ১২১
কাপ্যা ১২৭
কাব্য সঙ্গীত ১২৬
কামরূপ কামতা ২৭৫
কামানখোলা জমিদার বাড়ি ২৭
কারকুন ২১৫
কারবালার ময়দান ৯
কারাম ৩৩২, ৩৩৪
কালামিয়া গাইন ১১২
কালি বৈষ্ণবী ২০১
কালীকৃষ্ণ নট্ট ২০৪
কাসিদা ১৪৫
কাহানীর গান ৩২৭
কাহ্নপাদ ১৯৫
কিচ্ছাকাহিনী গান ২০, ১৭৮, ২৩০, ৩১৩
কিন্নরগীত ৫৯
কিরাতস ৪
কিশোরগঞ্জ ১৪১
কীর্তন গান ২৪, ২৮, ৬৭, ৭১, ৮০, ১২৬, ২৬৫, ২৭৬, ৩০২, ৩৪৭, ৩৬৪
কুকি ১২৫
কুচুক হা-সিকাম কামানি ১২৩
কুতুবদিয়া ৯৪
কুমারগুপ্ত মাহেন্দ্রাদিত্য ১৫০
কুয়াতুল মুমিনীন ২০৭
কুষান গান ২৮৮
কুষ্টিয়ার লালন ফকির ২৩
কৃষক আন্দোলন ২৪৬
কৃষি বিদ্রোহ ৩৭
কৃষ্ণ কুমার মজুমদার ৩২
কৃষ্ণ গোপাল বাউল ৩৩
কেনারাম ২১৮
কেল্লাবাবার গান ১৯
কোচবিহার ২৭৫
কোচুক হে সিকাম তান্নায় ১২৭
কোলকাতা ২০০
কোলাপাড়ার বাবু ২৬
ক্যাম্পাছারর গান১০৪
ক্লু বং প্লাই ১৩০

খ

খমক ৩১, ৩৮
খরমপুরের গান ১৮
খাজা বাবা সান ১৬৭
খাথাদকা ২৬৯
খাবি রিংয়া ২৬৯
খাম্বা থোইবী জগোই ৩৯৫
খাসিয়া লোকসঙ্গীত ৩৫০

www.pathagar.com

খিয়াং ১২০, ১৩৫
খুল্লুরা ২০, ২৯, ৩১
খুনুং ঈশৈ ৩৯৫
খুমকামনি ১২৩
খুমি লোকসঙ্গীত ১২৯
খুমি শিল্পগোষ্ঠী ১৩৫
খুলং ঈশৈ ৩৯৫
খোংজোম ঈশৈ ৩৯৫
খোমা ২০
খোয়াসাগর দীঘি ২৭
খোরশেদ আলম ২০৫
খ্রিস্টীয় কীর্তন ৪৯

গ

গগন হরকরা ৩৬
গঙ্গতলীয় থামানি ১২৩
গঙ্গাচরণ আচার্য ১৫২
গণসঙ্গীত ৩৫১
গম্ভীরা ৩২১
গহর বাদশা ৩১৫
গাইনের গীত ২৬৫
গাছাগান ১০১
গাজীপুর জেলা ১৩৯
গাজীর খামার ২৪৭
গাজীর গান ৪৯, ৫৪, ৬৫, ১৮৩, ২৭৭, ৩৬০
গাজীর গীত ৯৯, ৩৮৪
গাতার গান ৬০
গাম গান ৩৪২
গায়ে হলুদের গীত ২৫৬
গারো লোকসঙ্গীত ২৬৯, ৩৫১
গারোদের অবস্থান ২৭১
গারোদের বাদ্যযন্ত্র ২৭১
গার্শির গান ৬৭, ১৮৪
গিরীন চক্রবর্তী ২, ৩, ১৫, ১৮
গীত-গান ৪৬
গুনাই বিবির পালা ৫৭
গুপ্ত ১৩৮
গুরুসঙ্গীত ২৭৭
গেংগুলি ১২২
গো হত্যা নৃত্য ১৩১
গোপালগঞ্জ ১৪২
গোপীচন্দ্রের গান ২৮৩
গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ৫
গোমতী ৪
গোয়ালীর ছড়াগান ২৮৪
গোরক্ষনাথের গান ৫, ২৭৭, ২৮৫, ৩২৭
গোরক্ষবিজয় ৫
গৌরাঙ্গ চন্দ্র জলদাস ৮৮

ঘ

ঘনাই বিবি ৩১৪
ঘাটু গান ১৪৩, ২৫০, ২২৯, ২৩৯, ৩৪৮
ঘুঙ্গুর ৪
ঘুমপাড়ানি গান ১০১, ১৭৭, ২৯০

ঙ

ঙ চোয়ে আকাহ ১২৮

চ

চটক ২০
চটকা ২৭৬
চট্টগ্রাম ৭৩, ৮৭
চড়ক পূজার গান ৩৮৪
চণ্ডিদাস গোসাঁই ৬৭
চন্দ্র সরকার ১৯৯
চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ১৫০
চন্দ্রঘোনা ১২১
চন্দ্রবংশ ৪
চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ১৯২
চম্পাগাজী ৯৮
চরকের গান ২৭৯
চর্যাপদ ১০, ২১০
চা বাগানে আদিবাসী লোকসঙ্গীত ৩৬০
চাকগান ১৩০
চাকমা ৯৫, ১২০
চাকমা বারমাসীসমূহ ১৩১
চাকমা লোকসঙ্গীত ১৩০, ১৩১
চাকমা শিল্পগোষ্ঠী ১৩৫, ১৩৫
চাকলা ১
চাগায়াং ১২৭
চাটগাঁও ৭৪
চাদিগাঙ-ছারা ১২২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৮০
চিশতিয়া শিল্পীগোষ্ঠী ১৯

ছ

ছড়াগান ২৯০
ছন কবির গান ৩১৫
ছাদ পেটানো গান ১৯, ২৩১, ৩৫২
ছেলের কথা ৩৪

জ

জগন্নাথ কলেজ ২২
জয়নবের বিলাপ ১৫৩
জয়নুব বাদশা ২৮৭
জয়পুরহাট ৩১০

www.pathagar.com

জল ভরণ ও বর কনের স্নানের গীত ১৭৪
জলধর সেন ৩৬
জলসাগর ৮৭
জসমত খাঁ ২৮৭
জাইট ১২৯
জাখা মারা গীত ২৭০
জাগ গান ১৪৫, ২৮৫, ৩০১, ৩২৬
জাগরণের গান ৬৬, ১৮৩
জান গান ৩৪২
জামালপুর ১৪০, ২২৪, ২৪৫
জারি গান ২, ৯, ১৯, ৩২, ৫৯, ৬৪, ৭০, ৭১, ৭৮, ১০৩, ১৪৩, ১৫৩, ১৮২, ২২৫, ২৩৭, ৩০২, ৩৪৮, ৩৬০
জালেম বাদশা ৪৫
জাহাঙ্গীরনগর ১৩৯
জিকরনামা ২০৭
জিল-বাংলা ২২৪
জীবন পণ্ডিত ৯৮
জুম নৃত্যগীত ১৩২
জুয়াংফা ১২৭
জেলকদ বাদশা ২৮৮
জোয়ান অব আর্ক ৩৯১
জ্বালনধারা ৯৬
জ্বালন্ধরী ৯৬

ঝ

ঝাঁড়ফুকের গান ৮১
ঝাণ্ডির গান ৩২৬
ঝাপুড়ির গান ৩১৩

ট

টংক আন্দোলন ২৪৬
টাঙ্গাইল ১৪১, ২৩৪
টান ২০
টিপরা ৯৫, ১০৯
টেরাকোটা মন্দির ৩৭

ড

ডাকগান ১৪৫, ২৭৯
ডাকাতিয়া ৪
ডান্টা গান ৩৪২
ডুগডুগি ২০

ঢ

ঢাকা ১৪৯
ঢাকা দাঙ্গা ১৫০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২২
ঢাকিবাদ্য ও নাচ ৮০
ঢাকেশ্বরী মন্দির ১৩৯, ১৫০
ঢুগ্গি ২০
ঢোল ২০

ত

তঞ্চঙ্গা ১০৯
তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পগোষ্ঠী ১৩৫
তফু মোল্লাহ সরকার ৬৯
তবলা ২০
তর্জা গান ১৪৩
তাকিয়া বাড়ি ২৪
তামাসাখানা ৮৭
তাম্রশাসন ১৬২
তিতা খাঁ জামে মসজিদ ২৭
তিস্তাবুড়ি ২৭৮
তুকখা ২৭৭
তুর্কী ৯৭
তেভাগা আন্দোলন ২৪৬
ত্রিনাথের গান ১৮৪
ত্রিপুরা ১২০
ত্রিপুরা গান ১২৭
ত্রিপুরা ভৈরব ১২৬
ত্রিপুরা শিল্পগোষ্ঠী ১৩৫
ত্রিপুরা সারং ১২৬

থ

থাবল চোংবী ৩৯৬
থোইবী জগোই ৩৯৬

দ

দক্ষিণা রায়ের পালা ৫৪
দনওয়াজ ২৭৪
দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপ ১৯২
দাঁড়িয়াল ২০২
দাঁসাই গান ৩৪২
দায়েম শাহ মসজিদ ২৭
দালালবাজার মঠ ২৭
দালালবাজারের জমিদার বাড়ি ২৭
দিগুয়াল ভাইয়ের গান ২৯১
দুখের পালা ৫৭
দুদ্দুশাহ ৬৭
দুর্গাচরণ দাস ১৮
দুর্গাপূজার গীত ৩৬৫
দুলা মিয়া মাস্টার ১৮
দেউলি ২৭১
দেওয়ান শরীফ খাঁ ১৬১

www.pathagar.com

দেয়াঙ্গ ৮৭
দেহতত্ত্ব গান ৬৭, ১৪৪, ১৬৬
দোতরা ২০, ৩১, ৩৮

ধ
ধর্ম ৩৯৯
ধর্মপূজার গান ২৭৭
ধান ভানার গান ২৩৬
ধামাইল গান ৩৬৫
ধামালী গান ২৩৮
ধুয়াগান ৬৫, ১৪৪, ১৫৫, ১৮২, ২৩৪, ৩০২

ন
নওগাঁ জেলা ৩২০
নকুলেশ্বর দাস ১৯৯
নছিমন গান ৪৪, ৪৫, ৪৭
নটীগান ২০
নটুয়া সঙ্গীত ২৭৮
নবাইংলা ১২৮
নবীতত্ত্ব গান ১৬৫
নবীনচন্দ্র সরকার ১১৩
নবীবংশ-রসূল চরিত ৯৭
নরসিংদী ১৩৯, ১৬১
নাইক্ষ্যংছড়ি ১২১
নাওদৌড়ানির গান ২, ১৯
নাওগুম ঈশৈ ৩৯৫
নাগ জনগোষ্ঠী ২১৪
নাগল্যান্ডেই ১২৫
নাছির আহমদ ৮৬
নাটোর জেলা ৩২০
নাথ গীতিকা ১৩৮, ১৯৫
নাথধর্ম ৫
নাথসাহিত্যে ৫
নামকীর্তন গান ১৮৩
নারায়ণগঞ্জ ১৪০
নাল ২০
নাসির উদদীন বলবন ৩১০
নিগ্রোয়েড ২২৪
নির্ব্বাণ সঙ্গীত ৩৮৪
নিমাইচন্দ্রের গান ৩১৪
নিরঞ্জন শীল ২০২
নীল চাষ ৩৭
নীল বিদ্রোহের স্মৃতি ২৪৫
নীলকুঠি ৩৭, ২১৩
নীলমণি চক্রবর্তী ১৫২
নেত্রকোনা ১৪০
নৌকা বাইচের গান ১৪, ৮৫, ৩৫০, ৩৬৫

প
পঞ্চায়েত ৩৯১
পটগান ৫৯, ৬৫, ১৮২
পণ্ডিত প্রভাত চন্দ্র দাস ৩৩
পদাবলী কীর্তন ৪০
পদাবলী কীর্তন পালা ১৮৩
পদ্মাপুরাণ গান ৩৯, ৪৮
পদ্মার নাচন ৩৮, ৪৮
পরগনা ২৩৪
পর্তুগিজ ৭৩, ৯৭
পাইন্না সারি ৭৯, ১০২
পাংখোয়া লোকসঙ্গীত ১৩২
পাংখোয়া শিল্পগোষ্ঠী ১৩৫
পাঁচালী গান ৫৫, ২৭৬, ৩০৩, ৩৮৪
পাগলা কানাই ৬৮
পাগলি ৪
পাঞ্জুশাহ ৬৭
পাঠান ৯৭
পাতারা বা লহড়া ৩১২
পাতিল ২০
পাবনা ২৯৮
পাবনা কৃষক বিদ্রোহ ২৯৯
পারান পণ্ডিত ৯৮
পাল বংশ ৩৬, ১৩৮
পালংকি ৭৫
পালকির গান ২৩৬
পালা গান ২০, ২৬, ৫৫, ৭০, ৭৭, ১২৯, ১৪৪, ১৫১, ২৮৫, ২৮৬, ৩৬০
পালোয়ানচি ৭৫
পুঁথি গান ৭৭, ১৭৮
পুনদা তানমানি ১২৩
পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ২১৬
পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ১৯৫
পেনা ঈশৈ ৩৯৫
পেয়ারা বেগম ২০৫
পৌরাণিক যুগ ৩৮৯
প্যানোয়া ৭৫
প্রচলিত ত্রিপুরা লোকগীতি ১২৭
প্রবাল দ্বীপ ৭৫
প্রশান্ত মহাসাগরীয় ১২৫
প্রাচীন বৈষ্ণব গান ৩৬৪
প্রাচীন যুগ ৩৮৯
প্রেম সঙ্গীত ১৬৮, ৩৩৭, ৩৪০
প্রেমজুড়ি ৩৮

ফ
ফকির আফতাবউদ্দিন ৩
ফকির আশরাফুর রহমান ২৮

www.pathagar.com

ফকির বিদ্রোহ ২৪৫, ২৪৬
ফকিরি গান ৫৮, ১৮৪
ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ৭৪
ফতেহাবাদ ৯৪, ১৮০
ফয়সল আহকাম ২০৭
ফরায়েজি আন্দোলন ৩৭
ফরাসি ৭৩, ৯৭
ফরিদপুর ১৪১, ১৮০
ফলৌগান ৬০
ফসল তোলার গান ১৯
ফাগুয়া ৩৩৫
ফাজিল নাসির ৯৮
ফাতেমার জারি ২৭৬
ফুল ছিটানো গান ১৭৬
ফুলপাট গান ৮২, ১০১

ব

বকশ আলী ৯৮
বগুড়া ৩১০
বড় মসজিদ ২৭
বধূ বরণের গীত ১৭৩
বনবিবির পালা ৫৪
বন্দনা গীতি ৭৭
বন্ধুআলা ২৭৮
বম লোকসঙ্গীত ১২৯
বর পক্ষের প্রতি রসিকতাসূচক গান ১৭৬
বর বরণের গীত ১৭১
বর যাত্রার গান ১৭৫
বর সাজানোর গীত ১৭০
বরন ডাহানির এলা বা বৃষ্টি ডাকার গান ৪০০
বরস্যা গান ৩০০
বরিশাল ১৯২
বরেন্দ্র অঞ্চল ৩১০
বর্তমান যুগ ৩৮৯
বর্মণ ১৩৮
বলবন ১৯২
বল্লাল সেন ১৩৯
বাউনী বাউনী ১২৭
বাউল গান ২, ১০, ৩৭, ৮৩, ১২৬, ১৪৩, ১৫৭, ২২৯, ২৪৯, ২৮৯, ৩০৩, ৩২৭
বাউলসম্রাট লালন সাঁই ৩৬
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২৪৪
বাঁশি (আরবাঁশি) ২০
বাকলা সরকার ১৯২
বাঘা যতীন ৩৬
বাঙালি ২১৮
বানচন্দ্র তর্কালঙ্কার ৩, ১৮
বানাইগীত ২৭১
বান্দরবান ৭৬
বান্ধা গীত ৩৮৩
বাবু গুরুচরণ রায় ২৬
বাবু ভগিরত দাস ২৬
বারোমাসি গান ২৯, ৩২, ৬৭, ৮১, ১০০, ১৮৪, ২২৯, ২৩৮, ২৫৯, ২৮৫, ৩২৩, ৩৫২, ৩৬০
বাসুদেব ২১
বাহা উৎসব ৩৪১
বাহারুল্লাহ ৯
বিচার গান ৭১, ১৪৩, ১৫২, ১৮৩, ৩০৩
বিচ্ছেদ গান ২, ২৩৬
বিজনী ৪
বিজয় সেন ৩১৯
বিষ্ণু ২০
বিবিধ ১০৬
বিয়ের গান ২৪, ৩৪, ৪৬, ৮৩, ১৬৯, ২২৭, ২৫৬, ২৫৭, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৫১, ৩৬০
বিয়ের পূর্ব ৮৩
বিরহ বিচ্ছেদ ১৬৮
বিলাপ ১০৩
বিষয় ও বৈচিত্র্য ১০৪প্রেম-বিরহ ১০৪
বিষহরার গান ২৮৬
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা ৩৯৮
বুকানন হ্যামিলটন ২৭৪
বৃষ্টির গান ৮০, ২৩৫, ২৫৪
বেণাকুশার গান ২৮৮
বেদেদের গান ২০, ৮১
বেয়ারা গীত ৫৮
বেহালা ২০, ৪০
বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী ১৫২
বৈষ্টম বাউদিয়ার গান ২৮৯
বৈষ্ণব গান ১৪৯, ২৮৯
বৈষ্ণব সরকার ১৯৯
বোম ৯৫
বৌদ্ধ ৪
বৌদ্ধ দোহা ২১০
বৌদ্ধধর্ম ৪
ব্যাঙ বিয়ের গান ২২৯
ব্রতগান ৩৫১
ব্রহ্মপুত্র ১

ভ

ভগবানপুর ২৫
ভজন গান ১৫৭, ২৩৭
ভট্টসঙ্গীত ৩৬০
ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ১৯২

ভাওয়াইয়া গান ১৩২, ২৭৬, ২৯১
ভাটি-ভাইট্যা-বাঙ্গাল ২১৩
ভাটিয়ালি ২, ৭, ৮৮, ১৪২, ১৫৭, ২৩১, ২১৮, ২৩৬
ভাণ্ডারি সঙ্গীত ২৮
ভানুবিল কৃষক আন্দোলন ৩৯০
ভাবগান ৫৮, ৬৬, ১৮৩
ভাষা আন্দোলন ২৫
ভাসানযাত্রা গান ৫৬, ৩০২
ভাসিনীমোহন ৭০
ভিক্ষুক সঙ্গীত ১৫৭
ভুবন রায় ১৮
ভুবন রায়ের গান ২০
ভেড্ডিড ২৭৪

ম

মইষাল গান ২৯১
মকবুল আহমদ ১১২
মঙ্গলাগান ৩৬৫
মঙ্গোলয়েড ২২৪, ৩৪৬
মঙ্গোলীয় ২৭৪
মজিদ-মালতির কবিতা ৩১
মজুপুর মটকা মসজিদ ২৭
মঞ্চ গান ২৩০
মণিপুর ১২৫
মণিপুর ঘাট ২১৪
মণিপুরী ৩৮৯
মণিপুরী মৃদঙ্গ বাদন ৩৯৯
মণিপুরী মৈতৈ লোকসঙ্গীত ৩৫০
মৎস্যেন্দ্র নাথ ৫
মতুয়া সঙ্গীত ১৮৪
মধুবানু মসজিদ ২৭
মধুমালার গান ২৮৫
মনমোহন দত্ত ১৮
মনমোহন দাস ৮৯
মনসা মঙ্গলের গান ২৭৯
মনসার গান ৩২৭, ৩৮৪
মনসার ভাসান ২৭৮
মনোজ বিশ্বাস ৭০
মনোমোহন দত্ত ৩
মনোরঞ্জন ঠাকুর ১৫২
মনোরঞ্জন শীল ২০২
মনোহরা বৈষ্ণবী ২০০
মন্দিরা ২০
মফিজ উদ্দিন ২০৫
ময়নামতির গান ৫
ময়মনসিংহ ১৪০, ২১০, ২৪৩
মরমীয়া সঙ্গীত ২৭৯
মর্সিয়া ১৪৫, ২৩১, ২৮৮
মলয় ঘোষ দস্তিদার ৭৫
মহরম ১০
মহরমের জারি ২৭৬
মহাজনী গান ১৬৩
মহাত্মা গান্ধী ১৫০
মহাভারত ৯৭
মহামায়া বৈষ্ণবী ২০১
মহাস্থানগড় ৩১০
মহিম চন্দ্র নন্দী ১৫২
মহেশখালী ৯৪
মা আনন্দময়ী ৫
মাইজভাণ্ডারি গান ২৮, ৮৪, ৮৮, ১০৭
মাইজভান্ডারি মরমীগোষ্ঠী ৮৪
মাইজভান্ডারি সাংস্কৃতিক পরিষদ ৮৪
মাইবী জগোই ৩৯৬
মাখম গোসাঁই ২০১
মাগনগান ১৫, ২২৮, ২৭৭
মাঙ্গার গান ৩০১
মাছধরা গান ৫৯
মাছের বিয়ার গান ২৯১
মাজার সঙ্গীত ২, ১৫৩
মাজেরা ৪
মাড়োয়ার গীত ২৭৯
মাণিকগঞ্জ ১৪০
মাতারবাড়ী ৯৪
মাদই-সরালের এলা বা মাদই-সরালেল গান ৪০০
মাদার ৩১৪
মাদারীপুর ১৪১
মাদারের গান ২৭৭, ৩২৭
মানস পাল চৌধুরী ৮১
মানিক পীরের গান ৪১, ৪৮, ৬৬, ১৮৩, ২৭৭, ৩২৭
মানিকচন্দ্র রাজার গান ২৮৩
মানিকচন্দ্রের গান ৫
মানিকপাল রাজা ২৮৭
মানিকী গান ৫৭
মামিতা ১২৭
মারফতি গান ৬৭, ৮৮
মারমা ৯৫, ১০৯, ১২০
মারমা লোকসঙ্গীত ১২৭
মারমা শিল্পগোষ্ঠী ১৩৫
মারমা সঙ্গীত ও নৃত্য ১২৩
মারেফতি গান ১৬, ৮২, ১০৭, ১৪৪, ১৫৫, ২৭৭
মার্শিয়া জারী ৩২৬
মালজোড়া ১৫১, ৩৪৯, ৩৮৪
মালসী গান ২২৮, ২৩৫, ২৮৮, ৩২৪

www.pathagar.com

মালিক সোবহান ৯৫
মিজোরাম রাজ্য ৭৬
মীননাথ ৫
মীর কাসিম আলী খান ৭৩
মীর মশাররফ হোসেন ৩৬
মীর্জা হোসেন আলী ৩, ১৮
মুকুন্দ ঘোষ ৬৯
মুকুন্দদাস ২০৩
মুগল ৯৭
মুগল সুবাদার ইসলাম খান ১৪৯
মুঘল সম্রাট আকবর ২৩৪
মুন্সি মোজাহারউদ্দিন ৬৯
মুন্সিগঞ্জ ১৪০
মুরং ১০৯
মুর্শিদাবাদ ১৫০
মুর্শিদি গান ২, ১৬, ৪৩, ৮৪, ১৫৪, ১৬৬, ১৮৩, ২২৬
মুসলমানির গান ৪৬, ৪৭
মুসলিম ৪
মুসলিম বিয়ের গান ৩৪, ১৬৯, ৩৮৪
মুসলিম শাসন ৭৩
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫
মূলকুতের রহমান ৮৪
মৃদঙ্গ ৩৮, ৪০
মেঘনা ১
মেঘরাজার গান ১৫
মেঘার গান ২৭৭
মেদিনীপুর ২০৪
মেয়েলি গীত ৭, ১৯, ৮১, ৮৮, ১৫৪, ১৬৯, ২২৭, ২৩৬, ২৫৬, ২৮৯, ৩০০, ৩১২, ৩২৫
মেরাজতত্ত্ব ১৫১
মেহেদী তোলা ও বরকনের হাতে মেহেদী পড়ানোর গীত ১৬৯
মেহের চাঁন ৬৮
মৈমনসিংহ গীতিকা ১৯৫, ২১০
মোগল ৭৩
মোগল সাম্রাজ্য ১৮০
মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৩৯
মোঙ্গলীয় ৭৩
মোনাসেফ বয়াতী ২০৫
মোহন বাঁশি ১১৩
মোহাম্মদ নাসির ৮৩, ৮৬
মোহাম্মদ হাশেম ২২, ২৩
মৌর্য শাসন ১৬২
ম্রো ১২০
ম্রো বা মুরং লোকসঙ্গীত ১৩০
ম্রো শিল্পগোষ্ঠী ১৩৫

য

যাত্রা গান ২০, ২৪, ২৬, ৬৭, ৭১, ৮৩, ১৮৩, ৩০২
যামিনীকান্ত ১৯৮
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ২৫
যুগীকাস ৩১৪
যুগীর গান ২৭৭, ৩২৬

য়

য়্যাচড়া পূজার গান ৬৭

র

রংপুর ২৮৩
রঙ মহল ৮৭
রদুঃ উদিংনা রদুঃ জইং মাউইজিয়া রদু ১২৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৬
রমেশ শীল ১১৩
রয়ানী ১৯৪
রশীদ কাওয়াল ৮৫
রসময় সরকার ৬৯
রহিম সাধুর গান ২৮৪
রাইধ্বনী বৈষ্ণবী ২০১
রাখাইন ৯৫
রাখালিয়া গান ২৮৮
রাগ-গোমতী ১২৬
রাঙ্গামাটি ৭৬, ১২০
রাজবাড়ী ১৪২
রাজশাহী ২৯৮, ৩১৯
রাজা ধনপদ সিংহ ১৬১
রাজা মাগধী ৭৪
রাজাউল্লাহ ২০৫
রাধারমন বৈষ্ণব ২০১
রাম পম্লাং পম্লাই ১৩০
রামকীর্তন ৪০, ৪৭, ৪৯
রামগতির রানী ভবানী কামদা মঠ ২৭
রামদাস বাউল ১৬৪
রামমঙ্গল ৪০
রামায়ণ গান ৭১
রামায়ণীঃ রে-রে ২৬৮
রায়পুরের কেরোয়া গ্রামের জ্বীনের মসজিদ ২৭
রিয়াজউদ্দিন মালিথার ৩৯
রোয়া লাগা গীত ২৭০
রৌশনাবাদ ১

ল

লক্ষ্মীণ বালান্দর ৩১৫
লক্ষ্মীর গান ২৭৮
লছীমন গান ৩০৩

www.pathagar.com

লনী মোহন দাস ৩১
লবচন্দ্র পাল ৩
লসিমন ৩১১
লাংগী রাজা নঅবুন্নায় ১২৭
লাগড়েঁ গান ৩৪২
লাঙ্গুঠ রাজান বুমনি ১২৩
লাঙ্যা ১২৯
লাছাড়ী গান ৩৮৪
লাঠি খেলার গান ২০
লালনসঙ্গীত ৩৭
লিঙ্গুয়ফ্রাঙ্কা ১২১
লুংদি ১২৮
লুসাই লোকসঙ্গীত ১৩২
লেওয়াতানা ২৭০
লেটো গান ৪৭
লেবাং ১২৭
লৈশেম জগোই ৩৯৬
লোক সঙ্গীত ১২৬
লোককবি আক্তারুজ্জামান ২৫
লোকজগান ১৩২
লোকদেবী ৩৮
লোকবাদ্যযন্ত্র ২৮০
লোকসঙ্গীতে বদর পীর ৮২
ল্যাটিন আমেরিকা ১২৫

শ

শব্দকর ৩৬২
শব্দগান ৪৬, ৪৭
শরৎবালা ২০০
শরিয়তপুর ১৪২
শরীয়তুল্লাহ ৯
শলালিপি স্থাপত্য ১৬২
শাঁখমাল গান ৫৭
শাড়ী বানানী গান ২৯১
শামছ উদ্দিন বোখারি ২১২
শামছেল হক চিশতি ১৮, ১৯
শালবন বৌদ্ধবিহার ৪
শাহ কবির ২১২
শাহ কলন্দর ২১২
শাহ গোরা ৬
শাহ মাদার পীর ২১২
শাহ মুহাম্মদ সগীর ৭৭
শাহ মোহাম্মদ ইসরাইল (রঃ) ৬
শাহ মোহাম্মদ কামাল (রঃ) ৬
শাহ মোহাম্মদ নুরুদ্দীন (রঃ) ৬
শাহ মোহাম্মদ বোগদাদী (রঃ) ৬
শাহ রওশন ৬
শাহজাদা ৬
শাহপরি ৯৪
শাহবেলা ৬
শীতলক্ষ্যা ১৬১
শীতলা পূজা ২৭৭
শেফালী ঘোষ ২২, ২৩, ৭৯
শের আলী গাজী ২৪৭
শেরপুর ১৪০
শেরালী পাগল ৭
শেরালী পাগল ১৮
শৈ চিং প্রু১২৩
শৈলেন চক্রবর্তীর গান ২০
শৈলেশ দত্তগুপ্ত ১৮
শ্যামপুর দায়রা শরীফ ২৭
শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব ২২, ২৩, ৮০
শ্রমসঙ্গীত ১৫৬
শ্রী আনন্দস্বামী ৫
শ্রী বৈকুণ্ঠ গোস্বামী
শ্রীকৃষ্ণ ৪৪
শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর জিউ আখড়া ২৭
শ্রীমান নিকুঞ্জ বিহারী সেন ১৬২
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ১৬২
শ্রীরাধা ৪৪
শ্রীরামপুর রাজবাড়ি (রামগঞ্জ) ২৭
শ্রীহট্ট ৩৬২
শ্লোক ৩৪

স

সখিনার চৌতিশা ১৫৩
সঙযাত্রা ২৬৩
সঙ্গীতা সৌখিন শিল্পী গোষ্ঠী ২৬
সত্তরের নির্বাচন ২৫
সত্যপীরের গান ২৭৮, ২৮৬, ৩২৭
সন্ন্যাসী ২৪৫
সমতট ৪
সমাজ-চিত্র ১০৬
সম্রাট হরিচরণ আচার্য ১৯৮
সর্বভারতীয় সম্মেলন ১৫০
সর্বানন্দ সর্ববিদ্যা ৫
সলঙ্গ হত্যাকাণ্ড ২৯৯
সলঙ্গা বিদ্রোহ ২৯৯
সাইংগ্যাই ১২৮
সাঁওতাল ৩৩২
সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠী ৩৩৯
সাঁওতাল নৃত্যগীত ৩৩৬
সাঁওতালি ভিটা ২১৪

www.pathagar.com

সাগরভাসা পালা ৫৬
সাচিয়া কাম পন্নাই ১৩০
সাধক মনোমোহন দত্ত ৫
সামন্দর ৯৬
সারহুল উৎসবের গান ৩৩৬
সারি গান ২৪, ৫৯, ৬৫, ১৪৫, ১৫৫, ১৮৩, ২২৬, ২৩৮, ২৫২, ৩০১, ৩৪৮
সারিন্দা ২০
সারির নৌকার গান ৩২৫
সালদা ৪
সালিয়াজুরী ৪
সাহাপুর সাহেব বাড়ি ২৭
সিদ্দিকুর রহমান ২১
সিদ্ধাহাড়ির গান ২৮৪
সিনাইহানী ৪
সিমাসাঃ রে-রে ২৬৮
সিরাজগঞ্জ ২০৪
সিরাজদ্দৌলা ৩৭
সিলেট ৩৪৬
সুজনের গান ২০
সুধীর চন্দ্র নাথ ২৬
সুবল চন্দ্র মিত্র ৮৬
সুবল মিত্র ১১২
সুরেন চক্রবর্তী ৩, ১৮
সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন বলবন ৩১০
সুলতানি শাসনামল ১৩৮
সূর্যব্রতের গান ৩৬৪
সেন রাজত্ব ৩৬
সেন্টমার্টিন ৯৪
সেরেনজিং ২৬৯
সেলিনা রহমান ২১
সৈয়দ আব্দুল বারী শাহ ১৮
সৈয়দ আহমদ গেছু দারাজ ৬
সৈয়দ বাহাউদ্দিন ওরফে বেনু মিয়া ১৮
সৈয়দ মানজুর আল আহমদী ১৮
সোনা কাপড় ১৭৫
সোনাই ৪
সোনাউল্লাহ বয়াতি ৬৮
সোনাপীরের গান ২৮৫
সোনারগাঁ ১৩৮, ১৬১
সোনারায় ঠাকুরের গান ২৮৬
সোনারায়ের গান ২৭৭
সোরি গান ২৭৮
সোহরাই ৩৩৫
সোহাগ মাগার গীত ১৭৪
স্বদেশ প্রেম ১০৫
স্বদেশী আন্দোলন ৩১১
স্বভাব কবি রুহুল আমিন গেদু ২৪
স্বাথ্রাং ১২৮
স্বামী সত্যানন্দ ৫

হ

হং-অ-লা ১০২
হজাগিরি ১২৭
হযরত বদর শাহ ৭৪
হযরত রাশতি শাহ (রঃ) ৬
হযরত শাহ জালাল (রঃ) ৬, ৩৪৬, ৩৬২
হরিকৃপা চৌধুরী ১১২
হরিচরণ দাস ১৯৯
হরিশচর দরগাহ ২৭
হলুদ বাদশা ২৮৮
হাইল্যা সাইর ৭৯
হাইল্লা সারি ১০২
হাওড়া ৪
হাওর উন্নয়ন বোর্ড ২১৩
হাকিম চাঁন ৬৮
হাকীকাতুল আম্বিয়া ২০৭
হাজংদের লেওয়াতানা গান ৩৫১
হাজংদের লোকগীতি ২৬৯
হাজিয়া ২৬৯
হাজিরাতের গান ৩৬০
হাড়মালা ২১৫
হাতি খেদার গান ৭৮
হাপুগান ৩২৬
হায়দর আলী বয়াতি ২৯
হারমোনিয়াম ২০, ৪০, ৪৪
হালকা জিকিরের গান ৩১৪
হালদা ৭৯
হালদাফাড়া গান ১০০
হালুই গান ৬৫, ২৭৮
হালোই গান ১৮২
হাসান ১৫৩
হিন্দু ৪
হিন্দু মেয়ের বিদায় ৩৪, ১৭৪
হিরণবালা ২০০
হিরালের গান ৩৬০
হুদমা দেও ২৭৮
হেমাঙ্গ বিশ্বাস ৩৭৫
হেরোয়া ২৭৬
হোলি গান ২০, ৩৪৯, ৩৬৫
হোসেন ১৫৩
হোসেন বয়াতি ৩০
হ্যাঁচড়া পূজারগান ১৮৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীত

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি